আত-তাওহীদঃ

চিন্তাক্ষেত্রে ও জীবনে এর অর্থ ও তাৎপর্য

ড. ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

আত-তাওহীদ ঃ

চিন্তাক্ষেত্রে ও জীবনে এর অর্থ ও তাৎপর্য

মূলঃ
ড. ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী

অনুবাদঃ
অধ্যাপক শাহেদ আলী

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.icsbook.info

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)
বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬, ফ্যাক্স : ৮৯৫০২২৭,
E-mail: biit_org@yahoo.com , Web : www.iiitbd.org

প্রথম সংস্করণ : ১৯৯৮/১৪০৮ হিজরী
দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০১০
অগ্রহায়ণ ১৪১৭
জ্বিলহজ্জ ১৪৩১

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN: 984-8203-14-1

মূল্য : ২০০ টাকা

মুদ্রণ: চৌকস প্রিন্টার্স, ঢাকা-১০০০

This is a Bengali version of ***AL-TAWHID : Its Implication for Thought and Life*** written by Dr. Ismail Raji al Faruqi and published by the International Instiute of Islamic Thought (IIIT), USA, translated into Bengali by Prof. Shahed Ali and published by Bangladesh Instiute of Islamic Thought, House # 4, Road # 2, Sector # 9, Uttara Model Town, Dhaka-1230, Bangladesh. Phone: 8950227, 8924256, Fax: 8950227, E-mail: biit_org@yahoo.com Website: www.iiitbd.org
Price : Tk. 200, U.S $ 10

www.icsbook.info

প্রকাশকের কথা

ইসলামী উম্মাহর গৌরবময় বিকাশ ও দুঃখজনক অধঃপতনের ইতিহাস সত্যিকার অর্থে মানব ইতিহাসের একটি চিন্তা উদ্দীপক অধ্যায়। যে সমস্ত কার্যকারণ ইসলামী উম্মাহকে বিশ্বব্যাপী চিন্তা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের উচ্চতম শিখরে পদচারণায় সহায়তা করেছিল সেগুলোর ব্যাপক বিচ্যুতি কিভাবে ঘটেছে এবং তার ফলে মুসলমানগণ অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে তা নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও গভীর গবেষণা এবং ব্যাপক কার্যক্রম সুদীর্ঘ ইতিহাসে তেমন একটা দেখা যায়নি। খেলাফতে রাশেদার পতনের পর যদিও দেশে দেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধি ঘটেছে, সাংস্কৃতিক দিক থেকে মুসলমানদের একটা নরতর ধারা বিকাশ লাভ করেছে, তথাপি এটা সত্য যে, এসব উন্নয়নের সংগে ইসলামের মূল প্রাণশক্তির উন্নয়ন সমান্তরালভাবে ঘটেনি। ফলতঃ একটা পর্যায় অতিক্রম করার পর এই প্রাণশক্তির অভাবে ইসলামী সভ্যতা অধঃপতনের বলয়ে চলতে শুরু করে এবং বর্তমান শতাব্দীতে বিশ্বজাতিসমূহের মধ্যে মুসলিম জাতির অবস্থান সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে।

মুসলিম উম্মাহর রোগসমূহের মধ্যে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল 'তৌহীদের ধারণা' সম্পর্কে বিভ্রান্তি এবং দুঃখজনক অপর্যাপ্ততা। মুসলমানদের জীবনে আল্লাহর একত্ব কতখানি ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ মুসলমানরাই এ সম্পর্কে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারছেনা। এটি একটি অত্যন্ত গুরুতর আলোচনার বিষয়। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ব হচ্ছে ইসলামের মূল ও কেন্দ্রীয় শক্তি। মুসলমানদের জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে এর ব্যাপ্তি, সঠিকভাবে মুসলিম হিসেবে বেঁচে থাকা এবং মৃত্যুবরণ করা নির্ভর করে তৌহিদ সম্পর্কীয় সঠিক ধারণার উপর। মুসলমানদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম তৌহিদ এর ধারণাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

এই গ্রন্থটিতে শহীদ ড. ইসমাঈল রাজী আল-ফারুকী ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সবিস্তারে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। ইতিহাসের পথপরিক্রমায় বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির উত্থান ও পতনের ইতিহাস, দর্শন ও নৃতত্ত্ব থেকে তিনি আলোচনার উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ফলে তাঁর আলোচনা বিষয়টির অত্যন্ত গভীরে চলে গেছে এবং আলোচনাও প্রাণবন্ত হয়েছে। বস্তুতঃ গ্রন্থটি ড. ফারুকীর এক অনবদ্য সৃষ্টি বলতে হবে। এটি ইংরেজীতে রচিত। বইটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশ ইনিস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি আই আই টি) এটি বাংলায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলা সাহিত্যের একজন সুপন্ডিত ও কথাশিল্পী অধ্যাপক শাহেদ আলী সাহেব

www.icsbook.info

এ বইটি বাংলায় অনুবাদ করে যেমন বি আই আই টি'র ধন্যবাদার্হ হয়েছেন, তেমনি বাংলা ভাষার অগণিত পাঠককেও তিনি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর শারীরিক দুর্বলতা সত্বেও এ বইটির জন্য তিনি যে পরিশ্রম করেছেন সে জন্য আল্লাহর কাছে তাঁর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

অনুবাদ কর্ম একটি কঠিন কাজ। এ কাজের সম্পাদনাও সহজসাধ্য নয়। এই আয়াসসাধ্য কাজটি করেছেন জনাব আহমদ ফরিদ এবং ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান। তাঁদের কাছেও বি আই আই টি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে যাদের জন্য এ প্রয়াস সেই বিদগ্ধ পাঠক সমাজ এ অনুবাদ কর্ম থেকে উপকৃত হলে আমরা আমাদের শ্রমকে স্বার্থক মনে করব। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। বর্তমানে ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বইটির দ্বিতীয় সংস্করন প্রকাশিত হলো। আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন ॥

তারিখ: ২০১০ ইং
ঢাকা

প্রফেসর ড. মোঃ লুৎফর রহমান
ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিআইআইটি

www.icsbook.info

অনুবাদকের আরজ

বিরল মনীষার অধিকারী ইসলাঈল রাজী আল ফারুকী ইসলাম এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একজন অথোরিটি হিসেবে বিশ্বে মশহুর। তিনি ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক ইনটেলেকচুয়াল মোকাবেলার ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বে তাঁর তুলনা ছিলনা বললেই চলে। তাঁর গভীর পান্ডিত্য ও অন্তর্দৃষ্টি এবং রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অদ্ভূত জটিল সমস্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ইসলামের মৌলনীতিমালার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমাদেরকে অভিভূত করে। তাঁর স্কলারশীপ ও জ্ঞানের পরিধি এতই আকাশচুম্বি ছিল যে, ইহুদী ও খৃষ্টান পন্ডিতগণ তার মোকাবেলায় অসহায় বোধ করতেন। একারণে পশ্চিমা ইনটেলেকচুয়াল জগতে তিনি ছিলেন এক ভীতির পাত্র। শেষ পর্যন্ত এজন্য তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে ঘাতকদের হাতে জীবন দিতে হয় আমেরিকায়। এ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে কোন বিচার হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। ইসলামের পক্ষে ইনটেলেকচুয়াল জেহাদ চালাতে গিয়ে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী শহীদ হন।

ডক্টর ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী তাঁর জীবনকালে কয়েকবার ঢাকা এসেছেন। তিনি তখন করাচিতে Central Institute of Islamic Research এ প্রফেসর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সময়টা ছিলো ১৯৬১-৬৩ সাল। আমি তখন ইসলামি একাডেমীর কর্মাধ্যক্ষ। তখন প্রায়ই তিনি ঢাকা আসতেন। ইসলামিক একাডেমীতে তাঁর সঙ্গে ইসলামের বিবিধ প্রসঙ্গ ও সমস্যা নিয়ে প্রায়ই আমার দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হতো। Institute of Islamic Research এর জার্নালে তাঁর অতিশয় পান্ডিত্যপূর্ণ ও মূল্যবান প্রবন্ধগুলো ছাপা হতো। তারই কয়েকটি আমি অনুবাদ করিয়ে আমার সম্পাদিত ইসলামিক একাডেমী পত্রিকায় ছেপেছিলাম। মনে পড়ে, তাকে নিয়ে আমি ঢাকার উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো ঘুরে দেখিয়েছিলাম। আরও মনে পড়ে, তিনি তাঁর স্ত্রীর জন্য একটি ঢাকাই জামদানি শাড়ী কিনতে চেয়েছিলেন এবং কাঁঠাল ফল দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন করাচিতে একটি কাঁঠাল নিয়ে যাবেন। তাঁর সঙ্গে পরবর্তীকালে শেষ দেখা হয় ১৯৮০ সনে হোটেল পূর্বাণীতে এক আন্তর্জাতিক ইসলামিক সেমিনারে। সেই সেমিনারে আমি একটি ইংরেজী প্রবন্ধ পড়েছিলাম, মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা সমস্যা বিষয়ে। ড. সৈয়দ আলী আশরাফ এবং ড. ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী দুইজনেই আমার মতামতের পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ি যখন দেখি এমন এক মনীষী ও তাঁর স্ত্রীকে মুক্তচিন্তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বর্গ বলে বিজ্ঞাপিত মার্কিন মুলুকে ঘাতকদের হাতে জীবন দিতে হলো।

মনীষী ইসমাঈল রাজী আল ফারুকীর *আত-তাওহীদ* বইটি এর আগে আমি পড়িনি। পরম স্নেহভাজন সাবেক সিএসপি ও রাষ্ট্রদূত আহমেদ ফরিদ আমাকে বইটি বাংলায়

www.icsbook.info

অনুবাদের জন্য অনুরোধ জানালে আমি কাজটির গুরুত্ব অনুধাবন না করেই রাজী হয়ে যাই। ইতিপূর্বে আমি আল্লামা মোহাম্মদ আসাদের Road to Mecca এবং হিরোডোটাসের The History অনুবাদ করেছিলাম। এই দুইটি ছিল ভিন্ন প্রকৃতির পুস্তক। কিন্তু *আত-তাওহীদ* অনুবাদ করতে গিয়ে টের পেলাম কাজটি কতো দুরূহ। এ জাতীয় বই অনুবাদের জন্য যে স্কলারশীপ, যুক্তি ও বুদ্ধির যে প্রশিক্ষণের দরকার আমার তা নেই। তা সত্ত্বেও বন্ধুবর মনীষী ইসমাঈল রাজী আল ফারুকীকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের কাছে কিছুটা পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য এ গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করি। অনুবাদ আমি কতটা সফল হয়েছি সে বিচারের ভার সুধী সমাজের উপর। আমি একটা হুকুম পালন করে দায় সেরেছি মাত্র। আল্লাহ তায়ালা শহীদ ইসমাঈল রাজী আল ফারুকীর এই খেদমত গ্রহণ করুন।

তারিখঃ ১৯৯৮ ইং
বনানী, ঢাকা

অধ্যাপক শাহেদ আলী

www.icsbook.info

সূচিপত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মুখবন্ধ

প্রথম অধ্যায়

ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সারবত্তা ১৩

১. ধর্মীয় অভিজ্ঞতা স্বরূপ আত্ তাওহীদ ১৩

২. বিশ্ব দৃষ্টি হিসেবে আত্ তাওহীদ ২১

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের সার নির্যাস ২৮

১. আত্ তাওহীদের গুরুত্ব ২৮

২. ইহুদী ও খ্রীষ্টানধর্মে ঐশী উত্তরণ ৩১

৩. বিশ্ব সংস্কৃতিতে ইসলামের বিশেষ অবদান ৪০

তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের মৌলনীতি ৪৪

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানের মূলসূত্র ৪৯

১. সংশয়বাদ নয়, খ্রীষ্টানদের 'বিশ্বাসও' নয় ৪৯

২. ঈমান ঃ একটি জ্ঞান ও তাত্ত্বিক স্তর বা মান ৫১

৩. আল্লাহর একত্ব এবং সত্যের একত্ব ৫৩

৪. সহিষ্ণুতা ৫৬

পঞ্চম অধ্যায়

অধিবিদ্যার মূলসূত্র ৫৯

১. সুশৃংখল বিশ্বজগত ৬০

২. উদ্দেশ্যময় বিশ্ব ৬৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

নীতিশাস্ত্রের মৌলনীতি ৬৯

১. ইসলামের মানবিকতা ৬৯

২. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ৭৪

৩. মানুষের অপাপবিদ্ধতা ৭৫

৪. দেবতার প্রতিকৃতিতে ৭৮

৫. কর্মবাদ ৮২

৬. উম্মততত্ত্ব ৮৪

৭. বিশ্বজনীনতা ৮৬

৮. জীবন এবং জগত স্বীকৃতি ৯০

www.icsbook.info

সপ্তম অধ্যায়
সমাজ ব্যবস্থার মৌলনীতি ৯৩
১. ইসলামের অনন্যতা ৯৩
২. আত্ তাওহীদ এবং সমাজবাদ ৯৯
৩, তাত্ত্বিক তাৎপর্য ১০১
৪. ব্যবহারিক তাৎপর্য ১০৪
অষ্টম অধ্যায়
উম্মাহর মৌলনীতি ১১২
১. পরিভাষা ১১২
২. উম্মাহর প্রকৃতি ১১৪
৩. উম্মাহর অন্তর্গত প্রাণশক্তি ১২১
নবম অধ্যায়
পরিবার প্রথার মূলনীতি ১৪১
১. পৃথিবীতে পরিবার প্রথার অবক্ষয় ১৪১
২. সমাজের একটি গঠনমূলক একক হিসেবে পরিবার প্রথা ১৪২
৩. সমসাময়িক সমস্যাসমূহ ১৪৫
দশম অধ্যায়
রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি ১৫১
১. তাওহীদ এবং খিলাফত ১৫২
২. তাওহীদ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ১৬২
একাদশ অধ্যায়
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলনীতি ১৬৫
১. বস্তু ও আধ্যাত্মিকতার অপরিহার্য যুগ্ম অগ্রাধিকার ১৬৬
২. ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্বজনীনতা ১৭৭
৩. উৎপাদনের নৈতিকতা ১৮১
৪. উৎপাদনের নৈতিক নীতিমালা ১৮৩
দ্বাদশ অধ্যায়
বিশ্ব ব্যবস্থার মৌলনীতি ১৯২
১. বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ১৯২
ত্রয়োদশ অধ্যায়
সৌন্দর্যতত্ত্বের নীতিমালা ২০১
১. মুসলিম শিল্পের একত্ব এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বীগণ ২০১
২. নন্দনতত্ত্বের অতীন্দ্রিয়তা ২০৫
তথ্যসূত্র ২২৪
বিদেশী পরিভাষাসমূহ ও শব্দকোষ ২২৯

www.icsbook.info

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

তাওহীদের ধারণা ইসলামের তথা, ইসলামের সবকিছুর কেন্দ্রীয় বস্তু। এর কারণ হচ্ছে অস্তিত্বের এবং যা কিছু অস্তিত্বশীল সমস্ত কিছুর সাথে এর কেন্দ্রীকতা। ঐশী বিধান তথা অসীম আল্লাহতে বিশ্বাসের সঙ্গে এই উপলব্ধি জাগ্রত হয় যে, গোটা সৃষ্টিই তার অধিনস্থ। সমস্তকিছুর মর্মমূলে এই সম্পর্কহেতু একইভাবে সকল বস্তু এবং সকল সৃষ্টি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত, বিশেষ করে সবচেয়ে আদিস্তরে। কিন্তু প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তা হচ্ছে মাত্র শুরু। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী বিজ্ঞান, তা ধর্মীয়, নৈতিকতা বা প্রকৃতিই হোকনা কেন, মূলত তা হচ্ছে বহু বিচিত্র পৃথিবীর বৈচিত্রের তলদেশে শৃংখলা আবিষ্কারের জন্য অনুসন্ধান।

শহীদ ড. ইসলাইল রাজী আল ফারুকীর তাওহীদের উপর এই গ্রন্থটি কেবল ইসলামের মূল তত্ত্বের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনা, বরং ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে সেই মতবাদকে বুঝতে সাহায্য করে। তাওহীদ বা একত্বের সহজ মতবাদগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য ড. ফারুকী বহু বিষয় স্পর্শ করেছেন। তিনি তাঁর আলোচনায় ইতিহাস, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, দর্শন, জীবনবিধান, সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব এবং অন্যান্য শাস্ত্রের অনেক উপাদান ব্যবহার করেছেন। এর ফলে তাঁর তাওহীদ সম্পর্কে ধারণা সাহিত্যের গভীরতার দিক দিয়ে খুবই সমৃদ্ধ এবং তার উপলব্ধির দিক দিয়ে বিশাল। বলতে কি, সম্ভবতঃ এই পুস্তকটিই তাঁর অন্য সকল গ্রন্থের চেয়ে তাঁর গভীর এবং মৌলিক চিন্তা প্রতিফলিত করে।

ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট সমসাময়িক গ্রন্থাগারে এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের সম্পূর্ণ নতুন সংস্করণ পাঠকদের কাছে পেশ করতে পেরে গর্ববোধ করছে। এই সংস্করণে মূল পাঠের সংগতি রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু বিদেশী শব্দগুচ্ছের একটি তালিকা যোগ করা হয়েছে। সংক্ষেপে এই সংস্করণের গুণগতমান উন্নয়নের জন্য সকল চেষ্টাই করা হয়েছে।

পরিশেষে আমরা নিজেদেরকে এবং আমাদের পাঠকবর্গকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, পূর্ণতার মালিক কেবল আল্লাহ তায়ালা। তাই এই গ্রন্থের উন্নতি বিধানের জন্য যে কোন সংশোধনী বা পরামর্শ পরম যত্নের সঙ্গে গৃহীত হবে। এবং কেবল আল্লাহ তায়ালাই এগিয়ে নিয়ে যান এবং সাহায্য করেন।

ফেব্রুয়ারী ১৯৯২/শাবান ১৪১২ ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
হার্নডন, ভার্জিনিয়া

www.icsbook.info

মুখবন্ধ

এ গ্রন্থটি কয়েকটি স্বীকৃত ধারণার পটভূমিতে রচিত। এগুলো বুঝে নিলে এর বক্তব্য সহজেই বোধগম্য হবে এবং এর যৌক্তিকতা স্বপ্রমাণিত হবে।

প্রথমত, ইসলামের বিশ্ব-উম্মাহ্ তর্কাতীতভাবেই আধুনিক কালের সবচেয়ে হতভাগ্য সংস্থা। একথা সত্য যে, জনসংখ্যার দিক দিয়ে এ উম্মাহ্ বৃহত্তম, ভূমি এবং সম্পদের দিক দিয়ে সবচেয়ে বিত্তবান, উত্তরাধিকারের দিক দিয়ে মহত্তম এবং সবচেয়ে প্রাণবন্ত আদর্শের একমাত্র অধিকারী। তা সত্ত্বেও, এই উম্মাহ হচ্ছে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার একটি অতিশয় দুর্বল উপাদান। এটি বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে খণ্ডিত। এর সকল সীমান্ত অন্যান্য উম্মাহর মোকাবেলায় নিজেদের মধ্যে বিভক্ত; নিজের যা প্রয়োজন বা নিজে যা ভোগ করে তা উৎপাদনে অপারগ এবং তার শত্রুর বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম। সর্বোপরি, উম্মাহ, 'ওয়াসাত' না হ'য়ে (মানব জাতির বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে মধ্যপন্থা অনুসরণ না করে, কুরআন ২:১৪৩)– যা ছিল আল্লাহর অভিপ্রেত, এই উম্মাহ এখন সকলের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। যদি রোগ, ব্যাধি, দারিদ্র, অজ্ঞতা, হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, নীতিভ্রষ্টতা এবং অপবিত্রতার বিরুদ্ধে আধুনিক কালে মানব জাতির ঐতিহাসিক সংগ্রামে এই উম্মাহ কোনো অবদান রেখে থাকে, তা অতি সামান্য।

দ্বিতীয়ত, ঐশী বাণী "আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যদি না এবং যতক্ষণ না তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্য চেষ্টিত হয়" (কুরআন ১৩:১২), একইভাবে ইতিহাসেরও সিদ্ধান্ত। ইসলামী বিশ্ব-উম্মাহর ক্ষেত্রে এ বাণীটি প্রয়োগ করলে দেখা যাবে এতে সংস্কারের জন্য পূর্ববর্তী প্রয়াসগুলোর ব্যর্থতার ব্যাখ্যা রয়েছে, আর রয়েছে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান ব্যাধির কারণটি। অপেক্ষাকৃত কম সাম্প্রতিক অতীতে আরব উপদ্বীপ, উত্তর এবং পশ্চিম আফ্রিকায় সালাফিয়া আন্দোলন যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলো, সেগুলো সাম্প্রতিক কালের প্রয়াসগুলো অপেক্ষা অধিক সফল হয়েছিল। কারণ, এ সব আন্দোলন উম্মাহর অধঃপতনের গভীরমূল কারণগুলো বুঝতে চেয়েছে এবং অধিকতর মৌলিক প্রতিকারের প্রয়াস পেয়েছে। এসব আন্দোলন তাসাউফের (আধ্যাত্মিকতা) অহেতুক বাড়াবাড়িকে (গুলুও) আঘাত করেছে–যা ছিল সঠিক পদক্ষেপ এবং তারা অন্য সকল উম্মাহ বা বহির্বিশ্বের মোকাবেলা করার জন্য চেষ্টা করেছে, পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়াই। আর এ ছিল তাদের একটা মারাত্মক ভুল, যার পরিণামে তারা তাদের মহত্তম লক্ষ্য সত্ত্বেও সকলেই ব্যর্থ হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের 'জাতীয়তাবাদী' সরকারগুলো (তা সাংবিধানিক, রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র বা স্বেচ্ছাতন্ত্র, যাই হউক), অধিকতর সাম্প্রতিককালে যেসব সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেসবের প্রায় সবগুলোই ছিলো বালুর উপর প্রাসাদ নির্মাণ তুল্য, যেখানে আন্তরিকতা ছিলো। সেসব ক্ষেত্রে এ সব সংস্কার উম্মাহর বৈষয়িক চাহিদা পূরণের চেষ্টা করেছে, কিন্তু আত্মার গভীরতর চাহিদা বর্জন করেছে। প্রকৃতপক্ষে, তারা সমাজের অভ্যন্তরে দুষণই বর্ধিত করেছে ও জাতীয়তাবাদের বিস্তার করেছে– যা পাশ্চাত্যের একটি প্রাচীন ব্যাধির

www.icsbook.info

ঘৃণ্য রোগ-জীবাণু উম্মাহ দীর্ঘ অতীত ইতিহাসে যার মোকাবেলা করেছে; যার নাম 'আশ শূয়ূবীয়াই' অর্থাৎ গোত্রবাদ। ইউরোপে জাতীয়বাদ সফল হয়েছে (যদিও মাত্র কিছুকালের জন্য এবং নিশ্চয়ই এখন তার মরণদশা চলছে) প্রধানত একারণে যে, প্রোটেস্টান্ট সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা ক্যাথলিক চার্চের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয় এবং সংশয়বাদের দ্বারা তাদের গড হয় সিংহাসনচ্যুত। পক্ষান্তরে মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য কর্তৃত্বপরায়ণ এবং চার্চ না থাকায় এবং এক অনন্য অতিন্দ্রিয় পরম সত্তা বা আল্লাহর অবিচলিত বিশ্বাসহেতু, আর তার সামাজিক আচরণ বিধান, এই জাতীয়তাবাদ কখনো মুসলমানদের বোধগম্য ছিলনা, মুসলমানরা এর দ্বারা নেশাগ্রস্ত হওয়াতো দূরের কথা। এ কারণেই, 'জাতীয়তাবাদী' নেতা যখন নিজেকে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত করে তখন মুসলমানরা তাতে কিছুটা আগ্রহ প্রদর্শন করে। কিন্তু নেতার সেই রূপটি ধূসর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানগণ দ্রুত জাতীয়তাবাদের প্রতি তার আকর্ষণ হারিয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। এই সব আন্দোলন দ্বারা মানুষ নতুন করে নির্মিত হলো না। কারণ, এই আন্দোলনগুলোর কোনটিরই মুসলমানদের দুর্গতির মূল সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি ছিলনা। আধুনিকায়ন ব্যর্থ হলো একারণে যে, প্রকৃতপক্ষে এ ছিলো পাশ্চাত্যকরণ, যা মুসলমানকে তার অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং পাশ্চাত্য মানুষের একটি ক্যারিকেচারে পর্যবসিত করে। এমনকি, কুসংস্কার ও অজ্ঞতা থেকে মুসলমানের মৌলিক বিশ্বদৃষ্টিকে সংশোধন করার জন্য পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলো যে সামান্য গুরুত্ব দিয়েছিল এ সংস্কার আন্দোলনগুলোর কোনটিতে তার অস্তিত্বও ছিলনা, কারণ এই সংস্কারগুলো ধর্মকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এবং পাশ্চাত্য পন্থায় ধর্মকে পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে চলে। মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের যে পূর্বশর্ত আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন তা পূরণ করা হলো না এবং বিশ্ব উম্মাহ বার বার পথচ্যুত হয়ে অধঃপতনে নামতে থাকে।

নিশ্চয়ই শতাব্দীর অভিজ্ঞতার বদৌলতে ইখওয়ানুল মুসলিমীন আন্দোলন এই ব্যবধান পূরণের চেষ্টা করে। এর আরম্ভটি ছিলো চমৎকার, কিন্তু তার গতি বজায় রাখতে পারলনা। যে সংগ্রামে তার বিজয় অর্জন সম্ভব ছিলোনা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার ট্রাজেডি ছিলো তার একটি ক্ষুদ্র ত্রুটি; আরও গুরুতর ট্রাজেডি ছিলো ইসলামের এমন একটি রূপ স্পষ্ট করে তোলায় তার অক্ষমতা, যে রূপটি হবে মানবজীবনের প্রতিটি মুহূর্তের আধুনিক মানবিক কর্মকান্ডের প্রতিটি পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক। ইসলামের এই স্বপ্ন বা রূপটি উজ্জ্বলতম ছিলো মরহুম হাসান আল-বান্নার মনে; কিন্তু তাঁর অনুসারীদের কাছে এ ছিলো কিছুটা ঘোলাটে এবং কম স্বচ্ছ। দুর্ভাগ্যক্রমে, মহান মুসলমান মনীষীগণ নিজেদেরকে ব্যস্ত রেখেছিলেন অন্যত্র। তারা আল-বান্না যে দায়িত্বটি অসম্পূর্ণ রেখে গিয়েছিলেন তা পূরণ করতে পারলেন না– অর্থাৎ ইসলামের মৌলনীতিগুলোকে আধুনিক এবং টেকসই অভিজ্ঞতার সূত্র হিসেবে বিশদ রূপ দিতে ব্যর্থ হলেন। এতে করে আন্দোলনটি সংখ্যার দিক-দিয়ে স্ফীত হয়ে উঠলো বটে, কিন্তু চিন্তার গভীরতার দিক দিয়ে বেড়ে উঠলোনা। অথচ চিন্তার এই গভীরতার বিকাশই হচ্ছে ঐশী-আদেশ নির্ধারিত পরিবর্তনের শর্ত।

www.icsbook.info

তৃতীয় এবং শেষ অনুমানটি হল এই যে, ইসলামের বিশ্বউম্মাহর আর পুনরুত্থান ঘটবেনা অথবা তা 'উম্মাহ' ওয়াসাত এর রূপ নেবেনা, কেবলমাত্র তার মাধ্যম ছাড়া, যা চৌদ্দশ বছর আগে একে দিয়েছিল এর অস্তিত্বের ভিত্তি। যুগ যুগ পরমপরায়, এর চরিত্র এবং নিয়তি, কেবলমাত্র সে মূল ধারার ইসলামের মাধ্যমেই এই পুনরুত্থান সম্ভব। মুসলমানের ধারণায়, সে যেহেতু এই পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা (প্রতিনিধি), তাই তাকে করে তোলে মানব ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্ত। কেবলমাত্র আল্লাহর খলিফা হিসেবেই এবং সে কারণে, ইসলামী দৃষ্টির প্রতি সঠিক যথোপযুক্ত অঙ্গীকারের মাধ্যমেই, মানুষ দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করতে পারে, দেশ কালের সামগ্রিকতার মধ্যে। এ জন্য, মুসলমানকে অবশ্যই দেশকালের কার্যকারণ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে হবে (বৈষয়িক, মনস্তাত্বিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক), সে সবের গতি পরিবর্তন করে ঐশী প্যাটার্ণকে সফল করার প্রয়াসে সন্যাসবাদের পথে অগ্রসর হলে চলবে না, তাকে উচ্ছেদ করলে বা এড়িয়ে গেলে চলবেনা যেমনটি ঘটেছে হিন্দু-বৌদ্ধ আধ্যাত্মিকতা থেকে। এর পুনর্নির্মাণ করতে গিয়ে মুসলিম যে নিজ সৃষ্টিশীল ইচ্ছার অনুসরণ করে তা নয়, সে আল্লাহর অভিপ্রায়কে অনুসরণ করে। পরিশেষে, মুসলমানের এই পুনর্গঠন বা পুনর্নির্মাণ প্রমিথিয়ান পাশ্চাত্যের অবাধ্যতা ও বিজয় নয়, বরং আনুগত্য ও বিনয় নম্রতার মাধ্যমে একটি দায়িত্বশীল কর্ম। তাই মুসলমানদের জন্য রয়েছে ত্রিমুখী রক্ষা ব্যবস্থা: প্রকৃতিকে কাজে লাগানোর জন্য তার নিজের ক্ষমতার বিরুদ্ধে; সে সফল হলে ক্ষমতার অহমিকার বিরুদ্ধে, এবং সে ব্যর্থ হলে, যখন অসহায়তা এবং হতাশা মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তখন ট্রাজেডির বিরুদ্ধে।

মুসলিম তরুণ সমাজের শিক্ষার জন্য এই পুস্তকটি বাস্তবতার ইসলামী দৃষ্টি পেশ করার প্রয়াস পেয়েছে। এতে গ্রন্থকার আশা করছেন, তরুণ সমাজকে প্রকৃত আত্মসংস্কারের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেন সালাফিয়ার আন্দোলনের মহান সংস্কারকে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব, মুহাম্মদ ইদ্রিস সানুসি, হাসান আল বান্না এবং অন্যদের গভীর চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টিকে বর্তমানের পাশাপাশি স্থাপন করা যায়। মানুষের চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা এখানে বিশ্লেষিত ও সম্প্রসারিত হয়েছে এই আশায় যে, সব ক্ষেত্রের প্রত্যেকটিতে এটি সংস্থার কর্মসূচীর একটি বুনিয়াদী পুস্তক হবে। ইসলামের সারনির্যাস ও মর্মমূল তৌহীদ হওয়ায়, আত-তাওহীদই হচ্ছে বইটির নাম, এবং সেই প্রাসঙ্গিকতার উপকরণ ও আধারও বটে।

মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা, সকল বিষয়ের উপর মহত্তম বিষয়ে তার এক বান্দার সামান্য অবদান হিসেবে এই পুস্তকটি যেন তিনি গ্রহণ করেন, এবং আল্লাহ যেন পাঠকদের সত্যের দিকে পরিচালিত করেন। এই পুস্তকটি ইতিবাচকভাবে সত্যকে উপস্থাপন করে অবদান রাখলো কিনা অথবা নেতিবাচকভাবে যা সত্য নয় তা প্রদর্শন করে দায়িত্ব পালন করলো কিনা, যাই হোক না কেন, গ্রন্থকার এ বিষয়ে সন্তুষ্ট যে আল্লাহ তায়ালা তার এই পুস্তককে সেই লক্ষ্যের দিকে একটি উপায় হিসেবে ব্যবহার করবেন।

অক্টোবর ১৯৮২, জিল হজ্ব ১৪০২ — ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী

টেম্পল ইউনিভারসিটি

www.icsbook.info

প্রথম অধ্যায়

ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সারবত্তা

১. ধর্মীয় অভিজ্ঞতাস্বরূপ আত্ তাওহীদ

ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অন্তঃস্থলে দণ্ডায়মান আল্লাহতায়ালা–'শাহাদাহ' বা ইসলামী বিশ্বাসে ঘোষণা এই সাক্ষ্য– আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মোহাম্মদ (সা.) তাঁর রাসূল, বাণী বাহক; বা সাক্ষ্যদান শাহাদতের প্রবল দাবী এই : "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই" আল্লাহর নাম হচ্ছে 'আল্লাহ'– যার সরল মানে হচ্ছে আল্লাহ মুসলিমের প্রতিটি স্থানে, মুসলিমের প্রতিটি কর্মে, মুসলমানের প্রতিটি চিন্তায় দখল করে আছেন কেন্দ্রীয় স্থানটি। আল্লাহর উপস্থিতি সকল সময়ে মুসলিম চেতনাকে প্লাবিত করে। মুসলিমের কাছে আল্লাহ হচ্ছেন একটি পরম উত্তুঙ্গ আবিষ্টতা। কিন্তু তার মানে কি?

মুসলিম দার্শনিকরা ও ধর্মতত্ত্ববিদেরা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে শত বছর লড়াই করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটির পরিণতি ঘটেছে আল গাজ্জালি ও ইবনে সিনার যুক্তিতর্কে। দার্শনিকদের জন্য সমস্যাটি ছিল মহাবিশ্বের শৃংখলা রক্ষা করার জন্য একটি প্রয়াস। তাদের যুক্তি ছিল যে, বিশ্ব হচ্ছে একটি শৃংখলাবদ্ধ মহাজগত, (এমন একটি রাজ্য যেখানে রয়েছে শৃংখলা ও নিয়মের প্রভুত্ব) যেখানে সবকিছু ঘটে এক একটি কারণে এবং যথাযথ ক্রিয়া ব্যতিত কারণের অস্তিত্ব নেই। এই অবস্থানে তারা গ্রীক মেসোপটেমিয়া ও মিশরের ধর্ম ও দর্শনের উত্তরাধিকারের অধিকারী। খোদ সৃষ্টি হচ্ছে এ সব ঐতিহ্যের বিশৃংখলা বা অরাজকতা থেকে শৃংখলায় উত্তরণ। মুসলিমরা ঐশী সত্বার আলৌকিকতা ও মহত্বের সর্বোচ্চ ধারণা পোষণ করেন, কিন্তু তারা এই সত্বাকে একটি নৈরাজ্যিক বিশৃংখলা বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য বা সঙ্গতিপূর্ণ মনে করতেননা। এ দিকে ধর্মশাস্ত্রজ্ঞগণের বেলায় ছিলো এই আশংকা যে মহাবিশ্বের শৃংঙ্খলাবদ্ধতার উপর এমন একটি গুরুত্ব প্রদান অনিবার্যভাবে আল্লাহকে করে তোলে otiosus বা অথর্ব অলস ঈশ্বর। এতে করে একবার পৃথিবীকে সৃষ্টি করে, তার মধ্যে কারণসম্মতভাবে প্রত্যেকটি বিষয় চলার জন্য ঘড়ির যান্ত্রিকতা তৈরী করার পর আল্লাহর আর কিছু করার সামান্যই বাকি থাকে। তারা অভ্রান্তই ছিল। কারণ যে পৃথিবীতে একটি কারণের ফলে প্রত্যেক বিষয় ঘটে, সেখানে কারণসমূহ সবই স্বাভাবিক, অর্থাৎ পৃথিবীতেই সেগুলো বিদ্যমান এবং পৃথিবী থেকেই সক্রিয়; এটি এমন এক পৃথিবী যেখানে প্রত্যেকটি বিষয় ঘটে আবশ্যিকভাবে এবং সেকারণে, এটি এমন এক জগতে যেখানে আল্লাহর প্রয়োজন অনাবশ্যক। এধরনের একজন আল্লাহ কখনোই তৃপ্ত করতে পারেনা, মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে। হয় তিনি, যাঁর কারণে সবকিছুই বিদ্যমান, যাঁর দ্বারা সবকিছুই ঘটে, তার সূচনা বা নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম, না হয় রয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো 'খোদা', যে সবকিছুর প্রকৃত কারণ এবং সকলের প্রভু। একারণে তাঁরা দার্শনিকদের অভিমত প্রত্যাখ্যান করেন এবং

www.icsbook.info

'আকস্মিকতাবাদের' মতবাদ উদ্ভাবন করেন। এই থিওরি মতে, প্রতি মুহূর্তেই আল্লাহ পুনরায় সৃষ্টি করছেন পৃথিবীকে এবং এভাবে, পৃথিবীতে যাকিছু ঘটছে তা ঘটাচ্ছেন। তারা এই বিশ্বাস দ্বারা কার্যকারণবাদের অনিবার্যতার স্থলে এ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন যে, আল্লাহ যেহেতু ন্যায় পরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ সে কারণে তিনি প্রবঞ্চনা করবেন না এবং তিনি দেখবেন যাতে ক'রে সমুচিত কারণের ফলে সবসময়ই সঠিক পরিণতিটি ঘটে। কার্যকারণ প্রতিষ্ঠা কোনো বিষয়ে পরিণতি নয়, বরং ঐশী অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠাই তার অনিবার্য ফল এবং সেই অস্তিত্বের সঙ্গে কার্যকারণের সঙ্গতি বিধান। এভাবে, দার্শনিকদের উপর ধর্মশাস্ত্রবিদেরা অর্জন করেন একটা সরাসরি বিজয়।[১]

ধর্মশাস্ত্রবিদগণের অবস্থানের পেছনে রয়েছে মুসলিম অভিজ্ঞতা, যাতে আল্লাহ কেবল একটি পরম চূড়ান্ত প্রথম কারণ বা নীতি নয়, মানদণ্ড বা আদর্শিকতার কেন্দ্রস্থলও বটে। আল্লাহর এই রূপটিই এমন প্রত্যেকটি থিওরিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যাতে আল্লাহ হয়ে উঠেন– Otiosus অথর্ব এবং নিষ্ক্রিয়, আর এই আদর্শিকতা বা মানদণ্ডের মর্মের প্রতি মুসলিমের প্রতিক্রিয়ার ফলে দার্শনিকের থিওরি ধ্বসে পড়ে। আদর্শিকতার মানদণ্ড হিসেবে তিনিই হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি হুকুমের মালিক, তাঁর গতিবিধি, তার চিন্তা এবং কর্ম সবই এমন বাস্তব যে তা সন্দেহের অতীত, কিন্তু এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই মানুষ যতটুকু এর ধারণা করতে পারে, তার প্রত্যেকটি হচ্ছে তার জন্য একটি মূল্য, একটি ঔচিত্য, এমনকি ইতিমধ্যেই যখন তা কার্যকর হয়েছে তখনো তা থেকে কোনো ঔচিত্যবোধ সুচিত হয়না। মুসলমানদের জন্য একটি বিমূর্ত বিষয় হওয়া ছাড়াও আল্লাহকে পরমতত্ত্ব মূল্যে তাত্ত্বিকতার মূল্য বা বিনিময়ে, মূল্যতত্ত্ব থেকে আলাদা করা যায়না, অথবা তার উপর জোরও দেওয়া যায়না। এখানে আমরা যদি একজন মুসলিমকে, জ্ঞানের মূল্যের শ্রেণী ক্যাটেগরীকে ব্যবহার করতে দেই, তাহলে সে বলবে বিমূর্ত চিন্তার মূল্য এই যে, এতে করে তার অনিবার্যতা, তার চিত্তাকর্ষক আবেদন অথবা তার আদর্শিকতার অনুশীলন বা চর্চা করতে পারা যায়।

আল্লাহ হচ্ছেন চূড়ান্ত অন্ত, অর্থাৎ সেই শেষ যা হচ্ছে সমস্ত চূড়ান্ত সম্পর্ক বা বন্ধনের লক্ষ্য, যেখানে এসে সবকিছুই থেমে যাবে। প্রত্যেক কিছুই বাঞ্ছিত হয় অন্য একটির জন্য, যা আবার বাঞ্ছিত হয় তৃতীয় আরেকটির জন্য এবং এভাবে চলতে থাকে ও তার

---

১. এর প্রমাণ হচ্ছে দর্শন অর্থাৎ আলকিন্দি কর্তৃক সূচিত বিমূর্ত চিন্তাধারার ঐতিহ্য, যা আল-ফারাবি, ইওয়ানুস সাফা ইবনে সিনা এবং ইবনে রুশদ অনুসরণ করেন এবং দার্শনিকগণ যে অখ্যাতি অর্জন করেছিলেন, যে সব কটক্ষামূলক নামে তাদের ডাকা হতো, তার দ্বারা (যেমন হিল্লিনিয়ীন, মদ্ধিক, মশশাঅউন, রিবাকিউন) এবং সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে দার্শনিকগণ ও তাদের গ্রন্থাদির প্রতি যে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে করে সন্দেহ নেই যে, এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার জন্য দায়ী ছিলো, উম্মাহরর মৌলিক স্বজ্ঞা থেকে দার্শনিকদের দূরত্ব। মুসলিম দর্শনের গ্রীক উৎসমূল এবং ইসলামী চিন্তাবিদগণ কর্তৃক তার প্রত্যাখ্যানের একটি চমৎকার বিশ্লেষণের জন্য দেখুন : আলি সামি আল নাশকার, মানাহিজ আল-বাহাছ ইনদা মুফাককিরীন আল ইসলাম ওয়া নাকদ আল মুসলিমীন লিল, মানতিক আল-এ্যারিসটাডালিসি কায়রো, দারুল ফিকহ আল-আরবী, ১৩৬৭ হিঃ/১৯৪৭ খৃঃ

www.icsbook.info

থেকেই এ সম্পর্ক বা শৃংখলার দাবী এই যে, তা চলতে থাকবে, চূড়ান্ত অন্ত পর্যন্ত, যা নিজেই একটা গন্তব্য। আল্লাহ এই ধরনের একটি লক্ষ্য; অন্য সকল লক্ষ্যের একটি শেষ চূড়ান্ত লক্ষ্য, শৃংখলার শেষ। তিনি সকল বাসনার চূড়ান্ত উদ্দিষ্ট। একারণে তিনি সৃষ্টি করেন অন্য সকল কল্যাণ। কারণ যদি না চূড়ান্ত-অন্ত নির্দিষ্ট করা হয় তাহলে শিকলের সকল কড়াই খুলে পড়ে। চূড়ান্ত অন্ত হচ্ছে সকল শৃংখলার বা অন্তের সঙ্গে সকল সম্পর্কের মূল্যতাত্ত্বিক ভিত্তি।

আল্লাহ চূড়ান্ত, সর্বশেষ সীমানা এবং মূল্যতাত্বিক ভিত্তি, আল্লাহ সম্পর্কে এই ধারণা থেকেই এ সিদ্ধান্ত সুচিত হয়েছে যে, তিনি নিশ্চয়ই অনন্য। সৃষ্টিগতভাবেই ব্যাপারটি তা না হলে আবার উঠবে একের থেকে অপরের অগ্রত্ব বা চূড়ান্ততার প্রশ্ন।

চূড়ান্ত অন্তের প্রকৃতি এই যে তা অনন্য, ঠিক যেমন কার্যকরণ শৃংখলার চূড়ান্ততা বা সর্বশেষত্বের বৈশিষ্ট্য এই যে, তা অন্যের উপর চূড়ান্ত নির্ভরতার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে।[২] এই অনন্যতাকেই মুসলিম তার ঈমানের ঘোষণায় স্বীকার করে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।" ধর্মসমূহের দীর্ঘ ইতিহাসে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে মুসলমানদের ঘোষণা এসেছে বিলম্বে। একথা সত্য যে, কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'পৃথিবীতে এমন কোনো জনগোষ্ঠী নেই যার কাছে তিনি রাসূল প্রেরণ করেননি।[৩] এবং ' আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্ব শেখানো ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কোনো নবী রাসূল পাঠাননি।'[৪] কিন্তু আল্লাহর অনন্যতার দাবী একটি নতুন ব্যাপার। যে সময়ে এবং যে স্থানে ধর্মীয় চেতনার উচ্চতরো অবস্থা ছিলো দ্বৈত বা ত্রিত্ববাদ এবং নিম্নতর অবস্থা ছিলো বহু ঈশ্বরবাদ, সেখানে আল্লাহর অনন্যতার এই দাবী নিয়ে এলো প্রতিমা ভঙ্গের এক নতুন সজীবতা। এই ধর্মীয় চেতনাকে চিরকালের জন্য মুছে ফেলার জন্য ইসলাম দাবী করে যে, অনন্য আল্লাহকে বুঝাতে উপযুক্ত ভাষা ও ধারণা ব্যবহার করার জন্য চূড়ান্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। 'পিতা', 'মধ্যস্থতাকারী', 'ত্রাণকর্তা', 'পুত্র', ইত্যাদি শব্দ ও ধারণাকে ধর্মীয় শব্দকোষ থেকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হলো; জোর দেওয়া হলো ঐশী সত্তার অনন্যতা এবং পরম অসীমত্বের উপর, যেন কোনো মানুষই আল্লাহর সঙ্গে সে সম্পর্ক দাবী করতে পারেনা, যা অন্য সকল মানুষ পারেনা। ইসলামের কেটি মৌল বিশ্বাসঃ কোনো মানুষ বা সত্তাই অন্য কারো

---

২. যদি একাধিক ইলাহ থাকতো...তাহলে বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যের কারণে আসমান জমিন ধ্বংস হয়ে যেতো, প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, আল্লাহর যিনি তাদের সকল বর্ণনার উর্ধ্বে। (২১ : ২২)

৩. এমন কোনো উম্মাহ নেই যার কাছে সতর্ক করার জন্য আমি রাসূল পাঠাইনি (৩৫ : ২৪) ...। প্রত্যেক উম্মাহর কাছে আমি একজন রাসূল পাঠিয়েছি (১৬ : ৩৬), পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে আমি একের পর এক রাসূল প্রেরণ করেছি, যদিও তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিলো এবং প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিলো (২৩ : ৪৪)।

৪. আমরা প্রত্যেক উম্মতের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, তাদেরকে এই শিক্ষা দিতে যে, দাসত্ব কেবল আল্লাহরই উদ্দেশ্যে এবং মন্দ পরিহার করতে হবে। (১৬ : ৩৬)।

www.icsbook.info

থেকেই আল্লাহর বিন্দুমাত্র নিকটতর নয়। সমস্ত সৃষ্টিই হচ্ছে সৃষ্টি সদৃশ, অতীন্দ্রীয়কে যা স্বাভাবিকতার কাছ থেকে পৃথক করে সেই রেখারই এপাশে রয়েছে আল্লাহর মূল্যতাত্ত্বিক চূড়ান্ততার অপরিহার্য প্রাক-ধারণা। ব্যক্তির ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে আল্লাহর এই এককত্বের প্রাসঙ্গিকতা সহজবোধ্য।

মানুষের হৃদয় সব সময়ই বিভিন্ন স্তরের অভিকাংখিতার দ্বারা ঘোলাটে হয়ে পড়ে। কান্টের শিক্ষামতে, 'মহত্তম অভিপ্রায় হচ্ছে বিশুদ্ধতম'– অর্থাৎ সকল প্রকার খাম খেয়ালী উদ্দেশ্য থেকে পরিশোধিত, এবং সকল খামখেয়ালী উদ্দেশ্য বর্জন ও নির্বাচনের পর ইসলামই দেয় বিশুদ্ধতার ধারণা।

আল্লাহকে আদর্শিকতার মূল্য হিসেবে তথা এমন একটি লক্ষ্য হিসেবে ধারণা করা, যার অস্তিত্বই নির্দেশ এবং অভিপ্রায়– এভাবে আল্লাহকে বুঝা সম্ভব নয়, যদি না সেই সব সত্তা বিদ্যমান থাকে, যাদের জন্য এই আদর্শিকতাই হচ্ছে আদর্শ ও মানদন্ড; কারণ আদর্শিকতা হচ্ছে একটি সম্পর্ণ সম্পর্কমূলক ধারণা। এর জন্য এমন সব সৃষ্টির অস্তিত্ব আবশ্যক যাদের কাছে আদেশ বোধগম্য (এবং সে কারণে জ্ঞেয়) ও বাস্ত বায়নযোগ্য। সম্পর্কত্ব আপেক্ষিকতা নয় এবং এর দ্বারা এরূপ বুঝা যাবেনা যে, আল্লাহ হচ্ছেন মানুষ এবং তার পৃথিবীর উপর নির্ভরশীল, অথবা আল্লাহর জন্য মানুষ আবশ্যক। ইসলামে আল্লাহ হচ্ছেন স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু এই স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারা একথা বুঝায়না যে, জগতে মানুষ যে অনিবার্যতার মুখোমুখি হয় এবং যা-যা হওয়া উচিত তা বাস্তবায়িত করে তার সৃষ্টির প্রয়াজন নেই।

এ কারণে, ইসলামের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মর্মমূলে আল্লাহর স্থিতি, যিনি অনন্য, যাঁর ইচ্ছা সকল মানুষের জীবনের জন্য আবশ্যক এবং নির্দেশনা। আল-কুরআন বিষয়টি উপস্থাপন করেছে নাটকীয়ভাবে। এতে দেখা যায়, আল্লাহ তাঁর ফেরেস্তাদের কাছে বিশ্ব সৃষ্টি এবং সেখানে তার ইচ্ছা কার্যকর করার জন্য একজন প্রতিনিধি স্থাপনের অভিপ্রায় ঘোষণা করেছেন। ফেরেস্তাগণ এই বলে আপত্তি করে যে, এ ধরনের একজন প্রতিনিধি যে হত্যায় লিপ্ত হবে, মন্দকর্ম ও রক্তপাত করবে, তা সৃষ্টির উপযুক্ত নয়। তারা নিজেদের সঙ্গে এ ধরনের একজন খলিফার পার্থক্য উল্লেখ করে, কারণ ফেরেস্তারা ঐশী ইচ্ছাপূরণে কখনো গাফিলতি করেনা। তাদের এই আপত্তির উত্তরে, আল্লাহ বলেন, "আমি এমন কিছু জানি যা তোমরা জাননা[৫]"। কিন্তু যেখানে ঐশী ইচ্ছাকে কার্যকর না করে ভিন্ন রকম করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তার রয়েছে সেখানে ঐশী অভিপ্রায় কার্যকরকরণ আসলে অভিপ্রায়েরই একটি উচ্চতর এবং মহার্ঘতর অংশ পূরণ। ফেরেস্তাগণকে সঠিকভাবেই চুপ করিয়ে দেয়া হয়েছে, কারণ ঐশী নির্দেশ লংঘন

৫. তোমার প্রতিপালক যখন ফেরেস্তাদের বললেন, তিনি পৃথিবীকে তার একজন প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন, তারা বললো, "আপনি কি পৃথিবীতে এমন একজন প্রতিষ্ঠা করবেন, যে রক্তপাত এবং অপকর্ম করবে, অথচ আমরাইতো আপনার প্রশংসা এবং স্তুতিতে নিবিষ্ট রয়েছি।" আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ (আমি যা করতে চাচ্ছি) তার একটি লক্ষ্য আছে, তার জন্য আমার একটি উদ্দেশ্য আছে, তোমরা যা জাননা (২ : ৩০)

www.icsbook.info

করবার স্বাধীনতা তাদের নেই।[৬] একইভাবে অন্য আরেকটি নাটকীয়তরো কুরআনিক অনুচ্ছেদে আল্লাহ আকাশ, পৃথিবী, পর্বতমালা, নদ-নদীর উপর রাখতে চেয়েছিলেন তাঁর আমানত, তারা ভয়ে আতংকে সংকুচিত হয়ে সত্যকে বহন করতে অস্বীকার করে। কিন্তু মানুষ এই আমানত বা ঐশী অভিপ্রায়, যা স্বর্গমর্ত্য, কেউই কার্যকর করতে পারেনা, তা হচ্ছে সেই নৈতিক বিধান যা মানুষের কাছে স্বাধীনতা দাবী করে। আকাশে এবং জমিনে আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকর হয় প্রাকৃতিক আইনের অনিবার্যতার মাধ্যমে।[৭] এ হচ্ছে সৃষ্টিতে স্থাপিত অপরিবর্তনীয় সুন্নাহ বা প্যাটার্ণ বা ধরনে, যা সৃষ্টি যেভাবে চলে সেইভাবে সৃষ্টিকে চালায়; প্রাকৃতিক আইন লংঘন করতে পারে না প্রকৃতি। প্রকৃতি যা করতে সমর্থ, তা হচ্ছে প্রাকৃতিক আইনের পূর্ণ কার্যকরকরণ।[৮] কিন্তু যে মানুষ সাহসের সাথে এই আমানত গ্রহণ করে তার আল্লাহর অভিপ্রায় কার্যকর করা বা না করার উভয় ক্ষমতাই রয়েছে।[৯] একারণে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে কেবলমাত্র মানুষই নৈতিক কর্ম তথা স্বাধীনতার পূর্বশর্তগুলো পূরণ করে। নৈতিক মূল্যগুলো প্রকৃতির আদিমূল্যগুলোর চেয়ে অনেক বেশী প্রার্থিত, কারণ নৈতিক মূল্যের মধ্যেই এসবের ধারণা পূর্ব থেকে বিদ্যমান। একইভাবে, এগুলো আগে থেকেই হিতৈষণামূলক অথবা উপকরণমূলক মূল্যগুলোকে স্বীকার করে নেয় এবং সে কারণে এদের উভয়েরই উপরে এগুলোর অবস্থান। বস্তুতই এ সমস্ত হচ্ছে ঐশী অভিপ্রায়ের উচ্চতর দিক, যা মানব সৃষ্টিকে এবং পৃথিবীতে ঐশী প্রতিনিধির নিযুক্তিকে অত্যাবশ্যক করে তোলে।

জন্মগতভাবে লব্ধ এই দানের কারণে মানুষের অবস্থান ফেরেশতাদের উপরে, কারণ ফেরেশতারা যা করতে পারে তার চেয়ে বেশী করার সামর্থ তার রয়েছে।[১০] মানুষ কাজ করতে পারে নৈতিকতার সঙ্গে, অর্থাৎ স্বাধীনভাবে যা ফেরেশতারা পারেনা,

---

৬. আমরা আমাদের আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলাম, আকাশ মন্ডল, পৃথিবী এবং পর্বতমালার উপর, কিন্তু ভীত হয়ে তারা তা বহন করতে রাজী হলোনা। কিন্তু মানুষ তা বহন করলো (৩৩ : ৭২)।

৭. আমরা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি এবং প্রত্যেকটির জন্য তার মাত্রা, চরিত্র, এবং লক্ষ্য স্থির করেছি (৫৪ : ৪৯) .... পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাণী বুকে ভর দিয়ে চলেনা, আল্লাহ যার প্রত্যেকটির জীবিকার ব্যবস্থা করেননি। তিনি এর লক্ষ্য এবং পরিণাম সম্পর্কে জানেন, কারণ তিনিই তাঁর চিরন্তন ব্যবস্থার আওতায় প্রত্যেকটির জন্য বিধান স্থির করে দিয়েছেন (১১ : ৬), ... সূর্য্য উদয় হয় এবং অস্ত যায়, ঠিক যেভাবে সর্বক্ষমতাময় আল্লাহ বিধান দিয়েছেন, সেইভাবে তার কক্ষপথে বিচরণ করে। চন্দ্র অতিক্রম করে তার তিথিগুলো নিয়মিতভাবে এবং তার মূল সূক্ষ্মরূপে প্রত্যাবর্তন করে। চন্দ্র কিংবা সূর্য কেউই একে অপরকে অতিক্রম করেনা। রাত্রি এবং দিবস তাদের জন্য নির্ধারিত কক্ষ থেকে ভিন্ন পথে চলেনা, প্রত্যেকে তার জন্য যে কক্ষ আল্লাহ স্থির করেছেন, সেই কক্ষপথে চলে (৩৬ : ৩৮-৪০)।

৮. ঐ

৯. আমরা তোমার নিকট কিতাব নাযিল করেছি, সত্য সহকারে যাতে তুমি তার ঘোষণা করতে পার, পৃথিবীর কাছে, যে কেউ এর হেদায়েত মত চলতে সিদ্ধান্ত করে, সে তা করে তার নিজেরই কল্যাণের জন্য, যে কেউ এর হেদায়ত প্রত্যাখ্যান করে সেতো তা করে তার নিজেরই ক্ষতির জন্য (৩৯ : ৪১)।

১০. এবং আমরা ফেরেস্তাগণকে আদেশ করেছিলাম, আদমের নিকট নতি স্বীকার করার জন্য ....। তারা তা করেছিলো (২ : ৩৪)।

www.icsbook.info

মানুষ পৃথিবীর বস্তুসমূহের মধ্যে তার শারীরিক অস্তিত্বে সমভাবে উদ্ভিদের মতো বর্ধনশীল জান্তব জীবনে অংশগ্রহণ করে প্রাকৃতিক কার্যকর সূত্রের অনিবার্যতায়। কিন্তু যে সত্বার মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছার উচ্চতরো অংশ কার্যকর হতে পারে সম্পূর্ণভাবেই সেই সত্বার সমকক্ষ কেউ বা কিছু নেই। তার আন্তঃপ্রেরণা হচ্ছে মহাজাগতিক, ঐশী ব্যবস্থার এক সত্যিকার খিলাফত।

মানুষের মতো এইরূপ এক জীবকে আল্লাহর অভিপ্রায়কে বোঝার ক্ষমতা না দিয়েই যদি আল্লাহ সৃষ্টি করতেন অথবা স্থাপন করতেন পৃথিবীর উপর যা মানুষের নৈতিক আন্তঃপ্রেরণাকে গ্রহণ করবার জন্য যথেষ্ট নমনীয় নয় অথবা সেখানে সেই অভিপ্রায় অনুযায়ী করা বা না করার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবেনা, তাহলে আল্লাহর পক্ষে সে কাজ হতো দুর্বল এবং অসংবদ্ধ কাজ।

ঐশী অভিপ্রায় জানার জন্য মানুষকে দেওয়া হলো ওহী বা প্রত্যাদেশ, যা হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় যা কার্যকর করবে তার প্রত্যক্ষ এবং অব্যবহিত উদঘাটন। যখনই প্রত্যাদেশের বিচ্যুতি এবং বিকৃতি ঘটেছে অথবা মানুষ বিস্মৃত হয়েছে, তখনই আল্লাহ এর পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন ইতিহাসের আপেক্ষিকতাকে, দেশ ও কালের পরিবর্তনকে সম্মুখে রেখে এবং সবসময়ই তা করা হয়েছে নৈতিক নির্দেশমালার কার্য উপযোগী জ্ঞানকে মানুষের আয়ত্বের মধ্যে রাখার উদ্দেশ্যে। একই ভাবে, মানুষকে দেওয়া হয়েছে ইন্দ্রিয়াদি, যুক্তি এবং বোধশক্তি, স্বজ্ঞা, সকল রকমের পূর্ণতা, যা কারো সাহায্য ব্যতিরেকেই তাকে দিবে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা, ঐশী অভিপ্রায় আবিস্কার করতে। যেখানে প্রথমোক্ত অর্ধেকটি ব্যস্ত প্রাকৃতিক আইন নামক একটি শৃংখলা বা শিক্ষার অনুশীলনে, সেই আইনকে আবিস্কার করার জন্য সেখানে দ্বিতীয় অর্ধাংশটির ক্ষেত্র হচ্ছে নীতিবোধ এবং নীতিশাস্ত্রের অনুশীলন। আবিষ্ক্রিয়া এবং সিদ্ধান্তগুলো সুনিশ্চিত নয়। সবসময়ই এগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা ভুল ভ্রান্তির অধীন, আরো পরীক্ষা, আরো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, আরো সংশোধনের প্রয়োজন, গভীরতর অন্ত র্দৃষ্টির সাহায্যে। কিন্তু এ সমূদয় সত্বেও অনুসন্ধান সম্ভব এবং মানুষের যুক্তিবুদ্ধি হতাশ হতে পারেনা– তার নিজেরই পূর্বেকার অধিকার ও সিদ্ধান্তগুলোকে আবার পরীক্ষা ও সংশোধন করতে গিয়ে সংশয় এবং উদাসীনতায় নিক্ষিপ্ত না হয়ে। তাই যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে ঐশী অভিপ্রায়ের জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব এবং ওহী দেয় নিশ্চিত জ্ঞান। একবার উপলব্ধির পর এর উপাদানের কাম্যতা মানুষের চৈতন্যের একটা বাস্তব সত্য হয়ে ওঠে, বস্তুতঃ মূল্যের উপলব্ধি এবং তার হৃদয়স্পর্শী আবেদন ও সুনির্দেশ্য ক্ষমতা, নিজেই এর জ্ঞানস্বরূপ। কারণ মূল্যকে জানার মানেই হচ্ছে অস্তিত্বের স্বরূপ বিষয়ক মানুষের তাত্ত্বিক মনোভাব বা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা। এবং তার দিকেই গড়িয়ে চলা, অর্থাৎ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়া, তার ঔচিত্যকে উপলব্ধি করতে শুরু করা। যেমন নেতৃস্থানীয় মার্কিন অভিজ্ঞতাবাদী সি, আই লিহইস বলেন, "মূল্যের উপলব্ধি হচ্ছে একটি অভিজ্ঞতা এবং তা নিজেই একটি মূল্যায়ন।[১১]" মানুষের থিওরি

---

১১. C. I. Lewis তার *Analysis of Knowledge and Valuation* নামক গ্রন্থে এই ভাবধারাটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। (La Salle: The Open Court Publishing Co. 1946), 416-17

www.icsbook.info

বিষয়ে ইসলামে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার পরিনতি সম্পর্কে এই পর্যন্তই যথেষ্ট। এখন আমরা বিবেচনা করবো ইতিহাস, আর soteriology-এর তাৎপর্যসমূহ ব্যাখ্যা করবো। আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি, জগতের নমনীয়তার কথা, অবহিত হবার জন্য, দলাই মলাই হওয়ার ও নতুন আকার পাবার ও পলিশ হবার জন্য, এর প্রস্তুতির কথা- যাতে করে তা একটি ঐশী নমুনার নিরেট বাস্তব রূপ হয়ে উঠতে পারে। এই প্রস্তুতি এবং তৎসহ প্রত্যাদেশের বিদ্যমানতা ও যুক্তির সাহায্যে ঐশী অভিপ্রায়ের বিচার সম্মত প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার– এসব কিছুই মানুষের খিলাফতের দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতাকে অপরাধ করে তোলে। বস্তুতঃ মানুষের প্রকৃতিগত দায়িত্ব পূরণই হচ্ছে মানুষের পরিত্রাণ সম্পর্কে ইসলামের একমাত্র শর্ত।[১২] হয় তা মানুষের নিজস্ব কর্ম আর না হয় তা মূল্যহীন।[১৩] মানুষের করণীয় কাজটি অন্য কেউই করতে পারেনা, এমনকি আল্লাহও নয়, মানুষকে একটা পুতুলে পরিণত না ক'রে। নৈতিক কর্মের প্রকৃতিই এই যে, ইহা আপনিতেই নীতিসম্মত নয়, যদি না একজন স্বাধীন এজেন্ট তা করবার ইচ্ছা করে স্বাধীনভাবে, এবং তা সম্পাদন করার প্রয়াস পায়। মানুষের উদ্যোগ এবং প্রয়াস ছাড়া সকল নৈতিক মূল্যই চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে পড়ে।[১৪]

কাজেই ইসলামী soteriology প্রচলিত খ্রীষ্টান soteriology এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আসলেই ইসলামের ধর্মীয় শব্দকোষে soteriology (পরিত্রাণ) এর সমার্থবোধক কোন শব্দ নেই, ত্রাণকর্তা বলে কেউ নেই এবং এমনকিছু নেই যা থেকে পরিত্রাণ আবশ্যক। মানুষ এবং পৃথিবী ইতিবাচকভাবেই ভাল অথবা নিরপেক্ষ, কিন্তু মন্দ নয়।[১৫] মানুষ তার জীবন শুরু করে নীতিগতভাবে প্রকৃতিস্থ এবং সুস্থভাবে, কোনো আদি পাপ দিয়ে নয়, তা যতো লঘু বা আগাষ্টনিয়ানই হোক না কেন।[১৬] প্রকৃতপক্ষে, জন্মমুহূর্তেই তার অবস্থান জিরো পয়েন্টের উর্ধে, একারণে যে, তার নিকট রয়েছে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত একটি পৃথিবী, তার নীতিগত কর্মগ্রহণের জন্য।[১৭] তার ফালাহ

---

১২. এবং আমি (আল্লাহ) জ্বীন এবং মানুষকে আমার দাসত্ব ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি (৫১ : ৫৬)

১৩. আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন জীবন এবং মৃত্যু, যাতে তোমরা, তোমাদের কর্মে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারো। (অথবা সৎকর্মে তোমরা একে অপরকে ছাড়িয়ে যেতে পার).... (৬৭ : ২)

১৪. ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই, এখন থেকে সত্য এবং সত্যনিষ্ঠা, তাদের বিপরীত বা মিথ্যা থেকে স্পষ্ট হয়ে পড়েছে (২ : ২৫৬)। তাই যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক (১৮ : ২৯)।

১৫. আল্লাহই তা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন সুন্দরতম অবয়বে (৩২ : ৭) .... তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত কিছুতে সম্পূর্ণতা দান করেছেন (৮৭ : ২)।

১৬. সেন্ট অগষ্টিন *The Enchiridion*, অধ্যায় - ২৬। পাপ সম্পর্কে খ্রীষ্টান ধারণার বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, বর্তমান গ্রন্থকারের *Christian Ethics: A System atic and Historical Analysis of its Dominant Ideas* (Montreal : McGills University Press, 1967) অধ্যায় -৬।

১৭. আমি কি মানুষের চক্ষু, জিহ্বা এবং ওষ্ঠ সৃষ্টি করিনি? আমি কি তাকে দুটি পথই দেখাইনি। (৯০ : ৮-১০)। আল্লাহ অবশ্যই আসমান জমিনে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুই মানব জাতির বশীভূত

www.icsbook.info

বলতে (পরম সুখ বা পরিতৃপ্তি যা কর্মের মাধ্যমে প্রাপ্য নীতিগত পরম সুখ; সাফল্য, সুখ এবং স্বস্তি) ইসলাম যে পরিভাষাটি ব্যবহার করে তা এমন একটি পরিভাষা যার মূল অর্থ নিস্পন্ন হয়েছে, 'পৃথিবী থেকে তরুলতাদি উৎপন্ন হওয়া বুঝাতে' আর এই ফালাহ হচ্ছে মানুষ কর্তৃক ঐশী নির্দেশনার পরিপূরণ সহ গঠিত।[১৮] সে আল্লাহর করুণা এবং ক্ষমা দুই-ই আশা করতে পারে। কিন্তু সে তাঁর উপর নির্ভর করতে পারেনা যখন সে অজ্ঞতা আলস্য অথবা প্রকাশ্য বিদ্রোহ বশে-ঐশী অভিপ্রায় পালন করেনা। সে নিজে যেভাবে তার ভাগ্য ও পরিণামকে নির্মাণ করে তা হুবহু তাই হয়ে থাকে।[১৯] আল্লাহর শাসনের ভিত্তি, ইনসাফ, সুবিচার, তা কারো পক্ষে নয়, বিপক্ষে নয়। এর ন্যায়ের তৌলদণ্ড হচ্ছে সম্পূর্ণভাবেই চূড়ান্ত রকমে নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ সমতার মানদণ্ড। এবং জাগতিক ও আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তির পদ্ধতি, প্রত্যেকের জন্যই সে যার উপযুক্ত, সে আশিষপ্রাপ্ত হউক বা না হউক, হুবহু তারই বিধান দেয়।[২০]

বিশ্ব ইতিহাসের জন্য ইসলামের ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় রয়েছে বিপুল ও মহৎ তাৎপর্য। মুসলিম অন্তর্দৃষ্টির অগ্নিশিখা তাকে নিক্ষেপ করে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে, সেখানে তার নবী তাকে যে ঐশী আদর্শ জ্ঞাত করেছেন তার বাস্তবায়নকে কার্যকর করতে। এই লক্ষ্যের চেয়ে মহার্ঘতর কিছু তার সামনে ছিলোনা। এর স্বার্থে সে প্রস্তুত ছিলো চূড়ান্ত মূল্য দিতে, এমনকি তার জান কোরবান করতে। এর মূল বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সে সারা বিশ্বকেই গণ্য করে তার ক্রীড়ামঞ্চ হিসেবে; সে মনে করে তার উম্মাহ গোটা মানব জাতি নিয়ে গঠিত, অবশ্য অল্প কিছু সংখ্যক অবাধ্য লোককে বাদ দিয়ে যাদেরকে তিনি দলে আনবার চেষ্টা করেছিলেন অস্ত্রের সাহায্যে; তার Pax Islamica বা ইসলামী শান্তি, যা নির্ভরশীল ছিলো তার বাহুর উপর, কখনো তা একটি মাত্র উপাদান নিয়ে গঠিত সমাজ হিসেবে কল্পিত ছিলো না যেখানে কেবল ইসলামই প্রভূত্ব করবে। কুরআনের সনদ বলে এর অন্তর্গত ছিলো ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং সাবিয়ানগণ। মোহাম্মদ (সা.)-এর সনদ বলে জোরোস্ত্রীয়গণ এবং সেই সনদের ফকিহগণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বদৌলতে, হিন্দু এবং বৌদ্ধগণও। আদর্শ একই রয়ে যায়, অর্থাৎ এমন এক বিশ্ব, যেখানে, কুরআনের দাবী মতে, ঐশী কালামেরই রয়েছে আধিপত্য এবং প্রত্যেকেই স্বীকার করে এর প্রাধান্যকে। প্রণিধান-যোগ্য যে, রাসূলের উম্মা বা সমাজ

করেছেন (৪৫ : ১৩) তিনিইতো জমিনকে মানুষের বসতির স্থান করেছেন। আমি তোমাদের জন্য রাস্তা করে দিয়েছি যাতে তোমরা পথ পেতে পার (৪৩ : ১০)।

১৮. এম. এম আলজুবাইদি : *তাজুল আরুস* (দার মাকতাবাত আলহাইয়া ১৯৬৪) দেখুন : f:I-h vol 2. 199

১৯. সেই দিক মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বাহির হইবে, যাহাকে উহাদিগকে কৃতকর্ম দেখান যায়, কেহ অনু পরিমাণ সৎকর্ম করিলে সে তাহা দেখিবে এবং কেহ অনু পরিমাণ অসৎকর্ম করিলে সে তাহাও দেখিবে। (৯৯:৬-৮)

২০. এবং উহা এই কারণে যে, আল্লাহ বান্দাদের প্রতি যালিম নহেন। (৩:১৮২) অতঃপর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কর্মে নিষ্ঠ কোন কর্ম বিফল করিনা, হউকনা সে নর অথবা নারী... (৩:১৯৫)

www.icsbook.info

ব্যবস্থা ছিল একই আদর্শিক; কিন্তু মদীনা বা নগররাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল বহুজাতিক।[২১] কিন্তু এ ধরনের স্বীকৃতির বিন্দুমাত্র মূল্য থাকতে হলেও তাকে অবশ্যই হতে হবে মুক্ত স্বাধীন, প্রত্যেক ব্যক্তির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সিদ্ধান্ত। এই জন্যই ইসলামী শান্তিতে প্রবেশের জন্য কখনো মনে করা হতোনা যে, ইসলাম কবুল করতে হবে। বরং মনে করা হতো, একটা শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের ভিতর সে প্রবেশ করছে, যেখানে চিন্তাধারা স্বাধীনভাবে অগ্রসর হতে পারে এবং মানুষ অন্যের মধ্যে স্বাধীনভাবে প্রত্যয় উৎপাদন করতে পারে এবং নিজেও অন্যের দ্বারা প্রত্যয়দীপ্ত হতে পারে। বস্তুতঃ ইসলামিক রাষ্ট্র তার আওতাধীন সমস্ত ক্ষমতা ইহুদী সমাজ, খ্রীস্টান সমাজ, হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের ব্যবহারের জন্য তুলে ধরেছিল-যেখানেই এবং যখনই ওরা ইসলামের কর্তৃত্বে সহায়তা চেয়েছে ইহুদী ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সীমার মধ্যে তাদের কোন সদস্যকে ফিরিয়ে আনতে, যখন সেই সদস্য সেই সীমারেখা অস্বীকার বা লংঘন করতো। ইসলামী রাষ্ট্র ছিল একমাত্র অ-ইহুদী রাষ্ট্র, যেখানে ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করার কিংবা ইহুদী ধর্মের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ইহুদী হিসেবে বিদ্রোহ করার স্বাধীনতা ছিলনা। খ্রীষ্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধদের বেলায়ও একই আইন কার্যকর ছিল। যেখানে, উনিশ শতকে তার মুক্তি অর্জন পর্যন্ত ইউরোপের যে ইহুদী *Bayt ha Din* এর নির্দেশ লংঘন করতো, কেবল ইহুদী ধর্ম থেকে তার বহিস্করণই ছিল একমাত্র বিধান-যার ফলে সে হয়ে পড়তো আইন-বহির্ভূত এবং অপেক্ষা করতো ইহুদী পাড়ার ঠিক বাইরে, খ্রীষ্টান রাষ্ট্র কিংবা অ-ইহুদী জনপদের দ্বারা চিহ্নিত, হৃতসর্বস্ব ও নিহত হবার জন্য, সেখানে প্রাচ্য দেশের যে ইহুদী *Bayt ha Din* লংঘন করতো ইসলামী রাষ্ট্রে তাকে সংশোধন করা হত তার রাব্বিদের নামে। এতে ঐশী আমানত যে একটি নীতিগত ব্যাপার মুসলমানদের এই উপলব্ধির চূড়ান্ত প্রমাণ মিলে।

২. বিশ্ব দৃষ্টি হিসেবে আত্ তাওহীদ

প্রচলিত ভাবে এবং সাদামাটা ভাষায় প্রকাশ করলে তাওহীদ হচ্ছে এই প্রত্যয় ও সাক্ষ্য যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। বাহ্যত এই নীতিবাচক উক্তিটি, যা সংক্ষিপ্ত, তার চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত বহন করছে সমগ্র ইসলামের মহত্তম ও সমৃদ্ধতম তাৎপর্য। কখনো কখনো একটি মাত্র বাক্যেই সংহতভাবে প্রকাশিত হয়, একটা গোটা সংস্কৃতি, একটি গোটা সভ্যতা অথবা একটি সমগ্র ইতিহাস। ইসলামের আল-কালিমা, বা আশশাহাদা (ঘোষণা এবং সাক্ষ্য) নিশ্চয়ই এই তাৎপর্যই বহন করে। ইসলামের সকল বৈচিত্র, সম্পদ ও ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মনীষা, প্রজ্ঞা ও সভ্যতা এই সংক্ষিপ্ততম বাক্যটিতে সংহত রূপ পেয়েছে– 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

আত্-তাওহীদ হচ্ছে বাস্তব সত্য, বিশ্বজগত, দেশকাল, মানব ইতিহাস ও ভাগ্য সম্পর্কে একটা সাধারণ মনোভংগী এবং এর মর্মমূলে আছে নিম্নবর্ণিত নীতি মালা :

---

২১. তিনিইতো অবিশ্বাসীদিগের কালাম উক্তি ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন আল্লাহর কথাই সর্বোপরি (৯: ৪০) ধর্মত কেবল তারই উদ্দেশ্য। (২:১৯৩)...।

www.icsbook.info

ক. দ্বিত্ব বা দ্বৈততা

বাস্তবতার দুটি শ্রেণীরূপ–আল্লাহ এবং অন্-আল্লাহ। স্রষ্টা ও সৃষ্টি। প্রথম শ্রেণীটিতে সদস্য মাত্র একজন, আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা। তিনি একাই আল্লাহ, স্রষ্টা, ইন্দ্রিয়াতীত।[২২] কিছুই তাঁর মত নয়, তিনি অনির্দিষ্টকাল থেকে চিরকাল আছেন, সম্পূর্ণরূপে অনন্য এবং তার কোন শরীক বা সহচর নেই।[২৩] দ্বিতীয় বাস্তবতায় পড়ে দেশ, কাল, অভিজ্ঞতা, ও সৃজন; এতে পড়ে সকল সৃষ্টি, বস্তুজগত, বৃক্ষলতা ও জীবজগত, মানুষ, জীন এবং ফেরেস্তা, আসমান-জমিন জান্নাত এবং জাহান্নাম এবং এগুলো অস্তিত্বে আসার পর, এদের পরবর্তী সকল রূপ। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির এই দুটি শ্রেণী, তাদের অস্তিত্ব অথবা অস্তিত্বের স্বরূপের দিক দিয়ে যেমন, তেমনি তাদের অভিজ্ঞতা এবং জীবনের দিক দিয়েও চূড়ান্তভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহা সর্বকালের জন্যই অসম্ভব যে, এর একটি অন্যটির সঙ্গে সংযুক্ত বা অন্যটির মধ্যে প্রবিষ্ট হতে পারে, কিংবা একটিকে অন্যটি বলে মনে করা যেতে পারে বা অন্যটির মধ্যে বিশিষ্ট ভাবা যেতে পারে। অস্তিত্বের স্বরূপের দিক দিয়ে স্রষ্টা সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হতে পারেনা, সৃষ্টি পারেনা ইন্দ্রিয় সীমা অতিক্রম করতে এবং নিজেকে এমনভাবে রূপান্তরিত করতে যে, সে কোনভাবে বা কোন অর্থে তা স্রষ্টা হয়ে যেতে পারে।[২৪]

খ. ধারণা

গঠন ও ধারণক্ষমতা : বাস্তবতার দুটি শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবে ধারণা গঠন ও ধারণক্ষমতা মূলক। মানুষের ক্ষেত্রে এর উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে বোধশক্তি বা জ্ঞানের একটি অঙ্গ এবং আধার, বোধশক্তির মধ্যে পড়ে জ্ঞান অনুসন্ধান বিষয়ক সকল কর্ম, যেমন– স্মৃতি, কল্পনা, বিচার বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ, স্বজ্ঞা, উপলব্ধি প্রভৃতি। প্রত্যেক মানুষকে দেওয়া হয়েছে বোধশক্তি। এই দানটি এতই শক্তিশালী যে, তা আল্লাহর অভিপ্রায়কে বুঝতে সামর্থ্য দান করে দুটির একটি বা দুটি উপায়ে : যখন নিম্নবর্ণিত সেই অভিপ্রায় প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ কর্তৃক শব্দে উচ্চারিত হয়, মানুষের

---

২২. আসমান এবং জমিন এর স্রষ্টা আল্লাহ... তাঁর মত কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা (৪২:১১)... তারা যে বর্ণনা করে, তিনি সে সবের অনেক উর্ধ্বে (৬:১০০) দৃষ্টি তাতে কখনো পৌঁছায়না, তিনি সমস্ত কিছু দেখেন ... (৬:১০৩)

২৩. ঘোষণা কর, আল্লাহ এক এবং শাশ্বত, তিনি কাউকে জন্মদান করেন না, এবং তিনি জাতও নহেন, কোন কিছুই তার সঙ্গে তুলনীয় নয় (১১২ : ১-৪)... তারা জ্বীনগণকে আল্লাহর সহচর বলত (যদিও আল্লাহই জ্বীনদের সৃষ্টি করেছেন।) তারা তার প্রতি পুত্র এবং কন্যা সন্তান আরোপ করতো। এসব তারা করতো অজ্ঞতাবশত ঃ (৬ : ১০০)।

২৪. অথবা তারা কি জমিন থেকে একজন দেবতাকে বেছে নিয়েছে, যে মৃতকে জাগ্রত করবে? যদি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ থাকতো নিশ্চয়ই তাহলে আসমান জমিনে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হত। সমস্ত প্রশংসা আল্লার, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর প্রতি তারা যা কিছু আরোপ করে তা থেকে তিনি মুক্ত। আল্লাহ যা করেন এ সম্পর্কে তাকে কেউ প্রশ্ন করতে পারবেনা। কিন্তু তাদের প্রশ্ন করা হবে। তারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ স্থির করেছে? বল তোমরা প্রমাণ স্থির কর.... (২১ : ২১-২৪)

www.icsbook.info

কাছে, অথবা প্রকৃতির আইনের মাধ্যমে বাস্তব হয়, মানুষ ঐশী অভিপ্রায় তা থেকে জানতে পায় সৃষ্টির পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।[২৫]

গ. উদ্দেশ্যবাদ

বিশ্ব জগতের প্রকৃতি উদ্দেশ্যময় অর্থাৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ, যা স্রষ্টার একটি উদ্দেশ্যকে পূরণ করছে এবং তা করছে একটি পরিকল্পনা মাফিক। বিশ্ব জগত অনর্থক বা খেলার ছলে সৃষ্টি হয়নি।[২৬] ইহা অকারণ সৃষ্টি বা ঘটনা নয়, একে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রয়োজনীয় সবকিছুসহ, পূর্ণভাবে; যা কিছুরই অস্তিত্ব রয়েছে, তাই অস্তিত্বশীলতার জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রায় বা পরিমাণে এবং নির্দিষ্ট, একটি সঠিক উদ্দেশ্য পালন করে।[২৭] বিশ্বজগত প্রকৃতই একটি শৃংখলাবদ্ধ জগত, একটি সুশৃংখল সৃষ্টি, এ একটি নৈরাজ্য নয়, এতে স্রষ্টার অভিপ্রায় হামেশাই কার্যকর হচ্ছে। তাঁর প্যাটার্ণ সমূহপূর্ণ হচ্ছে প্রাকৃতিক আইনের অনিবার্যতায়। কারণ সেগুলো স্রষ্টা যেভাবে তার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, তার থেকে ভিন্নভাবে রয়েছে অন্তর্নিহিত।[২৮] মানুষ ছাড়া, আর সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রেই, সহজাত কথা প্রযোজ্য। মানুষের কর্মই হচ্ছে একমাত্র দৃষ্টান্ত, যেখানে আল্লাহর অভিপ্রায় অবশ্যম্ভাবীরূপে কার্যকর হয়না, কার্যকর হয় ইচ্ছাকৃত ভাবে, স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে; মানুষের দৈহিক এবং মানষিক কর্মকাণ্ডগুলো প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পর্কিত এবং সে কারণে তারা এসবের প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ মেনে চলে, অন্য সকল সৃষ্টির মতই, অপরিহার্যভাবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড যেমন বোধশক্তি ও নীতিগত ক্রিয়াকান্ড পড়ে নির্ধারিত প্রকৃতির আওতার বাইরে এসব নির্ভর করে তাদের কর্তার উপর এবং তার নির্দেশনা মেনে চলে, মানুষ কর্তৃক ঐশী অভিপ্রায় বাস্তবায়নের মূল্য গুণগতভাবে অন্যান্যদের দ্বারা অবশ্যম্ভাবী বাস্ত বায়নের মূল্য থেকে ভিন্ন। অপরিহার্য বা আবশ্যক পরিপূর্ণ কেবলমাত্র প্রাকতিক বা উপযোগমূলক মূল্যগুলোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর স্বাধীনভাবে পরিপূর্ণ নীতিগত মূল্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। অবশ্য, আল্লাহর নৈতিক উদ্দেশ্যগুলোর তথা মানুষের প্রতি

---

২৫. কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানে কখনো কোন পরিবর্তন পাবেনা এবং আল্লাহর বিধানে কোন ব্যতিক্রমও পাবেনা (৩৫ : ৪৩)

২৬. সৎকর্ম পরায়ন তারাই, যারা আসমান ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে এবং বলে, হে আল্লাহ এই সৃষ্টিকে অনর্থক সৃষ্টি করনি (৩: ১৯১) ... (২১:১৬) "নিশ্চয়ই আমরা আসমান, জমিন এবং এর মধ্যে যা আছে তা খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি।"

২৭. আল্লাহ যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং নিখুঁতভাবে করেছেন, তিনি জমিনকে করেছেন তোমাদের জন্য শস্য, আকাশকে চান্দুয়া স্বরূপ এবং তোমাদিগকে দিয়েছেন সুন্দরতম অবসর (৪০ : ৬৪) (৩২:৭) প্রত্যেক কিছুকেই দিয়েছেন তার বিশিষ্ট প্রকৃতি এবং শাশ্বত ব্যবস্থায় তার জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট স্থান (৩৬ : ১২)।

২৮. আল্লাহ যিনি আসমান এবং জমিনের মালিক, তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকের জন্য তিনি নির্বাচিত করেছেন তার বিশিষ্ট মাত্রা (তার চরিত্র, গতিপথ এবং নিয়তি) ১৫ : ২) বল আমাদের প্রতি এমন কছুই ঘটবেনা আল্লাহ যা আমাদের জন্য স্থির করেছেন তা ছাড়া (৩২ : ১২) (পূর্ব উদ্ধৃত) এই শিক্ষাই।

www.icsbook.info

তাঁর আদেশ নিষেধের অবশ্যই একটি ভিত্তি আছে বাস্তবজগতে এবং সে কারণে এগুলোর রয়েছে একটি হিত বা উপযোগমূলক দিক। কিন্তু এদেরকে, তাদের সেই বিশিষ্ট গুনটি দান করেনা (যে গুণটি হচ্ছে নীতিগত হবার বৈশিষ্ট্য)। এটি হচ্ছে সে সবের স্বাধীনভাবে সম্পন্ন হবার দিক, অর্থাৎ সব সময়ই মুক্ত থেকে সম্পন্ন, সংক্ষিত হবার দিক যা তাদেরকে দেয় সেই বিশেষ মর্যাদা যা আমরা নৈতিক সকল বস্তুর প্রতি আরোপ করে থাকি।[২৯]

ঘ. মানুষের ক্ষমতা এবং প্রকৃতির নমনীয়তা

যেহেতু প্রত্যেকটি বস্তুই সৃষ্টি হয়েছে একটি উদ্দেশ্যে, সামগ্রিকভাবে অস্তিত্বসমূহের সৃষ্টির উদ্দেশ্যও তার চেয়ে কম নয়– দেশ এবং কালে সম্ভব হওয়া অবশ্যই আবশ্যক।[৩০] অন্যথায় হতাশাবাদ থেকে নিস্কৃতি নেই। খোদ সৃষ্টি, দেশকালের প্রক্রিয়া সবকিছুই তাদের অর্থ এবং তাৎপর্য হারিয়ে বসবে। এই সম্ভাবনা ছাড়া তকলীফ (দায়িত্ব, নৈতিক বাধ্যবাধকতা, দায়িত্বশীলতা) অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং তার সঙ্গে ধ্বংস হয় আল্লাহর উদ্দেশ্যময়তা অথবা বিনষ্ট হয় তাঁর শক্তি, পরমের বাস্তবায়ন অর্থাৎ সৃষ্টির ঐশী যুক্তি ও কারণ, অবশ্যই ইতিহাসে সম্ভব হতে হবে, অর্থাৎ সৃষ্টির এবং বিচার দিবসের মধ্যে, কালের যে প্রক্রিয়া, তার মধ্যে তা সম্ভব হওয়া অবশ্যই আবশ্যক। তাই নৈতিক কর্মের কর্তা হিসেবে মানুষকে অবশ্যই নিজেদেরকে, তার সঙ্গীগণকে অথবা সমাজের, প্রকৃতির অথবা পরিবেশের পরিবর্তন করার ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হতে হবে, যাতে করে সে তার নিজের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে ঐশী প্যাটার্ণ বা আদেশ-নিষেধকে কার্যকর করতে পারে।[৩১] নৈতিক কর্মের একজন কর্তা হিসেবে মানুষকে তার সহচরগণ ও প্রতিবেশ, সকলেরই মানুষরূপী কর্তার ফলপ্রসু কর্মকে গ্রহণের ক্ষমতা ভিন্ন, এছাড়া মানুষের নৈতিক কর্মের সামর্থ্য হবে অসম্ভব এবং বিশ্বের উদ্দেশ্যময় প্রকৃতি পড়বে ধ্বসে। এখানেও তোমার কোলে আশ্রয় নেবার কোন অবকাশ নেই, সৃষ্টিকে যদি একটি উদ্দেশ্য আবশ্যক হয়– এবং এটি একটি আবশ্যিক ধারণা, যদি আল্লাহ হন এবং তার কর্ম একটি উদ্দেশ্যহীন অগ্নি পরীক্ষা না হয়। সৃষ্টিকে হতে হবে অবশ্যই নমনীয়, রূপান্তর সম্ভব, তার আধেয়, কাঠামো, অবস্থা ও সম্পর্কসমূহ পরিবর্তনক্ষম হতে হবে, যাতে করে মানবিক প্যাটার্ণ বা উদ্দেশ্যকে ধারণ করতে বা নিরেট রূপ দিতে পারে। একথা মানুষের দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক

---

২৯. আল্লাহ যে আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলেন প্রকৃতিকে, কিন্তু প্রকৃতি যা গ্রহণ করতে পারলনা, কিন্তু মানুষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে গ্রহণ করল এবং বহন করতো, তার নাটকীয় বর্ণনা দেওয়া হয়েছে কুরআনে। মূল কথা ইহাই নৈতিক বিধান তকলীফ (বাধ্যবাধকতা) অনিবার্যভাবেই বুঝায় কুদরত (করবার সামর্থ্য এবং ইখতিয়ার)।

৩০. (আল্লাহ) আমি জ্বীন এবং মানুষকে আমার দাসত্ব ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। (৫১ : ৫৬) ... (আল্লাহ) যিনি দৃষ্টি করেছেন জীবন এবং মৃত্যু যাতে তোমরা তোমাদের কর্মে যোগ্যতা প্রমাণ করতে পার (৬৭ : ২)।

৩১. ঐ

www.icsbook.info

প্রকৃতিসহ, সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রেই সত্য, সকল সৃষ্টিই তার যা হওয়া উচিত, তা হওয়ার অথবা আল্লাহর অভিপ্রায় বা প্যাটার্ণ অথবা পরম সত্যকে[৩২] এই দেশ ও এই কালের মধ্যে তা বাস্তবায়নের ক্ষমতায় ক্ষমতাবান।

৬. দায়িত্বশীলতা ও বিচার

আমরা লক্ষ্য করেছি ঐশী প্যাটার্ণের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের জন্য মানুষের বাধ্যবাধকতা রয়েছে তার নিজেকে, সমাজকে ও প্রতিবেশীকে পরিবর্তন করার জন্য। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি– মানুষ তা করতে সমর্থ, কেননা সৃষ্টি নমনীয়, তার কর্মকে গ্রহণ করতে এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে রূপদান করতে সে সক্ষম। এই সব বাস্তবতা থেকে এ সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয়ে উঠে যে, মানুষ দায়িত্বশীল।[৩৩] তার দায়িত্বশীলতা অথবা হিসাব ব্যতিরেকে নৈতিক বাধ্যবাধকতা সম্ভব নয়। মানুষ যদি না দায়িত্বশীল হয় এবং যদিনা তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোন না কোনভাবে এবং কোথাও না কোথাও তাকে হিসাব দিতে হয়, তেমন অবস্থায় নৈরাশ্যবাদ আবার অনিবার্য হয়ে ওঠে। অথবা দায়িত্বশীলতার পূর্ণতা হচ্ছে নৈতিক বাধ্যবাধতা অথবা নৈতিক অত্যাবশকতর অপরিহার্য শর্ত সত্য। নিয়মাতৃকতার মূল প্রকৃতি থেকেই তা সূচিত হয়।[৩৪] এই হিসাব দেশকালের মধ্যে বা অন্তে হউক অথবা উভয়ের মধ্যে হউক তা বিবেচ্য নয়। সত্য এই যে, অবশ্যই তা ঘটতে হবে। আল্লাহকে মেনে চলা অর্থাৎ তার আদেশ নিষেধ কার্যকর করা এবং তার প্যাটার্ণ বাস্তবায়নের তাৎপর্যই হচ্ছে ফালাহ অর্জন করা। তা না করার মানে হচ্ছে তার অবাধ্যতা করা, শাস্তি, দুঃখ-কষ্ট, অসুখত্ব এবং ব্যর্থতার যন্ত্রণা নিজের উপর ডেকে আনা।[৩৫]

উপরোক্ত পাঁচটি মৌলনীতি স্বতঃসিদ্ধ সত্য; এগুলো নিয়েই গঠিত আত-তাওহীদের মর্মবস্তু এবং ইসলামের সার নির্যাস। এই দুই-ই সমভাবে দীনে হানিফার সারবস্তু, আসমান থেকে যত প্রত্যাদেশ এসেছে সকলের সারকথা।[৩৬] সকল নবী রাসূলই এই

---

৩২. সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সমস্তকিছু প্রশংসা করে, আনুগত্য করে আল্লাহর, যা কিছুরই অস্তিত্ব আছে তা আল্লাহর প্রশংসা ও আনুগত্য করে (১৭ : ৪৪)

৩৩. এবং তারা (সকল মানুষ) হিসাব দিতে বাধ্য হবে। (২১ ২৩) (কুরআনুল করিমে বহু অনুচ্ছেদ রয়েছে যার প্রধানবক্তব্য হচ্ছে মানুষের দায়িত্বশীলতার ঘোষণা।

৩৪. 'হিসাব' দ্বারা ইসলাম একথাই বুঝিয়ে থাকে যে বিচার দিবসে আল্লাহ মানুষের হিসাব গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, তা কুরআনে সর্বত্র বিদ্যমান এবং এ হচ্ছে ইসলামের নৈতিক ধর্মী সমগ্র ব্যবস্থাটির ভিত্তি।

৩৫. মক্কায় অবর্তীন কুরআনের সূরাগুলোর পাঠ থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্কে চুক্তিমূলক। পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূল এবং তাদের উম্মতদেরও ধারণা একই। প্রাচীনকালের মানুষের সকল ধর্মীয় এবং নৈতিক ভিত্তিমূলেও বিদ্যমান এ অংগীকার চুক্তিমূলক মর্মকথা। মেসোপটেমিয়ার Fnuma Elish, এবং Lippit Ishter এবং হামুরাবীর আইনে, তা সম্পূর্ণ। দেখুন James B Pritchatred, *Ancient Near Eastern Texts* (Princeton : Princeton University Press, 1955)

৩৬. 'হানিফ' হিসেবে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর, আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর প্রকৃতির কোন পরিবর্তন নাই, ইহাই সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (৩০-৩০)

www.icsbook.info

মৌলনীতিগুলোর শিক্ষা দিয়েছেন এবং এগুলোর ভিত্তিতে তাদের আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। একইভাবে, এই মৌলিনীতিগুলো মানব প্রকৃতির গঠন কাঠামোতেই আল্লাহ নির্মাণ করেছেন, যা নিয়ে গঠিত অভ্রান্ত প্রাকৃতিক দীন অথবা স্বভাবগত বিবেক, যার উপর নির্ভর করে অর্জিত মানবিক জ্ঞান। তাই স্বভাবতই সকল ইসলামী সংস্কৃতিই এগুলোর উপর নির্মিত এবং এসব সম্মিলিত ভাবে গঠন করে তাওহীদের সারবস্তু, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক নৈতিকতা, নন্দনতত্ব এবং সমগ্র ইতিহাসব্যাপী মুসলিম জীবন এবং কর্মকান্ড।

চ. উপসংহার

উপসংহারে আমরা বলতে পারি, ইসলামে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সারনির্যাস হচ্ছে এই উপলব্ধি যে, মানবজীবন অর্থহীন নয়; এর অবশ্যই একটা উদ্দেশ্য থাকবে যার প্রকৃতি নতুন ক্ষুধা থেকে নতুন নিবৃত্তির দিকে, নিবৃত্তির স্বাভাবিক প্রবাহের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারেনা। মুসলিমের জন্য চূড়ান্ত অবস্থা হচ্ছে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণী-স্বাভাবিক এবং ইন্দ্রিয়াতীত নিয়ে গঠিত এবং সে ইন্দ্রিয়াতীতা তার দিকেই তাকায়, প্রকৃতির প্রবাহকে সে যে মূল্যগুলোর দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করবে সে গুলোর সন্ধানে। ইন্দ্রিয়াতীত ক্ষেত্রকে আল্লাহ হিসেবে চিহ্নিত করার পর, সে তা থেকে নির্গত নয় এমন যে কোনো কর্ম নির্দেশনাকে বাতিল বলে গণ্য করে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তার কঠোর অনমনীয় তাওহীদ হচ্ছে নৈতিক নির্দেশনা ছাড়া মানবজীবনকে অন্য কোনো নির্দেশনার অধীনে স্থাপন করতে অস্বীকৃতি। সুখবাদ, eudaemonism এবং অন্য সকল থিওরি, যা প্রাকৃতিক জীবনের প্রক্রিয়ার মধ্যে আবিষ্কার করে নৈতিক মূল্য, সেগুলো হচ্ছে তার জন্য আতংকজনক। তার মতে, এর যে কোন একটি গ্রহণ করা হচ্ছে মানুষের কর্মের লক্ষ্য ও নির্দেশনা হিসেবে আল্লাহর পরিবর্তে অন্য সব দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করা। শিরক (আল্লাহর সঙ্গে অন্যান্য ইলাহকে শরীক করা 'যা তাওহীদের লংঘন' হচ্ছে নৈতিক মূল্যগুলোকে প্রাকৃতিক এবং হিতকর মূল্য সমূহের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা, যে গুলো আসলে নিমিত্ত মাত্র এবং কখনো চূড়ান্ত নয়।

মুসলিম হবার অর্থই হচ্ছে যথার্থত কেবলমাত্র আল্লাহকেই (অর্থাৎ স্রষ্টাকে এবং প্রকৃতি অথবা সৃষ্টিকে নয়) লক্ষ্য বা মান নির্ধারক হিসেবে উপলব্ধি করা, কেবলমাত্র তাঁর অভিপ্রায়কেই আদেশ নিষেধ হিসেবে প্রত্যক্ষ করা, কেবল তাঁর প্যাটার্ণই সৃষ্টির ধর্ম নৈতিক অভিকাংখতা বলে উপলব্ধি করা; মুসলিম দৃষ্টির মূল কথা হচ্ছে সত্য, সুন্দর ও শুভত্ব। কিন্তু এগুলো তার পক্ষে নৈতিক বৃত্তিসমূহের প্রক্রিয়ার বহির্ভূত নয়। এ জন্য সে তার ধর্মীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের নিয়ম নীতির দিক দিয়ে একজন মূল্যতাত্ত্বিক বা Axiologist, তবে তার একমাত্র লক্ষ্য, আইনতত্ত্ববিদ হিসেবে, কেবল একটি সুষ্ঠু deontology তে পৌঁছানো; তার জন্য বিশ্বাসের দ্বারা যৌক্তিকতা প্রমাণ করা অর্থহীন, যদি না তা হয় কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য সহজ ভূমিকা। এখানেই যেমন তার মহত্ত ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী, তেমনি তার হীনত্বেরও অবকাশ। সে জানে মানুষ হিসেবে আসমান এবং জমিনের মধ্যে সে একা দন্ডায়মান এবং তাকে পথ দেখানোর জন্য তার

www.icsbook.info

বিবেক ছাড়া কিছুই নেই, কার্যসাধনের জন্য তার সমূদয় শক্তিকে নিয়োজিত করার ইচ্ছাকে ও পথের খানা-খন্দক থেকে তাকে উদ্ধার করতে। তার প্রতিকার হচ্ছে বিপদসংকুল জাগতিক জীবন যাপন করা কারণ তার পক্ষে তার কাজটি করে দেবার জন্য কোনো ইলাহ নেই, যদি এবং যখন সে কাজটি নিজে নিজে সম্পন্ন করতে পারে, তখন কাজটি যে কেবল সম্পাদিত হয় তা নয়, সে তা থেকে নিবৃত্ত হতেও পারেনা। প্রকৃতিগতভাবে বিপদের জীবন যাপনই তার ভাগ্য; একজন মুসলিম হিসেবে তাকে অবশ্যই ঐশী দায়িত্বভার সম্পূর্ণ কার্যকর করতে হবে, অথবা এই প্রক্রিয়ায়, তাকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে।[৩৭] নিশ্চয়ই তার পথের প্রত্যেক বাঁকেই তার জন্য ট্রাজেডি ওঁৎ পেতে আছে, এবং এটাই তার গর্ব। প্ল্যাটো যেমন বলেছেন 'শুভকে, মঙ্গলকে ভালবাসাই তার অদৃষ্ট।'

৩৭. এ প্রসঙ্গে, তাঁর পিতৃব্য আবু তালেব তাকে ইসলামের কারণে মক্কার শত্রুদের হাতে বনু হাশিমের দুঃখ যন্ত্রণা সমাপ্তির জন্য, ইসলাম প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করলে, রাসূল যে জবাব দিয়েছিলেন তা বিবেচনা করুন, তিনি বলেছিলেন ঃ "হে আমার পিতৃব্য, ওরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য্য এবং বাম হাতে চন্দ্র দেয়, তবুও আমি কখনো, আমার এই দাওয়াত থেকে নিবৃত্ত হবোনা, নতুন ধর্ম প্রচারে যদি আমি ধ্বংস হয়ে যাই তবুও।" (মোহাম্মদ হুসেন হাইকল : *The Life of Mohammad Abyev' Ismail R. al-Faruqi, (Indianapolis: American Trust Publications. 1976)*।

www.icsbook.info

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের সারনির্যাস

১. আত্ তাওহীদের গুরুত্ব

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামী সভ্যতার সারনির্যাস হচ্ছে ইসলাম। অথবা ইসলামের সারনির্যাস হচ্ছে আত্ তাওহীদ-এই বিশ্বাস ও ঘোষণা যে, আল্লাহ্ এক, একমাত্র পরম এবং ইন্দ্রয়াতীত স্রষ্টা, যা কিছু আছে সমস্তরই তিনি প্রভূ ও সৃষ্টা।

এই দুটি মৌলসূত্র স্বতঃসিদ্ধ; যারা ইসলামী সভ্যতার অন্তর্গত অথবা যারা এতে অংশগ্রহণ করেছে, এ কখনো তাদের সন্দেহের বিষয় নয়। কেবল অতি সাম্প্রতিক কালেই মিশনারী, প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ও ইসলামের অন্যান্য শত্রুরা এই বিষয়ে সন্দেহ করছে। কিন্তু আমরা মুসলমানদের জন্য এগুলো স্বতঃপ্রমাণ। ইসলামী সংস্কৃতি ও ইসলামী সভ্যতার একটি জ্ঞান ও সার আছে; যার নাম আত্ তাওহীদ[১], যা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও বর্ণনার উপযুক্ত। সার বা সারনির্যাস হিসেবে তাওহীদের ব্যাখ্যা অর্থাৎ ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার সর্বপ্রথম নির্ধারক মৌলনীতি হিসেবে তাওহীদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু।

আত্ তাওহীদ হচ্ছে সেই বস্তু যা ইসলামী সভ্যতাকে দেয় একটি পরিচয়, যা এর সকল উপাদানকে একত্রে আঁটসাঁট করে বাঁধে এবং তাদেরকে নিয়ে গড়ে তোলে একটি সংহত পরস্পর সংবদ্ধ, পরস্পর নির্ভরশীল অংশ সমন্বয়ে গঠিত একটি ব্যবস্থা, যাকে আমরা বলি সভ্যতা। অসম ও উপাদানগুলোকে একত্রে বাঁধতে গিয়ে সভ্যতার সারনির্যাস, এ ক্ষেত্রে আত্ তাওহীদ, এসবকে নিজের ছাঁচে মুদ্রিত করে তাওহীদ এগুলোকে নতুন আকার দেয়; অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে সুসংহত ক'রে তোলার জন্য পারস্পরিক সমর্থনের উদ্দেশ্যে তাদের প্রকৃতি বা স্বভাবের জবরদস্তি পরিবর্তন না করে এই সারবস্তু সভ্যতার উপাদানগুলোকে রূপান্তরিত করে এবং তাদেরকে দেয় তাদের নতুন চরিত্র, যে উপাদান নিয়ে সেই সভ্যতা গঠিত হয়। এ রূপান্তরের মাত্রা সামান্য থেকে মৌলিক পর্যন্ত হতে পারে। রূপান্তর অতি সামান্য তখনই যখন এসবের রূপের উপর তা প্রভাব ফেলে এবং তখনি তা মৌলিক যখন তা তাদের ক্রিয়াকে করে প্রভাবিত। কারণ, কর্মের উপর এই প্রভাবের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে সার নির্যাসের সঙ্গে এই জন্যই মুসলিমরা ইলমুত তাওহীদ–বিজ্ঞানের বিকাশ সাধন করে এবং তার নীচে স্থাপন করে ন্যায়শাস্ত্র, জ্ঞানতত্ত্ব, পরাবিদ্যা ও ধর্মশাস্ত্রের বিধি বিধান।

---

১. ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী *'জওহর আল হাদারা আল-ইসলামিয়া' আল মুসলিম, আল-মুয়াসির* ৭ম খণ্ড নং ২৭ (১৯০১/১৯৮১), ১-২৭। প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল 'Critical Response' সহ এবং 'Response to the Response' *আল-ইসলাম ওয়া আল-হাদারায়* (রিয়াদ, W. A. M. Y. Publications) ১৪০১/১৯৮১ দ্বিতীয় খন্ড ৫৮৩-৬৬৮।

www.icsbook.info

আল্লাহ বলেছেন, "আমি আমার দাসত্বের জন্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে মানুষ এবং জ্বীনকে সৃষ্টি করিনি। এবং প্রত্যেক জাতি বা উম্মতের কাছে আমি একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদেরকে এই কথা জানাতে যে, তাদের উচিত আল্লাহর দাসত্ব করা এবং তাগুতকে পরিহার কর। তোমার প্রভু এই নির্দেদ জারী করেছেন যে, তোমরা কেবল তারই দাসত্ব করবে, আর কারো নয়। আল্লাহর বন্দেগী কর, এবং কাউকে বা কোন কিছুকে তার শরীক করো না, আসো তোমাদেরকে আমি বলে দেই, তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে কী নিষেধ করেছেন। তোমরা কাউকে বা কোন কিছুকে তার অংশীদার করোনা।"[২]

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে বুঝাচ্ছে যে, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে কেবল আল্লাহর দাসত্ব। কেবল আল্লাহই ইবাদতের যোগ্য, কেবল তিনিই বন্দেগী পাবার উপযোগী। তাঁর প্রসন্নতা, মানে কেবল তারই জন্য সকল মানবিক বাসনা, মানুষের সকল কর্মের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমাদের নবী মোহাম্মদের (সা:) পয়গামের সারাৎসার হচ্ছে ইহাই, যা তাঁর পক্ষে কেবল আল্লাহর বাক্য দ্বারাই প্রকাশ করা সম্ভব ছিলো 'শোন তোমাদের প্রভূ তোমাদিগকে যা নিষেধ করেছেন, তা আমি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি। তোমরা তাঁর শরীক করোনা।"[৩] আত তাওহীদ যে আল্লাহর সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদেশ তার প্রমাণ এই যে, আল্লাহ সব পাপই ক্ষমা করে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন, কেবলমাত্র আত্ তাওহীদ লংঘনের পাপ ছাড়া। "আল্লাহ তাঁর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহকে শরীক করা ক্ষমা করবেননা, কিন্তু যাকে ইচ্ছা তিনি এর চেয়ে নিম্নতর অপরাধগুলো মাফ করে দেবেন। যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে কাউকে বা কোনো কিছুকে শরীক করে, সে তো মহাপাপ করে।[৪]

স্পষ্টই, আত্ তাওহীদকে বাদ দিয়ে ইসলামের কোন আদর্শই গ্রাহ্য নয়। যে মুহূর্তে তাওহীদকে লংঘন করা হবে সেই মুহূর্তে খোদ গোটা ধর্মই আল্লাহর দাসত্বের মানবিক বাধ্যবাধকতা, তাঁর আদেশাদি পালন এবং নিষেধাদি মেনে চলন সবই ধ্বসে পড়বে, কারণ আত্ তাহওহীদকে লংঘন করার অর্থই হচ্ছে, আল্লাহ যে এক এবং কেবল একমাত্র আল্লাহ তাতে সন্দেহ করা, আর তা করার মানেই হচ্ছে, এই ধারণা যে,

---

২. আমি জ্বীন এবং মানবজাতিকে কেবল আমার বন্দেগীর উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি। (৫১:৫৬).... প্রত্যেক জাতির কাছে আমি একজন রাসূল পাঠিয়েছি, একথা শিখানোর জন্য যে, ইবাদত কেবল আল্লাহরই উদ্দেশ্যে এবং মন্দকে বর্জন করতে হবে (১৬:৩৬)... তোমাদের প্রতিপালক এই বিধান দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবেনা (১৭: ৩৬) আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করোনা (৪:৩৬)... বল (হে মোহাম্মদ) মানুষকে 'শোন, আমি তোমাদের বলছি তোমাদের প্রতিপালক যা নিষেধ করেছেন, প্রথম এই যে, তোমার আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহকে শরীক করোনা। (৬:১৫১)

৩. (৬:১৫১)।

৪. আল্লাহ তার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, কিন্তু এ ছাড়া যার প্রতি ইচ্ছা, আর সকল অপরাধই তিনি ক্ষমা করে দেন, তাই যে কেউ আল্লাহর প্রতি শরীক স্থির করে, সে নিশ্চয়ই এক মহা অপরাধ করেছে (৪:৪৮)।

www.icsbook.info

আল্লাহর ঐশী ক্ষমতায় অন্যেরাও শরীক হতে পারে। আল্লাহর আদেশটির বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ না করে তা করা যায়না; কারণ, দুই কিংবা ততোধিক ইলাহ থাকলে, যুক্তি তর্কের দিক দিয়ে ইহাই অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, এই ইলাহদের প্রত্যেকেরই তার সৃষ্টির বা তার উপর নির্ভরশীলদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা হবে, চেষ্টা করবে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বীতায় একজন অপরজনকে ছাড়িয়ে যেতে।[৫] এ সব ইলাহ মানুষের কোন কাজে লাগবেনা, যদি না এক ইলাহ অন্য ইলাহগণকে ধ্বংস করে, অথবা নিজের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করে, কারণ কেবল তখনই সে হতে পারে পরম সত্তা যা আল্লাহর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আবশ্যক। কেবলমাত্র একটি 'চূড়ান্ত উৎসই' হতে পারে পরম শুভ, পরম কর্তৃত্বাধিকারী, পর মৌলসূত্র। অন্যথায় একজন অধীনস্থ ইলাহর কর্তৃত্ব, এমন একজন ইলাহ যার সঙ্গে থাকতে পারে আরো সব ইলাহ, সবসময়ই তার সম্পর্কে থাকবে সংশয়ের অবকাশ। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন, "যদি তাদের মধ্যে (আসমান জমিনে) আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ থাকতো এসবই বিশৃংখল হয়ে পড়তো।"[৬] প্রকৃতি দু'জন প্রভূ মানতে পারে না; প্রকৃতি সুশৃংখলভাবে চলতে পারেনা এবং আমরা তাকে যে একটি সুসংবদ্ধ জগত হিসেবে দেখি তা সম্ভব নয়, যদি কর্তৃত্বের উৎসই দুই বা ততোধিক হয়, যদি চূড়ান্ত নিয়ামক হয় দুই কিংবা তার বেশী।

তাওহীদ ব্যতিরেকে ইসলাম অস্তিত্বহীন। নিশ্চয়ই, কেবল যে আমাদের নবীর সুন্নাহই সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠবে এবং এর অনুজ্ঞার আমোঘতাই কেবল বিচলিত হবে তা নয়, নবুয়তরূপে বিধানটিই ধ্বসে পড়বে। এই ইলাহর ক্ষেত্রে যে সব সন্দেহ বহু সম্পর্কিত তাদের পয়গামের বেলায়ও সেগুলো হবে প্রযোজ্য। তাই, আত্ তাওহীদের মৌলনীতি অবলম্বনই হচ্ছে সকল পূণ্যকর্ম, সকল ধার্মিকতা এবং সকল সৎগুণের মূলভিত্তি। স্বভাবতই, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল আত্ তাওহীদ পালনকে দিয়েছেন সর্বোচ্চ মর্যাদা, সর্বোচ্চ মূল্য এবং করেছেন পুরস্কারের হেতু। তিনি বলেছেন, "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম বা সীমালংঘনের সঙ্গে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা, তারাই সুপথে পরিচালিত।"[৭] একইভাবে উবাদা ইবনুস সামিত বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে কেউ এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি একক, তাঁর

---

৫. আল্লাহ কখনো কোন পুত্রের জন্ম দেননি বা পোষ্যরূপে পুত্র গ্রহণ করেন নি। তাঁর কখনো কোন শরীক ছিলনা, যদি থাকতো তাহলে প্রত্যেকে তাঁর এলাকার উপর একচ্ছত্র আধিপত্য কামনা করতো, তেমনি অন্যদের এলাকার উপরও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতো, কিন্তু আল্লাহ তাদের সকল বর্ণনার উর্ধে পুত-পবিত্র (২৩:৯১)।

৬. আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ থাকলে বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যের কারণে আসমান এবং জমিন ধ্বংস হয়ে যেত। প্রশংসা আল্লাহর যিনি সর্বময় ক্ষমতার মালিক, তারা তার সম্পর্কে যা কিছু বলে তিনি তার সমস্ত কিছুর উর্ধে পুত-পবিত্র (২১:২২)

৭. সুপথে পরিচালিত লোকেরা, যারা ঈমান আনে এবং সীমা লংঘন করে না, তাদের বিশ্বাসকে অন্যায়ের দ্বারা কলুষিত করেনা নিরাপত্তা এবং সুপথের দিশা তাদের জন্য (৬:৮০)।

www.icsbook.info

কোনো শরীক নাই এবং মোহাম্মদ তাঁর দাস ও রাসূল, ঈসা আল্লাহর দাস এবং তার রাসূল, মরিয়মের প্রতি তাঁর আদেশ, তাঁর রুহ, এবং জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, আল্লাহ তাকেই দাখিল করবেন জান্নাতে।" এই হাদিসটি উভয় 'সহীতে'ই বর্ণিত হয়েছে যাতে ইত্বানের এই বর্ণনাও লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে কেহ এই সাক্ষা দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং আল্লাহর প্রসন্নতা ব্যতিরেকে সে আর কিছু কামনা করেনা, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের অনুমতি দেবেন না।" আবু সাঈদ আল খুদরীর এক বর্ণনা থেকেও জানা যায়, রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মুসা (আ.) আল্লাহকে বললেন 'যখন তিনি তাঁকে স্মরণ করবেন, কিংবা তাঁকে ডাকবেন, তখন আবৃত্তি করবার জন্য আল্লাহ যেন তাকে একটি প্রার্থনা শিখিয়ে দেন। আল্লাহ বলেন "হে মুসা, তুমি বল, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।" মুসা বললেন, "হে আমার প্রতিপালক, আপনার সকল দাসইতো এই কথাগুলো বলে।" আল্লাহ বললেন, "হে মুসা, যদি সাত আসমান এবং সেগুলো যা ধারণ করে আর সাত জমিন এবং তাতে যা কিছু আছে এ সবকিছু যদি ওজন করা হয় আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এই কালিমার সঙ্গে, তাহলে এই কালিমাই হবে ওজনে ভারী।" তিরমিযিতে এও বর্ণিত আছে যে, আনাস (রা.) নবী করিমকে (সাঃ) বলতে শুনেছেন, "আল্লাহ বললেন, হে মানুষ পৃথিবীর সমস্ত বস্তা ভর্তি করে পাপ নিয়ে যদি তোমরা আমার কাছে আস কিন্তু তোমরা এই সাক্ষ্য দাও যে, তোমরা আমার সঙ্গে কোন কিছু শরীক করবেনা, আমি তোমাদের কাছে আসবো ঐ সমস্ত বস্তা ভর্তি করুণা আর ক্ষমা নিয়ে।"[৮]

তাই, এ কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, মুসলমানের সংজ্ঞা দেওয়া যায়, তার তাওহীদ অনুসরণ, তার সাক্ষ্য ঘোষণার দ্বারা, সমস্ত সৃষ্টি, সমস্ত সত্বা ও জীবন, সমস্ত ধর্মের চূড়ান্ত মৌলনীতি হিসেবে, আল্লাহর পরম এককত্ব এবং ইন্দ্রিয়াতীততা দ্বারা।

২. ইহুদী ও খ্রীষ্টানধর্মে ঐশী উত্তরণ

ইতিপূর্বে যে সব সেমিটিক শিকড় থেকে ইহুদী ধর্ম ও খ্রীষ্টান ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে, সেই একই শিকড় থেকে উৎপন্ন বিশ্বের নবীনতম ধর্ম হিসেবে ইসলামকেও এই সব ধর্মের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ণয় করতে হয়েছে। ইসলাম নিজেকে যে রূপ গণ্য করে, তাদেরকেও অনুরূপ মনে করে, গঠন করে এই সব ধর্ম ও ইসলাম মিলে পৃথিবীতে ঐশী মিশনের বাহক হিসেবে, আর সে কারণে সেমিটিক চৈতন্যের আনুক্রমিক মুহূর্তগুলোকে।[৯] মানব ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্ত হিসেবে গণ্য করে, এভাবে ইহুদী ধর্ম ও খ্রীষ্টান ধর্মের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেও ইসলাম তাদের ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করেছে

---

৮. শেখ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব, তাঁর *কিতাবুত তৌহীদ* গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। দেখুন বর্তমান গ্রন্থকার কর্তৃক একই শিরোণামে অনুবাদ (Kuwait I. F. S. O 1399/ 1989)।

৯. H. Bettensan. *Documents of the Christiann Church* (London Oxford University Press, 1956) 61. 68-69

www.icsbook.info

এবং এদের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তিগুলোকে সংশোধন করতে চেষ্টা করেছে। আল্লাহর ইন্দ্রিয়াতীতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা, সেমিটিক চৈতন্যের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক বিভ্রান্তি, আর সে কারণে ইসলাম, আল্লাহর দৃষ্টিতে যাকে ক্ষমার সবচেয়ে কম যোগ্য বলে চিহ্নিত করেছে। ইসলাম দাবী করে ইহুদী ধর্ম ও খ্রীস্টান ধর্ম নিজেদেরকে এই অপরাধে অপরাধী করেছে, এদের আদিরূপে নয় আল্লাহর কাছ থেকে তারা যে ওহী পেয়েছিল তাতেও নয়, বরং তাদের ঐতিহাসিকরূপে, যে সব পাঠকে তারা ধর্মগ্রন্থ বলে গ্রহণ করেছে মানুষের পথনির্দেশের জন্য তাদের ধর্ম বিশ্বাস প্রকাশের উদ্দেশ্য, তাতেই বিভ্রান্তির সূচনা হয়েছে।

ক. ইসলাম কর্তৃক ইহুদী ধর্মের সমালোচনা

ইসলাম এই অভিযোগ করে যে, তৌরাতের সর্বত্র ইহুদী ধর্ম আল্লাহ সম্পর্কে বহুবচনে Elohim ব্যবহার করে। তারা দাবী করে যে Elohim মানুষের কন্যাদের বিয়ে করেছে (Genesis 6:2-4), দাবী করে যে ইয়াকুব এবং তাঁর স্ত্রী লাবানোর দেবতাগুলোকে চুরি করেছিলেন, কারণ তাঁরা এই সব দেবতাকে কামনা করতেন (Genesis 31:32)! God খোদা হচ্ছে একটি প্রেত, যাকে ইয়াকুব মুখামুখি দেখেছেন, তার সঙ্গে কুস্তি করেছিলেন যাকে তিনি প্রায় পরাজিত করেছিলেন (Genesis 33:24-30)! ইহুদীরা দাবী করে যে, আল্লাহ হচ্ছেন ইহুদী জাতির জনক (Psalms 2:7, 89:26, 11 Damuel 7:14:1 Chronicles 17:13 etc.) তাদের আরো দাবী যে, আল্লাহ হচ্ছে প্রকৃত অর্থেই তাদের জাতির জনক (Hosea 1:10 Isaiah 9:6, 63:14-16) অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে তাদের গণিকাবৃত্তির পরও যা মিথ্যা হয়ে যায়না (Hoasea 2 : 2-13)। ইসলাম এই অভিযোগও করে যে ইহুদী ধর্ম আল্লাহকে এমন আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধেছে যে, তিনি তাদের নৈতিকতা বিরোধী কাজ কর্ম, তাদের কাঠিন্য যে গোয়ার্তুমি সত্বেও, তিনি তাদের অনুগ্রহ করতে বাধ্য (Deuteronomy 9:5-6)। এক বন্দী ইলাহ, যে কিনা যে কোন অর্থে যে কোন মাত্রায় বন্দী, সে সেমিটিক চৈতন্যের তূরীয় আল্লাহ কিছুতেই নয়।

খ. খ্রীষ্টান ধর্মের অপরাধ

তুরীয়ত্বের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান ধর্মের অপরাধ গুরুতর। ইসলাম খ্রীষ্টান ধর্মকে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করে যে, খ্রীষ্টান ধর্ম অতুরীয় ধারণাকে ইহুদীদের রাজা, আল্লাহর পিতৃত্বকে, হযরত ঈসা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছে এবং আল্লাহর আদেশ পালনের নৈতিক তাৎপর্য দান ছাড়াও তারা এই অপরাধেও অপরাধী যে, তারা এঁকে দেয় আল্লাহ এবং ঈসার মধ্যে একত্বের তুরীয়ত্ব বিনাশী, অস্তিত্বের স্বরূপ বিষয়ক গূঢ়ের্থ। প্রকৃতপক্ষেই খ্রীষ্টান ঔদার্য নিজের সঙ্গা দিয়েছেন আল্লাহর সঙ্গে হযরত ঈসার এই মৌলিক অভিন্নতার পরিভাষায়, যা তাদের ব্যক্তিসত্তার বহুত্ব, চরিত্র এবং চৈতন্য থেকে স্বতন্ত্ররূপে স্পষ্টতই সেমিটিক প্রবাহের ভিতরে ঐশী সত্তার ইন্দ্রিয়াতীততা থেকে এই নতুন বিচ্যুতির উৎস খ্রীষ্টান ধর্মের ইহুদী উত্তরাধিকার নয়, খ্রীষ্টান ধর্মকে তা এই

www.icsbook.info

ধারণাগুলো দিয়েছে তাদের গুঢ়ত্ববাদ এই বিচ্যুতির উৎস যেমন অস্তিত্ব ছিলনা যার যুক্তি, "সে যদি কষ্ট ভোগ করে, সে আল্লাহ নয়, আর সে যদি আল্লাহ হয়, তাহলে কষ্ট ভোগ করেনি," ইন্দ্রিয়াতীততার সমর্থনে ছুঁড়ে মারা হয়েছিল সহগামী খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে।[১০] অবশ্য এর উৎস ছিল রহস্যবাদী ধর্ম সমূহের আসেমিটিক প্রভাব, এই উৎস থেকেই খ্রীষ্টান ধর্ম যাতনাবিদ্ধ আল্লাহর ধারণা গ্রহণ করে যিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং আবার জীবনে এসে পরিত্রাণ করেন, যার আশ্বাস (Mava) প্রদত্ত হয় সংবাদবাহী চিন্তার দীক্ষার প্রতি।[১১]

খ্রষ্টান ধর্মের গঠন পর্যায়ে অ-সেমিটিক জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যারা সম্পূর্ণ ভিন্ন আল্লাহর ধারণার সঙ্গে ছিল অপরিচিত, তাদের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মের সাফল্যের কারণ ছিল খ্রীষ্টান ধর্মের উপর এই তুরীয়ত্ব বিরোধী প্রভাব। হযরত ঈসার সমসাময়িকদের মধ্যে প্রচলিত নির্দোষ হিব্রু এবং আরামাইক ধারণা সমূহের ভুল ব্যাখ্যার জন্য, এ ছিল সমভাবে দায়ী। বার্নাস বা বার আদম বলতে বুঝায় একজন সু-জাত এবং সে কারণে পুণ্যবান মানুষকে, কিন্তু সেন্টপল এসে তা অর্জন করে এবং রহস্যময় অধিবিদ্যামূলক মাত্রা বা আয়তন। ঈসা (আ.) যে দাবী করেছিলেন কোন পূণ্যবান মানুষ সেই দাবীই করতে পারতো, অর্থাৎ "আমি এবং আমার পিতা (খোদা) এক", আল্লাহর অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বশ্যতা অর্থে। কিনতু খ্রীষ্টানরা এই অর্থে তা গ্রহণ করলো যে, হযরত ঈসা ঐশী মর্যাদা দাবী করেছেন। যেখানে Kurie, D. Kurios, Mar Mari এবং Maran শব্দগুলো কর্তৃত্বের অধিকারী যে কোন ব্যক্তির প্রতিই আরোপ করা যেত, সেখানে হযরত ঈসার সেমেটিক ভক্তরা মনে করলো এগুলো কেবল হযরত ঈসার প্রতিই আরোপ করা যেতে পারে। তারা যে হযরত ঈসাকে খোদারূপে ধারণা করে তারই প্রমাণ হিসেবে তারা এগুলোকে হযরত ঈসার প্রতি আরো বেশি করে আরোপ করে। পরিশেষে খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রবিদগণ এই সব উপাদানকে কিনা প্রশ্নে গ্রহণ করে, বহু ঈশ্বরের প্রমাণের জন্য হিব্রুধর্ম গ্রন্থসমূহ আতিপাতি অনুসন্ধান করে। অগষ্টিন, তারতুলিয়ান এবং আরো অনেকে তাদের বিশেষ ধরনের বুদ্ধিভিত্তিক আনাড়িপনা নিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, তাঁরা জেনেসিসের বহুবচন সর্বনামগুলোর মধ্যে পেয়েছেন ইলাহের ভিতরে তিন জনের অস্তিত্ব, "আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি।" (জেনেসিস ১ : ২৮) বর্তমান কাল কি, ব্যর্থ নির্লজ্জভাবে এই দাবীও করে যে, ঐশী প্রকৃতিতে নিহিত রয়েছে পুরুষত্ব ও নারীত্ব, কেননা উপরোক্ত উক্তির পরই জেনেসিসে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রী ও পুরুষ করে (জেনেসিস ১ : ২৮)। যেহেতু পূর্ববর্তী উক্তিটি শেষ হয়েছে 'প্রতিকৃতি' শব্দটি দিয়ে ব্যর্থ মনে করেন শেষোক্ত উক্তিটি অবশ্যই পূর্বোক্ত

১০.এই আকারে প্রকাশিত যুক্তিটি "The Arian Syllogism" নামে পরিচিত দ্র: Betteson.56

১১.G. Murray. *Five Stage of Greek Religion* (Garden City N. Y. Doubleday. 1955) 156-157

www.icsbook.info

শব্দটির ব্যাখ্যা এবং সে কারণে পুরুষত্ব ও নারীত্ব নিয়েই গঠিত ঐশী প্রতিমূর্তি।[১২] ঐশী অতুরীয়ত্বকে খ্রীষ্টানরা এত দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরেছে যে, তাদের জন্য এ হয়ে উঠেছে একটি অনড় স্থায়ী ধারণা, যার বলে পল টিল্লিস ঘোষণা করছেন sub specie etenitatis অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত খোদা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়, যদি না তাকে প্রকৃতি ও ইতিহাসের একটি বিষয় হিসেবে মুর্তরূপ দেওয়া হয়।[১৩] যেহেতু খ্রীষ্টান ধর্মে আল্লাহর তুরীয়ত্বের অবস্থা ছিল এই, সে কারণে একে যে ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে তাও ছিল সমভাবে অযথার্থ। যদিও আল্লাহ যে ইন্দ্রীয়াতীত; খ্রীষ্টানরা এই দাবী থেকে কখনও নিবৃত্ত থাকেনি তবুও তারা তার সম্পর্কে এভাবে কথা বলে যে, তিনি একজন প্রকৃত মানুষ, যিনি জমিনে বিচরণ করেছেন এবং মানুষ যা করে সবকিছু করেছেন, মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করাসহ। অবশ্য তাদের মতে ঈসা ছিলেন মানুষ ও খোদা দুই-ই। তারা কখনো ধর্মত্যাগ এবং ধর্মমতের বিরুদ্ধে তার অভিযোগের মোকাবেলায়, কখনো হযরত ঈসার মানবিকতা বা ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে একটা সংগতিপূর্ণ অবস্থান নেয়নি। একারণে সর্বোত্তম অবস্থায়ও তাদের ভাষা হচ্ছে সব সময়ই বিভ্রান্তিকর। চেপে ধরলে প্রত্যেক খ্রীষ্টানকেই একথা স্বীকার করতে হবে, আল্লাহ হচ্ছেন ইন্দ্রিয়াতীত এবং সর্বব্যাপী উভয়ই, কিন্তু তুরীয়ত্ব সম্পর্কে তার দাবী আসলেই ভিত্তিহীন। দুই বিপরীতকে স্বীকার করতে হলে ন্যায়শাস্ত্রের আইনকানুনকে পরিত্যাগ করতে হয়। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম তা করতেও প্রস্তুত ছিল। স্বতঃপ্রমাণ সত্যের উপরে আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী সত্যকে ও তাকে দেয় একটি epistemological মূলনীতির মর্যাদা। কিন্তু এই ধরনের নীতির আওতায় যে কোন বিষয়ের উপরই জোর দেওয়া যেতে পারে এবং আলোচনা হয়েও উঠে অর্থহীন। একজন খ্রীষ্টান এই দাবী নাও করতে পারে যে, ত্রিত্ববাদ হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলার একটি পন্থা, কারণ একত্বের চেয়ে ত্রিত্ব আল্লাহর প্রকৃতিকে প্রকৃষ্টতরভাবে ব্যক্ত করে, তাহলে আরো বেশী বহুত্বতা এই দায়িত্ব পালন করবে আরো ভালভাবে। যাই হোক পবিত্র ত্রয়ীকে in percipi এর মর্যাদায় চিহ্নিত করা হচ্ছে বেদাআত, কেননা তা অধিবিদ্যামূলক তত্ত্ব হিসেবে এক পদার্থকে অস্বীকার করে।

৩. ইসলামের ঐশী ইন্দ্রিয়াতীততা

এই প্রশ্নে ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মের সঙ্গে ইসলামের পার্থক্য হচ্ছে এক বিশ্বের পার্থক্য। ইসলাম আল্লাহর ইন্দ্রিয়াতীতাকে সকলের বিষয় বলে ঘোষণা করে দাবী করে যে, আল্লাহ সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যারা আল্লাহকে তার ইন্দিয়াতীতায় জানতে সক্ষম। এটা হচ্ছে একটি সহজাত দান, একটি ফিতরা (একটি প্রাকৃতিক অবস্থা যার

---

১২. Kart Darth : *Church Dogmatics* : অনুবাদ G. W. Bromely and T. F. Torrence (London T. & T. Clark 1960) III. part-1. 190 ff.

১৩. Paul Tillich, *Systematic Theology* (Chicago University of Chicago Press. 1957) Vol-2. 40

www.icsbook.info

মধ্যে জন্ম নেয় প্রতিটি মানুষ) যাতে সকল মানুষেরই অংশ আছে।[১৪] এর প্রকৃতি হচ্ছে একটি মানসিক শক্তির প্রকৃতি যা দিয়ে মানুষ ঐশী পরম একত্ব ও তৃরীয়ত্বকে চিনতে পারে। তাই ইসলাম যে সব মানুষ পরমকে, তাঁর ইন্দ্রিয়াতীত সত্তায় ধারণা করতে পারে এবং যারা তাঁকে কেবল অন্য ইলাহ বা প্রতিমার সাহায্যে উপলব্ধি করে, তাদের মধ্যে বৈষম্য বরদাস্ত করেনা। যেহেতু ঐশী তুরিয়ত্বের জ্ঞান মানুষের অন্তর্গত এবং সে কারণে অনিবার্য, ইসলাম তাই আদর্শ থেকে সকল বিচ্যুতিকে প্রকৃতি ও ইতিহাসের প্রতি আরোপ করে। ইসলামের ব্যাখ্যায় এই বিস্মৃতিপরায়ণতা, মানসিক আলস্য, তীব্র অনুভূতি এবং কায়েমী স্বার্থ হচ্ছে এসবের কারণ এবং এগুলো এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্ম পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে।

ইসলামী ধর্মমতের প্রথম ঘোষণা এই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই-মুসলিম যাকে বুঝে বিশ্বজগতের উপর আল্লাহর শাসকত্বে এবং তাঁর বিচারকত্বের কোন শরীকের অস্বীকৃতি এবং তার সঙ্গে এই সম্ভাবনার অস্বীকৃতিও যে, কোন জীব বা সৃষ্টি ঐশী সত্তার প্রতীক বা ব্যক্তিরূপ হতে পারে কিংবা ঐশী সত্তাকে কোনভাবে প্রকাশ করতে পারে। কুরআন আল্লাহ সম্পর্কে বলে, "তিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা এবং তিনি যখন কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন আদেশ করেন হও! অমনি তা হয়ে যায়। তিনি এক আল্লাহ, তিনিই তোমাদের ইলাহ (২:১১৭, ১৬৩)। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরজীবী, বিধাতা (৩:২) তিনি মহিমান্বিত, উহারা যা বলে তিনি তার কত উর্ধ্বে (৬:১০০)। কোন ইন্দ্রিয় তাঁকে দেখতে পারেনা, প্রশংসা তাঁরই যিনি ইন্দ্রিয়াতীত, যিনি তাঁর সম্পর্কে সকল দাবী এবং বিবরণকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে যান (১৭:৪৩)। এই দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর করতে গিয়ে মুসলমানরা অতিমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে, যেন তারা কখনো সম্ভাব্য কোন উপায়ে ঐশী সত্তার অস্তিত্বের সংগে কিংবা তাদের ঐশী উপলব্ধির সংগে কোন প্রতিমা বা বস্তুকে শরীক না করে। তারা অতিমাত্রায় সতর্ক থাকেন, ঐশী সত্তা সম্পর্কে কিছু বলতে বা লিখতে গিয়ে কেবলমাত্র কুরআনী ভাষা ব্যবহার করতে তাদের মতে সেসব শব্দ বা বাক্য কুরআনী প্রত্যাদেশে আল্লাহ নিজেই নিজের সম্পর্কে ব্যবহার করেছেন।

ক. শিল্পে ইন্দ্রিয়াতীতত্ব

মুসলমানরা সকল সময়ে এবং সকল স্থানে আল্লাহর ব্যাপরে কোন বস্তু বা ইন্দ্রিয়জ প্রতীককে আল্লাহর সঙ্গে জড়াতে বা শরীক করতে সযত্নে পরিহার করেছেন। কোন মুসলিম মসজিদে কখনো আল্লাহর শরীক হিসেবে কোন বস্তু বা বিষয়কে দেখা যায়নি,

---

১৪. Rudoph Otto ইসলামী দাবীর একেবারে নিকটে এসে পড়েন, যখন তিনি ঘোষণা করেন যে, সকল মানুষকেই একটি ক্ষমতা দান করা হয়েছে ইমানুল কান্টের একটি উক্তির অনুসরণে তিনি এর নামকরণ করেছেন Sensus Communis, ক্ষমতাটি এই যে, এর বদৌলতে মানুষ আল্লাহকে উপলব্ধি করতে পারে, তার রহস্যময় গভীর আধ্যাত্মিক অস্তিত্বে এবং তৎসহ তাঁর ক্ষমতা এবং মর্মস্পর্শী আবেদন ও আকর্ষণে (দ্রঃ The Idea of the Holy, (New York. Oxford University Press. 1958) অধ্যায়-৫।

www.icsbook.info

সর্বদাই একটি শূন্য প্রাসাদ থেকেছে মসজিদ। এর দেয়ালগুলো এবং সিলিং অলংকৃত হবে, হয় কুরআন থেকে নেওয়া আয়াত দিয়ে অথবা বিমূর্ত লতাপাতা এবং সর্পিলবন্ধুর কারুকার্য দিয়ে। এই লতাপাতার সর্পিল কারুকার্য ছিল পুষ্পবৃন্ত, পত্র এবং ফুলের শিল্পিত নক্সা। ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলোকে অস্বাভাবিকৃত এবং একইভাবে পুনরাবৃত্তি করা হত যাতে করে ঐশী সত্তার প্রকাশের বাহন হিসেবে এগুলোতে সৃষ্টিগতভাবে স্বাভাবিক কোন আভাসেরও অবকাশ না থাকে। লতাপাতা ও ফুলের এই সব নক্সার কেবলমাত্র জ্যামিতিক ফিগারই থাকতে পারে, যেগুলো তাদের জ্যামিতিক প্রক্রিয়ার জন্যই, আল্লাহকে প্রকাশ করার মাধ্যমে হিসেবে প্রকৃতিকে অস্বীকার করে। প্রকৃতিগতভাবেই এধরনের শিল্পকর্ম ব্যাপকতাধর্মী, যাতে ইঙ্গিত মিলে এক অনন্ত দৃষ্টির যার সঙ্গে এর ফিগারগুলোর পারস্পরিক জড়াজড়ি কল্পনাকে অনন্তের দিকে ধাক্কা দিয়ে অগ্রসর করে দেয়। এতে উৎপন্ন হয় যুক্তির একটি ভাব–এর নিজেরই অনন্ত অনুবর্তন, এবং কল্পনার কাছে দাবী জানায় নির্দিষ্ট প্রাচীর প্যানেল, ফ্যাসাড এবং মেঝের প্লান ছাড়িয়ে এই অনুবর্তনের সম্প্রসারণ, লতাপাতার কারুকার্যময় এই শিল্প, যখনই অনন্ত অনুবর্তন সৃষ্টির দাবী জানায় তখনই কল্পনা তাতে ব্যর্থ হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় তা প্রসংগকে দেয় অনন্তের নান্দনিক অন্তরদৃষ্টি, ইন্দ্রিয়তীততার বিশেষ একটি চেহারা, পরম নান্দনিক মৌলনীতি হিসেবে। ঐশী ইন্দ্রিয়াতীততা পরিপূরণ করতে গিয়ে ইসলামের সকল শিল্পকলার বিকাশ ঘটে, সকল শিল্পকলা বিশিষ্ট শৈলী লাভ করে অস্বাভাবিককরণ হিসেবে। সব আর্টই ছিল অবিকাশমুখী এবং ফিগারবিহীন; সমস্ত কিছুই তাদের সাধ্যমত সবকিছু করে মাধ্যাকর্ষণ ও সংশ্লেষণের প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ এবং ভর ও আলোর সকল প্রাকৃতিক উপাদানকে আলো ও পানিও রঙের সুর ও ছন্দের মুখাবয়ব ও তার উপলব্ধির। এক কথায় প্রাকৃতিক এবং সৃষ্টিগত সমস্ত কিছুকে, বাস্তবরূপ দিতে চেয়েছে, ভাসমানশূন্যে ঝুলন্ত অনন্তের ইংগিতবাহী নক্সায়। আমার জানা মতে ইসলামী চারুশিল্পে ইন্দিয়াতীততা বিবেচনার যোগ্য কোন ব্যতিক্রমকেই স্বীকার করেনি।[১৫]

খ. ভাষায় ইন্দ্রিয়াতীততা

ভাষায় ইন্দ্রিয়াতীততা সমভাবেই মুসলমানরা পৃথিবীর সর্বত্র বজায় রেখেছে, কারণ তারা সকল প্রকার ভাষা, উপভাষায় কথা বলে এবং তারা সকল প্রকার নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সদস্য। কুরআনের এই ঘোষণা যে, "আমরা তা অবতীর্ণ করেছি এক আরবী কুরআনে (১২:২! ২০:১১৩)" এর উদ্দেশ্যও ছিল তাই। আমরা এটিকে অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় সুস্পষ্ট আদেশরূপে (১২:৩৯)। এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর জন্য কেবল মূল আরবী কুরআনকেই, কুরআন বলে গণ্য করেছে। এবং এর অনুবাদকে মূলপাঠ মনে না করে কেবল বুঝার সহায়ক বলে গণ্য করেছে। গন প্রার্থনা হিসেবে কুরআনের ব্যবহার কেবল আরবীতেই করা যাবে। আল্লাহর নির্দেশ মত সালাতকে ইবাদতের প্রাতিষ্ঠানিক যে-রূপ মহানবী দিয়েছিলেন, তা আজো তার রূপে বহাল

---

১৫. Ismail R. al-Faruqi, "Islam and Art" Studia Islamica, Fasc xxxvii 81-109

www.icsbook.info

রয়েছে। অধিকন্তু, কুরআন ইসলামে যে সব জনগোষ্ঠীর ভাষা আরবী নয়, ক্রমশঃ তাদের চেতনাকেও রূপান্তরিত করেছে এবং তাদেরকে দিয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রণালী বা রীতি, যার সাহায্যে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে চিন্তা করা ও ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশ করা যায়। মুসলমানরা যখন আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলে, তখনই তা সম্পূর্ণ কুরআন বিষয়ক কথা হয়ে ওঠে– বক্তা তখন সর্তকতার সঙ্গে কুরআনের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রণালীকে অনুসরণ করে এবং এর আরবী শব্দমালা, এর আরবী সাহিত্যরূপ ও প্রকাশ ভঙ্গিগুলো অনুসরণ করে।

কুরআন ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সীমা অতিক্রম কিভাবে প্রকাশ করে? কুরআন বিশ্বের উপর আল্লাহর প্রভুত্ব, মানুষ ও সৃষ্টি জগতের লালন পালন ও বিকাশে আল্লাহর প্রযত্নকে প্রকাশ করার জন্য আল্লাহর ৯৯টি বা ততোধিক নাম দিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এর উপরও জোর দিয়েছে যে, ' কোন কিছুই তাঁর মত নয়।' (৪২ : ১১), তাঁর শব্দ, তাঁর কাল, আর তাঁর আলোর মত, তাঁর রাজ্যের অন্তগর্ত অথবা তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুই কুরআনের বর্ণনামত এমন বিষয় যে সবের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক প্রণালী প্রযোজ্য নয়। "যদি সমস্ত বৃক্ষই কলম হত, এবং আল্লাহর বাক্য রেকর্ড করার জন্য সকল সমুদ্রের পানি কালি হত, তাহলে কুরআন দাবী করে আল্লাহর কথা লেখা শেষ করার আগেই তা ফুরিয়ে যাবে।" "আল্লাহর একদিন মানুষের হাজার বছরের সমান।" (২২: ৪৭)। "আল্লাহর আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর আলো, এর উপমা হচ্ছে একটি প্রদীপ যার কাঁচ হচ্ছে একটি দীপ্তিমান নক্ষত্র, যার আলো দেয় পবিত্র জয়তুন বৃক্ষের তৈল, যা পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়। উহা আপনিতেই প্রজ্জলিত হয় যদিও আগুন একে স্পর্শ করেনা...." (২৪: ৩৫)। এভাবে দেখা যায় যৌক্তিক প্রায়োগিক ভাষা, বস্তুজগত থেকে গৃহীত ফিগার এবং সম্পর্ক ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই প্রশ্নাতীত অস্বীকৃতি রয়েছে যে, এসব সাদামাটাভাবে আল্লাহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

কালক্রমে যাদের ভাষা আরবী নয়, এমন কিছু মুসলমান যখন চেষ্টা করলো কুরআনের শিক্ষার সঙ্গে নিবিড়তর পরিচয় লাভ করতে, তখন তারা প্রাণী বা বস্তুতে নরত্ব আরোপে ভুল করে বসে। এমন সব ধর্ম থেকে তারা এসেছিল যেখানে জীবন জন্তুতে কিংবা মানুষে দেবত্ব আরোপ ছিল সাধারণ ব্যাপার, এই জন্য এই সব মুসলমানের পক্ষে তাদের দেবত্ব বা নরত্ব আরোপের মানসিক অভ্যাস ঝেড়ে ফেলা সম্ভব ছিলনা। মুতাজিলাগণ ইন্দ্রিয়াতীততার সমর্থনে দন্ডায়মান হয় এবং এই যুক্তি পেশ করে যে, ঐশী গুণাবলীকে রূপকভাবে নিতে হবে, আক্ষরিক অর্থে নয়। উৎসাহের আতিশয্যে মুতাজিলারা এই দাবী করে যে, এমনকি জান্নাতেও পুণ্যবানদের কাছে আল্লাহ দৃষ্টি গ্রাহ্য হবেন না। এ সম্পর্কে কুরআনে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে (৭৫ : ২২) তাকে রূপকভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, যাতে করে শব্দগুলোর প্রকাশ্য আভিধানিক অর্থ নাকচ করা যেতে পারে। মুসলিম জনতার এই আশংকা ছিল যে, রূপক ব্যাখ্যা আইনসিদ্ধ হলে অনিবার্যভাবেই এই সব শব্দের তাৎপর্য এবং তৎসঙ্গে এসবের আভিধানিক অর্থ লোপ পাবে। একবার শব্দের আভিধানিক নোঙ্গর তুলে ফেলা হলে, অর্থকে আবার তার নির্দিষ্ট স্থানে নোঙ্গর করার এবং অর্থকে যথেচ্ছ ভাটিতে ভেসে যাওয়া থেকে বাধা

www.icsbook.info

দেবার কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা। গ্রীক প্রভাবের চাপে পড়ে ইহুদী এবং খ্রীষ্টান ধর্মকে এই ঝুঁকি নিতে হয়েছিল, যার ফলে দুয়েরই ঘটেছে মৌলিক রূপান্তর।[১৬]

এই ভয় বা আশংকা প্রকাশের দায়িত্ব পড়েছিল আবুল হাসান আল-আশহারীর (মৃত্যু ৩২২ হিজারী/ ৯৩৫ খৃ.) উপর; তাঁর জীবন শুরু হয় একজন মুতাজিলা সদস্য হিসেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তিনি বলেন, ঐশী সিফাত যেমন আল্লাহ নয়, তেমনি না-আল্লাহও নয়। আত্তাশবীহ (নরত্বারূপ) যেমনি মিথ্যা, আত্তাতিল তেমনি মিথ্যা (সিফাতসমূহের রূপক ব্যাখ্যার মাধ্যমে সেগুলোর নিষ্ক্রীয়করণ), এর মধ্যে প্রথমোক্তটি হচ্ছে ইন্দ্রিয়াতীততার বিরোধী, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে আল্লাহর সিফাতসমূহ বিষয়ে কুরআনের দৃঢ় উক্তির বরখেলাফ, যা ওহী বা প্রত্যাদেশকে অস্বীকার করার নামান্তর। তাঁর যুক্তি মতে এই উভয় সংকটের সমাধান হচ্ছে, প্রথমে প্রত্যাদিষ্ট পাঠ যেভাবে নাযিল হয়েছে সেইভাবে স্বীকার করে নেয়া অর্থাৎ এর অর্থ এর আভিধানিক শব্দের মধ্যে নোঙ্গরকৃত, এবং দ্বিতীয় এই প্রশ্নকে অবৈধ বলে স্বীকার করা যে, 'সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানমূলক অর্থ কি করে ইন্দ্রিয়াতীত সত্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। তাঁর মতে, এই প্রক্রিয়া হচ্ছে (কেমন করে) এই প্রশ্নের উর্দ্ধে, অর্থাৎ বিলা কাইফ।[১৭]

স্পষ্টই আল-আশআরী বলতে চেয়েছেন যে, নরত্বারূপ অনিবার্য হয়ে উঠে, যদি যুক্তিনির্ভর প্রায়োগিতে কর্তা ও কর্মের কি করে ব্যাখ্যা করা হয়, তার উত্তর আশা করার মতই, সিফাতের কেন সম্পর্কেও উত্তর আশা করা হয়। কর্তা এবং কর্ম যেহেতু অজাগতিক বা ইন্দ্রিয়াতীত, সে কারণে প্রশ্নটি অবান্তর। এটাও সুস্পষ্ট যে, আল-আশআরী মনে করেন, কর্মের আভিধানিক অর্থ যে মুহূর্তে স্বীকার করা হয়, উপলব্ধি করা হয়, এবং পরে অস্বীকার করা হয়, সে মুহূর্তে ইহা মনের জন্য হয়ে উঠে একটি স্প্রিং বোর্ড-প্রাসঙ্গিক দৃঢ় উক্তির জন্য একটি নতুন প্রণালী সৃষ্টি করতে, যে বিষয়টি যৌক্তিক বুদ্ধিনির্ভর নয় কিন্তু কোন নতুন প্রণালী সম্ভব নয়। তাই বোধশক্তি যতক্ষণ শব্দটির আভিধানিক অর্থে নোঙ্গরবদ্ধ, ততক্ষণ মন দেখে যে প্রায়োগিক বুদ্ধিনির্ভর সত্যকথন এবং ইন্দ্রিয়াতীত লোকত্বরতা, উভয়ের অস্বীকৃতি মেনে নেওয়া হচ্ছে, তখন কল্পনা প্রয়োজনীয় প্রণালী তৈরী করে নিতে বাধ্য হয়। এই দোলায়মান অবস্থার মধ্যে লোকত্বর অভিজ্ঞতা, একটি আত্মিকবোধ অর্জিত হয়, যা লতাপাতা, ফুলের কারুকার্য ও শিল্পের অসীমতা এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অপ্রকাশ সম্ভাব্যতা থেকে ভিন্ন নয়।

---

১৬. (দ্রঃ) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে Regius Professor of Theology, Maurice Willes এর সঙ্গে বর্তমান লেখকের বিতর্ক (দ্রঃ) বিষয় ভাষায় ঐশী ইন্দ্রিয়াতীতকা বা তুরীয়ত্ব, যা প্রকাশিত হয়েছিল "World Faiths" এর *Journal of the World Congress of Faiths*-G No-107 (Spring 1979-19

১৭. আবু আল হাসান আল-আশআরী *Maqalat al Islamiyah* (Cairo, Maktabat al Nahdah al Misriyah 1371/(1954), Vol-1224-229 এতদসঙ্গে দ্রঃ মোহাম্মদ আব্দুল করিম আল শাহরিস্তানীর *আল মিলাল ওয়া আল নিহাল* (Cairo. Al Azhar Press 1328/1910 149 ff. আল আশআরীর দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা, ঐশী সিফাত সমূহ বিষয়ে।

www.icsbook.info

শব্দটির আভিধানিক অর্থ একটা নোঙ্গরের কাজ করে, যখন সমস্যাটির তাৎপর্য সম্পর্কে একটি প্রযোজ্য প্রণালীর অন্বেষণে কল্পনা ডানা বিস্তার করে এমন একটি প্রণালী, যাতে উপনীত হওয়া অসম্ভব। বস্তুতঃ কুরআন বাক্যকে তুলনা করে 'একটি গাছের সঙ্গে' যার শিকড়গুলো মাটির গভীরে দৃঢ় প্রোথিত এবং যার শাখা প্রশাখাগুলো অনন্ত এবং উর্ধ্ব আকাশে ধরা ছোঁয়া ও আয়ত্বের বাইরে।

গ. আরবী ভাষা সংরক্ষণ

আরবী ভাষায় নিহিত প্রণিধানের সকল বিভাগ ও শ্রেণীসহ আজ পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ কর্তৃক তার অব্যাহত ব্যবহার ১৪০০ বছরের পুরোনো প্রত্যাদেশ আধুনিক যে সব তফসিরি সমস্যার সম্মুখীন হয়, তার প্রায় সবগুলোকেই পরিহার করেছে। মানুষের নিত্য পরিবর্তনশীল বিষয়ে কুরআনের নির্দেশমালার ব্যবহার সব সময় হবে নতুন, আর একারণে নতুন হবে সমকালিন কর্ম ও সমস্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রমূর্ত বিধানমূলক আইন প্রণয়নে এর সাধারণ নীতিমালার বাস্তব রূপায়ন। ইসলামী আইন শাস্ত্রে এই নীতি সব সময় স্বীকৃত। কিন্তু প্রত্যাদেশ সম্পর্কিত পরিভাষাগুলোর অর্থ যে প্রণালীর সাহায্যে বুঝতে হবে, সেগুলো মহানবীর যেমন উপলব্ধিসাধ্য ছিল তাঁর সাহাবাগণের উপলব্ধিও ছিল ঠিক অবিকল সেই রকমই। আজও সেইগুলো বোধগম্য। প্রথমোক্তটি নয়, শেষোক্তটি হচ্ছে লোকোত্তর উপলব্ধি প্রকাশের সমস্যা। নবী যেভাবে কুরআনের অর্থ বুঝেছিলেন তাই হচ্ছে সেই সব অর্থকে আধুনিক সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে ব্যবহার বা অপপ্রয়োগের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রাক-ধারণা।

যেদিন প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয় সেইদিন যেভাবে তা বোধগম্য হয়েছিল আজকের দিনে কোন শিক্ষার্থীর সেইভাবেই তার বোঝবার সামর্থ্য ভাবলোকের ইতিহাসে প্রকৃতই একটি অলৌকিক ব্যাপার। ভাষার উন্মোচিতকরণ এবং 'সৃজনশীল ক্রিয়ার' মধ্যেকার পার্থক্য দ্বারা এর ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রথমোক্তটিতে ইঙ্গিত রয়েছে গুপ্ত রহস্যময় অর্থের মর্ম কেবল শিক্ষিত জনের কাছেই ব্যক্ত হয় এবং তা ও কেবল তফসিরি ব্যাখ্যার মাধ্যমে, এবং দ্বিতীয়টির ভূমিকা হচ্ছে উদ্ভাবনী, যার ফল বিশুদ্ধ কল্পকাহিনীর নির্মাণকার্য থেকে পৃথক করা যায়না। অধিকন্তু আপেক্ষিকতা ও আত্মময়তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রয়েছে সৃজনশীল ক্রিয়া তা থেকে নিরাপদ নয়– যে কারণে খ্রীষ্টান ধর্ম এবং ইসলামের পক্ষে যে কোন দাবী অসম্ভব হয়ে উঠে এবং সকল দাবীকেই ব্যক্তিগত এবং কালচিহ্নিত বলে গণ্য করা হয়। মুসলিম খ্রীষ্টান সংলাপের ফল অতি সামান্যই, যদি আদতেই তা দুই ব্যক্তির মধ্যে সংলাপ হয়, দুই ধর্মের মধ্যে নয়।

ভাষা বদলে যায়, যাতে তা কখনো একই থাকেনা– এ যুক্তি অপরিহার্য নয়। আরবী ভাষা পরিবর্তিত হয়নি যদিও এর মূল শব্দসমূহের ভাণ্ডার সামান্য সম্প্রসারিত হয়েছে, নতুন পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য। ভাষার মূলকথা যা হচ্ছে এর ব্যাকরণগত কাঠামো, এর ক্রিয়া ও বিশেষ্যসমূহের ধাতুরূপ, বাস্তবতা ও ধারণার মধ্যে সম্পর্কে নির্ণয়ের জন্য এর প্রণালীসমূহ এবং এর সাহিত্যিক নান্দনিকতা বা রূপগুলো মোটেই

www.icsbook.info

পরিবর্তিত হয়নি। সব কিছুই পরিবর্তনশীল এবং কখনো তা একই নয়, এই দাবী একটি মিথ্যা দাবী, কারণ পরিবর্তনকে যদি সত্যিকার অর্থে পরিবর্তন হতে হয় এবং সংশয়বাদীর বহুরূপের স্রোত হতে না হয়, তাহলে কিছু না কিছুকে অবশ্যই হতে হবে অপরিবর্তনীয় বা স্থায়ী। ভাষার সংজ্ঞার ক্ষেত্রে মুসলিম ভাষাবিজ্ঞানীগণ ছিলেন অনেক বেশী নিরাপদ এবং নির্ভুল, কারণ তারা ভাষার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন একটি, কেবল মাত্র একটি কাজ, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবেই ভাষা হচ্ছে বর্ণনাধর্মী। বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে তারা ওজস্বীতার সংজ্ঞা দিয়েছেন 'বর্ণনামূলক নির্ভুলতা' হিসেবে। একারণে তাদের কাছে শব্দ শাস্ত্রের চত্বর হয়ে উঠেছিল পবিত্র। "আল্লাহ নিজেই আদমকে শিখিয়েছেন বস্তুর নাম' (২:৩১)। এবং তারা কুরআনের আরবী ভাষার জন্য অন্য সকল ভাষার চেয়ে সম্পূর্ণ অভিধান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাদের মতে সৃজনশীলতা হচ্ছে মানবমনের কাজ। এবং এটাই তার যথার্থক্ষেত্র। এবং অধিকতর নির্ভুলতার সন্ধানে তারা এর সমর্থন করেন, আবিষ্কারের সামর্থ হিসেবে, এবং সত্য বা বাস্তবতার যে সব দিক কম সৃজনশীল বা কম সক্ষমদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, কিন্তু প্রতিভা যাকে আয়ত্ত করে, সেগুলোকে স্থাপন করে চৈতন্যে, পূর্ণ আলোতে। উপলব্ধ সত্য বা বাস্তবতার বিবরণ যতো বেশী নির্ভুল হবে, তা হবে তত বেশী উদাত্ত এবং সুন্দর। এবং একই সঙ্গে অধিকতর উপদেশ ও শিক্ষামূলক ভাষা, বর্তমান ক্ষেত্রে আরবী ভাষা, এভাবেই রয়ে গেছে একটি সুশৃংখল সাধারণ পদ্ধতি হিসেবে, যা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য উন্মুক্ত, যে বিষয়ে সঠিক রায়দান সম্ভব, যা প্রয়োজনীয় বুদ্ধি ও মেধাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিকে একজন ভাল গ্রন্থকার বা সমালোচক সম্পর্কে বলতে বাধ্য করে, 'হ্যাঁ এ ঠিক তাই'। এটা স্বাভাবিক ছিল যে, ইসলামী প্রত্যাদেশে এসবেরই সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ এ না থাকলে, যেমন মুসা, জরাতুস্ত্র, বুদ্ধ, এবং ঈসার প্রতি নাযিলকৃত প্রত্যাদেশসমূহ, তাদের মুলভাষা হারিয়ে যাওয়ায় অথবা বদলে যাওয়ায়, পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং ইন্দ্রিয়ের অনুধিগম্য আল্লাহ নিজেই হয়ে পড়েছেন ধর্ম ইতিহাসের এক দুর্বল শিক্ষার্থী।

৪. বিশ্ব সংস্কৃতিতে ইসলামের বিশেষ অবদান

ইসলামের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সারকথা হচ্ছে তাহীদ। স্পষ্টভাবেই ইসলামী এবং সে কারণে অভিনবত্ব হচ্ছে এর বক্তব্য ঘোষণার নেতিবাচক দিকটি। কোন সত্বাই যার প্রতি ঐশীত্ব বা উলুহিয়ত অভিধানটি যুক্ত হয় তা আল্লাহ ব্যতিত আল্লাহ নয় এই ঘোষণা ইহুদী, খ্রীষ্টান, এবং প্রাক ইসলামী আরবের আল্লাহর সঙ্গে অন্য সত্বাকে শরীক করার ধারণার মূলে আঘাত করে। আরবদের দেবদেবীগুলো যেগুলোর প্রতিকৃতি তৈরী হত পাথর ও কাঠ দিয়ে, যাদেরকে পুজারীরা প্রশংসা করতো, ধন্যবাদ দিত এবং ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী ও বলীর সাহায্যে যাদের তুষ্ট করতো সেসব ইলাহকে এক অক্ষম খোদার অবস্থায় ঠেলে দেয়। খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ ঐশী সত্বার মধ্যে তিন ব্যক্তিকে কল্পনা করে, যাদের প্রত্যেকেই একজন পুরোপুরি খোদা, এবং দাবী করে যে, আল্লাহ মানুষরূপ ধারণ করেছেন এবং এভাবে ঐশী একত্ব, ইন্দ্রিয়াতীততা ও আল্লাহর সম্পূর্ণ ভিন্নত্বকে তারা লংঘন করে। ইহুদী ধর্মে আল্লাহকে সম্বোধন করে সংক্ষিপ্ত বহুবচন ইলোহিমরূপে

www.icsbook.info

এবং ইলোহিম মানুষের কন্যাদের সঙ্গে যৌন ক্রিয়ায় অংশ নিত বলে বর্ণনা করে এবং এভাবে আল্লাহর এককত্ব ও তার ইন্দ্রিয়াতীততাকে অস্বীকার করে। অধিকন্তু ইজরাকে, ইহুদী রাজাগণকে এবং সাধারণভাবে ইহুদীগণকে আল্লাহর পুত্র কিংবা পুত্রগণ বলে এবং আল্লাহকে ইহুদিদের পিতা, ঘোষণা করে, যার সঙ্গে অন্য সকল সৃষ্টির চেয়ে তারা ভিন্নভাবে সম্পর্কিত। ইহুদীধর্ম একের মোকাবেলায় ঐশী সত্তার ইন্দ্রিয়াতীতার ব্যাপারে আপোস করে– যে আল্লাহর কাছে প্রত্যেকটি বস্তুই সমভাবে শূন্য থেকে এক একটি সৃষ্টি, এবং জাত ও বংশধর নয় বাহ্যত তাওরাতের সম্পাদকগণ এভাবে অন্য সকল জাতির উপর হিব্রুদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অতএব তাওহীদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত করতে চেয়েছে এজাতীয় খোদাবাদ থেকে। এভাবে তাওহীদ, দুটি উদ্দেশ্য সাধন করে : একদিকে আল্লাহকে বিশ্বজগতে একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়, এবং অন্যদিকে তাঁর সঙ্গে আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে সকল মানুষের মধ্যে সমতাবিধান করা হয়– যাদের সকলকেই দেওয়া হয়েছে সৃষ্টিসুলভ মৌলিক মানবিক গুণাবলী, যাকে বলা হয় জাগতিক মর্যাদা।

লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু এই সংক্ষিপ্ত ঘোষণার দ্বারা তাওহীদ মান বিচারের ক্ষেত্রে তিনটি নতুন অর্থ ব্যক্ত করে। প্রথমটি এই যে, সৃষ্টি হচ্ছে সেইবস্তু বা বিষয় যাতে পরম ঐশী অভিপ্রায় মূর্ত হয়। সে কারণে সৃষ্টির প্রত্যেকটি অঙ্গ বা উপাদান শুভ বা কল্যাণকর। এবং সৃষ্টি সম্ভাব্য সকল জগতের মধ্যে কেবল উত্তমই নয়, এ ত্রুটিমুক্ত এবং সম্পূর্ণ।[১৮] আসলে, মানুষ কর্তৃক নৈতিক দৃষ্টি ভেং কর্মের দ্বারা, সৃষ্টি নিজেই সৃষ্টির ঐশী লক্ষ্য।[১৯] তাই এর উপাদান বা হিতকর মূল্যগুলোর সম্ভোগের নির্দেশ।[২০] মূল্যময় এই হচ্ছে আল্লাহর একটি স্মারক, যা সংরক্ষণ এবং যার উন্নয়ন মানুষের পক্ষে প্রশংসা এবং ইবাদত। পরমের উপলব্ধির একটি উপকরণ হিসেবে সৃষ্টির প্রত্যেকটি বস্তুতেই অর্পিত হয়েছে উন্নত এবং মহাজাগতিক মূল্য। এর বিপরীতে খ্রীষ্টানধর্ম জগতকে অবমূল্যায়ন করেছে 'মাংস' হিসেবে, মানুষকে পতিত সৃষ্টি হিসেবে (Massa peccata) এবং দেশ কালকে এমন কিছুতে পরিণত করেছে যাতে পরমের উপলব্ধি সর্বকালের জন্যই অসম্ভব।"[২১]

---

১৮. আল্লাহ সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন নিখুঁতভাবে (৩২-৭) আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন ত্রুটি নেই, একবার দু'বার বহুবার বৈপরীত্ব কিংবা ত্রুটি অনুসন্ধান কর। তাঁর সৃষ্টিতে তুমি কোন ত্রুটি পাবেনা, তোমার ক্লান্ত দৃষ্টি তোমার দিকে ফিরে আসবে। (আল্লাহর সৃষ্টির পরিপূর্ণতা) সম্পর্কে বিশ্বাস নিয়ে (৬: ৩-৪)।

১৯. জমিনের উপরি ভাগে যা আছে, আমরা তা সৃষ্টি করেছি অলংকাররূপে, তোমাদের উপভোগের জন্য, যাতে আমরা পরীক্ষা করতে পারি আচরণে তোমাদের মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি জীবন এবং মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তোমাদের কর্মে নিজেদেরকে যোগ্য প্রমাণ করতে পার (৬৭: ২)।

২০. হে আদম সন্তান, তোমরা যখন মসজিদে যাও (জামাতে সালাত আদায় করার জন্য বা উৎসবে) তোমাদের সবচেয়ে উত্তম পোশাক পরিধান কর, খাও এবং পান কর, কিন্তু সীমা লংঘন করনা, সীমা লংঘনকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (বল হে মোহাম্মদ) আল্লাহ তার দাসদের জন্য যে সব সুন্দর এবং সুস্বাদু বস্তু দিয়েছেন, কে তা নিষেধ করেছে? বল এগুলো, এ পৃথিবীতে, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে তাদের জন্য এবং আখেরাতে আবার তারা উপভোগ করবে বিশুদ্ধভাবে।

২১. Augustine "De Diversi Quaastion" *Ad Simplicianum* i. g. 1 4 and 10

www.icsbook.info

দ্বিতীয় এই যে মানুষ এমন কোন বিপদের মধ্যে নেই যার মধ্য থেকে সে নিজেকে বার করতে সক্ষম নয়। এসবই সত্য যে মানুষের পথ বাধা বিঘ্নে কণ্টকিত, সে তার আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে বসতে পারে। অথবা অলস সুখবাদকে আনন্দের সহজতর পন্থা বলে বেছে নিতে পারে। কিন্তু এগুলো তাদের বিপরীতগুলোর চেয়ে অধিকতর বাস্তব নয় তাই মানুষের কোন ত্রাণকর্তা, কোন মসীহ বা পরিত্রাণের আশ্বাস নেই। পক্ষান্তরে তার নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে তার মহাজাগতিক কর্তব্যে এবং তার সাফল্যের প্রত্যক্ষ অনুপাত দ্বারা তার মূল্য পরিমাণ করতে হবে। তাই, ইসলাম খ্রীষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে এই শিক্ষা দান করে যে, সৃষ্টির পরাতত্বগত ভারসাম্য ক্ষুন্ন না করে ঐশী অভিপ্রায়ের অনুসরণ, দেশকালের সকল পর্যায়ে প্রকৃতির কার্যকারণসূত্রে ছেদ না ঘটিয়ে, সংক্ষেপে রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি বর্জন করে আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে মিথ্যা এবং একটি অসার আত্মাভিমান। তৌহিদ মানুষকে আহ্বান করে কল্যাণের দিকে, পরিত্রাণের দিকে নয় এবং তাদেরকে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়, এ জগতে এবং আখিরাতে সকল কর্মের যথাযথ অনুপাতে।

মানবিচার স্তরে তাওহীদ যে তৃতীয় অভিনব তাৎপর্যটি প্রকাশ করে তা এই যে, যেহেতু আমরা যে শুভকে বা কল্যাণকে উপলব্ধি করবো তাই হচ্ছে ঐশী অভিপ্রায় এবং যেহেতু ঐশী অভিপ্রায় তার সৃজন প্রকৃতির কারণে সকল সৃষ্টির জন্য সমান, কেননা সব সৃষ্টিই অনিবার্যভাবেই তার নিজ ঔচিত্যের সীমায় গন্ডীবদ্ধ তাই নৈতিক ক্রিয়ার বিষয় হিসেবে স্থান ও মানুষের মধ্যে কোন বৈষম্য হতে পারেনা। এই কথাটি যথাযথভাবে ব্যক্ত করেছিলেন হযরত ঈসা এবং Apostolic ফাদারগণ। কিন্তু তাদের খ্রীষ্টান অনুসরণকারীরা তা কদাচিৎ পালন করেছে, যে কারণে তাদের হিতার্থে আবার নতুন করে তার ঘোষণা প্রয়োজন হয়েছে। পক্ষান্তরে, ইহুদী ধর্ম নীতির প্রশ্নে তাকে নিয়ত অস্বীকার করেছে এবং সবসময়ই তার বিপরীতটি শিখিয়েছে। কেন্দ্রাতীগ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মিলনবিন্দু হিসেবে দেশকালের বিভিন্ন বিন্দুর মধ্যে যেমন কোন বৈষম্য হতে পারেনা, সেকারণেই মানুষের নৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যেও কোন বৈষম্য হতে পারেনা আর এভাবেই নৈতিক জীবন অনিবার্যভাবেই হয়ে উঠে বিশ্বজনীন এবং সমাজভিত্তিক, যুগপথ এ ছিল একটি নতুন আবিষ্কার-ইসলামী আন্দোলনের জন্ম লগ্নে যা ছিল অজ্ঞাত এবং অনাচরিত।

এই সমস্তই সেমিটিক ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতের মধ্যে পড়ে বলে মনে হয়। আরো প্রশস্ততর বিশ্বপ্রেক্ষিতে পৃথিবী যে স্থবিরতায় নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, ভারতীয় ধার্মিকতা ও গ্রীক ধার্মিকতার মধ্যে বিভক্ত হয়ে তা থেকে তার অর্গল ভেঙ্গে ইসলাম একটি খাঁটি পথ করে নেয়। ভারতীয় ধার্মিকতা এই দাবী করে যে, বিশ্বজগত হচ্ছে পরম (ব্রাহ্মণ), তার আদর্শরূপে নয়, কিন্তু তার বাস্তবায়িত ও বিশেষিত রূপে, একাঙ্গায়িত হিসেবে নিন্দিত রূপে। পরম আত্মা ব্রাহ্মণের বাস্তবরূপ দান ও এবং রূপায়ণ একটি অবাঞ্ছিত ব্যাপার; একারণে ধর্মীয় নৈতিক অনুজ্ঞা থেকে পরিত্রাণকে পলায়নরূপে ধারণা করা হয়েছে। সৃষ্টি জগতকে মন্দ বলা হয়েছে, অথচ পরম জগতকে (ব্রাহ্মণ, নির্বাণ)

www.icsbook.info

প্রশংসা করা হয়েছে আশির এবং জীবনের চরম লক্ষ্য হিসেবে; এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, বিশ্বচর্চা অর্থাৎ প্রজনন, খাদ্য উপাদন ও শিক্ষার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ যা পৃথিবীকে পরিণত করবে একটি উদ্যানে এবং ইতিহাস সৃষ্টি করবে, এসবই নিশ্চিতভাবে অকল্যাণ, কারণ এগুলো সৃষ্টিকর্মকে বিস্তার করে, গভীরতর ও প্রলম্বিত করে। স্পষ্টতই এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নৈতিকতা হচ্ছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং সন্যাসবাদী, বিশ্বজগত অস্বীকারকারী। উপনিষদের এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ইহুদী ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলে। হিন্দু ধর্ম এই দৃষ্টি স্বীকার বা গ্রহণ করে জ্ঞান প্রাপ্ত উচ্চ শ্রেণীর জন্য। এ ধর্ম এমন এক জনপ্রিয় ধার্মিকতার প্রচার করে যাতে নিম্নবর্ণের লোকেরা বিভিন্নভাবে কেবলমাত্র পরবর্তী জীবনে কঠিন কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার স্বপ্ন দেখে, অথচ যখন তারা এ জীবনে তাদের নির্ধারিত অবস্থানসমূহে, খেটে চলে এবং এতে তাদের আনন্দ ও আত্মতৃপ্তিও কম নয় যে, তারা তাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা পূরণ করছে। একইভাবে, বৌদ্ধ ধর্ম এই দৃষ্টিভঙ্গিকে পটভূমিকা হিসেবে রেখে, নিজ ধার্মিকতা গড়ে তুলে চীনাদের নিজস্ব জাগতিক নৈতিকতার ভিত্তিতে এবং নিয়োগ করে বুদ্ধিসত্বদের (মানুষ-পূর্বপুরুষের যাদেরকে উন্নীত করা হয়েছে ত্রাণ কর্তায়) মানুষকে তার জীবনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার জন্য মিশরীয় ও গ্রীক ধর্মসমূহের উপাদানগুলোকে মিত্রবাদ ও নিকট প্রাচ্যের মরমী ধর্মতন্ত্রের সঙ্গে একত্র করে, গ্রীক সভ্যতা প্লাবিত করে হযরত ঈসার সেমিটিক আন্দোলন, যা ইহুদী ধর্মের আইন সর্বস্বতার বিলোপ এবং সংস্কার করতে চেয়েছিল। একারণে যে-গ্রীক মিশরীয় উপাদান, যাতে আল্লাহকে জগতের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করে, তা রক্ষিত হয়, কিন্তু অবতারবাদের তত্ত্বে তাকে সংশোধিত ও গুলোয়ে ফেলা হয়, যাতে খোদা হয়ে উঠে মানুষ এবং মানুষ ঐশী সত্তার ক্ষমতার শরীক হয়। একারণে, সাম্রাজ্যের অধঃপতিত নিষ্পেষিত জনকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, বস্তু ও জগতের প্রতি জ্ঞানীসুলভ বিতৃষ্ণা, এবং মিত্রধর্ম ও ইহুদী ধর্মের পবিত্রাণমূলক ভরসা, সবকিছু সম্মিলিতভাবে ঐতিহাসিক খ্রীষ্টান ধর্মকে দেয় এই সিদ্ধান্ত যে, সৃষ্টি হচ্ছে পতিত, জগত হচ্ছে অস্থায়ী, সাময়িক অকল্যাণ এবং রাষ্ট্র ও সমাজ হচ্ছে শয়তানের ধর্ম এবং নৈতিক জীবন হচ্ছে ব্যক্তিগত, এবং সংসারত্যাগী।

ইসলামে আমরা দেখতে পাই একটি স্বাস্থ্যকর পরিচ্ছন্নতা। ইসলাম ভারত এবং মিশর উভয়ের এই দাবীকে প্রত্যাখান করে, যা জগতের সঙ্গে পরম সত্বাকে অভিন্ন মনে করে, সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টাকে, মিশর এবং প্রাচীন গ্রীসে যেমন সৃষ্টির অনুকূলে যা করা হয়েছিল অথবা ভারতে যেমন করা হয়েছিল স্রষ্টার স্বার্থে। ইসলাম নতুন করে ঘোষণা করে, প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিকে- যাতে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং মানুষ হচ্ছে আল্লাহর রাজত্বের দাস। ইতিহাস দ্বারা বলিয়ান হয়ে, ইসলামের এই নবতর স্বীকৃতি হয়ে উঠে, প্রাচীন মেসোপটেমিয় প্রজ্ঞার স্পষ্টীকরণ।[২২]

---

২২. Ismail R. al-Faruqi. Historical Atlas of the Religions of the World (New York : the Macmillan Co. 1974) The Ancient Near East. Chaps 1.2 and 3

www.icsbook.info

তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের মৌলনীতি

তাওহীদ মানুষকে দেয় কর্মবাদের নৈতিক আচরণবিধি, অর্থাৎ এমন একটি নৈতিক বিধান যেখানে মানুষের মূল্য এবং মূল্যহীনতার পরিমাপ হয় নৈতিক– ব্যক্তি তার দেহে এবং তার চতুষ্পার্শ্বে দেশকালের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে কতটুকু সাফল্য অর্জন করেছে তার দ্বারা। তাওহীদ নিয়্যত বা অভিপ্রায়ের নৈতিক বিধানকে অস্বীকার করেনা– যেখানে একই পরিমাপ করা হয় কেবল নৈতিক কর্মকর্তার চৈতন্যের উপর প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিগত মূলের স্তর দ্বারা, কারণ এ দুটি পরস্পর বিরোধী নয়। আসলে ইসলামী কর্মের নৈতিক অভিপ্রায় পরিপূরণের জন্য প্রাথমিক পূর্বশর্ত হচ্ছে নিয়্যত বা অভিপ্রায়ের চাহিদা পূরণ।[১] এভাবে ইসলাম তার নৈতিক বিধানকে পরিণাম বা হিতবাদ হয়ে উঠতে বাধা দেয়, চক্রটি যত মহৎই হউক।

এ কারণে দেশকালের প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ অথবা সৃষ্টির রূপান্তর মুসলিমের মনোনিবেশের জন্য প্রত্যাশিত। একমাত্র আল্লাহকে তার প্রভু হিসেবে স্বীকার ক'রে নিয়ে, নিজেকে, তার জীবন এবং সমস্ত কর্মশক্তিকে, আল্লাহর ইবাদতে সমর্পণ ক'রে এবং তার প্রভুর ইচ্ছাকে দেশকালের মধ্যে বাস্তবরূপ দিতে হবে, একথা ঘোষণা ক'রে, তাকে অবশ্যই ইতিহাস এবং হাট বাজারের রূঢ় ও কঠিন জগতে প্রবেশ করতে হবে এবং তার মধ্যে আনতে হবে বাহ্যিক রূপান্তর। নিজেকে শৃংখলার বাঁধনে এবং আত্মশাসনের জন্য অনুশীলন ছাড়া অন্য কোন কারণে সে সন্যাসী বা নির্জনবাসীর জীবন বেছে নিতে পারেনা। এমন অবস্থায়ও যদি তা দেশ কালের রূপান্তর সাধন প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর সাফল্য অর্জনের জন্য অনুকূল না হয়, তাহলে তা পর্যবর্সিত হবে অনৈতিক অহমকেন্দ্রিকতায়। কারণ তেমন অবস্থায়, নিজের রূপান্তর হয়ে উঠবে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য এবং তা বিশ্বকে ঐশী নমুনার সাদৃশ্যে রূপান্তরিত করার জন্য প্রস্তুতি হবে না।

কুরআন সৃষ্টির যৌক্তিকতা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং একে বর্ণনা করেছে মানুষ তার জাগতিক বৃত্তিকে যেরূপে গ্রহণ করবে সেভাবেই। কুরআন জোর দিয়ে ঘোষণা করেছে : এই বিশ্ব হচ্ছে সেই এলাকা যেখানে পরমকে উপলব্ধি করতে হবে

---

১. ধর্ম তার সামগ্রিক বিশুদ্ধতায় কেবল আল্লাহরই... আল্লাহ এমন কাউকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন না যে মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাসী অথবা বিধর্মী (৩৯: ৩) যে কেউ আনুগত্যের সঙ্গে আল্লাহর দিকে মুখ ফিরায় এবং সৎকর্ম করে, সে আল্লাহর কাছ থেকে তার পুরস্কার পাবে। এই সব লোক দু:শ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না এবং ভীত হবেনা। (২: ১১২), আল্লাহ কাউকে ক্ষমা করবেন না, কেবল তাদেরকে ছাড়া যারা তার দিকে মুখ ফিরায়, বিশুদ্ধ চিত্তে (২৬ : ৮৯)। এতে আছে একটি শিক্ষা, একটি সতর্কবাণী তাদের জন্য, যাদের হৃদয় নিষ্কলুষ অথবা তাদের জন্য যারা সঠিক প্রমাণ উপস্থিত হলে তর্ক থেকে বিরত হয় এবং তা সানন্দে গ্রহণ করে (৫:৩৭)।

www.icsbook.info

এবং মানুষই তা করবে। যে 'ফালাহ' বা কর্মে চরম উৎকর্ষের দ্বারা কুরআন সমগ্র সৃষ্টির তাৎপর্য বর্ণনা করে সৃষ্টির উপাদানের রূপান্তর ছাড়া তার অন্য কোন অর্থ নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ পুরুষ ও রমনী, জমিন, শহর এবং দেশের রূপান্তর।[২] "দ্বীনকে কে অস্বীকার করে", এই প্রশ্নের উত্তরে (দ্বীন শব্দটি আল্লাহ শব্দটির চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক) কুরআন বলে "এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে এতিমকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়, দরিদ্রকে অন্নদান করেনা।"[৩] তাই, এই পৃথিবীকে, এই দেশ ও কালকে মূল্যবোধ দ্বারা, এমনকি খাদ্যের মতো জাগতিক মূল্যে পরিপূর্ণ করা ধর্মে কেবল গুরুত্বপূর্ণই নয়, বরং তা ধর্মের বা দ্বীনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডও বটে। একারণে ইসলামের পরকালতত্ব, ইহুদী ও খ্রীষ্টান পরকালতত্ব থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রেও "আল্লাহর রাজ্য" হচ্ছে হিব্রুদের নির্বাসন অবস্থার বিকল্প, এরাজ্য ছিল দাউদের রাজ্য, যারা এ রাজ্য হারিয়েছিল তারাই একে অতীত প্রীতির সঙ্গে তুলে ধরেছে, যারা বর্তমানে দাসত্ব ও জিল্লতির সর্বনিম্ন স্তরে দাঁড়িয়ে আছে। খ্রীষ্টান ধর্মের ক্ষেত্রে এ ছিল ইহুদীদের বস্তুবাদী, বাহ্যিকতা-সর্বস্ব, নৈতিকী কেন্দ্রিকতার মোকাবেলা করার জন্য মূখ্য অভিযান; এ কারণে দাউদের রাজ্যকে আত্মিক রূপ দিয়ে, একে দেশকালের সম্পূর্ণ বাইরে নির্বাসিত করা জরুরী হয়ে পড়েছিল। পরবর্তী কালের ইহুদী ধর্মে এই প্রবণতা ইতিমধ্যেই বিদ্যমান ছিল এবং খ্রীষ্টান ধর্ম একে বিকশিত করেছে নতুন বিশ্বজনীন রূপ দিয়ে, মানব জাতির পরিত্রাণ হিসেবে, এবং জাগতিক আকর্ষণ থেকে একে ধুয়ে মুছে সম্পূর্ণ মুক্ত করেছে। উভয় ক্ষেত্রেই "আল্লাহর রাজ্য" হয়ে দাঁড়াল একটি "ভিন্ন স্বতন্ত্র জগত" এবং এমনিভাবে, এই জগত হয়ে উঠে সিজারের সাময়িক রঙ্গমঞ্চ, অসুর এবং জৈব অস্তিত্বের নাট্যমঞ্চ "যেখানে কীট পোকা এবং মরচে জীবনকে দুষিত করে ফেলে, সেখানে তস্কররা দরজা জানালা ভেঙ্গে চুরি করে।"[৪]

ইসলামী পরকালতত্বের একটি নির্মীয়মান ইতিহাস ছিলনা, এর জন্ম সম্পূর্ণভাবেই কুরআনে, এবং ইহুদী ধর্ম ও খ্রীষ্টানধর্মের মত এর সমসাময়িক অনুসারীদের অবস্থার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ইহা পৃথিবীতে একটি নৈতিক শীর্ষবিন্দুর কল্পনা করে, যে শীর্ষবিন্দুতে রয়েছে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা।[৫] অনেকটা যেন পৃথক অবস্থায় এবং

---

২. হে মানব সকল, কেবল আল্লাহরই ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই, তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যাতে তোমরা এতে বসবাস করতে পার (তাঁর নক্সার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে) অতএব, তার ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার কাছে অনুতপ্ত হও, "তিনি আমাদের প্রভু, প্রতিপালক, যিনি আমাদের সন্নিকটেই আছেন, তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন যারা তার করুণা প্রার্থনা করে (১১:৬১)।

৩. তুমি কি তার কথা বিবেচনা করেছ, যে দ্বীনকে অস্বীকার করে – এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে এতিমকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, যে অভাবগ্রস্থকে অনুদানে উৎসহিত করে না।

৪. পৃথিবীকে তোমরা তোমাদের ধন পুঞ্জীকৃত করোনা, যেখানে কীটপোকা, এবং মরিচা সবকিছু নষ্ট করে দেয়, দস্যুরা দরজা জানালা ভেঙ্গে ঢুকে এবং চুরি করে (৬: ১৯)।

৫. কুরআনের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় রয়েছে 'তারগীবে'র একটি উপাদান (এ জীবনে বা আখিরাতে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি), মানুষের ভাল আচরণ এবং ভাল কাজের জন্য, অথবা রয়েছে 'তারহীবের'

www.icsbook.info

মানুষের জন্য পৃথক ভাগ্য নিয়ে তাদের বর্তমান দুঃখ গ্লানি নিয়ে পৃথিবীর পুনরাবৃত্তি ঘটকু তা কাম্য ছিলনা। পৃথিবী হচ্ছে একমাত্র রাজ্য, একক এবং একমাত্র দেশ-কাল, যা কিছু ছিল হওয়া উচিত সে সমস্তই, এতে ঘটা উচিত এবং ঘটতে পারে মানুষের মাধ্যমেই। যেই এর অবসান ঘটলো তখনই কেবল পুরস্কার এবং রায় যার পূর্ণরূপ হচ্ছে পুরস্কার ও শাস্তি; তা ঘটতে পারে, এবং সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে, দেশকালের পন্থা থেকে আলাদাভাবে একটি ইন্দ্রিয়াতীত বা তুরীয় পন্থায়, যা মানব জ্ঞানের সম্পূর্ণ উর্ধে, কেবল ওহীর মাধ্যমে, আমাদেরকে প্রদত্ত রূপক বর্ণনা ছাড়া।

পরিণামে তাই ইসলামে জাগতিক ব্যাপারসমূহ অর্জন করে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সিরিয়াস তাৎপর্য। কমিউনিষ্টদের মতই মুসলমানদের জন্য ইতিহাস একই রকম নাজুক ব্যাপার। কেবল তফাৎ এই যে পরমকে নয়, সে নিজেকে জানে ইতিহাসের কাছে দায়ী বলে। মুসলিম এই ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আল্লাহ ইতিহাসকে যে রূপে চালিত করেন শেষ পর্যন্ত তা হচ্ছে ইতিহাসের নিজের আচরণের সরাসরি পরিণাম। ব্যক্তিগতভাবে, ব্যক্তিক পর্যায়ে যেমন, তেমনি গোষ্ঠীগত বা সামাজিক ক্ষেত্রে যেখানে কমিউনিষ্টদের জন্য খোদ ইতিহাসই হচ্ছে চরম এবং পরম এবং সে কারণে অনিবার্য এবং খ্রীষ্টানদের জন্য ইতিহাসই হচ্ছে অপ্রাসঙ্গিক, বাহুল্য এবং অশুভ সে ক্ষেত্রে এ হচ্ছে মুসলমানের জন্য খোদার নাট্যমঞ্চ, উপকরণ, পরীক্ষা, সারবস্তু এবং সৃষ্টির একেবারে মূল লক্ষ্য। এ থেকে দেখা যায় ইসলামের সংজ্ঞা মতে তার অনুসারীরা হচ্ছে অস্তিত্বের দিক দিয়ে 'সিরিয়াস', যে সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে এবং বলে, "তোমারই প্রশংসা হে প্রভু, কারণ এসব তুমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করনি"[৬] যে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায়, প্রকৃতি ও ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে বাধা দিয়ে বিপদ সংকুল জীবন যাপন করে এবং যে ইতিহাসে তার কৃতিত্ব ও ব্যর্থতার দ্বারা তার বিচার হউক তাতে রাজী। এভাবে তাওহীদ মুসলমানকে দেখে ইতিহাসের ঘূর্ণি কেন্দ্র হিসেবে, কারণ সেই হচ্ছে একমাত্র প্রতিনিধি যে ইতিহাসের মধ্যে আল্লাহর অভিপ্রায়কে পূরণ করতে পারে।

কেবলমাত্র এই প্রেক্ষিতে নবী করিমের (সা.) কর্মকান্ড, তাঁর সাহাবাগণ ও প্রথম যুগের মুসলমানদের চরিত্রের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। হেরা গুহায় মুহাম্মদের দিব্য দৃষ্টি এবং জিব্রাইলের মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, তাঁকে প্রেরণ করে মক্কায়, কর্মের মাধ্যমে মানুষ ও ইতিহাসকে নতুন ও রূপ দেবার জন্য। ইহা তাঁকে অভিজ্ঞতার

একটি উপাদান (শাস্তি, কষ্ট, অথবা মন্দের ভীতিপ্রদর্শন) মন্দ আচরণ ও মন্দ কর্মের জন্য। এতে মানুষের মত প্রাচীন নৈতিকতা এক ঐতিহ্যের নিরবচ্ছিন্নতা রয়েছে। ইসলাম কেবল এই গুলোর দৃশ্য আরো স্পষ্টভাবে, আরো উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করে, যেমনভাবে পূর্বে কখনো বর্ণিত হয়নি।

৬. তারাই সদাচারী যারা সব সময়ই তাদের কাজে, তাদের বিশ্রামে অথবা তাদের নিদ্রায় আল্লাহকে স্মরণ করে, যারা আসমান এবং জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে এবং ঘোষণা করে, যে আমাদের প্রভু, তুমি এ সমুদয় অযথা সৃষ্টি করনি, সমস্ত প্রশংসা তোমারই, আমাদেরকে রক্ষা কর চিরস্থায়ী আগুন থেকে (৩:১৯১)।

www.icsbook.info

আবেশের মধ্যে বন্দী করে রাখেনি, তাকে শিখায়নি এর পুনরাবৃত্তি কামনা ও প্রার্থনা করতে, তাঁর সহচরগণকে শিখায়নি তাদের নিজেদের জন্য এ অবস্থার আকাঙ্ক্ষা করতে। বরং তা অসহনীয় স্বচ্ছতার সঙ্গে তাঁকে আদেশ করল, দেশ এবং কালের বাস্ত ব, পৃথিবীকে দলাই মলাই করে এবং কেটে নতুন রূপ দিতে, ঐশী নমুনার সাদৃশ্যের সঙ্গে মিল রেখে; সম্ভবত ইহাই খ্রীষ্টান ধর্মের হযরত ঈসার উপর মুহাম্মদের অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত পার্থক্য, অর্থাৎ ইহা হযরত ঈসার ব্যক্তিক মূল্যগুলোকে স্বীকার করেও তা সেগুলোর উপর প্রাক-শর্ত হিসেবে এই ধারণা গড়ে তোলে যে, আল্লাহর দিদার, আল্লাহকে ভালবাসা এবং তার মধ্যে আত্মনিমজ্জন, তার মধ্যে বসতি কিছুই না, যদি না তা বাস্তবে এই পৃথিবীকে, এই ইতিহাসকে, এই বিষয়কে মূল্যের সেই স্ত রে উন্নীত করে, যা হচ্ছে আল্লাহর অভিপ্রায়। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এই অতিরিক্ত বাস্ত বতার কারণেই নবী করিম (সা.) তাঁর পিতৃব্য যখন ইসলাম কর্তৃক স্থিত অবস্থা বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন, তখন তিনি তার জবাব দিয়েছিলেন এই ভাষায় "আমার ডান হাতে যদি সূর্য দেওয়া হয় এবং বাম হাতে চন্দ্র দেয়া হয় যেন আমি আমার এই মিশন পরিত্যাগ করি আল্লাহ আমাকে সাফল্য দানের পূর্বে, অথবা আমি এই প্রক্রিয়ায় ধ্বংসও হয়ে যাই, তবু আমি তা গ্রহণ করবোনা।"[৭]

তাঁর শত্রুদের কাছে নিষ্ক্রিয়ভাবে আত্মসমর্পণ না করে এবং নিজেকে কোরবানীর আর একটি ভেড়া না বানিয়ে, মুহাম্মদ (সা.) তাদেরকে বুদ্ধিতে হারিয়ে মদিনায় হিযরত করলেন এবং প্রথম সপ্তাহেই গঠন করলেন প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র এবং তাকে দিলেন তাঁর সংবিধান। তাঁর নবুয়ত এই বাণী গ্রহণ ও তা প্রচার করা ছাড়া আর কিছুই ছিলনা, কিন্তু এই বাণীর একটি মৌলিক উপাদান ছিল, এবং মুহাম্মদই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি এই বাণীর দাবী পূরণ করেছিলেন। এই উপাদানটি প্রকৃতির প্রক্রিয়ায় তার জনগোষ্ঠীর এবং সকল মানুষের জীবনে বাধাদানের জন্য তাঁকে নির্দেশ দেয়, তাতে ক'রে বাঞ্ছিত রূপান্তর সাধনের জন্য। জীবনের সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বের এক দৃষ্টান্তমূলক জীবন যাপনের পর, একেবারে ব্যক্তিগত জীবন থেকে সামরিক, রাজনৈতিক এবং আইন ব্যবস্থা পর্যন্ত, যে সময়ে তিনি আরবকে একতাবদ্ধ করেন এবং বিশ্ব ইতিহাসে নাটকীয় হস্তক্ষেপের জন্য আরবদেশকে সমবেত করেন, তখনই তাঁর মৃত্যু হয়– যখন সমবেত বাহিনী প্রস্তুত ছিল ইসলামকে আরবের বাইরের পৃথিবীতে নিয়ে যাবার জন্য।

মহানবীর স্বপ্ন এবং তাঁর ব্যক্তিগত অনল প্রবাহে মুগ্ধ আবিষ্ট প্রথম দিকের মুসলমানরা ইতিহাসের রণক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়ে, এবং বদলে দেয় সকল জাতি ও সংস্কৃতির ব্যক্তিবর্গের অভ্যন্তরীণ গঠন, তাদের দৈনন্দিন জীবন, এক একটি গোটা সমাজের সংস্কৃতি, তৎসঙ্গে তাদের মানচিত্র, গ্রাম, নগরী এবং এক একটি গোটা সাম্রাজ্যের পরিচয় নির্দেশক নক্সা ও দিগন্তে ফুটে উঠা গাছ পালা ঘরবাড়ীর রূপরেখা। ইসলাম

৭. পূর্ববর্তী ১ম অধ্যায়, নং-৩৭।

www.icsbook.info

কর্তৃক সৃষ্ট, লালিত নতুন প্রজন্ম ও জেনারেশন, যে উদ্যম ও উন্মাদনার দ্বারা তাড়িত ছিল, তারই নমুনা হচ্ছে মাগরিবে আটলান্টিকের উপকূলে দাঁড়িয়ে উকবা ইবনে নাফির মশহুর ভাষণ : "হে সমুদ্র, তোমার ওপারেও পৃথিবী রয়েছে বলে যদি আমি জানতাম, ঘোড়ার পিঠে চড়ে তোমাকে আমি অতিক্রম করতাম।" মুসলমানরা যে মিশনে দীক্ষিত ছিল তা ছিল বিশ্ব জাগতিক। এবং তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল যে, তারা তাদের পুরো দায়িত্বই পালন করেছে। এ কঠোর কর্তব্যের প্রকৃতি ছিল নৈতিক এবং ধর্মীয়, কারণ রাজনৈতিক পদমর্যাদা, ক্ষমতা, অথবা অনৈতিক সুবিধা তাদের বিবেচ্য বিষয় ছিল না। ইসলাম যে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল সে বিশ্ব ব্যবস্থার দ্বারা শাসিত ছিল এ পৃথিবী, এমন এক পৃথিবী যেখানে কোন অন্যায়ই তার যথাযথ প্রতিকার থেকে রেহাই পেতোনা, যেখানে চিন্তার গতি ছিল অবাধ ও স্বাধীন, মানুষ যেখানে অন্যের মধ্যে প্রত্যয় সৃষ্টি এবং নিজে সত্যকে গ্রহণ করার জন্য ছিল স্বাধীন, যেখানে ইসলাম মানবজাতিকে আহ্বান করতে পারে আল্লাহর একত্বের প্রতি, সত্যের প্রতি ও মূল্যবোধের প্রতি। যদি ইতিহাস নিজেই বিদ্যমান না থাকতো আগে থেকে এবং চিৎকার না করতো রিফর্মেশনের জন্য, যেমনটি চিৎকার করেছিল মুসলমানদের কর্ণে, মুসলমানরা নিজেরাই তা সৃষ্টি করতো। কারণ, হাই ইবনে ইয়াকজানের মত, আল্লাহকে এবং ঐশী অভিপ্রায়কে আবিষ্কার করার পর, তাকে গাছ কেটে তৈরী করতে হতো একটি ভেলা, সমুদ্র পার হবার জন্য, যাতে তার ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতার সে অবসান ঘটাতে পারে, সমাজ এবং পৃথিবীকে খুঁজে পেতে পারে এবং সৃষ্টি করতে পারে ইতিহাস।

www.icsbook.info

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানের মূলসূত্র

১. সংশয়বাদ নয়, খ্রীষ্টানদের 'বিশ্বাসও' নয়

আজকের পৃথিবীতে এবং বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগতে সংশয়বাদ অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, 'শিক্ষিতদের' মধ্যে এ হচ্ছে প্রবলতম ধারণা এবং প্রায়শ তা দেখতে পাওয়া যায় নিরক্ষরদের মধ্যেও, যারা তাদের সমাজের 'বুদ্ধিজীবী' সম্প্রদায়ের অনুকরণ করে। সংশয়বাদের এ বিস্ময়কর বিস্তারের জন্য অংশত দায়ী হচ্ছে বিজ্ঞানের সাফল্য, যাকে ধর্মীয় মনের উপর প্রয়োগ-বুদ্ধির নিরন্তর বিজয় বলে গণ্য করা হয়। ধর্মীয় মনের সংজ্ঞার দ্বারা সেই সব ধারণার অনুসরণ বুঝায় খ্রীষ্টানধর্ম যা শিক্ষা দেয়, প্রয়োগবাদীদের মতে, খ্রীষ্টানধর্ম সত্য শিক্ষাদানের অধিকার ও ক্ষমতা বহু আগেই হারিয়েছে। এই কর্তৃত্বের উপযোগী খ্রীষ্টান ধর্ম কখনো ছিলনা, কেননা খ্রীষ্টানধর্ম আসলেই গোঁড়া তাকলিদে বিশ্বাসী– অর্থাৎ এতে, কতিপয় প্রস্তাবনাকে সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়– প্রথমে সেগুলোকে প্রায়োগিক পরীক্ষা এবং যুক্তিবিচারের মাধ্যমে বিচার না করে। পাশ্চাত্য জগত এবং যারা তাকে অনুকরণ করে তারা সকলেই খ্রীষ্টান ধর্মের উপর বৈজ্ঞানিক মনের সেই সহজ বিজয়ে এখনো মোহাবিষ্ট। এর প্রভাবে ওরা ঝাপ দেয় এই ভ্রান্ত এবং দ্বিগুণ সাধারণীকরণে, যেহেতু সকল ধর্ম জ্ঞানই হচ্ছে অপরিহার্যভাবে গোঁড়া মতবাদ বিশেষ, যেখানে সত্যমুখী সকল পথই হচ্ছে প্রয়োগভিত্তিক এবং চূড়ান্ত সমর্থন মিলবে কেবল একটি নির্দিষ্ট অর্থে যা নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। যা কিছুই এভাবে সমর্থিত নয়, তড়িঘড়ি তারা এ সিদ্ধান্তে আসে যে, তাই সন্দেহজনক, এবং যদি তা এভাবে সমর্থনের অযোগ্য হয়, তাহলে তা অবশ্যই মিথ্যা।

তাই, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে 'ডগমা' হচ্ছে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গির অনুকরণ, যা অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থনযোগ্য নয় এবং সে কারণে তা মূল্যহীন। সত্য অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। পরিণামে ঈমান বা বিশ্বাস হচ্ছে একটি কর্ম, একটি সিদ্ধান্ত যার দ্বারা মানুষ, যা মনের জন্য একটি বাধা, তাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে স্থির করে।[১] প্যাসকেল একে বর্ণনা করেছেন একটি বাজি রূপে, যা এমন এক বিষয়ের উপরে ধরা হয়, যার সত্যতা সবসময় তাকে এড়িয়ে যায়। খ্রীষ্টানদের মধ্যে যারা ধর্ম মানেনা, তারা খ্রীষ্টান ধর্মকে বর্ণনা করে– যেখানে কোন বিড়াল নেই তেমন একটি অন্ধকার কোঠায়, একটি কালো বিড়াল আছে বলে একজন অন্ধ মানুষের বিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের বিজয়-সৃষ্ট এ মোহাচ্ছন্নতার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেন জার্মান ধর্মতত্ত্ববিদ ক্লেয়ারকেমার,

---

১. ইহুদীরা প্রমাণ হিসেবে মু'যিযা দাবী করে এবং গ্রীকরা অনুসন্ধান করে প্রজ্ঞা। আমরা ঘোষণা করি ক্রুশবিদ্ধ ঈসার কথা, এমন একটি বাণী যা ইহুদীদের জন্য আপত্তিকর এবং জেন্টাইলদের জন্য নিরর্থক। সেন্ট পল, কারিন্তয়ানস (১: ২২-২৩)।

www.icsbook.info

'ধর্মকে যারা ঘৃণ্য মনে করে'[২] তাদের জবাবে তিনি তার খ্রীষ্টান অনুসারীদের এই পরামর্শ দেন যে, তারা যেন খৃষ্টান ধর্মকে বাস্তবের উপর নির্ভরশীল মনে না করে অথবা সত্যকে যেন বিচারকের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ না করে, আত্মগত বা মন্ময় অভিজ্ঞতার বিষয় মনে করে। দৃশ্যত পাশ্চাত্য চেতনার উপর তার কর্তৃত্বকে পূর্ণতা দান করেছে অলীক কল্পনা-বিলাসিতার বিপ্লব, এমনকি, এই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আল্লাহকে পর্যন্ত তার সত্যতার জন্য নির্ভর করতে হয়, ধার্মিক মানুষের অভিজ্ঞতার অনুভূতির উপর।

এ কারণে মুসলমানদের কখনোই তার ঈমানকে 'বিশ্বাস বা ধর্ম' বলা উচিত নয়। সাধারণ অর্থে যখন ব্যবহৃত হয় তখন *'belief* এবং *faith'* এই ইংরেজী শব্দ দু'টি বর্তমানে তাদের অর্থের মধ্যে বহন করে অসত্য সম্ভাবনা, সন্দেহ ও সংশয়ের অস্তিত্ব। এগুলোর বৈধতা কেবল তখনই থাকে যখন শব্দগুলো বিশেষ কোন ব্যক্তি বা গ্রুপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এই দু'টি শব্দের কোনটি কখনো একথা বুঝায় না যে, প্রস্তাবনাটি সত্য। এ হচ্ছে ঈমান শব্দটির অর্থের ঠিক বিপরীত। 'আমন' (নিরাপত্তা) থেকে নিষ্পন্ন এই শব্দটির দ্বারা বুঝায় যে, এর অন্তর্গত সমস্ত কওল উপলব্ধ ও গৃহীত হয়েছে। ইসলামী এবং আরবী প্রকাশভঙ্গিতে একজন মানুষ 'কাজীব' (মিথ্যাবাদী) অথবা মুনাফিক (প্রবঞ্চক) হতে পারে। কিন্তু ঈমান এই অর্থে মিথ্যা হতে পারে না যে, বিষয়টি অস্তিত্বহীন অথবা যা বলে তা থেকে ভিন্ন। একারণে 'ঈমান' এবং 'ইয়াকীন' শব্দ দু'টি সমার্থবোধক। ইয়াকীনের পূর্বে সত্যকে মানুষ অস্বীকার করতে পারে অথবা সন্দেহ করতে পারে, কিন্তু যখন ইয়াকীন বিদ্যমান তখন সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রমাণের মতই 'প্রত্যয়' উৎপাদক।[৩] এ সত্য এখন সন্দেহাতীত যে, যে ব্যক্তি সন্দেহ করে চলে তাকে শুধু একথা বলা যায় যে, 'নিজে দেখে না' (voila)। তাই ইয়াকীন নিশ্চয়ই সত্যের জন্য যতদূর সম্ভব apodeictic। তাই ঈমান হচ্ছে 'দৃঢ় প্রত্যয়', সন্দেহ, সম্ভাবনা, অনুমান এবং অনিশ্চয়তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ঈমান কোন কর্ম বা সিদ্ধান্ত নয়, গ্রহণ করার জন্য কোন সিদ্ধান্ত নয়, বা এমন কিছুতে বিশ্বাসস্থাপনের জন্য নয় যা সত্য বলে জ্ঞাত নয়, ওই ঝুড়িতে না রেখে এই ঝুড়িতে নিজের ভাগ্যকে রাখার বাজী নয়। ঈমান হচ্ছে এমন কিছু যা মানুষের জীবনে ঘটে, যখন সত্য তথা একটি বিষয়ের বাস্তবতা তার মুখে আঘাত করে এবং সন্দেহাতীত ভাবে, তাকে প্রত্যয়ী করে তোলে তার সত্যতা সম্পর্কে। ইহা চরিত্রের দিক দিয়ে একটি জ্যামিতিক সিদ্ধান্তের অনুরূপ, যেখানে পূর্ববর্তী প্রতিজ্ঞাগুলো দেয়া থাকায় মানুষ প্রত্যক্ষ করে এর সত্যতা এবং অনিবার্যতা। অথবা কুরআন যেমন বলেছে, যে বিষয়টির অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করা হচ্ছে, তাই সৃষ্টি করে রাখা হয় দর্শকদের

---

২. ফেডারিক ডি সিলিমেকার– *Rahgion Speeches to Its Cultural Despisers* Abyt John Oman (New Work Harper and Brothers publishers. 1958. pp 94

৩. বরং তোমরা যদি সুনিশ্চিত জ্ঞানের দ্বারা অবগত হতে, সুনিশ্চিতরূপে নরকাগ্নি প্রত্যক্ষ করতে। অতঃপর জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা তা অবলোকন করতে (১০২: ৫-৭)।

www.icsbook.info

সামনে, যাতে সকলেই তা দেখতে এবং স্পর্শ করতে পারে।[৪] খ্রীষ্টানদের Faith থেকে ভিন্নভাবে ইসলামের ঈমান হচ্ছে মানুষের মনে প্রদত্ত সত্য, মানুষের বিশ্বাস প্রবণতা নয়। সত্য অথবা উৎস-নির্দেশক শব্দগুলো রহস্য নয়, প্রতিবন্ধক নয়, অজ্ঞেয় এবং অযৌক্তিক নয় বরং বিচারলব্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ। প্রথমে এগুলো সম্পর্কে সন্দেহ ছিল, কিন্তু পরীক্ষার পর এগুলি সত্য হিসেবে দৃঢ়ভাবে বলবৎ ও প্রতিষ্ঠিত। এই সব সত্যের পক্ষে আর ওকালতির আবশ্যকতা নেই। যে কেউ এগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করে সে-ই যুক্তিনির্ভর এবং যে কেউ এগুলোকে অস্বীকার বা সন্দেহ করতে থাকে সে-ই অযৌক্তিক। কিন্তু সংজ্ঞা অনুসারে খ্রীষ্টান Faith সম্পর্কে তা বলা যায় না। ইসলামের ঈমানের জন্য এ হচ্ছে একটি আবশ্যিক বর্ণনা, এ জন্য আল্লাহ তায়ালা ইসলামের সত্যকে প্রকাশ করেছেন এই ভাষায়, "এই প্রত্যাদেশ দ্বারা সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছে এবং মিথ্যা বাতিল হয়ে গেছে, ঠিক যা হওয়া উচিত, জ্ঞান বা প্রজ্ঞা এখন ব্যক্ত হয়েছে স্পষ্টভাবে এবং ভ্রান্তি হচ্ছে ভিন্ন।"[৫] ইসলামের যৌক্তিকতায় নিহিত রয়েছে মানুষের সর্বোত্তম বিচার বুদ্ধির কাছে এর আবেদন। ইসলাম বিপরীত প্রমাণের ভয়ে ভীত নয়, কিংবা ইসলাম গোপনচারী নয়, যার আবেদন কোন আত্মিক অনুভূতির প্রতি নয়, কোন গূঢ় সন্দেহ এবং অনিশ্চয়তার প্রতি নয়। সত্য যে বাস্তবে, যা তার চেয়ে ভিন্ন কিছুরূপে, তাকে পাবার মানসিক উদ্বেগ বা বাসনা। ইসলামের দাবী প্রকাশ্য। এর সম্পর্ক যুক্তির সঙ্গে, যার লক্ষ্য হচ্ছে যুক্তিকে সত্য সম্পর্কে প্রত্যয়ী করা, যা বুদ্ধির অগ্রাহ্য, তা দিয়েও যুক্তি বা বিচারবুদ্ধিকে অভিভূত করা নয়,[৬] যা মানুষের 'বুদ্ধি ও উপলব্ধিকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করা যায়,' তার সাহায্যে জবরদস্তি তাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা নয়।[৭]

২. ঈমান ঃ একটি জ্ঞান ও তাত্ত্বিক স্তর বা মান

উপসংহারে একথা বলা কর্তব্য যে, ঈমান কেবল একটি নীতিশাস্ত্রীয় সতর বা মান নয়। আসলে প্রথমে এ হচ্ছে একটি বোধ বিষয়ক মান। অর্থাৎ এর সম্পর্ক হচ্ছে

---

৪. প্যাসকেলের বিশ্বাসের (faith) সঙ্গে ইসলামের ঈমানের বৈপরিত্য হচ্ছে চূড়ান্ত। প্যাসকেল বিশ্বাসের জন্য যুক্তি পেশ করেন একটা বাজী হিসেবে, যা মানুষ এমন একটি বিষয়ের উপর রাখে সংজ্ঞার দিক দিয়ে, যা অজ্ঞেয়। যখন প্যাসকেল ভাবেন যে, মানুষকে কখনো আল্লাহর অস্তিত্ব, তার আদেশ নিষেধ এবং শেষ বিচার সম্পর্কে চাক্ষুসভাবে বুঝানো যায়না, যখন ইসলাম চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তা প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রমাণ করার জন্য। এ কারণে এ ধরণের যৌক্তিক প্রত্যয় সৃষ্টির জন্য মুসলমানরা সকল প্রকার যুক্তি প্রয়োগ করেছে, কুরআনুল করিমে গৃহীত তাদের সর্বোত্তম সূত্রগুলো সৃষ্টি ও পরিবর্তন থেকে পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য থেকে এবং নৈতিক চৈতন্য থেকে এই যুক্তিগুলো তাদের প্রকৃষ্টতম সংজ্ঞা পেয়েছে কুরআনে।

৫. বল, হে মোহাম্মদ সত্য এখন প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং অসত্য মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে (১৭ : ৮১)। এই ওহী দ্বারা মিথ্যা থেকে সত্য, দৃষ্টি গ্রাহ্যভাবে পৃথক হয়ে পড়েছে (২: ২৫৬)।

৬. ইসলামের এই যুক্তিবাদের পুরষ্কার এবং স্পষ্ট প্রমাণের উপর এর তাগিদের, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার অনুশীলনের প্রতি সম্মানের, বিজ্ঞানের প্রতি এবং সমগ্র সৃষ্টিতে, প্রকৃতিতে, আকাশে, মানবিক মনস্তরে, আল্লাহর নমুনা আবিষ্কারের উপর প্রবল তাগিদের পার্থক্য বিচার করুন, করিন্তিয়ানস ১-এ, একে খ্রীষ্টানধর্মে বিশ্বাসের যে বর্ণনা দিয়েছেন প'ল তার সঙ্গে।

৭. ১. করিন্তিয়ানস (১: ১-২০)।

www.icsbook.info

জ্ঞানের সঙ্গে, এর সূত্রগুলোর সত্যতার সম্পর্কে, এবং যেহেতু এর সূত্র বিষয়ক উপাদানগুলোর প্রকৃতি ন্যায়শাস্ত্র ও জ্ঞানের মৌলনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত, সম্পর্কিত অধিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে, সেজন্য এ সিদ্ধান্ত অবধারিত যে, কর্মকর্তার মধ্যে তা কাজ করে একটা আলো হিসেবে, যা সমস্ত কিছুকে উদ্ভাসিত করে। আল গাজ্জালীর বর্ণনা মতে, ঈমান হচ্ছে এমন একটা দৃষ্টি যা সকল তত্ত্ব ও ঘটনাকে স্থাপন করে তাদের যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে এবং সেই প্রয়োজনীয় পরিপ্রেক্ষিতে, যা তাদেরকে সত্যিকারভাবে বুঝার জন্য আবশ্যক।[৮] বিশ্ব, বিশ্বজগতের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যার জন্য এ হচ্ছে মূল ভিত্তি যুক্তির মৌলনীতি সত্যই অযৌক্তিক অথবা যুক্তিবিরুদ্ধ হতে পারেনা এবং সে কারণে তা নিজের সঙ্গে বিরোধিতা করতে পারে না আসলে এ হচ্ছে যৌক্তিকতার প্রথম নীতি বা মূলনীতি। একে অস্বীকার করা বা এর বিরোধিতা করার মানে হচ্ছে যুক্তিসিদ্ধতা থেকে পলায়ন, এবং সে কারণে, মানবিকতা বা মনুষ্য জগত হতেও।

জ্ঞানের সূত্র হিসেবে আত্-তাওহীদ হচ্ছে এই স্বীকৃতি যে, আল্লাহ্ আল হক (পরম সত্য) এবং এই উপলব্ধি যে, তিনি একক; এর তাৎপর্য এই যে, সমস্ত বিবাদের এবং সমস্ত প্রশ্ন মীমাংসার জন্য তাঁরই স্মরণ করতে হবে। অর্থাৎ কোন দাবী পরীক্ষার উর্ধ্বে নয়, নিস্পত্তিমূলক সিদ্ধান্তের বাইরে নয়। আত তাওহীদ হচ্ছে এই স্বীকৃতি যে, সত্য প্রকৃতপক্ষে জ্ঞেয় এবং মানুষ সত্যে উপনীত হতে সমর্থ। এই সত্যকে যে সংশয়বাদ অস্বীকার করে, তা হচ্ছে তাওহীদের বিপরীত। সংশয়ের জন্ম হচ্ছে সত্যের অনুসন্ধানের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছুতে স্নায়ুতন্ত্রীর বা ক্ষমতার ব্যর্থতায়। অর্থাৎ জ্ঞান ও তথ্যের একটি নীতি হিসেবে সত্যকে জানার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অর্ধপথেই অনুসন্ধানত্যাগ। এ হচ্ছে নৈরাশ্যের মন্ত্রণাদাতা, যার ভিত্তি এই নির্বিচার ধারণার উপর যে, মানুষ বাস করে একটি নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্নের মধ্যে, যেখানে অবাস্তবতা থেকে সত্য বা বাস্তবতাকে কখনো পৃথক করা যায় না। নাস্তিবাদ তথা মূল্যের অস্বীকৃতির সঙ্গে এর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, কারণ মূল্যের উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন এই স্বীকৃতি যে, মানুষ মূল্যের সত্যে পৌঁছাতে সমর্থ।

মূল্য সম্পর্কে বা মূল্য বিষয়ক কোন দাবী সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। যাকে মূল্য বলে দাবী করা হয়, তা আসলেই মূল্য কিনা, তা কোন একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত বা লংঘিত হয়েছে কিনা, এবং নির্দিষ্ট ঘটনাটি যেরূপ বলে বর্ণিত হয়েছে আসলেই উহা

---

৮. আবু হামিদ আল-গাজ্জালী, আল মনকিদ মিন আল দালাল (দামেস্কস ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৩৭৬ /১৯৫৬) পৃষ্ঠা ৬২-৬৩। এখানে গাজ্জালী বলেন 'যুক্তির সাক্ষ্যকে ঈমান অস্বীকার করেনা বা তার বিরোধিতা করে না বরং প্রতিষ্ঠিত করে'। আমি আমার সন্দেহের একটি প্রতিষেধকের সন্ধানে ছিলাম, কিন্তু যুক্তিগত সাক্ষ্য ছাড়া সেই প্রতিষেধক লাভ অসম্ভব। অবশ্য কোন সাক্ষ্যই টিকেনা যদি না তার ভিত্তি হয় প্রাথমিক বিজ্ঞান (পরাবিজ্ঞান) এবং যেহেতু এসব বিজ্ঞানের ভিত্তি নিশ্চিত ছিলনা সে কারণে এসবের ভিত্তিতে সকল সিদ্ধান্ত একইরূপ অনিশ্চিত কিন্তু (ঈমানের অধীনে) এই যৌক্তিক ভিত্তি (বিজ্ঞান এবং পরাবিদ্যা) নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠে, যুক্তির দিক দিয়ে সুষ্ঠ এবং গ্রহণীয়, জ্ঞানে তাদের ভিত্তি কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হয়ে (পৃষ্ঠা ৬২)।

www.icsbook.info

তা কিনা, এই সব প্রশ্নের সমাধান না করে যদি এই সব প্রশ্নের সমাধান সম্ভব না হয় নিশ্চিতভাবে, অর্থাৎ তাদের সত্যতা নিশ্চিতভাবে না জানা যায়, তাহলে মূল্যের জ্ঞান ধ্বসে পড়ে। অন্য যে কোন তথ্যের মতই মূল্যের মূল্যত্ব, একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এর তাৎক্ষণিকতা একই রকম সন্দেহের বিষয় হতে পারে। তাই যদি কেউ সংশয়বাদের বিপরীত এই ধারণা নিয়ে অগ্রসর না হয় যে, এ সব বিষয়ে সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব, তাহলে নাস্তিবাদ অনিবার্য হয়ে উঠে।

৩. আল্লাহর একত্ব এবং সত্যের একত্ব

আল্লাহর উলুহিয়ত এবং তার এককত্ব স্বীকার করার মানে হচ্ছে সত্য এবং তার একত্বকে স্বীকার করা। আল্লাহর একত্ব এবং সত্যের এককত্ব অবিচ্ছেদ্য, একই বাস্তবতার এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন দিক। একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যখন আমরা এই বিবেচনা করি আত্-তাওহীদের মূলসূত্রের অর্থাৎ আল্লাহ একক এই সত্যের একটি গুণ হচ্ছে সত্যতা, কারণ সত্য এক না হলে আল্লাহ একক এই উক্তি যেমন সত্য হতে পারে, তেমনি আল্লাহ "অন্য কোন বস্তু বা শক্তি বা খোদা" তাও সত্য হতে পারে। তাই সত্য এক-এ দাবীর তাৎপর্য কেবল এই নয় যে, আল্লাহই কেবল এক, বরং এ দাবীও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, নীতি এবং ইতির এই সম্মেলন যা ব্যক্ত করে শাহাদা-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

একটি সুসংবদ্ধ মৌলনীতি হিসেবে আত্-তাওহীদে অন্তর্গত রয়েছে তিনটি নীতি বা সূত্র : প্রথম, সত্য বা বাস্তবতার সঙ্গে যার মিল নেই তেমন সমস্ত কিছুকে প্রত্যাখ্যান করা। দ্বিতীয়, চূড়ান্ত বৈপরিত্বের অস্বীকৃতি। তৃতীয়, নতুন অথবা বিরোধী সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য উন্মুক্ততা। প্রথম নীতিটি ইসলাম থেকে মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনার সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেয়, কেননা, ইসলাম ধর্মের সমস্ত কিছুকেই পরীক্ষণ ও সমালোচনার জন্য উন্মুক্ত রাখে। আইন বিষয়ক, ব্যক্তিগত বা সামাজিক নৈতিকতা বিষয়ক কোন নীতিই হউক অথবা বিশ্বজগত সম্পর্কে কোন উক্তিই হউক, ইসলামে তার যে কোন একটি দূষিত বলে গণ্য হবার জন্য যথেষ্ট, যদি সত্য বাস্তবতা বর্জিত হয়, অথবা সত্য বাস্তবতার অনুরূপ হতে ব্যর্থ হয়। এই নীতিটি মুসলমানদেরকে রক্ষা করে মতামতের বিরুদ্ধে অর্থাৎ জ্ঞান সম্পর্কে অপরীক্ষিত অনুমোদিত দাবীর বিরুদ্ধে। কুরআন ঘোষণা করে, অসমর্থিত দাবী হচ্ছে প্রবঞ্চনামূলক ধারণা (Zann) এবং তা আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ।[৯] যত তুচ্ছ বিষয় সম্পর্কে হউক, মুসলিমের সংজ্ঞা হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি, যে সত্য ছাড়া আর কিছুই দাবী করে না, যে সত্য ছাড়া আর কিছুই পেশ করে না, এজন্য যদি সে ধ্বংস হয়ে যায় তবুও। প্রকৃত মনোভাব গোপন করা, মিথ্যার সঙ্গে সত্যকে মিশানো বা নিজের স্বার্থ বা তার স্বজনদের স্বার্থের চেয়ে সত্যকে ক্ষুদ্র মনে করা, ইসলামে যেমন ঘৃণ্য তেমনি নিন্দনীয়।

---

৯. হে বিশ্বাসী লোকেরা! তোমাদের সঙ্গীদের সন্দেহ করা থেকে বিরত হও, সামান্যতম সন্দেহ একটা অপরাধ (৪৯ : ১২)।

www.icsbook.info

দ্বিতীয় সূত্রটি হচ্ছে, একদিকে যেমন বৈপরিত্য বর্জিত অন্য দিকে আপাতবিরোধ থেকে মুক্ত, এই নীতিটি হচ্ছে যুক্তিবাদের সারনির্যাস।[১০] এই নীতিকে বিশ্বাস না করে সংশয়বাদ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়, কারণ বৈপরীত্যের অর্থ হচ্ছে বিপরীত দু'টি অবস্থার সত্যতা কোন সময়ই জানা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই মানুষের চিন্তা এবং বাক্যে পরস্পর বিরোধ দেখা যায়। প্রশ্ন বৈপরীত্য বা পরস্পর বিরোধ পরিহার করা যায় কিনা, আর একটি নীতি বা তথ্য যা বৈপরিত্যগুলোর উপর একটি তোরণের মত বিদ্যমান, যার আলোকে বিরোধ দূর করা যেতে পারে, পার্থক্যগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

একই কথা সত্য যখন ওহী এবং যুক্তির মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখা দেয়। ইসলাম যে কেবল এ ধরনের বিরোধের যুক্তিতাত্ত্বিক, সম্ভাবনাই অস্বীকার করে তা নয়, বরং বিবেচনাধীন দ্বিতীয় সূত্রটি যে মুহূর্তে এর বোধ ঘটে, তখন এর ব্যবহারের জন্য দেয় দিকনির্দেশনা। যুক্তি কিংবা ওহী একে অন্যের উপর প্রভুত্ব করতে পারে না; যদি ওহী প্রথম ঘটে তাহলে এক ওহীর সঙ্গে আরেক ওহীর কিংবা ওহী দু'টির দাবীর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণের কোন সূত্রই থাকবেনা। যে কোন দুটি উক্তি বা অবস্থান, যা প্রত্যাদিষ্ট বলে দাবী করা হয়, তাদের মধ্যে অসঙ্গতি, পার্থক্য অথবা বাহ্যিক অসামঞ্জস্যের মীমাংসা হবে অসম্ভব। তাই কোন প্রত্যাদেশ নিজেকে নিজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার, তথা স্বগৃহকে শৃংখলামন্ডিত করার উপায় থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইবে না। পক্ষান্তরে প্রত্যাদেশ হতে পারে যুক্তি বিরুদ্ধ, অর্থাৎ যৌক্তিক পরীক্ষা ও জ্ঞানলব্ধ তথ্যাদির বিপরীত। যেখানে অবস্থা এরকম, সেখানে ইসলাম ঘোষণা করে যে, এ বিরোধ বা অসঙ্গতি চূড়ান্ত নয়। ইসলাম তখন অনুসন্ধানীকে তাগিদ দেয়, তার প্রত্যাদেশের বোঝাকে অথবা তার যুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাবলীকে অথবা উভয়কে পুনরায় বিচার করে দেখতে, অসঙ্গতিকে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে সত্যের একত্ব হিসেবে তাওহীদ আমাদের নিকট এ দাবী করে যে, এই বিপরীত থিসিসগুলোকে আর একবারের মত তলিয়ে দেখার ইচ্ছায় উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখতে হবে। তাওহীদ ধরে নেয় যে, নিশ্চয়ই কোন না কোন দিক বিবেচনা এড়িয়ে গেছে যা বিবেচনা করা হলে বিপরীত সম্পর্ক বা বিরোধ মিটিয়ে দিতে পারতো। একইভাবে, তাওহীদ আমাদের নিকট দাবী জানায় প্রত্যাদেশ পাঠককে, খোদ প্রত্যাদেশকে নয়– আবার প্রত্যাদেশের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে, নতুন করে তা পাঠ করার জন্য, পাছে না একটি অস্পষ্ট অর্থ তাকে এড়িয়ে যায়, যাকে বিবেচনা করলে অসঙ্গতি মিটে যেতে পারতো। যুক্তি বা জ্ঞানের প্রতি এই আহ্বান খোদ প্রত্যাদেশকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করবেনা, কারণ প্রত্যাদেশ মানুষ কর্তৃক সর্বপ্রকারে নিজ উদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর অনেক উর্ধ্বে, তবে তা আমাদের মানবিক ব্যাখ্যার মধ্যে

---

১০. এই প্রশ্নটির আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, বর্তমান গ্রন্থকারের প্রবন্ধ ও প্রতিক্রিয়া– *আল হাদারা- আল ইসলামিয়া*, অধ্যায়-২ নোট-১।

www.icsbook.info

সঙ্গতি বিধান করবে, বা তাওহীদ যুক্তিকর্তৃক উৎঘাটিত পুঞ্জিভূত সাক্ষ্য প্রমাণের সঙেগ আমাদের প্রত্যাদেশলব্ধ জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান করে। পক্ষান্তরে, বৈপরীত্য বা আপাত বিরোধকে চূড়ান্ত সত্য বলে গ্রহণ করলে তা কেবল দুর্বলমনা মানুষের কাছেই আবেদন রাখবে। মুসলিম হচ্ছে যুক্তিবাদী, কেননা সে সত্যের দুটো উৎসের একত্বের উপর অর্থাৎ প্রত্যাদেশ ও যুক্তির উপর জোর দেয়।

তাওহীদের তৃতীয় মূল সূত্রটি হচ্ছে সত্যের একত্ব; অন্য কথায় নতুন অথবা বিরোধী সাক্ষ্যের প্রতি মুক্ত দৃষ্টি। এই সূত্রটি মুসলমানকে আক্ষরিকতা, অন্ধতা এবং স্থবিরতা আনয়নকারী রক্ষণশীলতা থেকে রক্ষা করে। এই সূত্রটি মুসলিমকে শেখায় বুদ্ধিবৃত্তিক নম্রতা, একজন মুসলিমকে তার স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির সঙ্গে 'আল্লাহ আলাম' (আল্লাহ ভাল জানেন) এ বাক্যাংশটি যোগ করতে তাকে বাধ্য করে, কারণ তার এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, সত্য মানুষ যে কোন সময়ে সম্পূর্ণভাবে যা আয়ত্ব করতে পারে তার থেকে অনেক বড়।[১১]

আল্লাহর পরম এককত্বের স্বীকৃতি হিসেবে তাওহীদ হচ্ছে সত্যের উৎসসমূহের একত্বের স্বীকৃতি। আল্লাহ হচ্ছেন প্রকৃতির স্রষ্টা– যেখান থেকে মানুষ অর্জন করে তার জ্ঞান।[১২] জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে প্রকৃতির ডিজাইন বা নক্সাসমূহ, আল্লাহর সৃষ্টি।[১৩] নিশ্চয়ই আল্লাহ এগুলোকে জানেন, কারণ তিনিই হচ্ছেন এসবের রচয়িতা এবং একইরূপ নিশ্চিতভাবে তিনিই হচ্ছেন প্রত্যাদেশের উৎস, তিনি মানুষকে তাঁর জ্ঞান থেকে দান করেন এবং তাঁর জ্ঞান হচ্ছে পরম এবং বিশ্বজনীন।[১৪] আল্লাহ প্রতারক নন, এমন কোন অমঙ্গলকারী পরশ্রীকাতর কেউ নন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভুল পথে

---

১১. আমার প্রতিপালকের জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে, তুমি কি তার আদেশাবলীকে গুরুত্ব দেবেনা (৬ : ৮০) আল্লাহই সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন– এবং সাত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তার আদেশ সমস্ত বিছুতে প্রসারিত, যাতে তুমি জানতে পার যে, তিনি সর্বময় ক্ষমতাশালী, এবং প্রত্যেকটি বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে জানেন (৬৫ : ১২), তোমার প্রতিপালক জানেন, সকলের থেকে ভাল জানেন, কে তার পথ থেকে বিচ্যুত এবং কে সৎপথে পরিচালিত (৬ : ১৭)।

১২. এই হচ্ছে আল্লাহর আয়াত বা নিদর্শনপূর্ণ হিসেবে প্রকৃতি বা পৃথিবী সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনার অর্থ। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই কুরআন একটি সিদ্ধান্তের প্রতি উল্লেখ করছে যা প্রত্যেকের কাছে স্পষ্ট, যার দেখবার মত মন আছে, সৃষ্টি এবং তার স্রষ্টার মধ্যে, যার অস্তিত্ব এবং নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়ার ইঙ্গিত দেয় প্রকৃতির দৃশ্য ও ঘটনাবলী।

১৩. পৃথিবী নিদর্শনে পূর্ণ, যা হচ্ছে আল্লাহর কাজের প্রমাণ সত্য সম্পর্কে, যারা বিশ্বাসী এগুলো তারাই উপলব্ধি করে (৫১ : ২০).... আল্লাহই তোমাদেরকে আলোর জন্য দিয়েছেন সূর্য্য ও চন্দ্র। তিনি তাদের কক্ষপথ স্থির করে দিয়েছেন যাতে তোমরা ঋতু এবং বর্ষ গণনা করতে পার। তিনি এসবই সৃষ্টি করেছেন যথার্থতঃ এবং যাদের দেখার মত মন আছে তাদের কাছে তিনি প্রমাণ স্পষ্ট করে তুলেন। দিন ও রাত্রির অনুবর্তনে, আসমানে এবং জমিনে যা কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাতে, তাদের জন্য রয়েছে প্রত্যক্ষ নিদর্শন, আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিদের জন্য (১০ : ৫-৬)।

১৪. আল্লাহ সমস্ত কিছু জানেন (৪ : ৩২)। ... আমার প্রতিপালকের জ্ঞান সমস্ত বেষ্টন করে আছে, তোমরা কি তার নির্দেশ মান্য করবেনা (৬ : ৮০) ... আল্লাহ আদমকে শিখিয়েছেন সকল নাম (সকল বস্তুর সারকথা) ২ : ৩১)। তিনি মানুষকে কলমের ব্যবহার শিখিয়েছেন, তিনি তাকে শিখিয়েছেন যা সে জানতোনা (৯৬ : ৪৫)। আল্লাহ তোমাকে শিখিয়েছেন কিতাব এবং প্রজ্ঞা, তিনি না শিখালে তোমরা কখনো তা জানতে পারতেনা (২ : ১৫১)।

www.icsbook.info

পরিচালিত করা। তিনি তার সিদ্ধান্তও পরিবর্তন করেন না যা মানুষ করে থাকে যখন তারা তাদের জ্ঞান, তাদের ইচ্ছা, তাদের সিদ্ধান্তের পরবর্তন করে। আল্লাহ হচ্ছেন সকল বিষয়ে পূর্ণ এবং সর্বাগ্র, তিনি কোন ভুল করেন না, যদি করতেন তিনি ইসলামের ইন্দ্রিয়াতীত আল্লাহ হতেন না।

৪. সহিষ্ণুতা

তাহীদ হচ্ছে এই স্বীকৃতি যে, কেবল আল্লাহই আল্লাহ। আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে, এর তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহ সকল সৎগুণ ও সকল মূল্যের পরম উৎস। তাই এই দাবীর মানেই হচ্ছে আল্লাহকে পরম সৎ বলে গণ্য করা, অর্থাৎ তিনিই হচ্ছেন সর্বোচ্চ মহত্ব। এ কারণে প্রত্যেক উত্তম জিনিসই উত্তম আল্লাহ তায়ালা ভালকে তার ভালত্ব, মূল্যকে তার মূল্যত্ব দান করেন। চূড়ান্ত মঙ্গল বা সৎ গুণের উৎসের সৎ গুরুত্ব কখনো সন্দেহের বিষয় হতে পারে না। মানুষকে সব সময়ই এই ধারণা পোষণ করতে হবে যে, আল্লাহ যা কিছু করেন, তা তিনি করেন একটি সৎ উদ্দেশ্যে, যে উদ্দেশ্য তার নিজের, এর বিপরীত মত পোষণ তাওহীদের অস্বীকৃতি। এ জন্য কুরআন মুসলমানদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে কোন খারাপ চিন্তা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এবং সেই সব লোকের নিন্দা করেছে, যারা আল্লাহ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে মন্দ ধারণা পোষণ করে।[১৫] আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যন্ত্রণা দিতে এবং বিপদগামী করতে সৃষ্টি করেননি, আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে যা বুঝি তা সত্য, যদি না আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো স্পষ্টতঃই বিকৃত ও রুগ্ন হয়। আমাদের কান্ডজ্ঞানের কাছে যা সঙ্গত মনে হয় তাই সঙ্গত, যদি না তা অন্যরকম প্রমাণিত হয়। একইভাবে আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি এবং বাসনা যা চায় তা মূলত ভাল, যদি না তা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রকাশ্যভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়ে থাকে। তাওহীদ জ্ঞানতাত্বিক সত্য এবং নৈতিক পর্যায়ে আশাবাদিতার বিধান দিয়ে থাকে। একেই আমরা সহিষ্ণুতা বলে থাকি।

জ্ঞানতাত্বিক একটি সূত্র হিসেবে আশাবাদ হচ্ছে বর্তমানকে স্বীকার করে নেওয়া, যতক্ষণ না তা মিথ্যা বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; একইভাবে একটি নৈতিক সূত্র হিসেবে এ হচ্ছে বাসনার স্বীকৃতি– যতক্ষণ না সেসবের অবাঞ্ছনীয়তা প্রমাণিত হয়েছে।[১৬] প্রথমটিকে বলা হয় 'সাহ' আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'ইউসর' (স্বস্তি, সহিষ্ণুতা)। এই দুই মিলে মুসলমানকে বিশ্বের প্রতি নিজের সব দরজা জানালা বন্ধ করে দেওয়ার স্থবিরতা আনয়নকারী রক্ষণশীলতা থেকে রক্ষা করে। উভয়েই তাকে তাগিদ দেয় জীবনকে

---

১৫. আল্লাহ নিশ্চয়ই যারা ভান করে, শরীক করে, এবং আল্লাহ সম্পর্কে মন্দভাবে, তারা পুরুষই হউক বা নারীই হউক, তাদেরকে শাস্তি দিবেন, তারা মন্দের চক্রের আবর্তন করে, তারা আল্লাহর ক্রোধভাজন এবং লানতের ভাগী হয়েছে, তাদের জন্য আল্লাহ তৈরী করেছেন নিকৃষ্টতম চিরন্তন আগুন (৪৮ : ৬)।

১৬. এই রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামী আইনবেত্তারা এ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, আইনের ভিত্তি হিসেবে "আল্লাহ যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন তা ছাড়া আর সমস্ত কিছুই সাধারণভাবে হালাল বা বৈধ।"

www.icsbook.info

স্বীকার করতে এবং জীবনকে, নতুন অভিজ্ঞতায় গ্রহণ করতে। উভয়ই তাকে উৎসাহিত করে তার তীক্ষ্ণ যুক্তি বিচার দিয়ে, তার সৃজনশীল প্রয়াস দিয়ে, নতুন নতুন তথ্যের মোকাবিলা করতে এবং তার দ্বারা তার অভিজ্ঞতা ও জীবনকে সমৃদ্ধ করতে, তার সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

তাহীদের কেন্দ্র মূলে নিহীত একটি পদ্ধতিগত সূত্র হিসেবে সহিষ্ণুতা হচ্ছে এই প্রত্যয় যে আল্লাহ, কোন জাতিরই, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং তারা তাঁর খেদমত করতে বাধ্য।[১৭] এ কথা শেখানোর জন্য এবং মন্দ ও তার কারণগুলো সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করার জন্য, তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন নবী প্রেরণ থেকে বঞ্চিত করেননি।[১৮] এই ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা হচ্ছে এই নিশ্চয়তা যা সকল মানুষকেই দেওয়া হয়েছে, একটি কান্ডজ্ঞান রূপে, যার দ্বারা সে সত্যিকার ধর্মকে জানতে পারে। আল্লাহর অভিপ্রায় এবং আদেশ-নিষেধ এই যে, ধর্মের বিভিন্নতার মূলে রয়েছে ইতিহাস, তার সকল সক্রিয় উপাদান ও উপকরণ নিয়ে, তার দেশ ও কালের বিচিত্র অবস্থা নিয়ে, এর প্রাক-সংস্কার, প্রকৃতি, উত্তেজনা ও কায়েমী স্বার্থ নিয়ে ধর্মের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আদদীনুল হানিফ (আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট আদি ধর্ম) যা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে সকল মানুষ, ইতিহাসের অগ্রগতির ধারায়, মানুষ কোন না কোন ধর্মের অনুসারী হয়ে ওঠার আগে।[১৯] ইতিহাসের অধ্যয়ন (বহুবচনে) হচ্ছে সহিষ্ণুতার এই দাবী যে, মুসলমান প্রয়াস পাবে, প্রথমে প্রত্যেকের ইতিহাসের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার আদি মৌলিক দান আবিষ্কার করতে।[২০] যে দান তিনি করেছিলেন তিনি সকল দেশে ও কালে, যে সব নবীকে তিনি পাঠিয়েছিলেন শিক্ষাদান করতে এবং এ আদি ধর্মের উপর জোর দিতে, অপর মানুষকে এর দিকে আকৃষ্ট করতে-ভদ্রতা, সৌজন্য এবং সুন্দর যুক্তি সহকারে– যা সবসময়ই অধিকতর ভাল ও শুদ্ধ।[২১]

---

১৭. আমি জ্বীন এবং মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি (৫১:৫৬)।

১৮. প্রত্যেক উম্মাতের কাছেই আমি একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদেরকে শিখাতে, আর কারো নয় কেবল আল্লাহর ইবাদত করতে এবং মন্দ পরিহার করতে; কতগুলো লোক আল্লাহ কর্তৃক সঠিকভাবে পরিচালিত হয়েছে, অন্যেরা ছিল ভ্রান্ত পথে পরিচালিত, তজ্জন্য তারা অর্জন করে মন্দ পরিণাম। পৃথিবী সফর কর এবং নিজের চোখে দেখ অবিশ্বাসীদের পরিণাম কি হয়েছে (১৬ : ৩৬)।

১৯. 'আমি একজন নবী প্রেরণ করেছি পরম ও সহিষ্ণু ধর্ম প্রচার করতে'। অতীত ধর্মগুলোর মধ্যে কোনটিকে আপনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন, এই প্রশ্নের জবাবে মহানবী (সা.) পরম ও সহিষ্ণু হানিফী ধর্ম বা ইব্রাহীমের ধর্ম, এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস (আল জুবাইদি) তাজুল আবূস s. v. Hanaf. vol 6 p.-78) : আল ইমাম মুসলিম সহীহ মুসলিম, সারমর্ম : আল-হাফিজ আল মুনজারি, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনা মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন আলবানী (কুয়েত আল দারুল কুবাইতিয়া লি-আল-তিবা) ১৩৮৮/১৯৬৯, দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ২৪৯, হাদিস নং ১৯৮২।

২০. তুমি একনিষ্ঠ হয়ে আদি ধর্মের মুখ ফিরাও, সেই সহজাত ধর্মের প্রতি যা আল্লাহ দান করেছেন সমস্ত মানুষকে, আল্লাহর সৃষ্টি অপরিবর্তনীয়, এই স্বভাবগত দান আল্লাহর সৃষ্টি সকলের জন্য বিশ্বজনীন এবং অলঙ্ঘনীয়, ইহাই সত্য এবং মহামূল্য ধর্ম কিন্তু বহু মানুষ তা জানেনা (৩০ : ৩০)।

২১. তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, প্রজ্ঞাপূর্ণ যুক্তি এবং সুন্দর ভাষণ দ্বারা, অন্যদের সঙ্গে সংলাপ কর এবং তাদেরকে দান কর মহত্বের দৃষ্টি, তোমার প্রতিপালক জানেন, কে সত্য পথ থেকে ভ্রষ্ট এবং কে সঠিকপথে পরিচালিত (১৬ : ১২৫)।

www.icsbook.info

ধর্মে বা মানবিক সম্পর্কে এর চেয়ে কিছুই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রবর্তী নয়, সহিষ্ণুতা বিরোধীকে বন্ধুতে রূপান্তরিত করে এবং বিভিন্নধর্মের মধ্যে পারস্পরিক নিন্দাবাদকে প্রশমিত করে, রূপান্তরিত করে ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে পারস্পরিক পান্ডিত্যপূর্ণ অনুসন্ধানে এবং ধর্মের বিকাশে আদি প্রত্যাদেশে যা প্রদত্ত হয়েছিল, তা থেকে ঐতিহাসিক ও সংযোজনকে আলাদা করতে। নীতিশাস্ত্রে এর পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র 'ইউসর' মুসলমানকে রক্ষা করে জীবন অস্বীকারকারী প্রবণতার বিরুদ্ধে এবং তাকে নিশ্চয়তা দেয় আশাবাদের ন্যূনতম মাত্রায়, মানবজীবনে যে সব ট্রাজেডি এবং দুঃখ কষ্ট ঘটে, তা সত্ত্বেও, স্বাস্থ্য, ভারসাম্য এবং একটি মাত্রাজ্ঞান রক্ষার জন্য যা আবশ্যক। আল্লাহ আমাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন, "কষ্টের পরই তোমাদের জন্য আমি স্বস্তির ব্যবস্থা করেছি"[২২] এবং তিনি আমাদেরকে যেহেতু আদেশ দিয়েছেন, প্রত্যেকটি দাবীকে পরীক্ষা করে দেখতে ও রায়দানের পূর্বে, যা কিছু সুস্পষ্ট ঐশী বিধানের বিরোধী নয়,[২৩] তাকে ভাল কিংবা মন্দ বলে অভিমত জ্ঞাপনের পূর্বে উসুনীয়ন বা ফকীহবিদগণের পরীক্ষার কষ্টি পাথরে যাচাই করতে।

২২. আল্লাহ তোমাদের জীবনের জন্য চান পরিপূর্ণ সুখ শান্তি, দুঃখ কষ্ট নয় (২ : ১৮৫)।

২৩. হে বিশ্বাসীগণ! যদি বিধর্মীগণ তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে, তোমরা তাদের ত্বরিত বিশ্বাস করনা, নিজেরা অনুসন্ধান করে দেখ, অন্যথায়, অন্যায়ভাবে তোমরা আঘ্রাসনের শিকার হবে এবং তোমরা তোমাদের কাজের জন্য অনুশোচনা করবে (৪৯ : ৬)।

www.icsbook.info

পঞ্চম অধ্যায়

অধিবিদ্যার মূলসূত্র

হিন্দু বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব প্রকৃতিকে একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বলে গণ্য করে, যা পরম ব্রাহ্মণের সম্পর্কে ঘটেছিল।[১] সৃষ্টি (অর্থাৎ প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি) হচ্ছে পরমের বস্তুরূপ যা ঘটা উচিত ছিল না, কারণ এ হচ্ছে পরম হিসেবে এর পূর্ণতার একটি অবনতি। একারণে প্রকৃতির প্রত্যেকটি বিষয়কে গণ্য করা হয় একটি বিচ্যুতি বলে, যা তার সৃষ্টরূপের মধ্যে বন্দী, যা মুক্তিকামীতার মূলে এবং ব্রাহ্মণ হিসেবে প্রত্যাবর্তনের জন্য, যতক্ষণ ইহা পৃথিবীতে একটি সৃষ্টি হিসেবে বিদ্যমান ততক্ষণ ইহা কর্মতন্ত্রের অধীন, যার মাধ্যমে ইহা উন্নতর অবস্থায় পৌঁছে অথবা আরো অধঃপতিত হয়। ইহা পরোৎকৃষ্টের তাত্ত্বিক বিচ্যুতি মাত্র, বিশ্বজগতের এই প্রথম মূলসূত্র তা স্বীকার করে বা মেনে নেয় প্রয়োজন অনুসারে। খ্রীষ্টীয় সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকৃতিকে আল্লাহর সৃষ্টি বলে গণ্য করে, যা এক সময়ে ত্রুটিমুক্ত ছিল, কিন্তু যা 'পতনের' পর বিকৃত হয়ে পড়েছে বেং সে কারণে মন্দ হয়ে উঠেছে।[২] সৃষ্টির তাত্ত্বিক, মৌলিক এবং সর্বব্যাপী পাপই আল্লাহর পরিকল্পিত পরিত্রাণ নাট্যের হেতু, ঈসার মধ্যে তাঁর নিজ অবতরণের, তার ক্রশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর এই নাট্যের অনুসরণে খ্রীষ্টান ধর্ম দাবী করে তত্ত্বগতভাবে সৃষ্টি তার পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেছে অথবা করেনি। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় মন সৃষ্টিকে অধঃপতিত এবং প্রকৃতিকে পাপ মনে করে এসেছে।[৩] বস্তুসত্তার প্রতি গ্নস্টিক আধ্যাত্মিকতাবাদের যে বিপুল বিদ্বেষভাব তা সংক্রমিত হয় খ্রীষ্টধর্মে এবং খ্রষ্টধর্মের প্রথম শত্রু রোমানরা যে প্রকৃতি এবং 'জগত' কে সর্বস্তরে এত লুব্ধভাবে অনুসরণ

---

১. সৃষ্টি, কিংবা হিন্দু চিন্তাবিদরা যেমন বলতে পছন্দ করেন ব্রাহ্মণ বা পরম সত্যের প্রকাশস্বরূপ বিশ্ব, শেষ পর্যন্ত সত্য নয় এবং সে কারণে তা পরমের একটা বিকৃতি, তার ইন্দ্রিয়াতীত, সম্পূর্ণতা থেকে একটা বিচ্যুতি এবং তজ্জন্য একটি দুর্ভাগ্যজনক ভ্রষ্টতা, একথা বিভিন্ন উপনিষদে সমর্পিত। এটি শ্বেতাবতর ৪: ৯-১০ একটি উত্তম অনুচ্ছেদ। একইভাবে শরীয়যুগ বর্ণিত হয়েছে সংকর (দৃষ্টান্তস্বরূপ আদ্যসভ্যাম্বে) এবং বাসালুম কর্তৃক এই ধারণায় যে এ বিশ্ব হচ্ছে আল্লাহর দেহ, যে দেহের অস্তিত্ব আত্মার সম্পর্কে (বৃহৎ অরণ্য ৩ : ৭, ৩) অন্যের উপর নির্ভরশীল অস্তিত্ব, আধুনিককালে ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে আরো অধিক সতর্কতার সঙ্গে, এস, রাধাকৃষ্ণন প্রমুখ চিন্তাবিদগণ দ্বারা, দ্র : Indian Philosophy (London Allen and Unwin 1951, 1923) Vol. 38-39 197 and M Hiriyanna. *Outlines of Indian Philosophy* (London Allen and Un Wn. 1961, 1932), ৬৩-৬৫

২. ঐ।

৩. পৃথিবীতে একজন মানুষের মাধ্যমে পাপ এসেছে এবং তার এই পাপের সঙ্গে নিয়ে এসেছে মৃত্যু। এর ফলে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে পাপ ছড়িয়ে পড়েছে, কারণ প্রত্যেকেই পাপ করেছে। ধর্মীয় বিধান জারী হবার পূর্বে পৃথিবীতে পাপ ছিল এবং যেখানে বিধান বা আইন নেই সেখানে পাপের কোন হিসাব রাখা হয়নি। কিন্তু আদমের সময় থেকে মুসার সময় পর্যন্ত, মৃত্যু রাজত্ব করেছে মানবজাতির উপর, এমনকি তাদের উপরেও যারা আদম যেভাবে পাপ করেছিলেন সেভাবে পাপ করেনি, যখন আদম আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিলেন (Romans 5. 12-14)

www.icsbook.info

করেছে, তার প্রতি ঘৃণা ও বিরোধকে করেছে দৃঢ়তর। প্রকৃতি তার বস্তুগত সম্ভাবনা ও প্রবণতা নিয়ে শয়তানের রাজ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তু পর্যায়ে এর গতি হচ্ছে 'অন্য জগত' থেকে জৈব এবং পাপের দিকে প্রত্যাবর্তন, সামাজিক ক্ষেত্রে এর প্রলোভন হচ্ছে রাজনীতির প্রতি, আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতি, সিজারের দিকে। খ্রীষ্টীয় সংজ্ঞা অনুসারে, ইতিহাসের গতিকে প্রকৃতির দিকে রূপান্তরের ইচ্ছা বা কর্মসূচি অর্থহীন।[৪] হাজার বছর বা তার বেশী কাল ধরে প্রকৃতিকে ঐশী করুণার বিপরীত গণ্য করা হয়েছে; উভয়কে মনে করা হতো একে অপরের থেকে পরস্পর স্বতন্ত্র। একের অনুসরণ অনিবার্যভাবেই অপরের লংঘন। প্রথমে ইসলামী চিন্তাধারার প্রভাবে এবং পরবর্তীকালে রেনেসাঁ বুদ্ধিবাদ ও Enlightenment এর প্রভাবে খ্রীষ্টানরা নিজেদেরকে উন্মুক্ত করে জীবনের জন্য এবং বিশ্বের স্বীকৃতির জন্য, অবশ্য বিশ্বের অস্বীকৃতি এবং নিন্দা কখনো উচ্ছিন্ন হয়নি, কেবল নির্বাক হয়েছে। অধিকতর সাম্প্রতিক কালে ফরাসী বিপ্লবের পর ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং রোমান্টিসিজমের (Romanticism) বিজয়ের ফলে, প্রকৃতি এবং বিশ্বের প্রতি খ্রীষ্টান মনোভাবকে দখল করে প্রকৃতিবাদ এবং কখনো কখনো এই দুইয়ের উপরই কর্তৃত্ব করতে শুরু করে।

ইসলামের প্রকৃতি হচ্ছে সৃষ্টি এবং দান, সে সৃষ্টি হিসেবে প্রকৃতি হচ্ছে উদ্দেশ্যময়, পরিকল্পিত সম্পূর্ণ এবং সুশৃংখল! দান হিসেবে এ হচ্ছে একটি নির্দোষ উপাদান যা মানুষের আয়ত্বে অর্পিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সৎকর্মে সামর্থ দান এবং কল্যাণ লাভ। প্রকৃতি সম্পর্কে ইসলামের সারমর্ম এবং বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শৃংখলা, উদ্দেশ্যময়তা এবং মঙ্গলময়তা, এই তিনটি সিদ্ধান্তে।

১. সুশৃংখল বিশ্বজগত

আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, এই সাক্ষ্যদানের মানে হচ্ছে এ ধারণা যে, তিনি একক স্রষ্টা, যিনি প্রত্যেকটি বস্তু ও বিষয়কে অস্তিত্ব দান করেছেন, যিনি প্রত্যেক ঘটনার চূড়ান্ত কারণ এবং যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তাদের সকলের চূড়ান্ত পরিণতি, তিনিই আদি, তিনিই অন্ত। স্বাধীনভাবে ও প্রত্যয়ের সঙ্গে এবং এর বক্তব্যকে সচেতনভাবে উপলব্ধির মাধ্যমে এই ধরনের সাক্ষ্যদানের অর্থ হচ্ছে এই উপলব্ধি, যা-কিছু আমাদেরকে বেষ্টন করে আছে তা বস্তুই হোক, বা ঘটনাই হোক, যা কিছু ঘটছে প্রাকৃতিক, সামাজিক অথবা মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রসমূহে সে সবই হচ্ছে সৃষ্টি পরিচালনার ক্ষমতার অভিব্যক্তি, পরাশক্তিগত সামর্থের প্রকাশ তাঁর কোন না কোন উদ্দেশ্যের পরিপূরণ। এ কথার অর্থ এ নয় যে, তিনি প্রত্যক্ষ এবং ব্যক্তিগতভাবে সবকিছুর

---

৪. এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হইওনা, অথবা তোমাদের দেহের আচ্ছাদনের কাপড়ের জন্য। সর্বোপরি জীবন কি খাদ্যের চেয়ে অধিক মূল্যবান নয় এবং শরীর কি পোশাকের চেয়ে অধিক মহর্ঘ নয়? বিহঙ্গদিগের দিকে তাকাও, ওরা বীজ বপন করেনা, ফসল তোলেনা, এবং তা ভান্ডারে সঞ্চয় করেনা। তবুও তোমাদের স্বর্গীয় পিতা, তাদের যত্ন নেন, তোমরা কি পাপীদের চেয়ে অধিকতর মূল্যবান নও? (ম্যাথু ৬ : ২৫-২৬)।

www.icsbook.info

কারণ, প্রত্যেক ঘটনার পশ্চাতে অব্যবহিত কর্তা, বরং তিনি হচ্ছেন চূড়ান্ত কর্তা, যিনি ঘটনাকে ঘটান অন্য কারক এবং কারণের মাধ্যমে। আমাদের অবশ্যই এই হিসাব করতে হবে যে, আমাদের কর্মকান্ডের নৈতিক মূল্য বা মূল্যহীনতার জন্য আমরা সম্পূর্ণভাবেই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। কিন্তু অন্তর্গত যে ক্ষমতা অস্তিত্ব এবং অনুস্তিত্বের মাঝে ছড়িয়ে আছে, সে ক্ষমতা কেবল আল্লাহরই আছে এবং তিনি তা ব্যবহার করতে পারেন। মানুষেরা স্রষ্টা নয়, তারা অস্তিত্ব দান করতে পারেনা কিংবা অস্তিত্ব কেড়ে নিতে পারেনা, যদিও তারা এই ধরনের অস্তিত্ব দান বা অস্তিত্ব কেড়ে নিতে পারে, মাধ্যম বা কারক হিসেবে। একবার করা হলে, এ ধরনের উপলব্ধি হয়ে উঠে মানুষের দ্বিতীয় স্বভাব, যা তার জাগ্রত প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, এমন একজন মানুষ তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই যাপন করে এর ছায়ায়, যেখানে মানুষ প্রত্যেকটি বিষয় এবং আল্লাহর কর্মীকে প্রত্যক্ষ করে। সেখানে সে ঐশী উদ্যোগকে অনুসরণ করে, কারণ এ কর্ম হচ্ছে আল্লাহর। প্রকৃতিতে তা প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে প্রকৃতি বিজ্ঞানের সাধনা, কারণ প্রকৃতিতে এই ঐশী উদ্যোগ বা প্রবর্তনা সেই সব অমোঘ নিয়ম ছাড়া কিছুই নয়, যা দিয়ে আল্লাহ প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছেন।[৫] নিজের মধ্যে বা নিজের সমাজে ঐশী উদ্যোগ বা প্রবর্তনাকে প্রত্যক্ষ করার মানে হচ্ছে, মানববিদ্যাসমূহ এবং সমাজকে অনুসরণ করা এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র বিশ্বই যদি হয় প্রকৃতির এই সব আইন বা বিধান পরিপূরণের উদঘাটন।[৬] যে সব আইন আসলে আল্লাহর আদেশ এবং তার ইচ্ছাস্বরূপ, তেমন অবস্থায় মুসলিমের দৃষ্টিতে, সমগ্র বিশ্বজগতই হচ্ছে একটি জীবন্ত রঙ্গমঞ্চ, যা সক্রিয় হয়েছে আল্লাহর আদেশ এবং কর্মের দ্বারা।[৭] এই সব অর্থে খোদ রঙ্গমঞ্চটিকে এবং যা কিছু এর অন্তর্গত সমস্ত কিছুকে ব্যাখ্যা করা যায়। তাই আল্লাহর একত্বের মানে হচ্ছে তিনিই হচ্ছেন সমস্ত কিছুর আদি হেতু এবং আর কেউ তা নয়, আল্লাহর ক্ষমতা অত দুরবর্তী নয় এবং তার নিমিত্ততা এত অপ্রত্যক্ষ নয় যে, তাকে এক ধরনের 'অবসরপ্রাপ্ত' খোদায় পরিণত করবে। এ ছিল সেই সব দার্শনিকের ভুল, যারা আল্লাহর নিমিত্ততাকে সৃষ্টির আদিতে বেঁধে দিয়ে, সৃষ্ট বিশ্বকে কল্পনা করেছে একটি দম দেওয়া যান্ত্রিক ঘড়ির মত, যা চালু রাখার জন্য ঘড়ি নির্মাতার প্রয়োজন

---

৫. যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী তাদের জন্য পৃথিবী নিদর্শনে পরিপূর্ণ (৫১ : ২০), আল্লাহই তোমাদেরকে চন্দ্র ও সূর্য দিয়েছেন আলোর জন্য। কে ওদেরকে তাদের কক্ষপথে চালিত করছেন যাতে করে তোমরা ঋতু এবং বছর গণনা করতে পার। তিনি এসমস্তই সত্যসহকারে সৃষ্টি করেছেন এবং জানবার জন্য যার মন আগ্রহী তার জন্য তিনি পরিস্কারভাবে পেশ করেন প্রমাণ, যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য দিবস এবং রাত্রির অনুবর্তনে এবং আসমান জমিনে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে (১০ : ৫-৬)।

৬. আমার বিধানে তোমরা কোন পরিবর্তন দেখতে পাবেনা (১৭ : ৭৭)। ... ইহাই সেই ঐশী বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণের জন্য যা তিনি প্রবর্তন করেছিলেন, ... আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত (৩৩ : ৩৮) আল্লাহর পন্থা বা বিধান অতীতে যা কিছু বর্তমানেও তাই, সৃষ্টিতে আল্লাহর সুন্নতে কোন পরিবর্তন দেখতে পাবেনা (৩৩ : ৬২)। ... তাঁর সুন্নাহ চিরকালই অলংঘনীয়, অপরিবর্তনীয় (৩৩ : ৩০)।

৭. ইসমাইল রাজী আল ফারুকী এবং এ. ও. নাসিফ, *Social and Natural Sciences* (London Hodder and Stoughton 198) : অধ্যায় : ১)।

www.icsbook.info

হয়না। 'মুতাকাল্লিমুনরা' এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং আমরাও তা প্রত্যাখ্যান করি। আমাদের আল্লাহ হচ্ছেন জীবন্ত সক্রিয় আল্লাহ্, যার কর্ম যা কিছু ঘটছে তার মধ্যেই বিদ্যমান, যদিও তা ঘটে এর জন্য যথাযথ কার্যকারণ ব্যবস্থার মাধ্যমে। আমাদের আল্লাহ প্রতিটি মুহূর্তে সর্বত্র বর্তমান এবং সর্বত্র সক্রিয়, কেবল তিনিই সকল ঘটনার একমাত্র চূড়ান্ত কর্তা, সকল অস্তিত্বের কারণ।[৮]

তাহলে, অপরিহার্যভাবেই তাওহীদের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল অন্য সকল শক্তির অস্বীকৃতি, কেননা, আল্লাহর শাশ্বত প্রবর্তনাই হচ্ছে প্রকৃতির আমোঘ বিধানসমূহ। একথা হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতিতে আর কোন শক্তির হস্তক্ষেপ এবং জাদু, মায়া, ভূত প্রেতের বিষয় অস্বীকার করার শামিল এবং কোন শক্তি কর্তৃক প্রকৃতির নিয়মে ইচ্ছামত বাধাদানের যে কোন রূপ নৈসর্গিক ধারণার উচ্ছেদ। তাই তাওহীদের মাধ্যমে প্রকৃতিকে মুক্ত করা হয়েছে আদিম ধর্মের দেবদেবী ও ভূত প্রেত থেকে সহজ বিশ্বাসপ্রবণ। এবং অজ্ঞমানুষের কুসংস্কার থেকে আশ-শাইখ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব যেমন স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন কিতাবুত তাওহীদে, প্রত্যেকটি কুসংস্কার, জাদু টোনা, বা ইন্দ্রজালের প্রত্যেকটি বিষয়, এর কর্তাকে অথবা এর ফায়দাভোগীকে জড়িত করে শিরকের সংগে। তাওহীদ, অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিকে এক ইন্দ্রিয়াতীত আল্লাহর অধীনে স্থাপন করার পরিণামে এই প্রথমবারের মত ধর্মীয় পুরাকথাভিত্তিক কাব্যিক মনের পক্ষে নিজের গন্ডী অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব হয়, সম্ভব হয় প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সভ্যতার পক্ষে একটি ধর্মীয় বিশ্বদৃষ্টির আনুকূল্যে বিকাশ লাভ, যে বিশ্বদৃষ্টি চূড়ান্তভাবে, প্রকৃতির সঙ্গে পূণ্যের যে কোন সম্পর্ককে অস্বীকার করে। তাই আবশ্যিকভাবে তাওহীদ বিজ্ঞানের জন্য অর্জন করে, যা তার জন্য বাঞ্ছনীয়, এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ সেই মত যার প্রভাবে প্রকৃতি বিজ্ঞান ক্রিয়াশীল হতে পারেনা এবং তাই হচ্ছে প্রকৃতির ধর্ম নিরপেক্ষতার সাধন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই পারিপার্শ্বিক শব্দগুলো প্রকৃতি থেকে বহু নৈসর্গিক কারণসমূহের, ভূত-প্রেত, দেও-দানবের অপসারণের অধিক কিছুই বুঝাতনা– কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা; এবং রহস্যবাদীরা ভ্রান্তভাবে যে ভূত-প্রেতকে আরোপ করতো প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতি। বিজ্ঞান প্রকৃতি থেকে আল্লাহকে দূর করানো আবশ্যক মনে করেনা, তবে যে সব ভূত-প্রেত খামখেয়ালীভাবে এবং নৈসর্গিক ক্রিয়া করে প্রকৃতিকে যে সব থেকে মুক্ত করতে চায়। পক্ষান্তরে, আল্লাহ কখনো খামখেয়ালীভাবে কাজ করেন না এবং তাঁর সুনান (আইন কানুন এবং নমুনাসমূহ) অপরিবর্তনীয়।[৯]

আল্লাহ প্রকৃতি বিজ্ঞানের শত্রু নন, বরং তার অপরিহার্য শর্ত; কেননা, একই কারণসমূহ সর্বদা একই ফল উৎপন্ন করবে, বিজ্ঞানী তা স্বীকার না করলে বিজ্ঞান

---

৮. তোমরা কি আল্লাহর শরীক স্থাপন করবে? তিনি কি আল্লাহ নন (একক) যিনি পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের বসতিস্থল এবং তার মধ্যে দিয়ে মন্দসমূহ প্রবাহিত করেছেন এবং উহার উপর সুন্দর পর্বতমালা স্থাপন করেছেন। কে দুই সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরাল? (২৭ : ৬১)।

৯. তুমি কখনো কোন পরিবর্তন পাবে না আল্লাহর সৃষ্টিতে তাঁর প্যাটার্ণ জ্ঞানে অপরিবর্তনীয় (৩৫ : ৫৪)।

www.icsbook.info

কার্যকর হতে পারেনা। আর এই স্বীকৃতি হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণের অর্থ। তাওহীদ কার্যকারণের সমস্ত সূত্রকে একত্র করে সেগুলো প্রত্যর্পণ করে আল্লাহতে এবং তা অতি-প্রাকৃত কোন শক্তির প্রতি আরোপ করেনা। তা করতে গিয়ে যে কোন ঘটনা বা বিষয়ে ক্রিয়াশীল কার্যকারণ শক্তিকে এমনভাবে বিন্যাস করে যাতে তা হয়ে উঠে একটি প্রবহমান নিরবচ্ছিন্ন সূত্র, যার অংশগুলো কার্যকারণ সূত্রে, এবং সে কারণে অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে পরস্পর সম্পৃক্ত সূত্রটিকে পরিণামে আল্লাহর দিকে নির্দেশিত। সত্যের দাবী এই যে, এর বহির্ভূত কোন শক্তি, কার্যকারণ শক্তির কার্যকারিতায় হস্ত ক্ষেপ করেনা। তারও প্রাক ধারণা এই যে, বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ হচ্ছে কার্যকারণ ঘটিত এবং তা প্রায়োগিক অনুসন্ধান এবং তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠার অধীন। প্রকৃতির আইনসমূহ হচ্ছে আল্লাহর অপরিবর্তনীয় নমুনা, যার অর্থ আল্লাহ প্রকৃতির কার্যকারণ সূত্রগুলোকে চালু রাখেন, তাঁর পরিকল্পিত কারণের মাধ্যমে। কেবলমাত্র অন্য একটি কারণ কর্তৃক সংগঠন (যা সবসময় একই) নির্মাণ করে এ নমুনা বা প্যাটার্ণ। এই সংগঠনের অপরিবর্তনীয়তা যথার্থ, এই অর্থে এর পরীক্ষা ও আবিষ্কারকে, এবং সে কারণে বিজ্ঞানকে, তা সম্ভব করে তোলে। প্রকৃতিকে এ ধরনের পুনঃপৌনিক সংগঠনের অনুসন্ধানই হচ্ছে বিজ্ঞান, আর কিছু নয়, কেননা কার্যকারণ সূত্র, যে সব কার্যকারণ ঘটিত সংযোগ দ্বারা নির্মিত, তাই পুনরাবৃত্ত হয় অন্যান্য সূত্রে। এগুলোর প্রতিষ্ঠা হচ্ছে প্রকৃতির আইনের প্রতিষ্ঠা। এ হচ্ছে প্রকৃতির কার্যকারণ শক্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণের অধীনে স্থাপনের পূর্বশর্ত। মানুষের প্রকৃতি Usufruct বা ব্যবহারের অপরিহার্য শর্ত, এবং সে কারণে সকল প্রযুক্তির পূর্বানুমান।

পশ্চিমা জগতের আধুনিক বিজ্ঞানীরা আল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বলা যায় প্রকৃতি থেকে তাঁকে নির্বাসন দিয়েছে। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি এবং প্রকৃতির জ্ঞানসহ সকল জ্ঞানের উপর, নিজের হুকুম জারী করেছে চার্চ, তথা ধর্মীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ঘৃণাবশে এ যখন তারা করতে পারল, কেবল তখনই তাদের মধ্যে প্রকৃতি বিজ্ঞানের লালন এবং সমৃদ্ধি সম্ভব হল। গীর্জা কর্তৃক এই কর্তৃত্বের কারণে এক হাজার বছর খ্রীষ্টান ধর্ম কোন বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে পারেনি। এর আপাত বিরোধী পদ্ধতি, মানুষরূপে স্রষ্টার আবির্ভাবতত্ব এবং এর কর্তৃত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ, যা প্রকৃতি বিজ্ঞানে বিভিন্ন প্রশ্নের উপর যেমন ইচ্ছা বক্তব্য রাখতো, এই সবই বৈজ্ঞানিক মনোভাবের গতিবিধিকে গলাটিপে হত্যা করে চার্চ কর্তৃপক্ষ উপকথা এবং কুসংস্কারের পৃষ্ঠাপোষকতা করতো। উপকথা ও কুসংস্কার পরিহার করা চার্চের কর্তৃত্বের জন্য বিপজ্জনক গণ্য হত, বিজ্ঞানীদের আগুনে পুড়িয়ে মেরে চার্চ তার নিজের ভিত্তিকে রক্ষা করার চেষ্টা করতো।

সে যাই হউক, বিজ্ঞানীরা ক্রমশ বিজয়ী হন এবং চার্চ পরাভূত হয়। এভাবে তারা সাফল্য অর্জন করে তা হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা বা লোকায়তকরণ। এই অর্থে, প্রকৃতি বিজ্ঞান থেকে চার্চের কর্তৃত্বের বিলুপ্তি ঘটলো। বিজ্ঞানীদের এই সাফল্য ছিল বৈধ এবং চূড়ান্তভাবেই মূল্যবান ও সার্বিক। তাই বিজ্ঞানের ক্রিয়া এবং বিকাশের জন্য ভূত, প্রেত থেকে (mana numens) এবং সর্ব প্রকার যাদুকরের উপাদান থেকে প্রকৃতির মুক্তি আবশ্যক। এই অর্থে প্রকৃতি কতগুলো প্যাটার্ণ মত অর্থাৎ একটি সৃশংখল

www.icsbook.info

পদ্ধতির মাধ্যমে কাজ করে। বিজ্ঞানের জন্য এই আবশ্যকতা সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য। এই ধারণাকে বাদ দিলে, অর্থাৎ প্রকৃতির ব্যবহার খামখেয়ালীপূর্ণ, অনিয়মিত এবং অঘটন, এই সম্ভাবনা বিশ্বাস করে, কোন বিজ্ঞানই সম্ভব নয়। বিজ্ঞান ঐ ধারণার উপর তার সমস্ত দাবী স্থাপন করে যে, যখনই একটি কারণ উপস্থাপিত হয়, তখনই এর ফল তার অনুবর্তি হবে, বিজ্ঞানী যা আবিষ্কার করেছেন তা প্রকৃতির একটি সত্যিকার আইনের অর্থ এই যে, কারণ একই হলে তার কার্যকর ফল অবশ্যই অনুরূপ হবে।

এই ধরনের শক্তির উৎস কোথায়? বিশেষ করে উনিশ শতকের কিছু পশ্চিমা বিজ্ঞানী এই দাবী করেছেন যে, 'প্রকৃতির বুনটের নমুনাটি প্রকৃতি থেকেই লাভ করা যায়' অর্থাৎ প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই নমুনা বা নক্সাটি প্রত্যক্ষ করা যায়। মুসলিম দার্শনিকেরা একই অবস্থার ওকালতি করেন হাজার বছর আগে এবং গাজ্জালী উভয়কেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন একই রকম দার্শনিক সূক্ষ্মতার সঙ্গে।[১০] তাঁদের দাবীর বিরুদ্ধে তিনি অভ্রান্তভাবে এই যুক্তি পেশ করেছেন যে, প্রদত্ত প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ থেকে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কেউ এ সিদ্ধান্তে আসতে পারে যে, 'ক' এর পর 'খ' আসে এবং 'ক' এর পরে 'খ' এসেছে বহুসংখ্যকবার, অতীত পরীক্ষণে বা পর্যবেক্ষণে। অবশ্য, 'ক' এর পরে 'খ' আসে এর সঙ্গে 'ক' কর্তৃক 'খ' সৃষ্টি হয়েছে বা 'ক' এর হেতু 'খ', বিজ্ঞানীদের এই দাবীর সম্পর্ক অতিশয় দূরদূরান্তের, অথবা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও অবান্তর যে 'ক' এর পরে সব সময় 'খ' আসবে, এ হচ্ছে অনিবার্য অবশ্যম্ভাবী বা আমোঘ সম্ভাব্যতা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগতভাবে অপরিহার্য। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন কারণ এবং তাদের অনুমতি ক্রিয়া বা ফলের মধ্যে এই কার্যকারণ সম্পর্ক এবং অপরিহার্য সম্ভাব্যতা বিদ্যমান বলে স্বীকার করে থাকেন। বিশ শতকের বিজ্ঞান দার্শনিকেরা বিজ্ঞানীদের এই প্রাক সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি উৎঘাটন করেছেন। পরিণামে বিজ্ঞানীরা এখন অনেক বেশী নত হয়েছেন এবং তাদের অনেকেই আবার প্রত্যাবর্তন করেছেন ধর্মে, আল্লাহতে; যেই তাদের প্রকৃতির শৃংখলায় বিশ্বাসের ভ্রান্তি প্রকাশিত হল আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ এবং হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা সূত্রের দ্বারা। আরোহী লম্ফ, তথা-চিন্তা ক্ষেত্রে উর্ধমুখী ঝাপের বিষয়ে প্রশ্ন, দর্শন সর্বাধিক উত্থাপন করেছে। এবং সন্দেহবাদী দার্শনিক জর্জ শান্তায়ন জগতের সৃষ্টির সৃশংখলার বিজ্ঞানীদের বিশ্বাসকে এক টুকরা 'জান্তব বিশ্বাস' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের এরূপ বিশ্বাসের প্রতি তাদের এই স্পষ্ট তাচ্ছিল্যের কারণ এই বাস্তবতা যে, প্রায়োগিক সত্যের দিক দিয়ে এর কোন ভিত্তি নেই। এভাবে, সামান্য পরিবর্তন করে শান্তায়না সেই একই সমালোচনার পুনরাবৃত্তি করেন, যা আল গাজ্জালী করেছিলেন হিঃ ষষ্ঠ/খৃঃ একাদশ শতকে দার্শনিক বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে। শান্তায়ন এই 'জান্তব বিশ্বাস' বাক্যাংশটি গ্রহণ করেন প্যাভলবের দৃষ্টান্ত থেকে, যার সদিচ্ছা উল্লেখ করেছে সবাই। দৃষ্টান্তটি হচ্ছে একটি কুকুরের, যাতে দেখানো হয়েছে ঘন্টার ধ্বনি শুনে, কুকুর তার

---

১০. আবু হামিদ আল গাজ্জালী : *তাহাফাতুল ফালাসিফা*, তরজমা, ছাবিহ আহমদ কামালি (Lahore. The Pakistan Phlosophical Congress 1958) pp 186 ff.

www.icsbook.info

খাদ্য পেতে এতটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল যে, কুকুরটি বিশ্বাস করতো এই ঘন্টাধ্বনি হচ্ছে তার খাদ্যের কারণ।[১১]

আমরা মুসলমানদের জন্য এই শৃংখলার হেতু হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। সুসংবদ্ধ সুশৃংখল জগত প্রকৃতই একটি সুশৃংখল বিশ্বজগত, নৈরাজ্য নয়, যথাযথ এই কারণে যে, আল্লাহ এর মধ্যে তার শাশ্বত নক্সা বা নমুনাগুলো প্রোথিত করেছেন। এই নতুনাগুলো জ্ঞেয় অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ ও বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে এগুলো আবিষ্কার করা যায়। এই পর্যবেক্ষণ এবং বুদ্ধি-প্রয়োগ এমন দু'টি বৃত্তি যার দ্বারা আল্লাহ মানুষকে ক্ষমতাবান করেছেন, যাতে করে তারা তাদের কার্যের দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য পূরণ করে। বিজ্ঞানের জন্য বাধা না হয়ে, ইসলাম, বিশেষ করে ইসলামের তাওহীদ, হচ্ছে বিজ্ঞানের পূর্বশর্ত। মুসলমান সন্দেহাতীতভাবে এই প্রত্যয়ের অধিকারী যে, আল্লাহ তায়ালা বিদ্যমান; তিনিই সমস্ত কিছুর চূড়ান্ত হেতু, একমাত্র কর্তা যাঁর কল্যাণময় কর্মের মাধ্যমে, যা কিছু আছে এবং যা কিছু ঘটে, সমস্ত কিছুই ঘটছে। এভাবে তাওহীদের মাধ্যমে প্রকৃতিকে যখন দেখা হয়, তখন তা হয়ে উঠে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য উপযোগী ও প্রস্তুত। মুসলিম বিজ্ঞানীর জন্য তথাকথিত প্রথম পদক্ষেপ, আসলে কোন পদক্ষেপই নয়, বরং তা নীতি ধর্মকে যুক্তিতত্ত্বের বা ethymematic syllogism- এরই অন্য একটি পদক্ষেপ যার শুরু তার প্রধান প্রস্তাবনা হিসেবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দিয়ে।

২. উদ্দেশ্যময় বিশ্ব

প্রকৃতির যে শৃংখলা, তা কেবল কার্য এবং কারণের বস্তুগত শৃংখলা নয়, যে শৃংখলা দেশ এবং কালকে এবং এধরনের অন্য সব তাত্ত্বিক ধারণাকে আমাদের বোধশক্তির কাছে স্পষ্ট করে তোলে। প্রকৃতি সমভাবেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের একটি রাজত্ব, যেখানে প্রত্যেকটি বিষয় একটি উদ্দেশ্য পূরণ করে এবং তাতে করে সমস্ত কিছুর সমৃদ্ধি এবং ভারসাম্যের সহায়তা করে। উপত্যকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড় উপলখণ্ড থেকে সমুদ্র সমতলের আনুবীক্ষণিক জীব এবং উদ্ভিদ, woodroach (কাঠপোকার)-এর অন্ত্রে microbial (ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু) সদৃশ flagellate (বীজানু) থেকে শুরু করে নীহারিকামন্ডল এবং তাদের সূর্যসমূহ, redwoods নামক আমেরিকান বিশাল বৃক্ষরাজি ও তিমি মাছ এবং হাতী-অস্তিত্বশীল প্রত্যেকটি বস্তু তার উদ্ভব ও বিকাশ, তার জন্ম ও মৃত্যুর দ্বারা, তার উপর অর্পিত আল্লাহ কর্তৃক দায়িত্ব পালন করে, যা অন্য সব অস্তিত্বের জন্যও আবশ্যক। সকল সৃষ্টি পরস্পর নির্ভরশীল এবং সমুদয় সৃষ্টি যে চালু আছে তার কারণ হচ্ছে তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিদ্যমান পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য। আল্লাহ কুরআনুল করিমে বলেনঃ "আমি প্রত্যেকটি বস্তুকে দিয়েছি তার জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রা বা পরিমাপ।"[১২]

---

১১. George Santayana. *Skepticisn and Animal Faith* (New York: Scribner's)

১২. সমস্ত কিছু আমি সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দিয়েছি তার পরিমাপ, তার চরিত্র এবং তার পরিণাম (৫৪ : ৪৯) ... আল্লাহ সমস্ত কিছুর হিসাব রাখেন (১৯ : ৯৪)। ... নিশ্চয়ই তার ইচ্ছা কার্যকর হবে, তিনি সমস্ত কিছুর জন্যই পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন (৬৫ : ৩)।

www.icsbook.info

এটাই হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য যা প্রকৃতির সাম্প্রতিক দূষণ আধুনিক কালের মানুষের চেতনায় সৃষ্টি করেছে ভয়ংকর আশংকার; যার সঙ্গে মুসলমানরা অবহিত ছিল বহু শতাব্দী ধরে, এবং নিজেদেরকে দেখেছে তার মধ্যেই দণ্ডায়মান, কারণ অন্য যে কোন সৃষ্টির মতই মানুষ একইরূপ, তারই অংশ।

সৃষ্টির প্রত্যেকটি উপাদান যে, আর একটি উপাদানকে ভক্ষণ করে, এবং নিজেও তৃতীয় আর একটি উপাদান দ্বারা ভক্ষিত হয়, তা নিশ্চয়ই লক্ষ্যের একটি সম্পর্ক বা সংযোগ, সম্ভবত যা উচ্চতর প্রাণীসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট। আলজি, মাইক্রব ও এনজাইমের অদৃশ্য জগতের উপর যোগসূত্রের কর্তৃত্ব পর্যবেক্ষণ করা, এর সর্বত্রগামিতা প্রতিষ্ঠিত ও অনুমান করা কঠিনতর কাজ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা কম বাস্তব নয়। এর চেয়েও কঠিনতর হচ্ছে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের খাদ্য গ্রহণের প্যাটার্ণ আবিস্কার। যে সকল জীবের আহার্য গ্রহণ ছাড়াও সকল কর্মকান্ডে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কতগুলো শৃংখল বিদ্যমান, তার সঙ্গে সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক, উপাদানসমূহের একের উপর অন্যের অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, সে জমিনে হউক, পানিতে হউক, বাতাসে হউক, বা মহাশূন্যের বিষয় বস্তুই হউক। প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জটিলতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনো একেবারে শৈশব স্তরে, যদিও প্রকৃতি-বিজ্ঞানসমূহ কল্পনার কাছে সমগ্রভাবে পূর্ণ সিষ্টেমটিকে নির্মাণ করার জন্য এর যথেষ্ট উদঘাটন করেছে একটি উদ্দেশ্যময় পদ্ধতি হিসেবে বিশ্ব আমাদের সামনে পেশ করে একটি অতিশয় মহৎ দৃশ্য। ম্যাক্রোকোজমের আকৃতি ও ব্যাপকতা, মাইক্রোকোজমের নাজুক সূক্ষ্মতা এবং তৎসহ ভারসাম্যের কলা কৌশলের অপরিসীম জটিল ও ত্রুটিমুক্ত প্রকৃতি আমাদেরকে অভিভূত করে দেয়, এবং আমরা তাতে চমৎকৃত হই। এ সবের সম্মুখে, কুরআন যেরূপ বলে, মানব মন আক্ষরিক অর্থেই 'নমিত' হয়, কিন্তু এ নতি স্বীকার হচ্ছে প্রেম ও প্রশংসার কারণে, উপলব্ধি এবং মূল্য চেতনার ফলে নতি স্বীকার,[১৩]. কারণ উদ্দেশ্যময় আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে পৃথিবী হচ্ছে সুন্দর এবং এর উদ্দেশ্যময়তার কারণে যথার্থ অর্থে মহৎ। কবি যখন উচ্চারণ করেন, 'কি বিস্ময়কর এই গোলাপ এর মধ্যেই দৃশ্যমান আল্লাহর সৌন্দর্যের দ্বারা মানুষ ও কীট-পোকার উদ্দেশ্য পূরণ করে, যে সব উদ্দেশ্য এর প্রতি আল্লাহ দান করেছেন, যাদের দেখার মত চক্ষু আছে, তাদের চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে তারা তাকে দেয় পূর্ণতা, যারা দেখতে পায় উদ্দেশ্যময় পরিকল্প ও স্রষ্টা আল্লাহর প্রোজ্জ্বল ক্ষমতা ও মহৎ কারুকার্য কুশলতা।

ক. ঐশী ক্ষেত্র হিসেবে প্রকৃতি

ইসলামী বিশ্বাসের পরাবিদ্যামূলক শাখা সম্পর্কে এই পর্যন্তই যথেষ্ট, অন্য শাখাটি হচ্ছে নীতিশাস্ত্রগত। ইসলাম শিক্ষা দেয় মানুষের জন্য একটা রঙ্গমঞ্চ হিসেবে

---

১৩. আল্লাহর সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য কর একবার, দুইবার, ততোধিক বার (কোন খুঁত বা ত্রুটি পাও কিনা) তুমি তা পাবেনা, তোমার ক্লান্ত দৃষ্টি তোমার দিকে ফিরে আসবে ব্যর্থ হয়ে, অবশ্য। (আল্লাহর সৃষ্টির পরিপূর্ণতা সম্পর্কে প্রত্যয় নিয়ে) ৬৭ : ৪)।

www.icsbook.info

প্রকৃতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ইহা এমন একটি ক্ষেত্র যে, এখানে জন্মগ্রহণ ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে হবে এবং মানুষ ভোগ করবে আল্লাহর রহমত ও এভাবেই সে নিজেকে প্রমাণ করবে যোগ্য বলে।[১৪] প্রথমতঃ প্রকৃতি মানুষের সম্পদ নয়, আল্লাহর সম্পদ।[১৫] এখানে আল্লাহই মানুষকে দিয়েছেন তার কর্মকাল এবং উদ্দেশ্য, তার জন্য বিধিমালাও প্রবর্তন করেছেন।[১৬] একজন উত্তম ভূমি-প্রজার মত মানুষের উচিত তার প্রভূর সম্পত্তির যত্ন নেওয়া। ব্যবহারের অধিকার মানুষের নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাও তাকে প্রকৃতিকে বিনষ্ট করার অথবা এমনভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা দেয়না, যাতে করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত বা বিনষ্ট হতে পারে। ব্যবহারের যে অধিকারের সে অধিকারী, তা একটি ব্যক্তিগত অধিকার। যা প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্মকালে আল্লাহ দান করেন। এই অধিকার বংশগত কিংবা অন্যের পরিবর্তে প্রাপ্ত নয়, এবং সে কারণে তা মানুষকে এই অধিকার, অন্যদের ব্যবহারের অধিকারের উপর অগ্রাধিকার বলে দখল করার ক্ষমতা দেয়না। পৃথিবীর এবং আসলে সৃষ্টির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে, মানুষ মৃত্যুকালে আল্লাহর কাছে তার আমানত, সে যেমনটি তার জন্মগ্রহণ কালে গ্রহণ করেছিল তার চেয়ে বেহতর অবস্থায় ফিরিয়ে দেবে, মানুষের কাছ থেকে তাই আশা করা হয়।

দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির শৃংখলা মানুষের এখতিয়ারের অধীন, সে এতে তার ইচ্ছামত পরিবর্তন আনতে পারে। প্রকৃতিকে নমনীয় করে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকৃতি তার প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে মানুষের হস্তক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম, তার কর্মের দ্বারা কার্যকারণ সম্পর্কে পার্শ্ব পরিবর্তন বরণ করে নিতে সমর্থ। প্রকৃতির কোন এলাকা বা অঞ্চলই নিষিদ্ধ নয়, অগণিত সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র, ভূমণ্ডল, পৃথিবী এবং সমুদ্র যা কিছু তারা ধারণ করে, তা সহ, সমস্তই তার অনুসন্ধানের, তার ব্যবহারের এখতিয়ারভূক্ত,

---

১৪. আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু এবং জীবন যাতে তোমরা তোমাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পার, তোমাদের কর্মে এবং তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল (৬৭ : ২) ... আমি এই পৃথিবীর উপরিভাগে পৃথিবীর জন্য অলংকার স্বরূপ করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের কর্মে তোমাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পার (১৮ : ৭)।

১৫. তাই প্রশংসা আল্লাহরই যার হস্তে রয়েছে সমস্ত কিছুর উপর প্রভূত্ব, তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে (৩৬ : ৮৩) ... তোমরা যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর, বল, হে আল্লাহ সমস্ত কর্তৃত্বের, ক্ষমতার ও সমস্ত কিছুর মালিক (৩ : ৩৬)।

১৬. তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতিত তোমাদের কোন ইলাহ নেই, তিনি তোমাদেরকে জমিন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাহাতে তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন। সুতরাং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার দিকে পূর্ণভাবে প্রত্যাবর্তন কর (১১ : ৬১)। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্ত করবেন, যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থাকে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তার পরিবর্তন করে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করবেনা, এবং ইহার পর যারা অস্বীকার করবে, তারা হবে দুস্কৃতিকারী (২৪ : ৫৫)।

www.icsbook.info

সবই তার উপকারিতা, আনন্দ, আরাম-আয়েশ অথবা তার ভাবনা-চিন্তনের জন্যই।[১৭] সমস্ত সৃষ্টি মানুষের জন্য এবং মানুষের ব্যবহারের অপেক্ষায় রয়েছে। এর ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে তার ইচ্ছার অধীন, তার বিচার বোধই হস্তক্ষেপের একমাত্র সার্থক হাতিয়ার, একমাত্র বিচারক।[১৮] কিন্তু কিছুই তাকে সমগ্র সৃষ্টির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়না।

তৃতীয়ত, প্রকৃতির ব্যবহার উপভোগ করতে গিয়ে মানুষকে বলা হয়েছে নৈতিকতার সঙ্গে কাজ করতে, কেননা চৌর্য ও প্রবঞ্চনা, জবরদস্তি ও একচেটিয়া কারবার, মজুদদারি এবং শোষণ, আত্মসর্বস্বতা ও অন্যের প্রয়োজন সম্পর্কে নিশ্চেতনা, আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের অনুপযুক্ত এবং সে কারণে ইহা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।[১৯] ইসলাম অপ ও অতিরিক্ত ব্যয় এবং অপচয়মূলক ও ভোগ বিলাসমূলক উপভোগ নিষিদ্ধ করে,[২০] এর কোনটির সঙ্গেই ইসলামী সংস্কৃতির সঙ্গতি নেই। দারিদ্র কিংবা অভাব নয়, বরং সন্তুষ্টিই হচ্ছে একজন মার্জিত-রুচিসম্পন্ন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য, যা সে দেখাতে পারে তার ব্যবহারে আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

চতুর্থত, মানুষের নিকট ইসলামের দাবী এই যে, সে প্রকৃতিতে আল্লাহর প্যাটার্ণগুলোর রূপরেখাগুলো অনুসন্ধান করবে এবং বুঝবে; কেবল যে সেই সব রূপরেখা যা নিয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞান গঠিত তাই নয়, বরং সেই সব রূপরেখাও যা নিয়ে গঠিত প্রকৃতির সাধারণ শৃংখলা এবং সৌন্দর্য। প্রকৃতি যে আল্লাহর কর্ম, তার পরিকল্পনা ও নক্সা, তার ইচ্ছার বাস্তবরূপ, এসত্য প্রকৃতির উপর ছড়ায় এক মর্যাদার উজ্জল বলয়। প্রকৃতির কিছুকেই অপব্যবহার করা চলবেনা তার উপর জোর জবরদস্তি বা জুলুম করা যাবে না, যদিও তা মানুষের ব্যবহারের অধীন; উদ্যান বা বনাঞ্চল হিসেবে নদী বা পর্বতরূপে প্রকৃতির প্রতি ইন্দ্রিয় সচেতনতা এবং তার প্রতি কোমল যত্ন আল্লাহর উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

---

১৭. এবং আমরা আকাশকে অলংকার করেছি। এবং তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি মানুষের উপভোগের জন্য (১৫ : ১৪) ... আমরা পৃথিবীতে সুন্দর প্রতিটি জিনিস জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি (২২ : ৫)। ... সৌন্দর্যের নিষিদ্ধকরণ ভুল, কারণ সৌন্দর্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তার দাসত্বের উপভোগের জন্য এবং সুস্বাদু খাদ্য এবং পরিচ্ছদের ব্যবস্থা তিনি করেছেন। বল (হে মোহাম্মদ) : এগুলো বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে তাদের উপভোগের জন্য (৭ : ৩২)। আরও দেখুন Supra. n. ৫।

১৮. আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন (৩১ : ২০) ... তিনি চন্দ্র এবং সূর্যকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন যারা নিদৃষ্ট কক্ষে বিচরণ করছে এবং দিবস এবং রজনীও (১৪ : ৩৩) ... আল্লাহই তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন (৩৫ : ৩৯) ... তোমরা কি দেখতে পাওনা, পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ সমস্ত কিছুকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন (২২ : ৬৫)।

১৯. এবং চোরদের, তারা পুরুষ হউক বা নারী হউক, তাদের হাত কেটে দাও, আল্লাহর আইন লংঘন করার অপরাধের শাস্তি হিসেবে (৫ : ৩৮) এবং আমরা মিসকিনদের আহার্য দান করতাম না (৭৪ : ৪৪) ... দুর্ভোগ তাদের যারা অপবাদ রটায় এবং অসাক্ষাতে পরনিন্দা করে, যারা ধন-সম্পদ জমা করে ও তা বারবার গণনা করে এবং মনে করে যে এ ধন তাকে অমরত্ব দান করবে (১০৪ : ১-৩) ... তুমি কি তার কথা বিবেচনা করেছ যে দ্বীনকে মিথ্যা বলে? বস্তুতঃ সেই ওই ব্যক্তি, যে এতিমকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং অভাবগ্রস্থকে অনুদানে উৎসাহিত করেনা (১০৭ : ১-৩)।

২০. ধন-সম্পদের অপব্যয় করোনা (১৭ : ২৬)। ... অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই, যার জন্য রয়েছে চিরকাল জাহান্নাম, আল্লাহ অবাধ্যতার কারণে (১৭ : ২৭) কৃপণ হয়োনা, কৃপণদিগকে আল্লাহ পছন্দ করেন না (৬ : ১৪১)।

www.icsbook.info

ষষ্ঠ অধ্যায়

নীতিশাস্ত্রের মৌলনীতি

তাওহীদ ঘোষণা করে যে, একক অনন্য আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত ও দাসত্ব করার জন্য।[১] আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং তার আদেশ পালন তাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। তাওহীদ এ ঘোষণাও করে যে, এই উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষে মানুষের প্রতিনিধিত্ব।[২] কারণ আল কুরআন বলেঃ আল্লাহ মানুষের নিকট তার আমানত রেখেছেন, যে আমানত বহন করবার ক্ষমতা আসমান এবং জমিনের ছিলনা এবং যে দায়িত্ব বহন করতে তারা ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে সরে দাঁড়িয়েছিল।[৩] আল্লাহর এই দায়িত্ব হচ্ছে ঐশী অভিপ্রায়ের নৈতিক দিকটির পরিপূরণ, যা স্বভাবতই, এ দাবী করে যে, তা স্বাধীনভাবে বাস্তবায়িত হবে এবং মানুষই হচ্ছে একমাত্র সত্ত্বা যে তা করতে সক্ষম। যখনই ঐশী অভিপ্রায় প্রাকৃতিক আইনের অনিবার্যতার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়, তখন সেই বাস্তবায়ন নৈতিক পদবাচ্য নয়, তা বুনিয়াদি অথবা হিতকথামূলক। কেবলমাত্র মানুষই ঐশী অভিপ্রায়কে কার্যকর করতে পারা বা না পারার দ্বিবিধ সম্ভাবনার মধ্যে, অথবা সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারে, কিংবা দুইয়ের মাঝখানে যে কোন কিছু করতে পারে। আল্লাহর আদেশের আনুগত্যের ক্ষেত্রে মানবিক স্বাধীনতার এই ব্যবহার, আদেশ পালনকে নৈতিকতামন্ডিত করে।

১. ইসলামের মানবিকতা

তাওহীদ আমাদেরকে বলে, আল্লাহ যেহেতু কল্যাণময় এবং উদ্দেশ্যময়, তাই তিনি মানুষকে খেলাচ্ছলে এবং অযথা সৃষ্টি করেননি।[৪] এই বৃহৎ কর্তব্য পালনের জন্য

---

১. আমি মানুষ এবং জ্বীনকে আমার বন্দেগী ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি (৫১ : ৫৬) ... আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম অবয়বে (৯৬ : ৪) ... আমি তার (মানুষের) সৃষ্টিতে পূর্ণতা দিয়েছি এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁকে রূহ দিয়েছি। আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন শ্রবণ শক্তি, তোমাদের দৃষ্টি শক্তি ও ভাল মন্দ বিচারবোধ, তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (৩২ : ৯)।

২. যখন তোমাদের প্রতিপালক ফেরেস্তাদের বললেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি এবং আমার প্রতিনিধি হিসেবে, পৃথিবীতে স্থাপন করতে যাচ্ছি। তারা বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে। আমরাইত তোমার প্রশংসা স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি; আল্লাহ বলেন, আমার একটি উদ্দেশ্য আছে, যা তোমরা জাননা (২ : ৩০)।

৩. আমি আমার আমানত আকাশমন্ডল, পৃথিবী ও পর্বতসমূহের উপর রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তারা এ বোঝার ভয়ে ভীত হলঃ অবশ্য মানুষ তা বহন করতে রাজী হল (৩৩ : ৭২)।

৪. মানুষ কি মনে করে আমি তার মৃত্যুর পরবর্তীতে তার হাড্ডিতে জীবন দান করতে সক্ষম নই (৭৫:৩)? ... সে কি মনে করে হিসাব না করেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে (৭৫: ৩৬)? হে মানুষ, তোমরা কি মনে কর আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি (২৩:১১৫)? ... না আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে, তা খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি (২১:১৬)।

www.icsbook.info

তাকে তৈরী করার লক্ষ্যে তিনি মানুষকে দিয়েছেন ইন্দ্রিয়সমূহ, যুক্তি এবং বোধশক্তি। তাকে করেছেন পূর্ণতার অধিকারী, বলতে কি, তার মধ্যে তিনি সঞ্চারিত করেছেন তাঁর রূহ।[৫] এই বৃহৎ কর্তব্যই হচ্ছে মানব সৃষ্টির কারণ। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের, মানুষের সংজ্ঞার এবং তার জীবনের তাৎপর্যের এই হচ্ছে পরম উদ্দেশ্য। এর বদৌলতে মানুষ এক বিপুল গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বজাগতিক কর্তব্যের অধিকারী হয়। মানুষের নৈতিক প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য যে ঐশী অভিপ্রায় তার মহত্বর অংশটিকে বাদ দিলে, কয়েনাত বা সৃষ্টি, আর সৃষ্টি থাকে না। এবং বিশ্ব সৃষ্টিতে এমন আর কোন সত্ত্বা নেই যা মানুষের পরিবর্তে দায়িত্ব পালন করতে পারে। মানুষকে যদি সৃষ্টির মুকুট বলা হয়, তা নিশ্চয়ই এই কারণেই অর্থাৎ মানুষই সৃষ্টির মধ্যে কেবল তার নৈতিক এবং সেকারণে, ঐশী অভিপ্রায়ের উন্নততর দিকটি প্রবেশ করে দেশকালের ক্ষেত্রে এবং তা হয়ে উঠে ইতিহাস।

আত্-তাকলিফ (দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা) কেবলমাত্র মানুষের উপরই যা অর্পিত, তা কোন সীমা পরিসীমা মানেনা, তার সম্ভাব্য ক্ষেত্র ও কর্মের রঙ্গমঞ্চে, ব্যাপকতম পরিসরে। সমগ্র বিশ্বজগত এর আওতার মধ্যে পড়ে। মানুষের নৈতিক কর্মের বিষয় হচ্ছে সমগ্র মানব জাতি। সমস্ত জমিন এবং আকাশ হচ্ছে তার রঙ্গমঞ্চ, তার কাঁচা সামগ্রী। বিশ্বজগতের দূরতম প্রান্তে যা কিছু ঘটছে, তার প্রত্যেকটির জন্য মানুষ দায়ী, কারণ মানুষের *তাকলিফ* হচ্ছে বিশ্বজনীন সমগ্র সৃষ্টিব্যাপী, কেবলমাত্র শেষ বিচার দিবসেই এর সমাপ্তি ঘটে।

আত্-তাকলিফ হচ্ছে মানুষের মানবিকতার ভিত্তি, এর তাৎপর্য এবং মৌলিক উপাদান, মানুষের এই বোঝা গ্রহণ, মানুষকে স্থাপন করে সৃষ্টিতে সকলের উপরে একটি উচ্চতর মর্যাদায়, এমনকি ফেরস্তাদেরও উপরে। কারণ মানুষই কেবল দায়িত্ব পালনে সমর্থ। এতে নিহিত রয়েছে মানুষের বিশ্বজাগতিক তাৎপর্য। ইসলামের এই মানবিতকা এবং অপরাপর মানবতার মধ্যে যে ব্যবধান, তা এক বিশ্বের ব্যবধান। দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রীক সভ্যতা এক মজবুত মানবতাবাদের বিকাশ সাধন করেছিল, যাকে পশ্চিমা জগত রেনেসাঁর সময় থেকে তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। প্রকৃতিবাদের জ্ঞান বিকাশের উপর স্থাপিত, গ্রীক মানবতাবাদ, মানুষকে এবং তার পাপরাশিকে দৈবসম্মত বলে গণ্য করে, মানুষের প্রতি দেবত্ব আরোপ করে, এবং তার পাপকর্মকেও। একারণে, গ্রীকগণ অপরাধবোধ করেনা, তাদের দেবতাগণকে প্রবঞ্চক এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী রূপে অথবা জিনা ব্যভিচারকারী রূপে চিত্রিত করতে, চুরি, নিষিদ্ধ রমণীগণ, আগ্রাসন, হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতিশোধ, ও অন্যান্য পাশবিক কাজকর্মে

---

৫. মানুষ কি মনে করে কেউই তার কার্য নিরীক্ষণ করবেনা? আমি কি তার জন্য চোখ সৃষ্টি করিনি (দেখার জন্য), তার জিহ্বা এবং ওষ্ঠ (কথা বলার জন্য)? আমি তাকে সৎপথ ও ভ্রান্তপথ প্রদর্শন করিনি (৯০:৭-১০)? ... এবং যখন আমি মানুষের সৃষ্টি সম্পূর্ণ করলাম তখন আমি তার মধ্যে ফুঁকে দিলাম আমার রূহ (১৫ : ২৯)।

www.icsbook.info

লিপ্ত দেখে। মানুষের জীবন, যেসব উপাদান দিয়ে তৈরী তার অংশ হওয়াতে এই সব কর্ম এবং রিপুর তাড়না একই রকম স্বাভাবিক গণ্য হত, পূর্ণতা এবং গুণাবলীর মত। প্রকৃতি হিসেবে উভয়কেই মনে করা হত, সমভাবে ঐশ্বরিক, তাদের নান্দনিকরূপে ধ্যানের এবং পুজার উপযুক্ত বস্তু এবং তাদের সমকক্ষ হবার জন্য মানুষের সাধনার বিষয়, যারা ছিল মানুষেরই দৈবরূপ।[৬] পক্ষান্তরে, খৃষ্টান ধর্ম তার প্রাথমিক বছরগুলোতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল এই গ্রীক রোমান মানবতাবাদের প্রতি; এর পরিণতি দাঁড়ালো চূড়ান্ত বিপরীতে, আদি পাপের মাধ্যমে মানুষের অধঃপতনে, এবং মানুষকে ঘোষণা করল পতিত বলে।[৭] মানুষকে পাপের চরম, বিশ্বজনীন, সহজাত, অনিবার্য স্তরে অধঃপাতিত করে, যে পাপ থেকে কোন মানুষের পক্ষে নিজের চেষ্টায় কখনো নিষ্কৃতি লাভ ছিল অসম্ভব। এই অবস্থান ছিল মহান আল্লাহর নিজে মানবরূপে জন্মগ্রহণ, মানুষের পাপ পরায়ণতার জন্য যন্ত্রণা ভোগ, ও তার পরিত্রাণের জন্য মৃত্যুবরণ, তারই যৌক্তিক পূর্বশর্ত। অন্য কথায় আল্লাহকে যদি মানুষের পরিত্রাণ করতে হয়, তাহলে এমন একটি বিপাক অবস্থা অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হবে, যা থেকে কেবল আল্লাহই মানুষকে নিস্কৃতি দিতে পারেন। এভাবে মানুষের পাপ পরায়ণতাকে তার চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত করা হয়েছিল, যাতে করে তা খোদার ক্রুশ বিদ্ধ হবার লায়েক হয়।[৮] হিন্দু ধর্ম মানুষকে বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত করে এবং মানবজাতির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের জন্য নির্ধারণ করে হীনতম শ্রেণীসমূহ- ভারতীয় হলে অস্পৃশ্য শ্রেণীতে অথবা পৃথিবীর অবশিষ্ট লোককে ধর্মের দিক দিয়ে অপবিত্র অথবা দুষিত ম্লেচ্ছ শ্রেণীতে। এ জীবনে নীচতম বর্ণসমূহের ও অন্যদের পক্ষে সুবিধাভোগী উচ্চতর ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে উন্নীত হবার সম্ভাবনা নেই। কেবলমাত্র মৃত্যুর পরই আবার পুনর্জন্মের মাধ্যমে এভাবে নিম্নশ্রেণী থেকে উচ্চতর শ্রেণীতে আরোহণ সম্ভব। এ জীবনে মানুষ অপরিহার্যভাবেই যে বর্ণে জন্মগ্রহণ করে সেই বর্ণেরই সে অন্ত

---

৬. Murray, *Five Stages.* পৃ: ৬৫-৬, ৭৩।

৭. দ্র: পূর্ববর্তী অধ্যায় : নোট-২১।

৮. তাদের শব্দগুলো মারাত্মক প্রতারণাপূর্ণ, তাদের কণ্ঠ থেকে জঘন্য মিথ্যা ছড়িয়ে পড়ে এবং সাপের বিষের মত তাদের ঠোঁট থেকে ছড়ায় বিপজ্জনক ভয়ভীতি (Romans 3:13) ... আল্লাহর করুণারূপ মুক্ত দানের মাধ্যমে হযরত ঈসার (আঃ) সাহায্যে আল্লাহর বরাবরে সবকিছুই ঠিক হয়ে যায়, কারণ ঈসা তাদেরকে মুক্তি দান করেন, আল্লাহ তাকে দান করেছিলেন, যাতে করে তাঁর আত্মা উৎসর্গের মাধ্যমে মৃত্যুর বদৌলতে তিনি হবেন উপায়, যার স্মরণে মানুষের পাপ মাফ করে দেওয়া হবে। হযরত ঈসাকে (আঃ) তাদের বিশ্বাসের হেতুতে। আল্লাহ তা করেছেন একথা দেখানোর জন্য যে, তিনি ন্যায়পরায়ণ। অতীতে ছিলেন সহিষ্ণু এবং মানুষের পাপ উপেক্ষা করতেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি তাদের পাপ নিয়ে বিচার করেন, তার ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শনের জন্য, এভাবে আল্লাহ দেখান যে, তিনি ন্যায়পরায়ণ এবং যারা হযরত ঈসাকে (আঃ) বিশ্বাস করে, তাদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করেন (Romans 3:24-26) ... মন্দ কর্ম বৃদ্ধির জন্য আইন প্রবর্তিত হয়, কিন্তু সেখানে পাপ বৃদ্ধি পায়, সেখানে আল্লাহর করুণা বৃদ্ধি পায় অনেক বেশী, যেন পাপ যেমন মৃত্যুতে রাজত্ব করেছিল, তেমনি আবার অনুগ্রহ ধার্মিকতার দ্বারা অনন্ত জীবনের নিমিত্ত আমাদের প্রভুর যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা রাজত্ব করে (Romans 5:20-21) ...

www.icsbook.info

ভুক্ত। যতদিন এ পৃথিবীতে সে জীবিত আছে ততদিন নিম্নবর্ণের মানুষের জন্য নৈতিক উন্নয়নের সাধনা অর্থহীন, নিস্ফল। পরিশেষে, বৌদ্ধধর্ম সকল মানব জীবনকে এবং সৃষ্টিতে অন্য সকলের জীবনকেই অনন্ত যন্ত্রণা এবং দুর্দশা বলে গণ্য করে। এর দাবী অনুসারে অস্তিত্বই একটা পাপ, এবং মানুষের একমাত্র অর্থপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে, নিয়মানুবর্তিতা এবং মানুষিক প্রয়াসের মাধ্যমে এ থেকে মুক্তি লাভ।[৯]

আত্-তাওহীদের মানবিকতা বা মানবতাবাদই একমাত্র নির্ভেজাল খাটি নীতিসূত্র। তাওহীদই কেবল মানুষকে সম্মান করে এবং সৃষ্টি হিসেবে ইজ্জত দেয়; দেবত্ব আরোপ না করে অথবা পাপ কুলষিত না করে তাওহীদই কেবল মানুষের সৎগুণাবলীর ভিত্তিতে মানুষের মূল্যের সংজ্ঞা দান করে এবং মানুষের মহৎ দায়িত্ব পালনে প্রস্তুতির জন্য তাকে যে সহজাত গুণাবলী আল্লাহ দান করেছেন, সে সবের ইতিবাচক লক্ষণের ভিত্তিতে মানুষের মূল্য নিরূপণের প্রয়াস পায়। তাওহীদই কেবল স্বাভাবিক জীবনের উপাদানগুলোর ভিত্তিতে মানবজীবনের গুণাবলী ও লক্ষ্যসমূহের সংজ্ঞা দান করে; এগুলোকে অস্বীকার না করে তাওহীদ তার মানবিকতাকে করে তোলে জীবনমুখী এবং নৈতিকতাময়।

ইসলামে নীতিশাস্ত্র ধর্ম থেকে অবিচ্ছেদ্য এবং তা সম্পূর্ণভাবে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী মন-মানসে, 'ধর্মীয়-ধর্ম নিরপেক্ষ', 'পবিত্র-অপবিত্র' 'গীর্জা-রাষ্ট্র' এ ধরনের বিপরীতের জোড়ার অবকাশ নেই, এবং ইসলামের ধর্মীয় ভাষা আরবীতে, তার শব্দ ভান্ডারে, এ ধরনের, কোন শব্দ নেই। তাই ইসলামী জ্ঞানের প্রথম মৌল সূত্রটিই হচ্ছে সত্যের একত্ব, ঠিক যেমন মানবজীবনের প্রথম দিক। এই তিনটি একত্বই একটি হচ্ছে পরম মৌলনীতি; ইসলামে আল্লাহর অস্তিত্ব কোন প্রশ্নের বিষয় ছিলনা। ইসলাম সঠিকভাবে এধারণা করেছে যে মানুষ অবশ্যই একটি ধর্মনিষ্ঠ সত্বা, এমন একটি জীব যার চেতনা সব সময়ই আবর্তিত হয়েছে আল্লাহর উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে। এর আল্লাহর একত্বের আহ্বান ছিল নতুন জিনিস। কারণ, অধিকাংশ মানুষ প্রায়ই উলুহিয়তের সঙ্গে অন্যান্য সত্বাকে, শক্তি ও মানুষের অভিপ্রায়কে মিশিয়ে ফেলেছে, এবং এককত্বকে নষ্ট করেছে। অবশ্য ইসলাম তার আবির্ভাবের পূর্বে মানবজাতি এবং মানুষের গোটা ইতিহাসকে সমূহ ক্ষতির ধারণা থেকে রক্ষা করার সতর্ক আগ্রহে, এই ঐশী একত্ব প্রথম মানুষ আদম এবং তার বংশধরগণের নিকট পরিজ্ঞাত ছিল বলে ঘোষণা করে এবং এর অনুপস্থিতিকে, যেখানেই আল্লাহর এককত্ব দৃশ্যমান ছিলনা, একটি মানবিক বিকৃতি ও ভ্রষ্টতা বলে চিহ্নিত করেছে।

মানবমনে এই একত্বের উপস্থিতি ইসলামের মতে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, ঈমান অথবা নিশ্চিত প্রত্যয়। প্রমাণ যেখানে চূড়ান্ত নয়, সেখানে মানুষ যে 'সিদ্ধান্ত' নেয়, তা তো 'বিশ্বাস স্থাপন' ঈমান বা ধর্মীয় অভিজ্ঞতা নয়। ইহা যেন মানুষের উপর এবং কোন

---

৯. রাধাকৃষ্ণশান *Indian Philosophy* পৃঃ ৪৪৩।

www.icsbook.info

বিষয়ে তার ধারণার উপর নির্ভরশীল নয় এবং যে বিষয়ে নিশ্চয়ই apodeictic-নিশ্চয়তা অসিদ্ধ বলে ঘোষিত সে বিষয়ে তা মুল্যায়নের উপরও তা নির্ভর করেনা, প্যাস্কেলের সূত্রানুযায়ী একটা বাজিও নয়। ইহা তার নিজস্ব সাক্ষ্য এবং সত্যের জোরেই এমনি অনিবার্য যে, মানুষকে অবশ্যই তা মেনে নিতে হবে, একটি জ্যামিতিক উপপাদ্যের সিদ্ধান্তের মতই। ইসলাম দাবী করে, ঐশী একত্বের উপলব্ধি, মানুষের জীবনে সেভাবেই ঘটে ঠিক যেভাবে একটি নিরেট তত্ত্ব প্রবেশ করে মানুষের চেতনায়। আল্লাহর এককত্বের সত্যতা যেমন যুক্তিসিদ্ধ, যেমন বিচারলব্ধ, তেমনি অনিবার্য। ঐশী এককত্বের মানে এই যে, আল্লাহই একমাত্র আল্লাহ, এবং সৃষ্টিতে কোন কিছুই কোন দিক দিয়েই তাঁর মত নয়। সে কারণে কোন কিছুকেই তার শরীক করা যায়না। তিনি, যা কিছু আছে, সমস্তেরই স্রষ্টা, প্রভু এবং মালিক, প্রতিপালক এবং রিযিকদাতা, বিচারক এবং কর্মবিধায়ক। প্রকৃতিতে তাঁর অভিপ্রায়ই হচ্ছে নিয়ম, আইন এবং মানুষের আচরণে তাঁর অভিপ্রায় হচ্ছে চরম লক্ষ্য। ইহাই মানবজীবনের চূড়ান্ত অভীষ্ট।

মানুষের পক্ষে এহেন চৈতন্য একই সঙ্গে তার পক্ষে এবং তার চতুস্পার্শ্বের পৃথিবীর জন্য মোহনীয়; মানুষকে তা গ্রাস করে, যেহেতু এর লক্ষ্য হচ্ছে tremendum এবং fascinosum. এই চৈতন্যের দ্বারা বেষ্টিত হবার মানেই হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে ব্যক্তিগত গোপন দিকও বাদ না দিয়ে, সর্বদর্শী আল্লাহর দৃষ্টিসীমার মধ্যে তাঁর ঐশী অভিপ্রায়ের চূড়ান্ত প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যের আলোকে, পরম ইনসাফের তৌলদন্ডে আসন্ন বিচারের ছায়াতলে নিজের সমগ্র জীবনযাপন করা। এর চেয়ে অধিকতর সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বআরোপিত নিয়মানুবর্তিতা, অধিকতর কার্যকর আত্মপ্রণোদনা আর কিছু নেই। আল্লাহর এককত্বের চৈতন্যের এই পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীতে সমস্ত কিছুই সৃষ্টি হয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে। এবং দেশকালের প্রতিটি মুহূর্তে এই লক্ষ্যকে সংরক্ষণ করছেন, এই লক্ষ্যের স্রষ্টা নিজেই; প্রকৃতির কোন আইনই যান্ত্রিকভাবে সক্রিয় নয়–কারণ এর অনিবার্যতার মূলে অন্ধনিয়তির বা দম দেওয়া ঘড়ির মত সৃষ্টজগত নয়, বরং তার মূলে রয়েছেন কল্যাণময় আল্লাহ তায়ালা, যাঁর ইচ্ছাই হচ্ছে মানুষের জন্য রঙ্গমঞ্চ এবং উপকরণাদি সরবরাহ করা, যেখানে মানুষের কর্ম অস্তিত্বের স্বরূপের দিক দিয়ে কার্যকর। একারণে প্রকৃতি ও মানব বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিজ্ঞানের সমস্ত দরজা উন্মুক্ত রয়েছে সম্ভাব্য চূড়ান্ত চুলচেরা প্রায়োগিক অনুসন্ধানের জন্য, নান্দনিক মূল্যে ও নৈতিকজগত থেকে কিছুমাত্র বিচ্ছিন্ন বা সম্পর্কহীন না হয়ে। এখানে সত্য এবং মূল্য সমন্বিত হয়েছে একটি মাত্র উপাত্তের মধ্যে, যার উৎস হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, যা তাঁর অভিপ্রায়কে করছে পূরণ। এই দৃষ্টির আলোকে পৃথিবী হচ্ছে প্রাণ-উদ্দীপিত, কারণ এর প্রতিটি অণু পরমাণু সক্রিয় রয়েছে আল্লাহর ইচ্ছানুক্রমে, আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার মাধ্যমে, একটি মূল্যের লক্ষ্যে, যা হচ্ছে ঐশী অভিপ্রায়।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে শরীয়ার মর্মকথা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সারমর্ম। মুসলমানরা একেই নাম দিয়েছেন তাওহীদ যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সত্য এবং জীবনের তিনটি

www.icsbook.info

একত্ব। মুসলমানদের সত্যের প্রতিফলন, তাদের সমষ্টিমন এবং কর্ম ও আশার মূলে রয়েছে এই ঐক্য। মানুষের কী করা উচিৎ এই প্রশ্নের উত্তর কেবল এর আলোকেই দেয়া যেতে পারে।

২. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

তাই ইসলামী নীতিশাস্ত্রের শুরু হচ্ছে মানুষের মধ্যে আল্লাহর ঐশী উদ্দেশ্য চিহ্নিতকরণ করে নিয়ে জীবনে এবং ইতিহাসে মানুষের নিরবচ্ছিন্ন প্রতিপালন। তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? যুগপত ধর্মীয় এবং প্রাচীন সেমিটিক পরিভাষা ব্যবহার করে ইসলাম বলে যে, আল্লাহর দাসত্ব করার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কুরআন বলে, "আমি মানুষ এবং জ্বীনকে আমার বন্দেগী ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।[১০] দার্শনিক পরিভাষায়, একথা বলার মানে হচ্ছে মানষের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই পরম লক্ষ্যের বাস্তবায়ন। স্পষ্টতঃই এখানে মানব জীবনের উদ্দেশ্যময়তার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যময়তাকে অস্বীকার করলে তা হয়ে উঠে জীবনের অর্থহীনতার হতাশাবাদী ঘোষণা। জীবনের মানে বীরত্ব, দরবেশত্ব, কিংবা পৃথিবীকে হলুদ রঙ্গে রঞ্জিত করা কিনা, তা অন্য বিষয়; আসলে মানব জীবনের অর্থপূর্ণ বা কল্যাণময় এই প্রথম দাবীর ইতিবাচক উত্তর মেনে না নিয়ে, এই প্রশ্নটি উত্থাপন করা যায়না। এই অর্থ কিংবা কল্যাণ, যা সকল সৃষ্টিরই উদ্দেশ্য, ইসলামের মতে তা হচ্ছে ঐশী অভিপ্রায়েরই পরিপূরণ। অথচ এই পরিপূরণ সহজাতভাবে ঘটে শারীরবৃত্তিক বা মনোবৃত্তিক ক্রিয়ায় এবং স্বাধীনভাবে তা ঘটে নৈতিকতার পরিমণ্ডলে। নৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে নৈতিক মূল্যাবোধের বাস্তবায়ন ঘটে এবং এগুলো হচ্ছে সেই রাজ্যের উচ্চতর অধিকারী, ঐশী অভিপ্রায়ের মহত্বর অনুজ্ঞা। ঐশী অভিপ্রায়ের মধ্যে নিম্নতর স্তরের আবশ্যকসমূহ রয়েছে, যেমন খাদ্য, বৃদ্ধি, আশ্রয়, আরাম-আয়েশ, যৌন জীবন ইত্যাদি। কেননা সৃষ্টিতে প্রত্যেকটি বিষয়ই ঐশী উদ্দেশ্যময়তার সঙ্গে সংযুক্ত এবং যথাযথ শ্রেণী অবস্থানের মধ্যে সেগুলো পূরণ করতে গিয়ে মানুষ ঐশী অভিপ্রায়কে পরিপূরণ করে। কিন্তু তার পেশার ক্ষেত্র বা আঙ্গিনা হচ্ছে নীতিরজগত, যেখানে ঐশী অভিপ্রায় কেবল স্বাধীনভাবেই কার্যকর হতে পারে, অর্থাৎ মানুষের যা করা উচিত তা থেকে ভিন্ন করার মানুষের সামর্থ্যের বাস্তব সম্ভাবনার মধ্যে তা ঘটে থাকে। এই অর্থেই মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা, কেননা কেবল সে-ই নীতিগত এবং সে কারণে উচ্চতর মূল্যসমূহ বাস্তবায়িত করতে পারে এবং কেবল সে-ই পারে সামগ্রিকভাবে গোটা ক্ষেত্রটিকে বাস্তবায়নের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে। এজন্য মানুষ হচ্ছে এক ধরনের মহাজাগতিক যোগসূত্র বা সেতু, যার মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে ঐশী অভিপ্রায় এবং বিশেষ করে, তার উচ্চতর নীতিগত অংশটি প্রবেশ করতে পারে দেশ কালের ভেতরে, এবং এভাবে, তা হয়ে উঠে বাস্তব।

---

১০. আমি মানুষ ও জ্বীনকে আমার দাসত্ব ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি (৫১ : ৫৬)

www.icsbook.info

কুরআনের একটি অনুচ্ছেদে আল্লাহ বলেন যে, তিনি তাঁর আমানত আসমান এবং জমিনকে অর্পণ করেছিলেন, কিন্তু তারা ভীত হয়ে তা গ্রহণে তাদের অক্ষমতা জানায় এবং কেবল মানুষই তা সাগ্রহে গ্রহণ করে।[১১] অন্য একটি অনুচ্ছেদে কুরআন আমাদের একথা বলে যে, ফেরেস্তারা আল্লাহর মানব সৃষ্টির পরিকল্পনায় বাধা দিয়েছিল, যেহেতু তারা জানতো যে মানুষ মন্দকর্ম করতেও সমভাবে সমর্থ যা ফেরেস্তারা পারেনা। অবশ্য আল্লাহ তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন, মানুষের জন্য নির্ধারিত করেন এক মহত্তর সৌভাগ্য।[১২] মহাজাগতিক ব্যবস্থায় বা শৃংখলায় মানুষের মন্দকর্ম করার সামর্থ্য আসলেই একটি ঝুঁকি। কিন্তু এ ঝুঁকিটি সেই মহা প্রতিশ্রুতির সঙ্গে অনুপমেয় যা মানুষ প্রমাণ করতে পারে স্বাধীনভাবে। কুরআন যা বলতে চায় তা এই যে, কেবল মানুষই নৈতিক মূল্য রূপায়ণ করতে পারে। কারণ এর জন্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা কেবল তারই আছে। কেবল মানুষই পারে মূল্যের সমগ্র জগতকে অনুসরণ করতে, কারণ এধরনের অনুবৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় মানসিকতা ও ধারণা শক্তি তারই আছে। মানুষকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তাকে দান করেন তার প্রজ্ঞা, ফেরেস্তাদের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন এবং তাদেরকে আদেশ দেন, মানুষের সম্মানে, মানুষকে সিজদা করতে।[১৩] তাই, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, ইসলামে মানুষকে সৃষ্টির মুকুট বলে গণ্য করা হয়; ফেরেস্তাদের চেয়ে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয় তার অনুপম নৈতিক বৃত্তি ও ভাগ্যের কারণে।

৩. মানুষের অপাপবিদ্ধতা

ইসলাম দাবী করে যে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে নিষ্পাপরূপে এবং বলা যায়, জীবন নাট্যমঞ্চে তার অভিনয় তার জন্মের পরে, জন্মের পূর্বে নয়। তার পিতামাতা যেই হউক, তার মামা, চাচা বা পূর্ব পুরুষ যারাই হউক, তার ভাইবোন যেই হউক, তার প্রতিবেশী বা সমাজ যা-ই হউক, মানুষের জন্ম নিষ্পাপ হিসেবে। এতে অস্বীকার করা হয় মানুষের আদি পাপকে, তার জন্মগত অপরাধকে, অন্যের দায়িত্ব বহনকে, তার জন্মের পূর্বে অতীতের ঘটনায় মানুষের গোত্রগত বা আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্টতা থেকে।[১৪]

---

১১. আমি আমার আমানত রাখতে চেয়েছিলাম, নভোমন্ডল, পৃথিবী ও পর্বতমালার উপর, কিন্তু ওরা তা বহন করতে অস্বীকার করে এবং এই দায়িত্ব গ্রহণে ভীত ছিল। যাই হউক, মানুষ তা গ্রহণ করল (৩৩ : ৭২)।

১২. আল্লাহ, যখন ফেরেস্তাদের বললেন, "আমি মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি এবং আমার প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে স্থাপন করতে যাচ্ছি", তারা বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে, আমরাইত তোমার প্রশংসা স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি; আল্লাহ বলেন, আমার একটি উদ্দেশ্য আছে, যা তোমরা জাননা (২:৩০)।

১৩. আল্লাহ আদমকে সমস্ত কিছুর নাম শিখালেন (২:৩১) ফেরেস্তাদের বললাম, আদমের প্রতি নত হতে, তারা সকলেই নত হল ইবলিস ছাড়া, সে অমান্য করল ও অহংকার করল, সুতরাং সে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল (২: ৩৪)।

১৪. কোন মানুষই অপরাধের জন্য দায়ী নয়....। প্রত্যেক মানুষের জন্য রয়েছে, সে যা করেছে তার ভাল মন্দ কর্মই (৫৩:৩৮-৩৯)। আল্লাহ মানুষকে তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করেনা। সে ভাল যা উপার্জন করে, তা তারই এবং মন্দ যা উপার্জন করে, তাও তারই (২:২৮৬)

www.icsbook.info

প্রত্যেক মানুষেরই জন্ম নিষ্পাপরূপে, এ হচ্ছে ইসলামের দাবী এবং এ দাবীর ভিত্তি হচ্ছে মানুষের নিরংকুশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিস্বাধীনতা।[১৫] কুরআন ঘোষণা করে, "কোন মানুষই তার নিজের বোঝা ছাড়া অন্যের বোঝা বহন করবেনা।"[১৬] মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যা অর্জন করেছে তা ভাল হউক, মন্দ হউক তা তারই প্রাপ্য,[১৭] কেউই অন্যের কর্মের জন্য বিচারের সম্মুখীন হবেনা এবং কেউই অন্যের পক্ষে সুপারিশ করতে পারবেনা।[১৮] ইসলাম সম্পূর্ণভাবে মানুষের নিজের কর্মের অর্থেই মানুষের কর্তব্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করে, এবং কর্মকে এই বলে সংজ্ঞায়িত করে যে, মানুষ, সুস্থ বয়স্ক মানুষ, কর্মে অংশ গ্রহণ করে, তার শরীর দিয়ে সচেতনভাবে এবং স্বেচ্ছায়, যাতে করে সে দেশ কালের প্রবাহের মধ্যে সৃষ্টি করে কিছুটা বিঘ্ন বা বিশৃংখলা, এই অপরাধ এবং দায়িত্বশীলতা যে নীতিমূলক ক্যাটেগরী এবং যা কেবল তখনই ঘটে যখন স্বাধীন ও সচেতনভাবে কর্মটি সম্পন্ন হয়-এ হচ্ছে নৈতিক চৈতন্যের একটি কঠিন নিরেট তথ্য।

কিছু সংখ্যক আধুনিক খৃষ্টান লেখক প্রাচীন আদি পাপের মতবাদটিকে একটি নতুন বর্ণনার ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁরা দাবী করেন, এই ভিত্তিটি পাওয়া গেছে জীববিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীর আবিষ্কার থেকে এবং তাদের দ্বারা মানব প্রকৃতির বিশ্লেষণ থেকে। তাঁদের জীবনধারণ ও বেঁচে থাকার ইচ্ছা, সহজাতবৃত্তিগুলোর চাহিদা পূরন আনন্দ ও আরাম-আয়েসের বাসনা, মানুষের লাভের ইচ্ছা, তার আত্মপ্রচারের লোভ, এমনকি তার অসম্পূর্ণতার অনস্বীকার্যতা এবং আল্লাহ থেকে তার স্বাতন্ত্র্য, সম্ভবত এ সব কিছুই তাদের মতে, মানুষের আদি পাপের

---

১৫. আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি (হে মোহাম্মদ) কিতাব সত্যসহকারে। অতঃপর যে সৎপথ অনুসরণ করে, সে তা করে নিজের কল্যাণের জন্য এবং যে বিপদগামী হয়, সে তো বিপদগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য, বল (হে মোহাম্মদ) আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্য) এসেছে এবং সুস্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক, যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক (১৮:২৯)।

১৬. প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কাহারও ভার বহন করবেনা (৬:১৬৪) উহা এজন্য যে একে অপরের কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবেনা। এবং মানুষ তাই পায়, যা সে করে। তার কর্ম পরীক্ষিত হবে (৫৩:৩৯)। যারা সৎ পথ অবলম্বন করে, তারাও নিজেদের জন্য সৎপথ অবলম্বন করে থাকে এবং যারা পথ ভ্রষ্ট হয় তারা তো পথভ্রষ্ট হয় নিজেদের ধ্বংসের জন্য। কেউ অন্য কাহারও ভার বহন করবেনা। আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেইনা (১৭:১৫)।

১৭. যে কেউ সৎকর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং মন্দ কর্ম করলে তার প্রতিফল সে নিজেই ভোগ করবে, তোমার প্রতিপালন তার বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করেন না (৩:৪৬)।

১৮. বল আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে না এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না (৩৪:২৫)। বিচার দিবসে কোনো মানুষই অন্য মানুষের কাজে আসবে না, ভাল কিংবা মন্দ, যারা অন্যায় করেছিল তারা নিক্ষিপ্ত হবে অগ্নিতে, যা তারা বিশ্বাস করতো না (৩৪:৪২)।

www.icsbook.info

কতগুলো কেন্দ্রীয় উপাদান এবং এই সমুদয়কে তারা সমুদয় প্রাকৃতিক ও মনোজাগতিক প্রবণতার আত্মকেন্দ্রিক নির্দেশনা বলে সংজ্ঞায়িত করে থাকেন।[১৯]

নিশ্চয়ই, জৈব বিজ্ঞানী, শারীর বিজ্ঞানী, রোগবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং সবক'টি বিজ্ঞান মানুষের মধ্যে যা কিছু অধ্যয়ন করে, মানুষ সে সকল নিয়েই গঠিত এবং তাদের অনুশীলনের বিষয়কে নিশ্চয়ই জন্মের পূর্বে নির্ধারিত অন্য একটি 'কঠিন তথ্য দেওয়া হয়।' কিন্তু এসমস্তই, শারীরিক কিংবা মানসিক হউক, এগুলো প্রাকৃতিক এবং অনিবার্য। মানুষ তার ইচ্ছামত এগুলো অর্জন করেনা, শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তি উভয়েরই সামর্থ্য শারীরিক কাঠামোর দ্বারা পুনঃ নির্ধারিত বা একজন পাহাড়ে আরোহণ করতে পারেনা, অন্যজন হস্তী বহন করতে পারেনা, কিন্তু তাদের পর্বত আরোহণে ব্যর্থতা অথবা হস্তী বহনে অসামর্থ্যের জন্য তাদের 'অপরাধী' গণ্য করণ হবে অযৌক্তিক। কুরআন ঘোষণা করেছে, মানুষ যা বহন করতে পারে তার চেয়ে বেশী কিছু বহন করার জন্য মানুষকে দায়ী করা হয় না।[২০] প্রকৃতি বা স্বভাব কর্তৃক পূর্ব নির্ধারণ হচ্ছে মানুষের অপাপবিদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, এর জন্য কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার কোন বৈধ যুক্তি নেই। কেননা, নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে– একজন মানুষের চৈতন্যের দ্বারা ধারণাকৃত বিষয়টি ঘটানোর জন্য মানুষের সহজাত স্বাভাবিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে সামর্থ্যের জন্য যথোপযুক্ত। যেখানে সামর্থ্য নেই সেখানে স্বাধীনতা নেই এবং সে কারণে দায়িত্ব বা অপরাধ কোনটাই থাকতে পারেনা। আদি পাপের আধুনিক প্রবক্তারা তাদের তথ্যের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য প্রায়ই আশ্রয় নেন প্রকৃতির দানের উপর। তাদের সবচেয়ে সাধারণ যুক্তি এই : নবজাত শিশুর আত্মকেন্দ্রিকতাকেই বিবেচনা করুন। বয়স্ক ব্যক্তির কথা না হয় বাদই থাকলো। সকল আধুনিক খ্রীষ্টীয় আত্মপক্ষ সমর্থনের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত হচ্ছে পল টিলিসের সাড়ম্বর দাবী, যিনি আদি পাপকে ব্যক্তিগত অপরাধ বা পাপ বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন, এ ভাবে যে, অপরাধ সংগঠিত হয় মানুষ সম্পর্কে আল্লাহর ধারণা নির্যাস থেকে অস্তিত্বে আল্লাহর মনের মধ্যে যখন আসে।[২১] কিছু সংখ্যক ভারতীয় চিন্তাবিদের, এখানে আমরা বৌদ্ধ গৌতমকেও ভুলবনা, নির্বিচার দাবী, প্রকৃতির সমগ্র জগতই আসলে মন্দ এবং অবাস্তব উভয়েই, একই ধরনের।[২২]

---

১৯. Barth *Church Dogmancs.* Part-1 অধ্যায়-৪, অধ্যায়-১৪, pp. 35 ff. Tillich : *Systematic Theology,* vol-2. pp 44 ff: Reinhold. Neibuhr. *The Nature and Destiny of Man. A Christian Interpretation* (New York : Scribner 1941) pp 245. 263-269

২০. কাউকে তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করা হবেনা। হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এই দয়া কর, যেন আমাদের সাধ্যাতীত কর্মের ফল আমাদের বহন করতে না হয় (২ : ২৮৬)।

২১. Tillich. *Systematic Theology* Vol-2 29-44

২২. T.R.V Murti. *The Central Philosophy of Buddhism* (London : Allen and Unwin. 1955) 330-331.also Radhakrishnan. *Indian Philosphy 362* ff.

www.icsbook.info

৪. দেবতার প্রতিকৃতিতে

ইহুদী এবং খ্রীষ্টান দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত হয়ে কুরআন দাবী করে যে, মানুষকে আল্লাহর প্রতিকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে।[২৩] অবশ্য, ইহুদী ধর্মের মতই এবং খ্রীষ্টান ধর্ম থেকে ভিন্নভাবে, ইসলাম এই প্রতিকৃতিকে সকল মানুষের মধ্যে সহজাত এবং চিরন্তন বলে গণ্য করে। অর্থাৎ প্রকৃতির অংশ হিসেবে ইহা কখনো হারিয়ে যেতে পারেনা। ইসলাম একটি স্বাভাবিক দৈব প্রকৃতি এবং একটি নৈতিক প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে খ্রীষ্টান মতবাদকে অনুসরণ করে না। ইসলাম উভয়কে কিংবা এর কোন একটিকে অস্তিত্বের স্বরূপমূলক মর্যাদা দেয়না, শাস্ত্রীয় *inquinamentum* শব্দটির দ্বারা যা বুঝায়। এই খ্রীষ্টান পার্থক্যের প্রয়োজন হয় মানুষের পতনকে কিছুটা অস্তিত্বের স্বরূপ বিষয়ক এবং কিছুটা সকল মানুষের পক্ষে সত্য প্রমাণ করার জন্য। কারণ, এতে করেই এমন একটি দুর্দশা বা বিপাক ঘটে যা থেকে কোন মানুষের পক্ষেই নিজের চেষ্টায় পরিত্রাণ সম্ভব নয়। যীশুরূপে ঈশ্বরের আর্বিভাবের ধারণা ইহাই।[২৪] ইসলাম এসব ধারণাকে স্বীকার করেনা, আর এ জন্যই সকল সময়ে সকল মানুষকে ঐশী প্রতিকৃতির রূপ বলে ইসলাম গণ্য করতে পেরেছে। মানুষের মধ্যে আল্লাহর প্রতিকৃতির যে ধারণার উপর ইসলামী চিন্তাধারণার ভিত্তি, তা মূলত দার্শনিক anthropology কুরআন ঘোষণা করে যে, আল্লাহ মানুষকে একটি আত্মা দান করেছেন এবং এ আত্মাকে বর্ণনা করেছেন মানুষের মধ্যে আল্লাহর নিঃশ্বাস বলে।[২৫] অতঃপর মানুষের মনকে দুভাগে বিশ্লেষণ করা হয়েছে– একটি জন্তুর অংশ, যা মানুষকে দিয়েছে তার ক্ষমতা এবং বাসনা, এবং আর একটি অংশ হচ্ছে তার যুক্তিবাদী দিক, যা মানুষকে দিয়েছে তার ক্ষমতা এবং বাসনা, এবং আর একটি অংশ

---

২৩. যখন আল্লাহ মানুষের সৃষ্টি সম্পূর্ণ করলেন এবং তার মধ্যে তার রূহ ফুঁকে দিলেন, ফেরেস্তেরা তার কাছে নতি স্বীকার করল (১৫ : ২৯)। আল্লাহই তোমাদেরকে এই পৃথিবী দিয়েছেন বসবাসের জন্য, আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন, তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট, তোমাদেরকে দিয়েছেন উৎকৃষ্ট জীবন উপকরণ, এই তো আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক এবং কত মহান বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ (৪০ : ৬৪)। তিনি সত্যসহকারে আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন সুন্দরতম অবয়ব, পরিণামে তাঁর নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন (৬৪ : ৩)।

২৪. সেন্ট অগ্যাষ্টিন, 'পেলাজিয়ানদের দুটি চিঠির বিরুদ্ধে' *Nicene and Post Nicene Fathers* (Grand Rapids. Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co 1948). First series, vol. 5. p. 378. কিন্তু আমি আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অন্য প্রকারের এক ব্যবস্থা দেশকে পাচ্ছি, যা আমার মন সে আইনকে সমর্থন করে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং পাপের যে ব্যবস্থা আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আছে, আমাকে তার দাস বানায়। দুর্ভাগ্য, মানুষ আমি, এই মৃত্যুর দেহ থেকে কে আমাকে নিস্তার করবে। প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রভু খৃষ্টের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করেন। অতএব, এই আইন আমাদের ব্যবস্থার আমি নিজে আপন মন দিয়েই কেবল আল্লাহর বন্দেগী করতে পারি, কিন্তু আমার মানব প্রকৃতি দিয়ে পাপের গোলামী করি (Romans 7 : 23-25)।

২৫. এবং যখন আমি মানুষকে সম্পূর্ণরূপে গঠন করলাম, তখন আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিলাম। (১৫ : ১৯)।

www.icsbook.info

হচ্ছে তার যুক্তিবাদী দিক, যা মানুষকে দিয়েছে তার মন। কুরআন মানুষকে তার ইন্দ্রিয় দান করার কথা বলে। কুরআন আরও বলে, মানুষকে দেওয়া হয়েছে প্রকৃতি, আল্লাহ এবং তার অভিপ্রায়কে জানার ক্ষমতা, যে ক্ষমতা এতই শক্তিশালী যে তা নির্ভরযোগ্য। কার্যত যা প্রত্যাদেশের বিকল্প কিংবা তার সমান হতে পারে।[২৬] মুসলিম দার্শনিকগণ সর্বত্রই এ দুটির মধ্যে সমীকরণ করেছেন। যুক্তি বা বুদ্ধি হচ্ছে মানুষের সেই অংশ যা মানুষকে করে তুলে দেবতুল্য এবং আল্লাহর নিঃশ্বাস হওয়াতে এ হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে দেবতুল্য অঙ্গ, যার সাহায্যে তার প্রতিরূপকে জানতে পারে মানুষ, জানতে পারে আল্লাহকে।

এই ঐশী ছায়া সকল মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে বিদ্যমান একে কখনো ধ্বংস করা যায়না কিংবা কখনো তা হারিয়ে যায় না। মানুষের মৌলিক মানবতা এর দ্বারাই গঠিত। এ হচ্ছে মানুষের মহত্তম ও মূল্যবান সম্পদ। ইহা ঐশী সম্মত। যেখানে অস্তিত্ব নেই সেখানে মানুষ নেই এবং যেখানে এর ঘাটতি রয়েছে সেখানে রোগীর অবস্থাকে বলা হয় মস্তিষ্ক বিকৃতি। এখানে ইসলামী মানবতাবাদ আর গ্রীক মানবতাবাদ (সক্রেটিস, প্লেটো, এরিষ্টটল) একই। পার্থক্য কেবল এই যে, যেখানে গ্রীক যুক্তিবাদের সর্বোচ্চ বিষয় ছিল সংস্কৃতি, (paideia) সেখানে মুসলমানদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হচ্ছে তাকওয়া (ধার্মিকতা, সদাচরণ)। অবশ্য আরো একটু মনোযোগ দিয়ে তাকালে দেখা যাবে গ্রীক সংস্কৃতিও ইসলামী ধার্মিকতার অন্তর্গত। কারণ ইসলামে আল্লাহ হিসেবে আল্লাহর স্বীকৃতি, অর্থাৎ স্রষ্টা, প্রভু ও বিচারক হিসেবে, তাঁর উপলব্ধি হচ্ছে চিরকালই সর্বোচ্চ যুক্তিবাদ।

ইসলাম গ্রহণ মানবতা থেকে মুলগতভাবে ভিন্ন, কারণ গ্রীক মতবাদ আজাদ নাগরিককে স্বীকার করে দাস শ্রেণীর জন্য নির্ধারণ করেছে অন্য একটি নিম্নতর স্থান। ইহুদী মানবতাবাদ থেকেও ইসলাম একইরূপ ভিন্ন, যা প্রকৃতিগতভাবে সকল মানুষের মধ্যে দেবতার প্রতিকৃতির উপস্থিতি ঘোষণা করে ও তার নিজের অনুসারীদের প্রতি অর্পণ করে একটি নির্বাচিতের মর্যাদা। খ্রীষ্টান মানবতা থেকেও ইসলাম স্বতন্ত্র; কেননা খ্রীষ্টান মানবতা যা প্রকৃতিগত zelem রূপে সকল মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান, তার পার্থক্য নির্ধারণ করে অর্জিত demuth এর সঙ্গে যা কেবল খ্রীষ্টান ধর্মের অনুসারীরাই তাদের বিশ্বাস ও দীক্ষার বদৌলতে অর্জন করে। পরিশেষে, ইসলাম ধর্ম-নিরপেক্ষ ইউরোপীয় মানবতাবাদ থেকে ভিন্ন; কারণ ইউরোপীয় মানবতাবাদ নিজের সংজ্ঞার জন্য কেবলমাত্র ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক পরিভাষাই ব্যবহার করে এবং এতে করে,

---

২৬. যখন আমি মানুষের সৃষ্টি সম্পূর্ণ করলাম এবং তার মধ্যে ফুঁকে দিলাম আমার রূহ। আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, চক্ষু কর্ণ ও বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয়। তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (৩২:৪)। যে বিষয়ে তোমার কোন জানা নেই, সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়েনা। কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় এদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে (১৭:৩৬)। আমি তাদেরকে দেখাব আমার নির্দশনসমূহ বিশ্বজগতে এবং ওদের নিজেদের অন্তরের অন্তঃস্থলে। ফলে ওদের নিকট প্রত্যয় জমে উঠবে যে আল কুরআন সত্য (৪১:৫৩)।

www.icsbook.info

এশিয়, আফ্রিকান এবং ইউরোপীয়দের জন্য মানবেতর মর্যাদা স্থির করে। এমনকি, মহান ক্যান্ট, যিনি ছিলেন যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিকাশকালের মহত্তম রাজকুমার এবং নিঃশর্ত আশু-কর্তব্যের অনুজ্ঞার প্রবক্তা, তিনিও তার নিজস্ব যুক্তিবাদকে তার নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তে উপনীত করতে পারেননি এবং এশিয় ও আফ্রিকানদের জন্য হীনতর মর্যাদা নির্ধারণ করেছিলেন। ইসলাম সকল মানুষকে একইভাবে দেখে এবং কুরআনে আল্লাহ বার বার মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, "আমি তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছি ধূলিকণা থেকে, যে সদাচারণে, সৎকর্মশীলতায় এবং জ্ঞানে মহত্তর, সে-ই তোমাদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।"[২৭] "যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা কি সমান?" কুরআন বার বার জিজ্ঞাসা করে আলংকারিক ভাষায়।[২৮] বিদায় হজ্জের দিনে মহানবী (সা.) একটি ওহী লাভ করেন যার মাধ্যমে ওহী এবং ইসলামের পরিপূর্ণতা ঘোষিত হয়। সেই মহান দিনে, যখন সেখানে উপস্থিত ছিল জাতের দিক দিয়ে প্রায় সকল আরব এবং ভাষা ও সংস্কৃতিতে ব্যতিক্রমহীনভাবে আর, মুসলিম জনতাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া তিনি তার কর্তব্য মনে করেছিলেন। কেবল সদাচারণ ছাড়া একজন আরব এবং একজন অনারবের মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই।[২৯] মন অথবা যুক্তি হিসেবে দ্বিতীয় যে শক্তিটির দ্বারা মানব আত্মা ঘটিত তা হচ্ছে মানুষের দায়িত্বশীলতার সামর্থ্য। মুসলিম দার্শনিকগণ এই ক্ষমতাকে 'ক্বদর' (কর্মক্ষমতা) হিসেবে সংঘবদ্ধ করার জন্য জোর দিয়েছেন এবং ধর্মতত্ত্ববিদগণ এই ক্ষমতার উপর জোর দিয়েছেন 'কসব' হিসেবে, (কর্মের প্রতিফলন অর্জনের সামর্থ্য) ক্বদর এবং কসবের মধ্যে যে পার্থক্য, তা একটি ধর্ম শাস্ত্রীয় সূক্ষ্ম পার্থক্য মাত্র। নীতিগত স্তরে উভয়ই সমান, কারণ দুইয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের কর্মের জন্য মানুষের দায়িত্বশীলতার একই পরিণতি।

উত্তম তথা আল্লাহর অভিপ্রায়কে জানার ক্ষমতা, নিঃশর্ত অনুজ্ঞা পালন করা বা না করার সামর্থ্য এবং তার নিজ কর্মের জন্য তার দায়িত্বশীলতা নিয়ে মানুষের মানবিক উপকরণাদি গঠিত: ব্যতিক্রমহীনভাবে সকল মানুষই এই সজ্জা বা উপকরণ সম্ভার প্রদত্ত হয়েছে।

ইসলামে কোন soteriology নেই, ইসলামের দৃষ্টিতে 'পবিত্রাণ' হচ্ছে একটি ভ্রান্ত ধর্মীয় ধারণা; ইসলামী শব্দকোষে যার অনুরূপ কোন পরিভাষা নেই। মানুষ এমন কোন বিপাকের মধ্যে পতিত নেই, যার থেকে তারা 'পরিত্রাণ' পেতে হবে। প্রথম

---

২৭. হে মানব জাতি, আমি একটি মাত্র যুগল থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তোমাদেরকে করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্র, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সেই হচ্ছে সর্বোত্তম যে সবচেয়ে ন্যায়নিষ্ঠ, ন্যায়বান (৪৯ : ১৩)।

২৮. বল, যারা এবং যারা জানেনা, তারা কি সমান? নিশ্চয়ই না, বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে (৩৯ : ৯)।

২৯. Amin Duwaydar. *Suwer min hayat-al Rasul* (Cairo: Dar al Maarif bi Misr 1372. 1953) c.,593.

www.icsbook.info

মানুষ আদম একটি ভুল করেছিলেন, (তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়েছিলেন) কিন্তু তিনি অনুতপ্ত হন এবং তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[৩০] তার কর্মটি ছিল একটি সাধারণ মানবিক ভুল। এ ছিল নীতিগত বিচারে প্রথম ভুল, প্রথম অন্যায়াচরণ, প্রথম অপরাধ। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তা প্রথম হলেও এ ছিল একটি মানুষেরই কর্ম এবং সে কারণে সে ছিল নিজে ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বশীল, সে নিজে ছাড়া আর কারও উপরে এর প্রতিক্রিয়া ছিলনা। এর যে কেবল কোন মহাজাগতিক প্রতিক্রিয়া ছিলনা তাই নয়, তার নিজের সন্তানদের উপরও এর কোন প্রভাব ছিলনা। এর দ্বারা আদমের নিজের বা অন্য কারো 'পতন' হয়নি। অবশ্য এর ফলে আদম বেহেস্ত থেকে পৃথিবীতে প্রেরিত হন, কিন্তু এতে করে তাঁর প্রতিকৃতির, তাঁর সামর্থ্যের, তাঁর সম্ভাবনার, তাঁর পেশার বা ভাগ্যের কোন পরিবর্তনই হয়নি। মানুষের 'পতন' হয়নি এবং সে কারণে তার পরিত্রাণ বা মুক্তিপণের প্রয়োজন হয়না, বরং মানুষ দাঁড়িয়ে আছে একটি নিঃশর্ত অনুজ্ঞা, একটি ঔচিত্যের আওতায়, এবং এই নিঃশর্ত অনুজ্ঞা পালন করা বা না করার উপর নির্ভর করছে তার মূল্য। ইসলাম পতনের কথা না বলে জোর দেয় তার দায়িত্বশীলতার উপর, তার পরিত্রাণের চেয়ে তার পরিতৃপ্তি বা পরম সুখের উপর। মানুষের পরম সুখ বা পরম দুঃখ তার নিজেরই কর্মফল। এই পরম সুখ কারো অনুগ্রহ বা মধ্যবর্তিতার উপর নির্ভর করেনা। এ কোন দীক্ষা দানের ফল নয়, কিংবা খ্রীষ্টান ধর্মে যেমন, কোন রহস্যময় দেহে অংশ গ্রহণের পরিণাম নয়। ইসলাম উভয় থেকেই মুক্ত।

মানুষ যে নৈতিক অনুজ্ঞার অধীন তা কোন অতীত ঘটনা, তা পতনই হউক বা অন্য কারো দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্তই হউক, তার দিকে দৃষ্টি ফেরায়না বা তার উল্লেখ করেনা। এই ধরনের অতীত ঘটনা থেকে এই নৈতিক অনুজ্ঞা সূচিত হয়না, বরং তা সম্পূর্ণভাবে ঘটিত বর্তমান কিংবা ভবিষ্যত কিছুর দ্বারা। একারণে ইসলাম বিশ্বাস দ্বারা যৌক্তিকতা বিধান সমর্থন করেনা, স্বীকার করেনা পরিত্রাণ। ইতিহাস (Heilsgeschichte) একমাত্র প্রাসঙ্গিক অতীত; যা ইসলামের স্বীকৃত তা হচ্ছে, ঐশী আদেশ নিষেধের প্রত্যাদেশ এবং এইসব আদেশ মান্য বা অমান্য করার জন্য অতীতের মানুষের সুখ অথবা কষ্ট। অতীতে যে পরিত্রাণের নাটক মঞ্চস্থ মুসলমানের এই বিশ্বাসে ফল হচ্ছে মানুষের নৈতিকতা। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর অস্তিত্ব হয়েছে, তাতে বিশ্বাস থেকে মানুষের নৈতিকতা সৃষ্টি হয়না, কিন্তু আল্লাহ আছেন হচ্ছে সত্য ও মূল্যের অস্তিত্ব এবং উভয়েই দাবী করে তার আনুগত্য ও কর্মক্ষমতা। এই দাবী নিহিত রয়েছে দেশ কালের মধ্যে ঐশী পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দিতে গিয়ে যে ইতিবাচক বিঘ্ন উৎপন্ন হয় তাতে। যে বিশ্বাস এবং তার সহযোগী সকল শক্তির দ্বারা মূল্যবোধ ও তার পারস্পরিক সম্পর্ক প্রত্যক্ষ হয় এবং তাদের উপকরণগুলো নির্বাচিত ও নির্ধারিত হয়, সে সমস্তই ঐশী পরিকল্পনাকে নিরেট রূপ দেবার প্রস্তুতি মাত্র। ইসলাম দাবী করে, খোদ রূহানিয়াত

---

৩০. আদম তার প্রতিপালকের কাছ থেকে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলেন, এবং অনুতাপ প্রকাশ করলেন, আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমা পরবশ হলেন, কারণ তিনি অত্যন্ত ক্ষমাপ্রবণ ও দয়ালু (২: ৩৭)।

www.icsbook.info

এবং তার সমগ্র ক্ষেত্রটিই অসার, যদি না বাস্তবে নর এবং নারীর মধ্যে তা নিরেট রূপ লাভ করে। ইসলামে ধরে নেওয়া হয় যে, জন্ম মুহূর্তে মানুষ নৈতিকতার দ্বারপ্রান্তে অবস্থান করে, যাকে বলা যেতে পারে নৈতিকতার মাত্রার শূন্য বিন্দু। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম মানুষের কর্তব্যকে ইতিবাচক কর্ম বলে ধারণা করে, নতুন কিছু করা হিসেবে অতীতে কৃত কিছুকে নস্যাৎ করার জন্য নয়; ইসলামের নৈতিকতা সম্পূর্ণভাবে ভবিষ্যতমুখী, এমনকি যখন তা চরম রক্ষণশীল ও স্থবির, তখনো এই নীতিগত ইতিবাচক স্বীকৃতিই মুসলিমকে দিয়েছিল তার প্রাণশক্তি। অতীতের শৃংখলের ভারে নুইয়ে না পড়ে, মুসলমান হয়ে উঠেছিল জগতমুখীতা ও কর্মচঞ্চলতার দৃষ্টান্ত, সন্যাসবাদ এবং ইতিহাস অবমূল্যায়নের পরম শত্রু।

৫. কর্মবাদ

জেরিমিয়ার অন্তর্মুখী নৈতিক অন্তরদৃষ্টিকে এবং পরবর্তী ধর্মের সেমিটিক ব্যক্তিবর্গের অন্তর্মুখীনতাকে তাদের যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌছানোর জন্য ইহুদীদের নিকট হযরত ঈসাকে পাঠানো হয় ফেরিসি এবং সেডিউসিদের বর্তমান বহির্মুখীনতা এবং আক্ষরিকতার মোকাবেলায়, অভিপ্রায়ের ব্যক্তিগত নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে। ইহা স্বাভাবিক যে এ ধরনের বাড়াবাড়ি, বৈপরীত্য প্রদর্শন করে বিপরীত বাড়াবাড়ির জন্য বিভ্রান্তিকর বাহুল্য উক্তির স্বরূপ উন্মোচন করার জন্য। হযরত ঈসা এই শিক্ষা দিলেন যে, একটি কর্মের নৈতিক চরিত্র হচ্ছে তার ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া বা পরিণতির নয়, যার মূল্য নির্ধারণ করা হয় উপযোগবাদের মূল্যের দ্বারা; বরং এ হচ্ছে সহগামী এবং সম্পূর্ণভাবে প্রবর্তনামূলক অভিপ্রায়। বহু কাহিনীর মাধ্যমে তিনি সুন্দরভাবে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন যে, কর্মটি ক্রিয়ার দিক দিয়ে মন্দ বলে প্রতিভাত হলেও আসলে কিন্তু তা সত্য নয়, এর প্রণোদনার কারণে, যেখানে নিয়্যত পবিত্র, যেখানে হৃদয় পরিচালিত হয় আল্লাহর প্রতি মহৎ প্রেম ও এর আনুগত্যের দ্বারা, সেখানে তার কর্মটি নির্দোষ এবং ব্যক্তিটি সুরক্ষিত।[৩১]

এ কারণে অগাস্টিন বলতে পেরেছিলেন, 'আল্লাহকে ভালবাস এবং তুমি যা ইচ্ছা কর তা সম্পাদন কর'। আর ইমানুয়েল ক্যান্ট বলেছিলেন, মূলত ভাল জিনিস হচ্ছে একটি সদিচ্ছা। হযরত ঈসার মহৎ প্রয়াস ছিল, ব্যক্তির অন্তর্গত মৌলিক আত্ম-বিবর্তনের দিকে নিবদ্ধ; এই নৈতিকতার অংশ ছিলনা নৈতিক ক্রিয়ার প্রতিফলের নিন্দা করা এবং সে কারণে, দেশ, কাল ও ইতিহাসের এবং পৃথিবীর প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ। এর শক্তি নিহিত রয়েছে সকল কর্মের মূল উৎস বা ইচ্ছাকে পরিস্কার ও পবিত্র করার জন্য এর একমুখী দৃঢ়তার মধ্যে। ইহা যখন নৈতিক শুভকে নিয়্যতের একটি অবস্থা রূপে সংঘবদ্ধ করা হয়, নিয়্যতটি যখন আল্লাহর প্রেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন তা ঠিক কাজই করে; কারণ এই নীতির সামান্যতম বিচ্যুতি কার্যত যে কোন কর্মের দুষণ বলে

---

৩১. দেখুন, এই গ্রন্থকারের *Christiam Ethics*. অধ্যায়-৬।

www.icsbook.info

গণ্য হয়। ব্যাপক বাহ্য-সর্বস্বতার এই ছিল হযরত ঈসার ঐশী জবাব, এতে করে তিনি একটি আইনে প্রাণ সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, যা আইনের মর্মকে হারাতে বসেছিল।[৩২]

ইসলাম হযরত ঈসার প্রত্যাদেশকে স্বীকার করে এবং এর নৈতিক অন্তর্দৃষ্টিকে আগ্রহের সঙ্গে সমর্থন করে। বলতে কি, এই অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করার জন্য ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ কর্মে প্রবেশ করার পূর্বে, ইসলাম তার অনুসারিকে মৌখিক এই ফরমূলা ঘোষণা করতে আদেশ করে "আমি ইচ্ছা করি পরিকল্পিত এই কাজটি করতে কেবল আল্লাহরই উদ্দেশ্যে"– সে আনুষ্ঠানিক ইবাদতের ক্ষেত্রেই হোক অথবা জনপদ থেকে কোন আবর্জনা বা কাঁটা সরানোই হোক। ইসলাম কোন কাজকেই নৈতিকভাবে মূল্যবান মনে করেনা যদি না তা এভাবে শুরু হয়, এভাবে নিয়োজিত হয়, আল্লাহর প্রসন্নতার দিকে লক্ষ্য রেখে। এভাবে ইসলাম মহত অভিপ্রায়কে একটি প্রতিষ্ঠানে রূপ দিয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ায় একে প্রায় বহির্মুখী করে তুলেছে, যে রীতিটিকে ইসলামের প্রভাবে মধ্যযুগে ইহুদীরা গ্রহণ করে, এর অস্তিত্বের নিশ্চয়তা বিধান করতে নৈতিক কর্মকর্তার মধ্যে।

এসত্বেও ইসলাম অভিপ্রায়কে অতিক্রম করে কর্মের নৈতিকতাবাদে উত্তীর্ণ হয়, শুভ অভিপ্রায়কে নৈতিকতার একটি অপরিহার্য শর্ত স্থির করার পর, ইসলাম অভিপ্রায় থেকে ইচ্ছার উত্তরণের বিধান দেয়, দেশ কালের ব্যক্তিগত চৈতন্যের এলাকা থেকে হাট বাজারের জটিলতার মধ্যে এবং নির্মীয়মান ইতিহাসের অন্ধকার কর্মকান্ডে। মূল্যবোধ বা ঐশী ইচ্ছা, যাতে মানবিক অভিপ্রায়ের কিছুই নেই, তা একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারেনা, এগুলোকে হতে হবে বাস্তব এবং মানুষই হচ্ছে সেই সৃষ্টি, যার সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে সেগুলোকে স্বাধীনভাবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে বাস্তবে রূপদান। কাজেই তাকে সৃষ্টির তাত্ত্বিক ভারসাম্য অবশ্যই লংঘন করতে হবে। তাকে অবশ্যই তার কাছে ঐশী প্যাটার্ণের যে নৈতিক আয়তন উৎঘাটিত হয়েছে তাকে প্রকৃতিতে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য প্রকৃতিকে আবার দলাই মলাই করে ও কাটছাঁট করে প্রয়োজনীয় বল দিতে হবে। পৃথিবীর অন্তর্গত প্রবণতাগুলো অবশ্যই পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে যে যতটুকু সফল হবে, তাই হচ্ছে তার ফালাহ-এর মানদন্ড যেখানে শুভ ইচ্ছা হচ্ছে নৈতিক প্রচেষ্টা ও প্রয়াসের ক্ষেত্রে প্রবেশের টিকেট, সেখানে কর্মবাদ অথবা ইতিহাসে পরম সত্যের সার্থক বাস্তবায়ন হচ্ছে, বেহেস্তে প্রবেশের টিকেট। তার মানে হচ্ছে, সেখানে আল্লাহর সান্নিধ্যে বসতি। শুভ ইচ্ছা পূর্বাহ্নেই স্বীকৃত বলে এর দ্বারা কর্মফলের নৈতিক হেতুবাদে প্রত্যাবর্তন বুঝায়না। এটি একটি প্লাস পয়েন্ট, এজন্য যে, ইসলাম কোন বিকল্প যেমন চায়না, তেমনি কিছু বর্জনও করতে চায়না। হযরত ঈসার নীতিত্বে সঠিকভাবেই চিহ্নিত হয়েছে যে, পৃথিবীতে

---

৩২. প্রাগুক্ত।

www.icsbook.info

মানুষের নৈতিক মর্যাদার চূড়ান্ত বিচারক হচ্ছে ব্যক্তিগত বিবেকবোধ এবং এর বিচারই কেবল পারে ইচ্ছাকে সঠিক পথনির্দেশনা দিতে। পক্ষান্তরে, প্রকৃতিগতভাবেই কর্ম হচ্ছে প্রকাশ্যে পরার্থকেন্দ্রিক এবং তা অহংকে অতিক্রম করে সব পৃথিবীর কাছে তা দৃষ্টি গ্রাহ্য এবং বাহ্য উপায়ের সাহায্যেই তার পরিমাপ করা যায়, তার উদ্দেশ্য অহম, অপর ব্যক্তিরা অথবা প্রকৃতি যেই হোক। একারণে ইহা আবশ্যক যে, কর্ম নিয়ন্ত্রিত হবে পাবলিক আইন অর্থাৎ শরীয়া দ্বারা, যা পরিচালিত হবে পাবলিক পদ অথবা রাষ্ট্রের দ্বারা, অন্য কথায় খিলাফত দ্বারা এবং এর বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা হবে একটি পাবলিক বিচার বিভাগ কর্তৃক, অর্থাৎ কাজীর দ্বারা। একথা স্মরণে রেখে ইসলাম ঘোষণা করে যে, কর্ম হচ্ছে ঈমানের আবশ্যিক সহপন্থী।[৩৩]

কুরআনুল করিমে কর্মের জন্য আল্লাহর আদেশ হচ্ছে অসংখ্য এবং সেগুলোতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ক্লুউদ (আয়েশ, নিষ্ক্রিয়তা) এর প্রতি আল্লাহর নিন্দা কম গুরুত্বপর্ণ নয়, এমনকি যখন নির্জন বাস। আত্মনিগ্রহ অথবা কর্মবর্জনকে বেছে নেওয়া হয় অন্তর্জগতের ব্যক্তিক গুণাবলীর অনুশীলনের জন্য, যা দেখা যায়, খ্রীষ্টীয় সন্যাসবাদে, সেক্ষেত্রেও ইসলাম তার নিন্দা করেছে উচ্চ কণ্ঠে। কুরআন বলে, সন্যাসবাদ হচ্ছে পাদ্রীদের আবিষ্কার, এ কোন ঐশী ব্যবস্থা নয়, (অধিকন্তু) ওরা (খ্রীষ্টানগণ) অপব্যবহার করেছে।[৩৪]

৬. উম্মতত্ত্ব

আমরা দেখেছি, কর্মবাদ চায় মানুষ তার নিজেকে অতিক্রম করে, যা সে নিজে নয়, অর্থাৎ অপরের মধ্যে উত্তীর্ণ হবে। যেহেতু-মানুষের বাইরের এ সত্যই হচ্ছে প্রকৃতি, তাই ইসলামী কর্মতত্ত্ব চায় এই পৃথিবীকে বেহেস্তে রূপান্তরিত করতে। এই ধরনের রূপান্তরের জন্য প্রকৃতি-বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিজ্ঞান যা কিছুরই নির্দেশ দেয় প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তা একটি অপরিহার্য ধর্মীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, যখন ব্যক্তি-মানুষের অহমের বাইরের অন্যেরা হচ্ছে অন্য একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ, তখন ইসলামী কর্মবাদের অর্থ হবে মানব জাতিকে বীর, সাধু-দরবেশ ও প্রতিভায় রূপান্তরিত করা, যাদের জীবনে এবং কর্মতৎপরতায় ঐশী অভিপ্রায় পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু উম্মতবাদ দ্বারা যা বুঝায়, অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ততা অবশ্যই হতে পারে, যেমনটি দেখা যায় বহুক্ষেত্রে, অ-উম্মতদের সঙ্গে, এবং এমনকি, সন্ত্রাসীদের সঙ্গে। খ্রীষ্টীয় মিশরের প্রথম দিকে, এই ধরনের পরার্থপরতার খ্রীষ্টীয়ান প্রয়োজন প্যাকোমিয়াসের প্রধান বিবেচ্য, এন্টোসিট ছিলেন নিয়াসের ব্যক্তিক সন্যাসবাদের মোকাবেলায়।[৩৫]

---

৩৩. ঈমানের অপরিহার্য সহগামী যে অপরিহার্য কর্ম, তা কুরআনে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হয়েছে, বার বার ঈমানের সঙ্গে সৎকর্মকে যুক্ত করাতে, যা দেখা যায় বহু আয়াতে; যেমন, যার ঈমান আছে এবং যে সৎকর্ম করে (১৮ : ৮৮) যাদের ঈমান আছে এবং যারা নেক কাজ করে (৪ : ১৭৩)।

৩৪. নিশ্চয়ই তারা সমান নয় : যেসব বিশ্বাসী সামর্থ্য থাকা সত্বেও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনা এবং যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে জেহাদ করে, জানমাল দিয়ে, আল্লাহ তাদের প্রথমোক্তদের থেকে অর্ধেক মর্যাদা দিয়েছেন। (৪ : ৯৫)।

৩৫. *The New Scaff Herzog Encyclopedia of Religious Knowledg*, Samed Macauley

www.icsbook.info

কর্মের কর্তা হিসেবে কর্তা বা এজেন্টদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, ইসলাম আনয়ন করে উম্মতের নতুন ধারণা, যাতে কর্তা তার কর্মে অন্যদেরকে সম্পৃক্ত করে তাকে সহকর্মী বা সহযোগী হিসেবে। এর লক্ষ্য ছিল কর্মবাদকে একটি সামষ্টিক বিষয়করে তোলা, অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে কর্তা হিসেবে কর্মে অংশগ্রহণকারী করে তোলা এবং এভাবে এর নৈতিক মূল্য বা ত্রুটির ভাগী হওয়া। যদি মানুষকে লক্ষ্য হিসেবে উন্নত করতে বা সম্পূর্ণতা দানে পরার্থপরতাবাদ সক্ষম না হয়, তাহলে একটা রেজিমেন্টেড সমাজ, যার সদস্যরা অভ্যাসবসে রীতি প্রথার দাসত্ব করে অথবা এক রাজনৈতিক স্বৈরাচারীর ভয়ে একসঙ্গে কাজ করে, তাও সফল হবেনা। যেহেতু বাঞ্ছিত লক্ষ্যটি হচ্ছে নৈতিক, সে কারণে কর্তাকে তা অবশ্যই অর্জন করতে হবে তার নৈতিক স্বাধীনতায়। কর্মকে যদি নৈতিক হতেই হয়, তাহলে সে কর্মের পিছনে নিয়্যত বা অভিপ্রায় থাকতে হবে এবং তা করতে হবে একমাত্র আল্লাহরই ওয়াস্তে। যান্ত্রিকভাবে কর্তব্য সম্পাদন নৈতিক বিচারে মূল্যহীন। তেমনি হচ্ছে বাইরের জবরদস্তিতে বাধ্য হয়ে কর্তব্য পালন। যে কর্ম, কর্তার মুক্ত দৃষ্টি এবং অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়, কেবল সেই কর্মেরই নৈতিক মূল্য রয়েছে।

এজন্য ইসলাম বিধান দেয় যে, অন্যদেরকে আহ্বান জানাতে হবে, শিক্ষিত করতে হবে, সতর্কিত হতে হবে, এবং যথার্থভাবে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে হবে, লক্ষ্যভূত সংশ্লিষ্ট সমষ্যাটিকে গ্রহণ করে প্রত্যেকটি কাজে অংশগ্রহণের জন্য। জোর জবরদস্তি করেও প্রকৃতির অন্তর্গত হিতকর মূল্যগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে এবং রেজিমেন্টেশনের মাধ্যমে মানুষের অন্তর্গত পরার্থপর নৈতিক লক্ষ্যটির বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে। কিন্তু কেবল মাত্র বাস্তবায়ন ও রূপায়ণের জন্য তা নৈতিক পদবাচ্য হবেনা। তা সত্বেও ইসলাম সঠিকভাবে এই নৈতিকতারই দাবী করে। এই নৈতিকতা অর্জিত হতে পারে কেবল তখনই যখন অন্যদেরকে আহ্বান জানানো হয় কর্মটির বাঞ্ছনীয়তা সম্পর্কে প্রত্যয় সৃষ্টির জন্য, এবং যখনই তারা এ বিষয়ে প্রত্যয়শীল হবে, তারা ওতে অংশগ্রহণ করবে, স্বেচ্ছায় এবং সচেতনভাবে মূল্যের প্রকৃত উপাদানগুলোকে রূপ দেবে। ঐশী অভিপ্রায়ের রূপায়ণ বা বাস্তবায়ন, যেহেতু সীমার মধ্যে বন্দী নয়, এবং তা সকল কালে এবং সকল স্থানে, সকল কর্মকান্ড এবং সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক তাই এ থেকে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য যে, ইসলাম যে সমাজের প্রবক্তা তা নিরবচ্ছিন্নভাবে তৎপর রয়েছে অন্যকে এবং নিজেকে প্রত্যয়শীল করার প্রয়াসে, স্বাধীনভাবে মূল্যের অনুসরণ ও বাস্তবায়নের চেষ্টায়। এ ধরনের একটি সমাজই হচ্ছে যথার্থ অর্থে উম্মাহ, যার মানে সম্প্রদায়, জোটবদ্ধ মানুষের দল অর্থে নয়, এরূপ সমাজই হচ্ছে ইসলামের উদ্দিষ্ট উম্মাহ।[৩৬] এর সদস্যরা ত্রিমুখী ঐক্যমত

Jackson (Grand Rapids, Michigan, Baker Book House 1977) S. V. Monastiasm, vol 8, pp. 462-3

৩৬. মানব জাতির জন্য সৃষ্ট তোমরাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দাও, মন্দকর্ম নিষেধ কর, এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন কর (৩ : ১১০)।

www.icsbook.info

গঠন করে-মননে কিংবা দৃষ্টিতে, অভিপ্রায় বা ইচ্ছায় এবং বাস্তবায়ন প্রয়াসে অথবা কর্মে শরীয়ার বন্ধনে, এ হচ্ছে বিশ্বাসীদের ভ্রাতৃত্ব, যা নিরন্তর গতিশীলতায় অগ্রসরমান, এ হচ্ছে একটি শিক্ষা যেখানে মানুষের মনে প্রত্যয় বা বিশ্বাস উৎপাদনই হচ্ছে চিরন্তন পাঠ্য বিষয়। এটি হচ্ছে হৃদপিন্ডের একটি ক্রীড়াকেন্দ্র, যেখানে মানুষের ইচ্ছাকে বিরবচ্ছিন্ন নিয়মানুবর্তীতা ও অনুশীলনের অনুবর্তী রাখা হয়। এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে মানব ভাগ্যকে ঘাড়ে ধরে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং তৈরী হয় ইতিহাস। উদারনৈতিকতার রাজনৈতিক থিওরী থেকে উম্মাহর থিওরীর তফাৎ এই যে, এখানে রাষ্ট্রীয় ইখতিয়ার সবচেয়ে বেশী, সবচেয়ে কম নয়, যেখানে সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ এবং তাঁর আইন সংখ্যাগুরুর খেয়াল-খুশীর সার্বভৌমত্ব নয়, চূড়ান্ত কল্যাণ হচ্ছে ঐশী নমুনা, সদস্যদের যুক্তি শাসিত কর্মময় জীবনের সুখ নয়। উম্মাহর একজন সদস্য হিসেবে, ব্যক্তি মুসলিম বাধ্যতামূলকভাবে রিক্রুট কোন সৈনিক নয় বরং আজীবন স্বেচ্ছাসেবী, পৃথিবীতে পরম সত্যের বাস্তবায়নের জন্য যাকে নিত্য সমাবেশ করা হয়।[৩৭] উম্মাহ হচ্ছে এমন এক সমাজ যেখানে কর্ম হচ্ছে সকলের জন্য, কোন এক সমুহবাদী দলের নয়-কর্তৃত্বশীল কিন্তু কর্তৃত্ববাদী নয়।

এসমস্তই কুরআনের ঘোষিত এই সত্যের অনুসিদ্ধান্ত যে, মানব জীবন খেলাধুলা নয়, মানুষের অস্তিত্ব একটি ক্রীড়া নয়, বরং একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[৩৮] প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুসলিম হচ্ছে এক সিরিয়াস ব্যক্তি, যে এক মহৎ লক্ষ্যের জন্য বেঁচে থাকে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, "হে মানব জাতি, আমরা তো কেবল এ উদ্দেশ্যে তোমাদের সৃষ্টি করেছি যে, তোমরা তোমাদের কর্মের দ্বারা তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে।"[৩৯] এজন্য মুসলমানের জীবন বিপদ সংকুল। কিন্তু তার এই অনিশ্চিত অস্তিত্ব তার গর্বের বিষয় এবং ঐশী অভিপ্রায় দর্শনই হচ্ছে তার খাদ্যপুষ্টি। প্রতিমূহূর্তে আল্লাহ সম্পর্কে তার জাগরতা একটি শূন্য মোহ নয়। এরই আওতায় নিজেকে সে দেখতে পায় আল্লাহ এবং সৃষ্টির মধ্যে মহাজাগতিক মাধ্যম হিসেবে; একারণেই মানুষ হচ্ছে মহাজাগতিক ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্ত।

৭. বিশ্বজনীনতা

ঐশী অভিপ্রায়ের সামগ্রিকতার বাইরে কোন মানুষের এই অবস্থান নেই; ঠিক যেমন এই প্রাসঙ্গিকতার বাইরে অথবা এর দেশকালের বাইরে কোন বিন্দুর অস্তিত্ব নেই।

---

৩৭. বিশ্ব উম্মাহর নৈতিক ভূমিকার উপর আরো আলোচনার জন্য দেখন On the Raison d'etre of the Ummah. *Islamic Studies* vol-2. No 2 (জুন ১৯৬৩)।

৩৮. তারাই নিষ্ঠাবান, ন্যায় পরায়ণ, যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নভোমন্ডল এবং পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে, আর বলে: হে আমাদের প্রতিপালক। তুমি ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে বাঁচাও (৩ : ১৯১)। আমি নভোমন্ডল এবং পৃথিবীতে এবং উভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে, খেলার স্থলে সৃষ্টি করিনি (২১ : ১৬)।

৩৯. আল্লাহই তো সৃষ্টি করেছেন জীবন এবং মৃত্যু, যাতে করে তোমরা তোমাদের কর্মের দ্বারা নিজেদেরকে যোগ্য প্রমাণ করতে পার। তিনি দয়াময়, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমতাশীল (৬৭ : ২)।

www.icsbook.info

গোটা বিশ্বই হচ্ছে উদ্দেশ্য এবং গোটা মানবজাতি হচ্ছে নৈতিক প্রয়াসের উদ্দেশ্য ও কর্তা। তাই পৃথিবী হচ্ছে মানুষের প্রয়াসের ক্ষেত্র এবং গোটা মানবজাতিকেই পৃথিবীর এবং তাদের রূপান্তরণে অংশগ্রহণ করতে হবে। ইসলামের বিশ্বজনীনতা হচ্ছে নিরংকুশ এবং তার বাইরে কেউ নয়। ঠিক যেমন আল্লাহ হচ্ছে সকলের প্রভু ও মালিক এবং তাতে কোন ব্যতিক্রম নেই, একারণে পৃথিবীর অবস্থান হবে ইসলামের বিশ্বব্যবস্থার অভ্যন্তরে, না হয় বাইরে। একারণেই, ইসলামের ক্লাসিকাল থিওরীতে পৃথিবী 'দারুল ইসলাম' শান্তি এবং 'দারুল হরব' (যুদ্ধগৃহ)– এই দুই ভাগে বিভক্ত। কারণ নৈতিক স্বাধীনতা, দায়িত্ব এবং শান্তির ব্যবস্থার মধ্যে তৃতীয় কোন বিকল্প নেই এবং যেখানে এগুলো অস্বীকৃত, কুঞ্জ সেখানে আইনানুগততা ও আইন বিরুদ্ধতা বা যথেচ্ছাচারের মধ্যে মধ্যবর্তী কোন অবস্থান নেই। ঠিক যেমন ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে নিজেকে অতিক্রম করে অন্যদের মধ্যে উত্তরণ, তেমনি হচ্ছে সমাজের দায়িত্ব, ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের জন্য সংসর্গ-পরিত্যাগ বা বিচ্ছিন্নতাবাদ হচ্ছে নৈতিক আলস্য এবং দাক্ষিণ্যের অভাব, এবং অবিচার, আগ্রাসন, অপরাধ, ক্ষুধা, অজ্ঞতা, ও মূল্যের বাস্তবায়নের অপ্রয়াসের মোকাবেলায় যখন মানুষ ও সমাজের সংসর্গ ত্যাগ করে দুরে থাকে বা নিষ্ক্রিয় থাকে, তখন তা হয়ে উঠে একটা নির্জলা অপরাধ, যাতে বলা যায় আল্লাহর বিরুদ্ধতায় নিজের নাক থাবড়ানো। বৈরাগ্যবাদ হচ্ছে আল্লাহর উদ্দেশ্যময়তা, যা কিছু বিদ্যমান তার প্রত্যেকটির অর্থময়তার ব্যাপারে আল্লাহর দাবীর সম্পূর্ণ সরাসরি বিরুদ্ধতা। যাই হোক, বিশ্বজটিলতার প্রকৃত বিপরীত হচ্ছে বৈশোষিকতা যা অতীতে henotheism এবং ট্রাইবেলিজমের রূপ পরিগ্রহ করেছিল এবং আমাদের কালে যা রূপ নিয়েছে জাতবাদ, জাতি-বের ও জাতীয়তাবাদে। হিব্রু, ইহুদী ঐতিহ্য কখনো particularism বা বৈশিষ্টকতাবাদের সূত্র থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি, যার প্রভাবে ইহুদীরা মনে করে, কোন যৌক্তিক বা নৈতিক কারণে নয়, কেবল আল্লাহ তাদেরকে নির্বাচন করেছেন এই দাবীতে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর নির্বাচিত বলে গণ্য করে এবং তাদের আধুনিক বংশধরেরা বিভিন্ন জাতি এতকাল যারা তাদের, সমমর্যাদা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তাদের মোকাবেলায় ইহুদীদের জৈবতাত্ত্বিক সংজ্ঞাকে উচ্চে তুলে ধরেছে।[৪০] ইতিহাসে দেখা যায়, খ্রীষ্টানেরা মোটামুটিভাবে সেন্ট পলের পরামর্শ অনুসরণ করেছে যে, "খ্রীষ্টের মধ্যে ইহুদী বলে কিছু নেই, গ্রীক বলে কিছু নেই।"[৪১] কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, অগাষ্টিন থেকে ক্রুসেড, লুথার, কেলভিন এবং মার্কিন পিউরিটানিজম পর্যন্ত, অদৃষ্টবাদ, অন্যান্য খ্রীষ্টান এবং অখ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে, স্থূল প্রজাতিগত বৈরীভাবাপন্ন আড়াল হিসেবে কাজ করছে।

---

৪০. দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, Obert Gordis, *A Faith for Moderns* (New York; Bloch Publishing Company 1971) pp 322 ff. আরো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের জন্য দেখুন Martin Buber Gi On Judaism এর শেষ অধ্যায় (New York, Schoken Books1972)

৪১. সুতরাং ইহুদী এবং গ্রীকদের মধ্যে, দাস ও স্বাধীন মানুষের মধ্যে, নারী এবং পুরুষের মধ্যে, কোন বৈষম্য নেই, কেননা, তোমরা সকলেই খৃষ্ট যীশুতে মিলনে এক (গালাতীয় ৩ : ২৮)।

www.icsbook.info

ইতিহাসে খ্রীষ্টানদের একের প্রতি অন্যের ব্যবহার এবং গত কয়েক শতাব্দীতে আফ্রিকান, এশিয়ান এবং আমেরিকানদের প্রতি আচরণ, সেন্ট পল এবং ঈসার প্রতি, অসম্মানের কারণ হয়েছে, যারা স্বজনদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে বলেছিলেন, কেননা তারা হচ্ছে ইব্রাহীমের বংশধর, আল্লাহ এই সব প্রস্তর থেকেও ইব্রাহীমের সন্তান সৃষ্টি করতে সক্ষম।[৪২]

ইসলাম সর্বদাই বিশ্বজনীনতায় বিশ্বাসী এবং এই সমস্যার ক্ষেত্রে ইতিহাসে মুসলমানদের রেকর্ড হচ্ছে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন এবং তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কালামের সর্বোচ্চ অথরিটি তথা, ঐশী পয়গাম বা কুরআনের মাধ্যমে, যা চূড়ান্ত গুরুত্ব ও স্বচ্ছতার সঙ্গে বলে : "হে মানবজাতি আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একটি যুগল নারী ও পুরুষ থেকে এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি এবং জনগোষ্ঠীতে রূপ দিয়েছি যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে কেবল সে-ই শ্রেষ্ঠতর, যে অধিকতর সকর্ম পরায়ণ।[৪৩] এবং হে মানুষ তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একই সত্তা থেকে।[৪৪] যেসব গুণাবলী ও উপাদান, উপকরণ নিয়ে মানবিকতা গঠিত, প্রকৃতিগতভাবে গোটা মানবজাতিই তার অধিকারী। এই সব গুণাবলী, উপকরণ কখনো বিদ্যমান ছিলনা অথবা কোন এক কালে থাকলেও ব্যক্তির অপরাধের কারণে অথবা তার পূর্ব পুরুষদের কিংবা সংগী-সাথীদের অপরাধ হেতু, পরবর্তীকালে তা হারিয়ে গেছে, এ সব যুক্তিতে ইসলাম কোন মানুষের বিরুদ্ধে বৈষম্য স্বীকার করেনা, কিংবা এই সমতাবাদকে বিশেষ কোন সংস্কৃতি বা সভ্যতার মধ্যে সীমিত করেনা। ইসলামী মানবতাবাদ, যে সব নৈতিক মৌল নীতিমালার দ্বারা গঠিত, কোন মানুষের জন্যই ইসলাম সেগুলোকে নিষিদ্ধ মনে করেনা, যদিও বা সে অন্য ধর্মে বিশ্বাসী হয়, অন্য সংস্কৃতি, সভ্যতা বা কালের মানুষ হয়, কিংবা ইতিহাসে তার জাতির জড়িত হওয়ার কোন আকস্মিক কারণে সে দাস হয়ে থাকে, অথবা এখনো সে দাস।[৪৫] ইসলামের বিশ্বজনীনতাবাদ মানুষে মানুষে সকল ভেদ- বৈষম্যকে অতিক্রম করে যায় এবং এভাবে তা পৌঁছায় 'ফিতরাতে'- যেখানে ইসলাম স্থির করে

---

৪২. এবং মনে করোনা যে, ইব্রাহীম তোমাদের পূর্ব পুরুষ, তোমরা একথা বলে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। আমি তোমাদেরকে বলছি যে, আল্লাহ এই সব পাথর হতে, ইব্রাহীমের জন্য সন্তান উৎপাদন করতে পারেন (মাথি ৩ : ৯)।

৪৩. হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একটি মাত্র যুগল থেকে, নারী ও পুরুষরূপে, আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে জানতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান, যে অধিক সাবধানী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন (৪৯ : ১৩)।

৪৪. হে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি সত্তা হতে সৃষ্টি করেছেন (৪ : ১)।

৪৫. আবু হামিদ আল গাজালী Al Munquidh ... পৃ. ৫৮ সহীহ আল-বোখারীর হাদিসটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন : 'প্রত্যেক শিশুই প্রকৃত ধর্মে জন্মগ্রহণ করে; পিতামাতাই পরবর্তীকালে শিশুটিকে ইহুদী, খ্রীষ্টান অথবা অগ্নিপুজক বানায়।'

www.icsbook.info

ফিতরাত বা প্রকৃতি কি দিয়েছে অথবা জন্মের কারণে তার অধিকার কি?[৪৬] নিশ্চয়ই ইসলাম অগ্রাধিকার দেয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে, সৎকর্মশীলতা, ধর্মানুরাগ ও সৎগুণকে, সৎকর্মপরায়ণতাকে, সৎকর্মকে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে আত্মসংযমকে। যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং জীবন দিয়ে সংগ্রাম করেছে, তারা এবং যারা পশ্চাতে পড়ে রয়ে গেছে, তারা সমান নয়।[৪৭] এবং ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে, কেবল তখন পর্যন্ত এই পার্থক্য বজায় থাকে যতক্ষণ এবং যে পর্যন্ত ইসলামের অনুগামী ব্যক্তিটি অধিকতর প্রাজ্ঞ, অধিকতর ধার্মিক, অধিকতর সৎকর্মপরায়ণ এবং স্বত:স্ফূর্ত সংগ্রামী থাকে। যদি এরা এই লক্ষ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে (তাদের স্থলে) আল্লাহ আনয়ন করবেন আর এক জাতিকে, যারা ওদের মত হবেনা।[৪৮] সবক'টি সেমিটিক ধর্মে আল্লাহও মানুষের সম্পর্ক ব্যক্ত হয়েছে একটি চুক্তিরূপে, যেখানে মানুষ আল্লাহর দাসত্ব করবে এবং আল্লাহ মানুষকে শস্য, সন্তান-সন্ততি, স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুখ দিয়ে পুরস্কৃত করবেন এবং সকলেই এর বিপরীত অবস্থা সম্পর্কেও ছিল সচেতন অর্থাৎ মানুষ যেখানে আল্লাহর দাসত্ব করেনা সেখানে মানুষের ভাগ্যে জুটবে কষ্ট ও শাস্তি। কেবলমাত্র ইহুদী এবং খ্রীষ্টান ধর্মেই চুক্তির ধারণাটিকে, যার মানে হচ্ছে, আল্লাহ এবং মানুষের দ্বিমুখী কর্ম, তাকে রদবদল করে প্রতিশ্রুতিতে। ইহুদী ধর্মের ক্ষেত্রে এ হচ্ছে আল্লাহর একটি একমুখী প্রতিশ্রুতি, ইহুদীদেরকে অনুগ্রহ করবেন বলে তাদের ধার্মিকতা বা সৎকর্মপরায়ণতার কথা বিবেচনা না করেই, এমনকি, Hosea এর প্রতিচ্ছবির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে তাদের বারবনিতাসুলভ মাখামাখি সত্বেও, এবং খ্রীষ্টানদের ক্ষেত্রে এ হচ্ছে আল্লাহর একক প্রতিশ্রুতি যে, তিনি তার সঙ্গী অর্থাৎ মানুষকে ভালবাসবেন এবং মুক্তি দেবেন, যদিও সে মানুষ পাপ করে এমনকি সে যদি পাপ করে আল্লাহর বিরুদ্ধেও। ইসলাম মেসোপটেমিয় চুক্তিকে বহাল রেখেছে, যার ফলে দায়িত্ব অর্পিত হয় উভয় পক্ষের উপর, একপক্ষ দাসত্ব করবে, অন্যপক্ষ তার পুরস্কার দেবে, এবং উভয়পক্ষেরই রয়েছে বিশেষাধিকার, একপক্ষ অমান্য করবে, দাসত্ব করবেনা এবং অন্যপক্ষ শাস্তি দেবে।[৪৯]

---

৪৬. তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনের প্রতিষ্ঠিত কর, আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর এই প্রকৃতির কোন পরিবর্তন নেই, ইহাই সরল দিন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা (৩০ : ৩০)।

৪৭. নিশ্চয়ই তারা সমান নয়, যে সব বিশ্বাসী সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও জেহাদে অংশ গ্রহণ করেনা এবং যারা আল্লাহর পথে ধন, প্রাণ দিয়ে জেহাদ করে; যারা ঘরে বসে থাকে, আল্লাহ তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন, যারা জেহাদ করে তাদের। আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জেহাদ করে, তাদেরকে আল্লাহ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্টত্ব দিয়েছেন (৪ : ৯৫)।

৪৮. এবং যদি তোমরা (আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ব্যয় করা থেকে) মুখ ঘুরিয়ে নাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের স্থানে অন্যদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, তারা তোমাদের মত হবেনা (৪৭ : ৩৮)

৪৯. যারা (এই প্রত্যাদেশে) বিশ্বাস স্থাপন করেছে যারা ইহুদী হয়েছে এবং খ্রীষ্টান এবং যারা সারেইন, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার আছে তাদের

www.icsbook.info

৮. জীবন এবং জগত স্বীকৃতি

ইসলামে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মূল থেকে এ ধারণা জন্ম নেয় যে, আল্লাহ মানুষকে স্থাপন করেছেন এমন এক পৃথিবীতে যা হবে তার প্রতি বন্দেগীর রঙ্গমঞ্চ। আল্লাহ যদি অমঙ্গলকামী ধোঁকাবাজি না হন তাহলে মানুষের বন্দেগী অবশ্যই সম্ভব। এই সম্ভাব্যতার দাবী এই যে, জগত হবে নমনীয়, মানুষের কর্মকান্ড গ্রহণে সক্ষম এবং আল্লাহ যে নমুনা বা নক্সা ব্যক্ত করেছেন সেই নমুনাতে তার রূপান্তর সম্ভব। ঐশী ব্যবস্থাপনার আবশ্যিক ফল হচ্ছে, মানুষ এবং জগতের পরস্পরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক উপযুক্ততা।

কল্পনাসর্বস্ব হিন্দু চিন্তাধারা এবং বৌদ্ধধর্ম, জৈন ধর্মের সঙ্গে ইসলামের পার্থক্য এই যে, ইসলাম পৃথিবীকে ন্যায়পরায়ণতা বা ধর্মীয় পরম সুখের জন্য বিদেশ মনে করেনা। পৃথিবী হিসেবে পৃথিবী অস্বীকৃত নয়, এবং প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। পক্ষান্তরে পৃথিবী হচ্ছে নিষ্পাপ এবং শুভ, যা কেবল মানুষ কর্তৃক ব্যবহৃত এবং উপভোগের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে কোন মন্দ নেই, মন্দ কেবল মানুষ কর্তৃক এর অপব্যবহারের মধ্যেই। এই অপব্যবহারই হচ্ছে villain বা দুস্কৃতিকারী যাকে অস্বীকার করতে হবে এবং যার মোকাবেলা অপরিহার্য। অর্থাৎ পৃথিবীর নৈতিক ব্যবহার আবশ্যক, এজন্যই ইসলামের নীতিশাস্ত্রে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। মহানবী (সা.) তার উম্মত অনুসারীগণকে নির্দেশ দিয়েছেন, ইবাদত বন্দেগীর আচার আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারে বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে, চিরকৌমার্যের বিরুদ্ধে, অতিদীর্ঘ উপবাসের বিরুদ্ধে, নৈরাশ্যবাদ ও বিমর্ষ অসামাজিক মানসিকতার বিরুদ্ধে। তিনি তাদেরকে আদেশ করেছেন মাগরিবের আগেই রোজা ভঙ্গ করতে, তাদের শরীর পরিষ্কার করতে, দাঁত ব্রাশ করতে, চুল- দাঁড়ি পরিপাটি রাখতে ও সুগন্ধি ব্যবহার করতে, এবং জামাতে সালাতের সময় সবচেয়ে উত্তম কাপড় ব্যবহার করতে, বিয়ে করতে, বিশ্রাম গ্রহণ করতে ও ঘুমাতে এবং খেলাধুলা ও শিল্পকলার মাধ্যমে নিজেদের সজীব সক্রিয় রাখতে। স্বভাবতই ইসলাম তার অনুসারীদেরকে তাদের বৃত্তিসমূহের অনুশীলনের জন্য নির্দেশ দিয়েছে- আদেশ দিয়েছে, নিজেদেরকে, প্রকৃতিকে এবং যে পৃথিবীতে তারা বাস করছে, তাদের বুঝার চেষ্টা করতে, তাদের খাদ্য, আশ্রয়, আরাম-আয়েশ, যৌনমিলন ও জন্মদানের সহজাত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে, মানুষ এবং প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য স্থাপন করতে। পৃথিবীকে একটি উৎপাদনশীল বাগান, একটি উর্বর খামার এবং সুন্দর উদ্যানে রূপান্তরিত করতে,

---

প্রতিপালকের নিকট, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবেনা। তোমাদের অস্বীকার নিয়েছিলাম এবং তোমাদের উপর তোমাদের ঊর্ধ্বে তুরকে স্থাপন করেছিলাম। অঙ্গীকারটি এই ছিল যে, তারা আমার প্রত্যাদেশকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করবে, এবং সব সময় মেনে চলবে, আল্লাহর ভয়ে (২ : ৬২-৬৩)। তোমরা সৎকর্ম করলে সৎকর্ম নিজেদের জন্যই এবং মন্দকর্ম করলে তাও করবে নিজেদের জন্য (১৭ : ৭)। এবং তোমরা যদি পুনরায় মন্দ কর্মে প্রত্যাবর্তন কর, আমিও তোমাদেরকে আবার শাস্তি দিব (১৭ : ৭-৮)।

www.icsbook.info

নান্দনিক সৌন্দর্যকর্মে তাদের উপলব্ধি, আকাঙ্ক্ষা, ক্রীড়াকান্ড, তাদের রূপায়ন প্রকাশ করতে। এসবই যেমন ইতিহাস তেমনি তা সংস্কৃতিও বটে। ঐশী অভিপ্রায়ের মূল কথাই হল ইতিহাস বিনির্মাণ, সংস্কৃতি সৃষ্টি এবং তা করা সুন্দর হবে। ইহাই সত্যনিষ্ঠতা, সৎকর্মশীলতা, যত সামান্যই হোক, মহাবিশ্বে সমগ্র মূল্যের সঞ্চয়ে প্রতিটি কর্মই ইসলামের মতে কিছু না কিছু যোগ করতে সঙ্গম-আল্লাহর ইবাদতরূপে তার বন্দেগী হিসেবে যদি তা করা হয় কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে। এ কারণে তার দেহ সম্পর্কে মুসলমানের কোন আতিবষ্টতা নেই এবং তার সহজাত কামনা বাসনা পূরণের ব্যাপারেও।একজন সচেতন মুমিন হিসেবে কামনা বাসনার এইরূপ পরিপূরণ হচ্ছে, তার জন্য ভারী, অনাগত জান্নাতের আনন্দের স্বাদবিশেষ, যদি সে আল্লার প্রতি তার কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে নিয়োজিত থাকে। কুরআন আলংকারিকভাবে জিজ্ঞাসা করে, "এই পৃথিবীর যে শোভা ও সৌন্দর্যের বস্তুসমূহ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং সুস্বাদু বিশুদ্ধ জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন, কে তা নিষেধ করার দুঃসাহস রাখে।" এবং আল্লাহই এর জবাব দিয়েছেন গুরুত্ব সহকারে। 'নিশ্চয়ই এগুলো এই পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের উপভোগের জন্য বৈধ এবং বিচার দিনে এগুলোর অধিকারী কেবল তারাই হবে।[৫০] বার বার কুরআন আদেশ করেছে খাও, পিও এবং উপভোগ কর, কিন্তু অমিতাচার করোনা।[৫১]

এতে স্পষ্টই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করার সাফল্য ও কৃতিত্ব সম্মানের বস্তু। পৃথিবী হতে যদি ফল আদায় করতে হয় অবশ্যই পৃথিবীকে চাষ করতে হবে। এভাবে আল্লাহর প্রতি কৃষিকার্যের মাধ্যমে বন্দেগীর মেসেপটেমিও কোভনেন্ট বা চুক্তিমূলক মৌলনীতিকে আবার নতুন করে স্পষ্টরূপ দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীকে একটি ফলের বাগানে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে মানুষ পাবে তার পুষ্টি ও আনন্দ। কুরআন স্বীকার করে, আল্লাহ পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। এ কারণে সৃষ্টির সমস্ত কিছুই মানুষের ব্যবহার এবং উপভোগের জন্য। সমুদ্রসমূহ, নদ-নদী, পর্বতমালা, এমনকি ভূমন্ডল তারকারাজি, সূর্য ও চন্দ্র, সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের ব্যবহার ও নান্দনিক তৃপ্তির জন্য।[৫২]

---

৫০. বল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ আপন দাসদের জন্য যে সব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করল? বল, যারা পার্থিক জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে বিশুদ্ধভাবে বিশ্বাস করে এসব তাদেরই জন্য (৭ : ৩২)।

৫১. হে বনী আদম, প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে এবং আহার ও পান করবে, কিন্তু অমিত আচার করবে, আল্লাহ অমিতাচারীকে পছন্দ করেন না (৭ : ৩১)।

৫২. তিনি সমুদ্রকে তোমাদের বাধ্য করেছেন, যাতে তোমরা তা হতে তাজা মাছ খেতে পার এবং আহরণ করতে পার রত্নাবলী, যার দ্বারা তোমরা অলংকৃত হও, এবং তোমরা দেখতে পাও সমুদ্রের বুক চিরে নৌযান চলাচল করে, এ জন্য যে তোমরা যেন আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার। এবং তোমরা হয়তো তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে (১৬ : ১৪)। এবং আল্লাহ তোমাদের গৃহকে করেছেন তোমাদের আবাসস্থল, বিশ্রাম স্থান; জীবজন্তুর লোম, পশম ও চর্মকে করেছেন তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছেদ; তাবুর উপাদান, এবং যা থেকে তোমাদের পার্থিক জীবনে পেতে পার নানা উপকারিতা (১৬ : ৮০)।

www.icsbook.info

ইসলামের উম্মাহতন্ত্র মানুষের কর্মের ইচ্ছাকে আশির্বাদ করে, "যে কমপক্ষে একবার বায়াতে (খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের নির্বাচনে, রীতিসম্মত নির্বাচনে) অংশগ্রহণ করেনি তার মৃত্যু হচ্ছে একজন অমুসলিমের মৃত্যু" রাসসূলুল্লার (সা.) একটি বিখ্যাত হাদিসে উক্ত হয়েছে।[৫৩] আল্লাহই রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন, তাই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ হচ্ছে একটি ধর্মীয় বা দ্বীনি কর্তব্য। আল্লাহর আইনকে কার্যকর করা হচ্ছে শাসকের দায়িত্ব এবং শাসিতের কর্তব্য হচ্ছে আইন মেনে চলা এবং শাসককে পরামর্শ দেওয়া ও আইন বলবৎ করতে সাহায্য করা। উভয়েরই দায়িত্ব হচ্ছে সমগ্রের প্রয়োজনে এর প্রয়োগকে গভীর মূল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার জন্য তাদের প্রয়াসকে সংহত করা এবং বিশ্বজনীনতার চাহিদা পূরণের জন্য তা ব্যাপক পরিসরে প্রসারিত করা। আর ইসলাম তাই ঘোষণা করে এই হচ্ছে ইসলাম, যা পরম লক্ষ্যের অভিসার, যা এই পৃথিবীতে এবং দেশকালে সম্ভব বলে, তার চূড়ান্ত বাস্তবায়ন, পৃথিবীর রাজত্বের বিকল্প হিসেবে আল্লাহর রাজত্বের কোন প্রয়োজন ইসলামে নেই। এই হচ্ছে একটি মেসায়ার যুগ বা কাল যা এজগতে অস্বীকৃত, কিন্তু অন্য জগতে বাস্ত বায়িত হবে, যেখানে বর্তমান পৃথিবীর মূল্যে জীবনের পরম লক্ষ্য অর্জনীয়; এইরূপ সম্পূর্ণ পরজাগতিক ধ্যান ধারণাকে ইসলাম সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে যুগপথ সমভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে সকল দৈহিক নিগ্রহ, জগৎ অস্বীকৃতি, সন্যাসবাদ ও বৈরাগ্যবাদ। ইসলাম কর্তৃক এই প্রত্যাখ্যান এত প্রবল এবং জগত এতো স্বীকৃত, এতো দৃঢ় ছিল যে, প্রায়ই অভিযোগ করা হত, ইসলাম হচ্ছে বিশুদ্ধ জাগতিকতা। সত্য এই যে, ইসলামের এই জাগতিকতা বিশুদ্ধ জাগতিকতা নয়, বরং তা মিশ্র এবং আল্লাহর উপলব্ধি এবং ইসরামী জীবনের আধ্যাত্মিক বোধ আসলে এই ভূমিকাই পালন করে। ইসলাম নির্দেশ দেয়, জাগতিক জীবনকে অবশ্যই অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। জগতকে আয়ত্ব করতে আল্লাহর আদেশ পূর্ণ করার অভিপ্রায় পূরণ করতে হবে, আল্লাহর অন্যান্য আদেশ দ্বারা যে নৈতিক সীমা নির্দেশিত হয়েছে, তার প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে এ-ই হচ্ছে ইসলামের আধ্যাত্মিকতা। দেহ বিমুক্ত নিরন্তর উপাসনা ধ্যানের জীবন নয়, আত্ম-অস্বীকৃতি ও জগত অস্বীকৃতির জীবন নয়, দেশ কালের মধ্যে যার বাস্তবায়ন সম্ভব নয় তেমন কোন রাজ্যের জন্য আর্তি জীবন নয়। বরং এই পৃথিবীর পূর্ণ উপভোগের জীবন, যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে পৃথিবীকে আরো সুন্দর এবং উন্নত করার জন্য অবিরাম কর্মতৎপরতা, যা নৈতিক নীতিমালার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা আতিশয্য, পরের ক্ষতি, অন্যায়, হিংসা এবং বৈষম্যের বিরোধী।

---

৫৩. সহিহ মুসলিম, আলমুযহিরী কর্তৃক সারমর্মে উল্লেখিত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৪, হাদিস নং-১২৩৩, হাদিসের পাঠটি এইরূপ, "যে কোন ব্যক্তিকে (একটা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের) আনুগত্য থেকে বহিষ্কার করে, সে বিচার দিবসে, আল্লাহর মুখামুখি হবে। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন যুক্তি ছাড়া বায়াত গ্রহণ না করে যে কেউ মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হবে জাহিলি (একজন অমুসলিম) মৃত্যু। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর কর্তৃক বর্ণিত এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন নাফী।

www.icsbook.info

সপ্তম অধ্যায়

সমাজ ব্যবস্থার মৌলনীতি

১. ইসলামের অনন্যতা

সামাজিক আয়তন ও পরিসরের দিক দিয়ে, পৃথিবীতে যত ধর্ম ও সভ্যতার আবির্ভাব হয়েছে ইসলাম যে সবের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে একক ও অনন্য। ইসলাম দুনিয়ার অন্যান্য ধর্ম থেকে আলাদাভাবে দ্বীন বা ধর্মকে জীবনের মূল ব্যাপার বলে গণ্য করে। দেশকালের মূল বিষয়বস্তু ইতিহাসের মূল প্রক্রিয়া বলে গণ্য করে ইসলাম তাকে নির্দোষ, কল্যাণকর এবং নিজ গুণেই বাঞ্ছনীয় ঘোষণা করে– এসবই হচ্ছে নেককাজ ও সৎকর্মপরায়ণতা, যদি তা করা হয় সুন্দর ও উৎকৃষ্টভাবে, এবং এসবই অপবিত্র, অন্যায়, অসদাচরণ, যদি তা করা হয় বিপরীতভাবে। এ কারণে ইসলাম নিজেকে দেশকালের সমস্ত কিছুর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক মনে করে এবং সমগ্র মানবজাতিসহ গোটা ইতিহাসকে সমগ্র সৃষ্টির জন্য সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। প্রকৃতি থেকে আগত বা তার সঙ্গে যা সম্পর্কিত তা নির্দোষ, কল্যাণকর এবং আপনিতে বাঞ্ছনীয়। প্রকৃতি বা জগতের নিন্দার উপর নেককাজ বা নৈতিকতার ভিত্তি হতে পারে না। ইসলাম চায় প্রকৃতি থেকে লভ্য সমস্ত কিছুই মানুষ অর্জনের চেষ্টা করবে, সে খাবে, পান করবে, সে গৃহবাস করবে, আরাম-আয়েশ ভোগ করবে, পৃথিবীকে একটা উদ্যানে পরিণত করবে, দাম্পত্য মিলন উপভোগ করবে। জীবনের সমস্ত উত্তম জিনিস উপভোগ করবে। বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটাবে। শিখবে, জ্ঞান অর্জন করবে, প্রকৃতিকে ব্যবহার করবে, পরস্পর সহযোগিতা করবে। সংক্ষেপে এই সমস্ত কাজই সে করবে, কিন্তু করবে ন্যায়সঙ্গতভাবে, মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে, চুরি ও অন্যকে শোষণ না করে; নিজের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, প্রকৃতির প্রতি এবং ইতিহাসের প্রতি অবিচার না করে। প্রকৃতপক্ষে এ কারণেই ইসলাম মানুষকে খলিফা বলে। এ সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হচ্ছে আল্লাহর অভিপ্রায়ের পরিপূরণ ও রূপায়ণ।

এর পরিণাম স্বরূপ আমরা দেখতে পাব ইসলাম উপরে উল্লেখিত লক্ষ্যগুলোকে সকল মানুষের সাধারণ লক্ষ্য, তাদের মৌলিক মানবাধিকার বলে গণ্য করে এবং এগুলোর নিশ্চয়তা বিধান করতে চায়। এই লক্ষ্যের উপর ইসলাম তার সমাজতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছে। কেবল এই লক্ষ্য, আদৌ বাস্তবায়িত হলেই, ইসলামের মত সমাজব্যবস্থা আবশ্যক। যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, মানুষের সংঘ বা সমাজ হচ্ছে প্রকৃতিগত, ইসলাম তার সঙ্গে যুক্ত করে আবশ্যকতার গুণ। দেশকালের পরিসরে ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থা এবং তার পরিতৃপ্তি, উম্মাহ বা দারুস সালাম (শান্তিনিকেতন) এর সঙ্গে দ্বীন ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা কেবল অতি গুরুত্বপূর্ণ নয়, চূড়ান্তও বটে। ইসলামী আইনের একটি ক্ষুদ্র অংশই ধর্মীয় আচার

www.icsbook.info

অনুষ্ঠান এবং উপাসনা ও নেহাত ব্যক্তিগত নৈতিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত।[১] ইসলামী আইনের বৃহত্তর অংশের সম্পর্ক হচ্ছে সমাজব্যবস্থার সঙ্গে। এমন কি, আইনের ব্যক্তিগত দিকগুলো, যার বিষয়বস্তু উপাসনার আচার অনুষ্ঠান এবং খোদ আচার অনুষ্ঠানসমূহ ইসলামে এতটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আয়তন অর্জন করে যে, সেই পরিসরের অস্বীকৃতি বা দুর্বলতা সেগুলোকেই কার্যত অসিদ্ধ করে দেয়। যাকাত এবং হজ্জের মত কোন কোন রীতি বা আচার-অনুষ্ঠান তাদের প্রকৃতি এবং পরিণামের দিক দিয়ে স্পষ্টতই সামাজিক ধরনের। সালাত এবং সাওমের মত অন্য প্রথাগুলোর সমাজমুখীনতা এর চেয়ে সামান্য কম। কিন্তু সকল মুসলমান একথা স্বীকার করেন যে, প্রার্থনার দ্বারা উপাসকের 'মন্দ প্রবণতার নিবৃত্তি' বুঝায়না, তা অসিদ্ধ।[২] এবং হজ্জযাত্রীর জন্য যে হজ্জ সামাজিক কল্যাণ বহন করেনা তা অসম্পূর্ণ।[৩] ইসলামের হৃদপিন্ড হচ্ছে সমাজব্যবস্থা এবং তার স্থান, ব্যক্তিগত জীবনের পূর্বে বা অগ্রে। আসলে ইসলাম ব্যক্তিগত অবস্থানকে সামাজিক অবস্থানের প্রাক শর্ত মনে করে এবং মনে করে মানব চরিত্র অবগুণ্ঠিতই থেকে যায়, যদি তা সীমিত থাকে ব্যক্তিগতের উপর এবং ব্যক্তিত্বের গন্ডি অতিক্রম করে, সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ না হয়। যে সকল ধর্ম ব্যক্তিকেন্দ্রিক গুণাবলী কর্ষণ করে, ইসলাম সেগুলোর সঙ্গে একমত এবং মনে করে, এ সব গুণাবলীর (আল্লাহর ভীতি, ঈমান, হৃদয়ের পবিত্রতা, নম্রতা, কল্যাণ বদান্যতার প্রকাশ করে, প্রেম ও অঙ্গীকার, ইমানুয়েল কান্ট 'শুভ ইচ্ছার' দ্বারা যা বুঝিয়ে থাকবেন) সম্পূর্ণই আবশ্যক; আসলে ইসলাম এ সকল সৎগুণ ও ন্যায়নিষ্ঠ সৎকর্মকে ধর্মপরায়ণতার অপরিহার্য শর্ত বলে গণ্য করে, কিন্তু এ সমস্তকে এবং এগুলোর অনুসরণকে শূন্য গর্ব বলে জ্ঞান করে, যদি না এ সবের চর্চা যারা করে তারা সমাজের অন্য মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ বৃদ্ধি করে।

ক. ভারতীয় ধর্মগুলো থেকে স্বতন্ত্র

কতকগুলো ধর্মে, বিশেষ করে, উপনষিদীয় হিন্দু ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম জগতকে পাপ গণ্য করে এবং জগতের অস্বীকৃতিকেই পরিত্রাণ বা পরম সুখ বলে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ জগত থেকে মুক্ত হতে পারলেই পরিত্রাণ লাভ ও মহাসুখ ঘটে। অধিকন্তু এই ধর্মগুলো পরিত্রাণকে একটি ব্যক্তিক বা ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে দাবি করে। কারণ তারা পরিত্রাণের সংজ্ঞা দেয়, চৈতন্যের বা উপলব্ধির পরিভাষায়, যা কেবল ব্যক্তিগতভাবেই

---

১. ইসলামী আইনের, আইন বিষয়ক গ্রন্থসমূহের বেশীরভাগেরই বিষয় মু-আমালাত– যা অর্থের দিক দিয়ে স্পষ্টতই সমাজ বিষয়ক। যদি রাষ্ট্র, পরিবার, সমাজ, বিচার বিভাগ এবং ফৌজদারী দন্ডবিধি, যা একইভাবে সমাজ বিষয়ক তা মু-আমালাতের সঙ্গে যোগ করা হয়, সেগুলো সেই সব গ্রন্থের কেবল একটি সামান্য ভগ্নাংশেই হবে, যা আচার অনুষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত নৈতিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত।

২. সালাত অশ্লীল এবং মন্দকর্ম থেকে মানুষকে বিরত রাখে (২৯ : ৪৫)।

৩. সকলের জন্য হজ্জের কথা ঘোষণা করে যাও (হজ্জ সম্পাদন) করতে মানুষ আসবে পায়ে হেটে অথবা বাহনে চড়ে, পৃথিবীর প্রত্যেটি কোণ থেকে, যাতে করে তারা এ থেকে ফায়দা অর্জন করতে পারে (২২: ২৮)।

www.icsbook.info

অর্জিত হতে পারে। জগতের উন্নয়ন এবং সে কারণে তার সম্প্রসারণ, জগতে অন্ত র্নিহিত বস্তুকেন্দ্রিক প্রক্রিয়াকে গভীরতর করার জন্য জগতের সঙ্গে নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া হচ্ছে পাপ। উদ্দেশ্য যখন এর সম্পূর্ণ বিপরীত, কেবল তখনই জগতের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ককে স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ পৃথিবীর কবল থেকে এবং এর 'কর্ম' থেকে পূর্ণ মুক্তি অর্জন ঘটে, তাই (নিজেকে বিলুপ্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখার আইন বা বিধান)– হিন্দু ধর্মে কেবল মাত্র কর্তার ক্ষেত্রে, অথবা বৌদ্ধ মতবাদে কর্তা ও অন্যদের জন্য এবং সে কারণে মিশনারী কর্মতৎপর ব্যক্তিদের বেলায়-উভয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আয়তনটি কেবল আদি ব্যাপারই নয়, বরং নৈতিকতা ও পরিত্রাণের সমগ্র প্রক্রিয়াটি এ নিয়েই গঠিত। পক্ষান্তরে, মানুষের সামাজিক কর্মকান্ড একটা রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই হউক, মূলত পাপ বা মন্দ, কেননা প্রকৃতিগতভাবে তা জগতের স্থায়িত্ব বা সমৃদ্ধি চায়। অর্থাৎ জৈবতাত্ত্বিক, বৈষয়িক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবন– সংক্ষেপে জগতের স্থায়েত্ত্ব ও সমৃদ্ধি তার লক্ষ্য।[৪] হিন্দুরা যদি একটা সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ সাধন করে থাকে, একটা রাষ্ট্র, একটা সাম্রাজ্য, একটা সভ্যতা এবং এখন পর্যন্ত বিদ্যমান একটা বিশিষ্ট মানব সম্প্রদায় সৃষ্টি করে থাকে, তা তারা করেছে উপনিষদীয় দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে। যদি তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যে তাদের সমাজব্যবস্থা স্বীকৃতি পেয়ে থাকে, তা পেয়েছে যা অনিবার্যতার সঙ্গে আপোস করে। ইহা এমন একটি স্বীকৃতি যা না মানা বা গ্রহণ না করাই বরং ব্রাহ্মণের পক্ষে শ্রেয়। পক্ষান্তরে, দৃষ্টান্তস্বরূপ বৌদ্ধরা অশোকের রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও প্রয়াস মেনে নিতে ও তার প্রতি ইতিবাচক সমর্থন দিতে পেরেছে। পৃথিবী থেকে বাঞ্ছিত সুখ অর্জনে অন্যদের সাহায্য করার জন্য এক্ষেত্রে বুদ্ধ সংঘ নামে একটা সমাজব্যবস্থা গঠন করেছে, যা হচ্ছে পরিত্রাণকামী সন্যাসী বা ব্যক্তিদের প্রথম সম্প্রদায়।[৫]

খ. ইহুদী মতবাদ থেকে ভিন্নতা

এই দৃশ্য বা পরিসরের অন্য প্রান্তে, যা ভারতীয় ধর্মবোধ থেকে সম্পূর্ণ বৈপরিত্যের দিক থেকে কম নয়, রয়েছে হিব্রুদের বিষয়টি, তারা নিজেদেরকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছে এবং তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে তাদের স্বপ্ন যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে তাতে করে, মানব জাতি থেকে রয়েছে তারা হচ্ছে একটি ভিন্ন জনগোষ্ঠী। তারা হচ্ছে খোদার 'পুত্র এবং কন্যা', স্রষ্টার সঙ্গে তাদের বিশেষ সম্পর্কের কারণে বাকি সকলের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য। ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত আইন কেবল তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্যদের নয় এই বিধান আদেশ নিষেধের মাধ্যমে যে সমাজব্যবস্থাকে তুলে ধরে, তার অধিকারী কেবল হিব্রুরাই। ওদের ধর্ম ছিল একটি ট্রাইব (Tribe) কেন্দ্রিক

৪. Murti. *The Central Philosophy* vol-1 P 19. Robert Zachner. Hinduism (New York Oxford University Press 1966) pp. 125-26

৫. John B. Noss. *Man's Religions* (New York: Macmillan 1974) 5th ed pp. 126-27

www.icsbook.info

ধর্ম, যাতে ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে একটি ট্রাইব বা জনগোষ্ঠীর হিত এবং ক্ষতির পরিভাষায়। তাদের সমাজ ব্যবস্থার ছিল একটি জৈবতাত্ত্বিক ভিত্তি। কেবল জন্মগত ইহুদীরাই ইহুদী এবং ঐ ইহুদীদের ইহুদী ধর্মে ধর্মান্তর গ্রহণ কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং তা রাখতে হবে একটি ন্যূনতম পর্যায়ে। এ হচ্ছে জাহিলিয়ার রেসিজম, বংশ বা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ববোধ, যার মধ্যে মূল্যের কোন চর্চা নেই, মুরুয়াহ (সাহস, বীরত্ব, মহানুভবতা) নেই, যা এর মূলগত মন্দ প্রকৃতি বা পাপকে লাঘব করতে পারে। কারণ হিব্রু ইতিহাস, যা তাওরাত কর্তৃক আদর্শায়িত বা সহজ কথায় পবিত্রিকৃত, প্রত্যাদেশ দ্বারা এবং অন্যান্য সেসব সাহিত্য যা নিয়ে ওল্ড টেস্টামেন্ট গঠিত, এবং যেভাবে তা সাধারণভাবে জ্ঞাত, তা হচ্ছে ঐসব মূল্যের সম্পূর্ণ বিপরীত মূল্যে পরিপূর্ণ।[৬] এক্ষেত্রে হিব্রু এবং তাদের বংশধর ইহুদীদের বেলায়, সম্মান অথবা ন্যায় বিচারের যে কোন মূল্যে, ট্রাইবের উদবর্তন বা অব্যাহত অস্তিত্বই হচ্ছে লক্ষ্য। নেক কর্ম বা নৈতিকতার যে কোন মূল্যে রেস বা বংশের উদবর্তন বা অব্যাহত অস্তিত্বই হচ্ছে বাঞ্ছনীয়। এমনকি, ইসরাইলের নিজ সামাজিক আইনের মধ্যে তা পবিত্রতম, যেমন অগত্যা নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে যৌন সংসর্গ এবং ব্যভিচারও অলংঘনীয় নয়, যখন 'ইব্রাহীমের বংশধারার বিরবচ্ছিন্নতা বিপন্ন হওয়ার প্রশ্ন উঠে।[৭]

গ. খ্রীষ্টান ধর্ম থেকে পার্থক্য

খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে এই মারাত্মক নৃতত্ত্ব কেন্দ্রীকতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে যা হযরত ঈসার সময়ে নিষ্প্রাণ আইন সর্বস্বতায় ফসিলিকৃত হয়ে উঠেছিল। অপরিহার্যভাবেই হযরত ঈসার আহ্বান ছিল বিশ্বমুখী এবং ব্যক্তি অভিমুখী বা অন্ত র্মুখী। ইহুদীদের জাতিগত কুল গৌরবের মন্দ পরিণাম সম্পর্কে ঈসা এতটাই সচেতন ছিলেন যে, তাঁর আত্মীয়রা, যেহেতু তাঁরই আত্মীয়, এজন্য অধিক পাবার দাবীদার এমন ইঙ্গিত মাত্রেই তিনি ক্রুদ্ধ হতেন।[৮] ঈসার এই আহ্বান যা সারবত্তার দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে নৈতিকতাভিত্তিক (কেননা তার খোদা এবং কিতাব ইহুদীদের খোদা এবং কিতাব মূলতই অভিন্ন) তা পরিণত হতে পারতো একটি স্থায়ী আন্দোলনে যাতে ইহুদীদের বাড়াবাড়িগুলো সংশোধন হতে পারতো, যদি এর অনুসারীরা সেমিটিক

---

৬. Ismail R. al-Faruqi. *Usul al-Sahyuniyah fi al Din al Yahudi* (Cairo Mahad al Dirasat al Arabiyah al Aliyah 1963)

৭. কনিষ্ঠা কন্যাটিরও একটি পুত্র ছিল, যার সে নাম দিয়েছিল Benammi (Genesis. 19: 38)।

৮. যীশুর মা এবং ভাইয়েরা যখন এলেন, তখনও তিনি লোকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন, ওরা বাইরে দাঁড়িয়েছিল এবং চেয়েছিল তার সঙ্গে কথা বলতে। তাই তাদের একজন তাকে বলল, দেখ তোমার মা এবং ভাইয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এবং তারা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। উত্তরে তিনি বললেন, আমার মাতা কে, আমার ভাইয়ারা বা কারা। এর পর তিনি আপন শিষ্যদের দিকে হাত বাড়িয়ে বল্লেন, এই দেখ আমার মাতা এবং ভ্রাতারা আমার নিকট পূর্ব থেকে যা কিছু বলেন, যে তা পালন করে, সেই আমার ভাই, বোন ও মা (মথি ১২: ৪৯-৫০)। এই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়েছে মার্ক (৩: ৩১-৩৫)-এ।

www.icsbook.info

অর্থাৎ ফিলিস্তিনী এবং তাদের পড়শীদের মধ্যে সীমিত থাকতো। কিন্তু গ্রীকদের দ্বারা গৃহীত হবার ফলে ঈসার এই দাওয়াত নতুন একটি 'রহস্য ধর্মে'[৯] রূপান্তরিত হয়। সেমাইটদের লোকোত্তর খোদা হয়ে উঠলেন ত্রিত্ববাদের মধ্যে এক 'পিতা', যে ত্রয়ীর দ্বিতীয় জনকে নির্মাণ করা হয়েছে মিত্র এবং এডোনিসের প্রতিকৃতিতে, যে মৃত্যুবরণ করে আবার বেঁচে উঠে, আবেগ মুক্তি বা মোক্ষণের মাধ্যমে পরিত্রাণ এনে দেবার জন্য।[১০] যীশুর অন্তর্মুখীনতার পরিণয় বন্ধন ছিল বস্তুর প্রতি অসুস্থ ঘৃণার সঙ্গে যা বুদ্ধিসর্বস্ব জ্ঞানতত্ত্বের একটি বৈশিষ্ট্য, পরিণয় বন্ধন ছিল সমগ্র রাজনৈতিক জীবন তথা রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সামগ্রিক নিন্দাবাদে ইহুদী ট্রাইবেলিষ্ট রাজনীতির প্রতি তার সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গির সহিত। মুক্ত নাগরিকদের দাস সমাজ থেকে পৃথকীকরণ এবং মুক্ত নাগরিকদের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক নপুংসকতা ছিল চর্চা বা ধর্ম থেকে রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের সূচনা। খ্রীষ্টান চার্চ বা ধর্ম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন করে, এবং এক সময়ে দুই তরবারীর তত্ত্ব সাধারণভাবে গৃহীত হয় একটি রাজনৈতিক থিওরী হিসেবে, কিন্তু তা ছিল আদি খ্রীষ্টান বিবেকের পরিপন্থী। এই বিবেকের বিদ্রোহ ঘটে লুথারের মাধ্যমে এবং চার্চকে আবার নিয়ে বন্দী করা হয় সেই খাঁচার মধ্যে, যা চার্চের প্রথম দিকের মতবাদ নির্মাণ করেছিল তার চার পাশে। আজ কদাচিৎই কোন খ্রীষ্টান ধর্মানুসারী মধ্যযুগের থিওরিকে গ্রহণ করে। কদাচিৎ কোন খ্রীষ্টান রাজী হবে রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মকে একটি অংশ দিতে, দূর থেকে সমালোচনা করার অধিকার দেওয়া ছাড়া।[১১]

বর্তমানে খ্রীষ্টান ধর্মের কোন সমাজ বিয়সক থিওরী নেই।[১২] দেশকাল এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার নিন্দা, প্রত্যেকটি জাগতিক কর্মকান্ড, এমনকি খোদ সমাজ ব্যবস্থাকে অসার এবং পরিত্রাণ লাভের প্রক্রিয়ার সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক গণ্য করায় খ্রীষ্টান ধর্মে কোন থিওরীর অবকাশ নেই। সমাজ ব্যবস্থাকে অপরিহার্য পাপ বলে গণ্য করা ছাড়া, কল্যাণ-বিধানের বাইরে দাঁড়িয়ে, এমনকি তার জাগতিক অস্তিত্বে খ্রীষ্টান ধর্ম যতটুকু সংশ্লিষ্ট (ঈসার শরীর হিসেবে এর বাহ্য অস্তিত্ব যা এই পৃথিবীর নয়, কিংবা এ পৃথিবীতে নেই) তাতে করে খ্রীষ্টান ধর্ম হচ্ছে একটি অস্থায়ী প্রতিষেধক, যেখানে দান-দক্ষিণা এবং বিশ্বাস হচ্ছে দৈনন্দিন বিধান। কিন্তু এতে প্রোগ্রাম ভিত্তিক কর্মকান্ড অথবা আইন কানুনের জন্য প্রয়াসের কোন মূল্য নেই, যেখানে ইতিহাস নিজেই অপ্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বহীন। আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, শিল্প বিপ্লবের সময়

---

৯. Franz Cumont. *Oriental Religions in Roman Paganism* (New York ... Dover Publications 1956) p 210

১০ Ibid. pp. 117 134. M. John Robertson. *Pagon Chrissts* (Secaucus N. University Books 1911) p. 108. ff. Carl Clemen. *Primitive Chritianity and Its Non-Jewish Sources* tr. Robert G. Nisbet (Edinburgh T & T Clark 1972) pp. 182ff.

১১. Karl Barth. *Against the Stream* (London : SCM Press 1954) pp 29-31.

১২. Reinhold Nicbur, *Moral Man* and Immoral Society (New York Scribner's 1955)।

www.icsbook.info

থেকে ইউরোপে এবং উত্তর আমেরিকায় খ্রীষ্টান চিন্তাবিদরা খ্রীষ্টান ধর্মের নামে ক্রমবর্ধমান হারে সামাজিক ন্যায়বিচারের উচ্চতর ব্যবস্থার জন্য পরিকল্পনা আহ্বান করেছেন এবং তা কার্যকর করেছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের এ সমস্ত কর্ম জগত বিমুখতা থেকে খ্রীষ্টান ধর্মকে নড়াতে পারেনি। দারিদ্র বিমোচনের জন্য আবশ্যক এবং অত্যন্ত হিতকর হলেও, কিংবা বুদ্ধিভিত্তিক দিক দিয়ে একটি নৈতিকতা ও ন্যায়পরায়ণতাবোধ সঞ্চারিত করার প্রয়াস সত্বেও তাদের কর্মকান্ড অসার প্রমাণিত হয়েছে।[১৩] যা বিশ্বাসে মৌলিক সূত্রগুলোর সংস্কারের জন্য প্রয়োজন, তা সাধনের জন্য আজ পর্যন্ত কদাচিৎ কেউ দুঃসাহস করেছে– যেমন আল্লাহর প্রকৃতি, সৃষ্টির লক্ষ্য, মানুষের প্রকৃতি ও গন্তব্য। যত দিন না তা করা হয়েছে ততদিন খ্রীষ্টান চিন্তাধারা স্বতঃবিরোধীই থেকে যাবে, সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার নীল নক্সা নিয়ে তারা যতই অগ্রসর হোক-না-কেন।

ঘ. আধুনিক সেক্যুলারিজম থেকে ভিন্নতা

স্পষ্টতই ইসলামী সমাজব্যবস্থা হচ্ছে আধুনিক সেক্যুলারিজমের (ধর্মহীন নিরপেক্ষতা) সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্তমান ধর্ম নিরপেক্ষতা চায় ধর্মের সম্ভাব্য সকল নিয়ন্ত্রণ থেকে সমাজের পাবলিক বা রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকান্ডকে দূরে রাখতে। পাশ্চাত্য জগতে সেক্যুলারিজমের ইতিহাসে যা দেখা যায়, তার প্রধান যুক্তি হচ্ছে ধর্ম অন্য সকলের উপর সমাজের একটি অংশ বা চার্চের একটি কায়েমী স্বার্থ, যেহেতু চার্চের অভ্যন্তরীণ গঠন এবং তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া কর্তৃত্ববাদী, যাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা উপেক্ষিত, এবং যেহেতু তাতে সমগ্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব নেই, তাই চার্চ কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ নির্ধারণ অত্যাচারের সামিল, একটি গ্রুপ বা দল কর্তৃক জাতির শোষণ এবং দমনের একটি প্রকার। পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে যুক্তিটি নিশ্চয়ই সত্য, যেখানে প্রাথমিক চার্চ জনসংখ্যার কেবল একটি অংশেরই প্রতিনিধিত্ব করে, সেখানে ক্যাথলিক খ্রীষ্টান মতবাদ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বিরোধী কর্তৃত্ববাদী শক্তিরূপে এবং জনগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় গড়ে তুলে কায়েমী স্বার্থ। বহু শতাব্দী ধরে ক্যাথলিক চার্চ যেহেতু ইউরোপে সবচেয়ে বেশী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির অধিকারী ছিল সেকারণে সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির যে কোন আন্দোলন স্বভাবতই চার্চের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রামের রূপ নেয়।[১৪]

অধিকতর সাম্প্রতিককালে, সেক্যুলারিজম বলছে, ধর্ম থেকে উদ্ভূত মূল্যসমূহের দ্বারা রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ নির্ধারণের বিরোধীতা তার লক্ষ্য। কেননা, উৎস হিসেবে

---

১৩. See this author's Christian Ethics pp. 279 ff.

১৪. বিভিন্ন থিয়রির দীর্ঘ তালিকা এবং যারা রিফর্মেশনকে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও নৃতাত্ত্বিক খন্ডে ব্যাখ্যা করেছেন, তার রেফারেন্সের জন্য দেখুন : *The New Schaff-Herrzog Encyclopedia of Religious Knowledge.* s.v. Reformation (1.Theories of the Reformation) vol.9.417-418.

www.icsbook.info

ধর্মকে পাশ্চাত্য বিশ্বাসের অযোগ্য বলে গণ্য করে।[১৫] দাবি করা হয়, এই উৎস হচ্ছে অযৌক্তিক কৃসংস্কারপূর্ণ এবং নির্বিচারী। বলাবাহুল্য, এই সব অভিযোগের প্রতি মানুষ সহানুভূতিশীল তখনই হতে পারে, যখন অভিযোগগুলো উত্থাপিত হয় খ্রীষ্টান ধর্ম এবং সেই সব ধর্মের বিরুদ্ধে যেসব মতবাদের ভিত্তি হচ্ছে অন্ধবিশ্বাস অথবা সেই সব ধর্মের বিরুদ্ধে ইতিহাসের নির্দিষ্ট কোন কোন যুগে যাদের অবক্ষয় ঘটেছে। কিন্তু এসব অভিযোগ সেই সব ধর্মের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক, যেগুলো স্বভাবসংগত অর্থাৎ যৌক্তিক ধর্ম, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার অধিকারী যা যুক্তি বিচারের মানদন্ডের সার্বজনীন বৈধতা স্বীকার করে। অথবা সেই সব ধর্মের ক্ষেত্রেও তা অপ্রসাঙ্গিক যেগুলো তাদের স্থবিরতা ও অবক্ষয়ের যুগ তিক্রম করার প্রয়াস পায় সব প্রেমিস বা প্রস্তাবনা বাক্যের প্রতি সমালোচনার আলোকে যৌক্তিক আবেদন জানিয়ে, সকল প্রকৃত মানবিক মূল্যবোধ যে সব প্রেমিসের অন্তর্গত। অবশ্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সেক্যুলারিজমের অনুসরণ করা হয় অগভীর মুক্তিতে। তাদের মুক্তি এই যে, বিজ্ঞানের যুগ সেক্যুলারিজমের বাস্তবতাবাদ ও প্রগতির সঙ্গে অভিন্ন মনে করে। অথচ ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, ধর্ম সেক্যুলারিজমের বিপরীত মূল্যসমূহ জারি করে, আর এটি এমন একটা দাবী যার অবস্থান সত্য থেকে চূড়ান্ত দুরত্বে। প্রকৃতপক্ষে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই দাবীটি হচ্ছে কপটতামূলক, কেননা কোন সমাজ দাবী করতে পারেনা যে, কোন মূল্যের সাহায্য ছাড়াই তার ক্রিয়াকান্ড নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়, বা এমন সব মূল্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যা তার নিজ ধর্মের উত্তরাধিকার থেকে মোটেই অর্জিত নয়।

২. আত্ তাওহীদ এবং সমাজবাদ

'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই', একথা স্বীকার করার মানেই হচ্ছে তিনিই বিশ্বের একমাত্র পালনকর্তা ও বিচারক, এ কথার স্বীকৃতি। এই সাক্ষ্য থেকে এ সিদ্ধান্ত সূচিত হয় যে, মানুষকে একটা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, কারণ আল্লাহ অযথা সৃষ্টি করেন না, এবং সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে এই পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কিত ঐশী অভিপ্রায়ের রূপায়ণ, যে পৃথিবী হচ্ছে মানব জীবনের রঙ্গমঞ্চ। এই স্বীকৃতির ফলে একজন মুসলিম, দেশ এবং কালকে অতি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। কেননা, এ হচ্ছে, যে দেশ এবং কালে সে অস্তিত্বশীল তার সঙ্গে সম্পর্কিত ঐশী প্যাটার্ণ বা নমুনার রূপায়ণ, যার ফলে সে লাভ করে পরম পরিতৃপ্তি বা স্বস্তি। আল্লাহ তাকে আদেশ করেছেন, তার সঙ্গী-সাথীদের সাথে সহযোগিতায় কাজ করতে। তাওহীদের আওতায় মুসলমানের জীবন অতিবাহিত হয় নিরবচ্ছিন্ন পর্যক্ষেবেণর অধীনে। সমস্ত কিছু জানেন এবং সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ হয়, আর মানুষ মানুষ ভালো কিংবা মন্দ যা কিছু করে, তার হিসাব রাখা হয়। আল্লাহর অভিপ্রায় অবশ্যই প্রাসঙ্গিক ও সংগত এবং তার চিহ্নিত প্যাটার্ণ বা নমুনা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। তাই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত সারা বিশ্বে ঐশী নমুনার বাস্তব রূপদান।

---

১৫. Harvey Cox. *The Secular City* (New york : Macmillan. 1956)

www.icsbook.info

আর পবিত্র গ্রন্থে আল্লাহ আদেশ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন এক উম্মাহ হউক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ নিষেধ করবে। এরাই সফল কাম।"[১৬] এই আদেশই হচ্ছে উম্মাহর সনদ যার দ্বারা এই উম্মতের সৃষ্টি হয়েছে এবং তার সংবিধান দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে আল্লাহর ইচ্ছার রূপদানের জন্য এ হচ্ছে একটি মানব সংঘ। এটি একটি বৈধ জাগতিক প্রতিষ্ঠান, কেননা কেবল এই ধরনের সংঘের মাধ্যমেই উচ্চতর, তথা ঐশী অভিপ্রায়ের নৈতিক অংশটি ইতিহাস হয়ে উঠবে। যেহেতু নৈতিক হওয়ার জন্য কর্মকর্তার স্বাধীনতা আবশ্যক তাই উম্মাহ, যা কিনা নৈতিক কর্মকর্তাদের একটি সংঘ তাও অবশ্যই হবে স্বাধীন ও মুক্ত। এই উম্মাহ তার জীবনে ঐশী অভিপ্রায়ের দ্বারা পরিচালিত হয়, কারণ এই অভিপ্রায়ই হচ্ছে তার অস্তিত্বের একমাত্র শর্ত।[১৭] আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে কুরআনে এবং মহানবীর সুন্নাতে। এটি বিদ্যমান রয়েছে প্রকৃতিতে, যা মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি আবিষ্কার করবে এবং প্রতিষ্ঠিত করবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বা বাস্তবে। সম্ভাবনার আকারে ইহা প্রকৃতিতেই নিহিত রয়েছে। যা যুক্তি-বুদ্ধি ও বোধের মাধ্যমে অনুধাবন বা উপলব্ধি করতে হবে। অধিকন্তু কুরআনে আরবী ভাষায় ঐশী অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে এবং মহানবীর কর্মে ও আচরণে তা বাস্তবে রূপ পেয়েছে। মূলত হাদিস হচ্ছে এরই বাহ্যরূপ, নিত্যদিন এগুলো পালন করবার জন্য এই অভিপ্রায়কে বিধি-বিধানের রূপদান করেছেন মহানবী, তার সাহাবাগণ এবং উম্মাহর আইনবেত্তাগণ। আদর্শগত রূপের দিক দিয়ে এই আইন হচ্ছে ঐশী এবং অলংঘনীয়। কিন্তু ইহা তার প্রেক্ষিতে রূপের দিক দিয়ে সবসময়ই সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার প্রয়োজনের অধীন, ব্যক্তি এবং উম্মাহর অভিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক ফায়দার পক্ষে।

তাই উম্মাহ তার নিয়মকানুন দ্বারা শাসিত নয়, কিংবা এর শাসিত জনগণ দ্বারা শাসিত নয়, উভয়ই আইনের অধীন। শাসক হচ্ছে আইনের এক্সিকিউটর বা কার্যকর শক্তি মাত্র। যে কার্য সম্পাদন করে সে কর্তাই হোক অথবা অন্যের কর্মকাণ্ডের কারণে সে পীড়িতই হোক। উভয়ের ক্ষেত্রেই আইন হচ্ছে বিধি-বিধানকে মুহূর্তে বা অভিলম্বে কার্যকর করার হাতিয়ার। উম্মাহ একটা আইন পরিষদ নয়, উম্মাহ আইন প্রণয়ন করেনা, কিংবা জনসাধারণের সাধারণ ইচ্ছার অভিব্যক্তি নয় আইন। আইন হচ্ছে ঐশী সম্ভূত। ইহা আসে আল্লাহর কাছ থেকে এবং সে কারণে আইন হচ্ছে সর্বোচ্চ। যখন মুসলমান বলে আল্লাহ ছাড়া কারো সার্বভৌমত্ব নেই বা "আল্লাহ হচ্ছেন একমাত্র অধীশ্বর, সার্বভৌম প্রতিপালক এবং মালিক"– যা একজন মুসলিমের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সার ও মর্মকথা, তখন সে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির উপর সার্বভৌম ক্ষমতার

---

১৬. তোমাদের মধ্যে একটি উম্মত হউক যা মানুষেকে সৎকার্যের দিকে আহ্বান করবে এবং মন্দকর্ম নিষেধ করবে। এরাই সফলকাম (৩ : ১০৪)।

১৭. মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের কে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে আনয়ন করা হয়েছে, কারণ তোমরা সৎকর্মের নির্দেশ দাও, মন্দ কর্ম নিষেধ কর এবং আল্লাহতে তোমরা বিশ্বাসী (৩:১১০)

www.icsbook.info

অধিকারী। উম্মাহর অভ্যন্তরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছে ঐশী আইন বা আল্লাহর আইন, শাসক নয়, যে কেবল তা কার্যকর করে। তাই উম্মাহ হচ্ছে একটি নমোক্র্যাসি, একটি রিপাবলিক, যেখানে শাসন ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছে আইন। উম্মাহ একটি থিয়োক্র্যাসি বা পুরোহিততন্ত্র নয়, কারণ, এতে কেউ আল্লাহর নামে ঐশীপদ এবং শাসন ক্ষমতার অদিকারী হয় না। এ এক 'গণতন্ত্র', 'গোষ্ঠীশাসন' বা 'স্বৈরশাসন' নয়, যাতে ব্যক্তি, দল বা সমগ্র জনগোষ্ঠী নিজ অধিকার বলে শাসন করার অধিকার অর্জন বা উপভোগ করে। এর কোনটিই আইনের উৎস নয়, যাতে করে এমন দাবী করা যেতে পারে যে, রাজনৈতিক শাসনের লক্ষ্য হচ্ছে, সেই ব্যক্তি বা সমগ্র জনগোষ্ঠীর চরিত্রার্থতা। উম্মাহর অস্তিত্ব এবং কর্মকাণ্ড তখনই বৈধ বলে গৃহীত হয় যখন তা ঐশী নির্দেশমালা পূরণ করে। যে মুহূর্তে উম্মাহর কর্মকান্ডে ইসলামী আইন আর বলবৎ নয়, উম্মাহ তখনই তার ইসলামী প্রাধিকার হারিয়ে ফেলে। তখনই বিপ্লবের অবস্থা সৃষ্টি হয়। বস্তুত এমন অবস্থায় মুসলিম নাগরিকদের কর্তব্যই হচ্ছে বিপ্লব সাধন যা 'তোমাদের মধ্যে একটি উম্মাহ হউক..."[১৮] আল্লাহর এই আদেশকে পূরণ করার ইচ্ছায় সম্পাদিত হবে।

৩. তাত্ত্বিক তাৎপর্য

ঐশী অভিপ্রায় বা আল্লাহর ইচ্ছায় উপলব্ধি ও বাস্তবায়ন কিংবা মূল্যের বাস্তব রূপদানের জন্য উম্মাহ আবশ্যক, অর্থাৎ এমন একটা মানব সংঘ প্রয়োজন যা ঐশী ইচ্ছার দ্বারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ এবং কর্মে অনুপ্রাণিত। এর এই আবশ্যকতা নিম্ন বর্ণিত বিবেচনার দ্বারা নির্দেশিত, যার সমস্ত কিছুই সূচিত হয় ইসলামে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রকৃতি থেকে।

ক. ইসলামী জীবনের জন বা গণ প্রকৃতি

ইচ্ছার নৈতিক ক্ষেত্রে, যেখানে নৈতিক গুণ হচ্ছে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রতিটি মুহূর্তের দায়িত্বের স্বীকৃতি বা অঙ্গীকার এবং সে কারণে তা কর্মকার্তার উপলব্ধির অবস্থাই তাই কর্মকর্তার নিজস্ব বিবেক এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোন বিচারক হতে পারেনা। কেননা যেহেতু বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং মনোগত এবং হৃদয়ের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কেউ কিছু জানেনা, জানেনা এর প্রণোদনা ও আন্তর্জাতিক ক্রিয়া সম্পর্কে, তাই কর্মকর্তা নিজে ছাড়া নৈতিক অভিপ্রায়ের উপর ভিত্তিমূল যে কোন সমাজব্যবস্থাই চালিত হবে, একটি 'সম্মান রক্ষার' আলোকে, যেখানে সব সময়ই বিচারক হচ্ছে ব্যক্তির বিবেক। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্য অপর কোন ব্যক্তির কেবলমাত্র পরামর্শদাতার ভূমিকাই থাকতে পারে; এমনকি যেখানে বিবেক (নৈতিক এজেন্টকে) অপরাধী ঘোষণা করেছে, এবং কাফফারা বা ক্ষতিপূরণের জন্য রায় দান করেছে সেক্ষেত্রেও, বিবেকই হচ্ছে, সেই রায় কার্যকরকরণের একমাত্র বিচারক। যে

---

১৮. প্রাগুক্ত।

www.icsbook.info

কোন অবস্থায়, রূপান্তরের কাম্য হচ্ছে বিবেকের অনুজ্ঞা অনুযায়ী, বিবেকের আওতায় এবং বিবেকের মাধ্যমে রূপান্তর। স্পষ্টতই অপরাধ নিরূপণ এবং সংশোধনের জন্য কেবলমাত্র বিবেকই আবশ্যক, পড়শী বা অন্য ব্যক্তির বাস্তব অস্তিত্ব আবশ্যক নয়। প্রতিবেশী বা অপর ব্যক্তিদের 'আইডিয়া' এরূপ হতে পারে কেননা এই কর্মকর্তার মধ্যে এই আইডিয়ার উপস্থিতিতে (যদি কেবল দৃষ্টিবিভ্রমও হয়) তার ইচ্ছাই কর্ম অথবা অভিপ্রায়কে নীতি সংগত বলে গণ্য করার জন্য যথেষ্ট। কর্মের নৈতিকতার ক্ষেত্রে তা ভিন্ন, যেখানে দেশকাল বিঘ্নিত হয়েছে এবং পরিমাপযোগ্য পরিণাম সৃষ্টি হয়েছে, যাতে করে কর্মের ভাল কিংবা মন্দ সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় আইন বা বিধিবিধান সম্ভব নয়। আইনের গবেষণা, প্রণয়ন, প্রবর্তন, স্তরে স্তরে বিন্যস্ত একটি বিচারক ব্যবস্থা এবং একটি শাসনযন্ত্রসহ আইন হচ্ছে আবশ্যক। সমাজ বা উম্মাহ যে সব শাখা প্রশাখা নিয়ে গঠিত এবং যে সব কর্মকান্ড ও কর্তব্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এগুলো হচ্ছে এরই শাখা প্রশাখা এবং যন্ত্র। এর দ্বারা অবশ্য বিবেক অনাবশ্যক হয়ে পড়েনা, কারণ, এক্ষেত্রে যেমন, তেমনি মানুষের নিয়্যতের নৈতিকতার মধ্যেও তা সক্রিয় থাকে। এ ছাড়াও এবং এর বাইরেও নতুন সমাজ যন্ত্রটি (আইন প্রণয়নমূলক, বিচার বিষয়ক ও প্রশাসনিক) প্রবেশ করবে এসব ক্ষেত্রে, এবং মানুষের জীবনকে শাসন করবে। মানুষের নিয়্যত বা অভিপ্রায় নয়, সৃষ্টির কার্যকরণ বন্ধন থেকে বিচ্যুতি বা জাগতিক ভারসাম্য বিনষ্ট, শুভমুখী হউক অথবা মন্দই হউক, তার আলোকেই বিচার্য থাকে। তাই বিবেকের বাইরেও ইসলাম স্থাপন করেছে আইন বা বিধান। চার্চ ও মুরব্বী এবং শিক্ষক ও আদর্শ নির্দেশক হিসেবে পুরোহিত বা মোল্লাদের ডিঙিয়ে, ইসলাম স্থাপন করেছে বিচারালয় ও রাষ্ট্র।

খ. বাস্তব-অস্তিত্বশীল, কংক্রীট, সামাজিক কাঠামোর আবশ্যকতা

দেশ কালের রূপান্তর এবং নৈতিক মূল্য হিসেবে আমানতের (ঐশী আমানত) প্রকৃতি সম্পর্কে ইসলামী ধ্যান-ধারণার নৈতিক ধর্মীয় নির্দেশ থেকে এ সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক হয়ে উঠে যে, মানবজাতি এবং জগতকে বাদ দিয়ে ইসলাম অসম্ভব। এটা স্পষ্ট যে, দেশকাল না থাকলে এবং বিশ্বের ব্যবহারকারী হিসেবে মানুষের সঙ্গে এরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান না থাকলে স্থান বা দেশের রূপান্তর সম্ভব নয়। কেননা মানুষ জগতকে কাজে না লাগালে জগতের পরিবর্তন অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই রূপান্তর বা পরিবর্তনের ফল মানুষ ব্যবহার না করলে, ইসলামের দাবী মতে এই রূপান্তর একবারের বেশী এবং নিশ্চয়ই সর্বকালে সাধিত হতে পারেনা। তাহহলে পরিশ্রমী, কষ্টভোগী এবং উপভোগকারী মানবজাতির অস্তিত্ব আবশ্যক। সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া সে মানবজাতি বাঁচতে বা টিকে থাকতে পারেনা।

ঐশী অভিপ্রায় বা আল্লাহর ইচ্ছার নৈতিক দিকটির উপলব্ধির বেলায় তা সম্ভব কেবল একটি সমাজ ব্যবস্থার সদস্যদের মধ্যে অন্তর্মানবিক সম্পর্কের পটভূমিকায়। কারণ একটি নৈতিক মূল্যের সঠিক উপকরণ হচ্ছে মানবিক সম্পর্কসমূহের কাঠামো এবং

www.icsbook.info

এক মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের মিলন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেখানে ক্রয়-বিক্রয়, পণ্য এবং সেবা বিনিময়ের অস্তিত্ব নেই সেখানে আসলে ন্যায়পরায়ণতা এবং সততার অনুশীলন সম্ভব নয়। যেখানে অভাব বা চাহিদা নেই, যেখানে কিছু মানুষ প্রাচুর্যের অধিকারী নয়, এবং অন্যরা অভাবগ্রস্থ নয়, এবং যেখানে কারো কোন কষ্ট যন্ত্রণা নেই এবং কেউ সান্তনার মুখাপেক্ষী নয়, সেখানে দয়া দাক্ষিণ্য অনুশীলনের আবশ্যকতা থাকেনা। তাই সমাজকে আজ আমরা যেরূপে জানি তাতে সমাজ হচ্ছে নৈতিকতার অপরিহার্য শর্ত। কারণ সমাজ স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় এবং একে অন্যের অবয়বে সৃষ্টিকে পরস্পর প্রভাবিত করার পটভূমিকায়-এর অতিরিক্ত কিংবা কম কিছুই নয়। তাই অধিকতর যৌক্তিকতার সঙ্গে ধর্মীয় বা দ্বীনি ফালাহ অর্থাৎ কর্মের মাধ্যমে সাফল্য সৃষ্টি হচ্ছে সমাজের অস্তিত্বের একটি শর্ত। বিপরীতপক্ষে, নৈতিকতাকে বাদ দিয়ে কোন সমাজ বাঁচতে বা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনা, অন্যথায় থমাস হবস্ যাকে বলেছেন, সকলের বিরুদ্ধে সকলের দ্বন্দ্ব, সকলের যুদ্ধ থেকে কোন পরিত্রাণ নেই। এমনকি একদল দস্যুদেরও, যদি দস্যুদের একটি দল হিসেবে তাদের টিকে থাকতে হয়, তেমন অবস্থায় তার সদস্যদের জন্য কিছু না কিছু নৈতিক নিয়মকানুন ও শৃংখলা অবশ্য প্রতিষ্ঠিত করতে হয়।

গ. মূল্যতত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা

ঐশী অভিপ্রায় বা আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ করতে হলে তার জ্ঞান অপরিহার্য। এই জ্ঞান সমাজবদ্ধতার আওতায় যেরূপ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের আওতায় সেরূপ নয়। কারণ দুটি আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গিতে আল্লাহর ইচ্ছা বা অভিপ্রায় এক নয়। প্রথমত, সমাজবদ্ধভাবে, মূল্য অনুসরণ ও চর্চার ফলে যে ফল লাভ হয় তা গুণগতভাবে ব্যক্তিগত প্রয়াসের ফল থেকে ভিন্ন। সমাজবদ্ধ জীবনে একটি নির্দিষ্ট মূল্যের স্তর ভিন্ন, কারণ সমগ্র সমাজের স্বার্থের আলোকে তাকে বার বার বিবেচনা করতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মূল্যের মধ্যে নতুন মূল্যতাত্ত্বিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। পুরনো বৈপরীত্যগুলোর (antinomy) এতে সমাধান হয় এবং নতুন বৈপরিত্য আবিস্কৃত হতে পারে এবং আসলে এমন সব মূল্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যা ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্বজ্ঞান লক্ষ্য ছিলনা। দ্বিতীয়ত, যেখানে স্বভাবে বাধ্যবাধকতা কেবলমাত্র মূল্যের উপর নির্ভর করে, যা আসলে একটি ক্রিয়া বা সাধন পদ্ধতি মাত্র, সে ক্ষেত্রে মূল্য বিষয়ক কর্তব্য যা বাস্তব অস্তিত্বশীল বস্তুকে রূপান্তরিত করতে চায়, তার সঙ্গে অবিচ্ছেত্যভাবে জড়িত। মূল্যের পূর্ণতার উপলব্ধি, যা কিনা প্রতীকতত্ত্বের প্রথম অভিকাঙ্ক্ষিত, তা মূল্যের সম্ভাব্য সকল বাধ্যবাধকতা বিবেচনা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নাও হতে পারে। কর্তব্যকর্ম রূপায়ণের এক মঞ্চ থেকে অন্য মঞ্চ কাঠামোগতভাবে ভিন্ন হয়ে থাকে। সমাজবদ্ধতা রঙ্গমঞ্চ দ্বারা কেবল সংখ্যায় বা পরিমাণগত বৃদ্ধি বুঝায় না। তৃতীয়ত, যেহেতু মূল্যগুলোর পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ মূল্যসমূহ তাদের প্রত্যক্ষ বাস্তবায়নের বেলায়, যখন তাদের প্রবল আবেদন প্রথম যাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল তারা ছাড়া অন্যদেরও প্রভাবিত করে, তাই বিশ্বের সামগ্রিক মূল্য বিচারে, এ হবে একটি সুনিশ্চিত ক্ষতি, যদি এদের

www.icsbook.info

পরিবর্তনশীলতা কোন না কোনভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। কেননা দলগত অনুভূতি এবং দলগত বাস্তব রূপদানের ফলে, কার্যকারণের একটি ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হতে পারে, যা কেউই কার্য থেকে কারণ পর্যন্ত অনুধাবন করতে পারেনা। চতুর্থত, কল্পনা ও তার বাস্তবায়নের অস্তিত্ববিষয়ক দ্বন্দ্ব থেকে একটি সুফল পাওয়া যেতে পারে, যা তত্ত্বগত আলোচনার ফলকে বহুদূর অতিক্রম করে যায়।

৪. ব্যবহারিক তাৎপর্য

বিবেচনার সর্বশেষ পদক্ষেপটি অনিবার্য রূপে প্রতিয়মান করে যে, আল্লাহর অভিপ্রায় হচ্ছে সমাজমুখী, সমাজকেন্দ্রিক। কর্মের নৈতিকতার প্রথম দুটি স্বতঃসিদ্ধ এবং একটি সক্রিয় সামাজিক কাঠামোর বাস্তব অস্তিত্বসহ এই বিবেচনাগুলো ইসলামের দ্বীনি অভিজ্ঞতার উপাদান হিসেবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলনীতিমালার ইঙ্গিত দেয়, যা ইসলামী সমাজের আচার-অনুশীলন, কর্মকান্ড ও জীবনযাপনকে প্রভাবিত করে। এগুলো হচ্ছে বিশ্বজনীনতা, সামগ্রিকতা এবং স্বাধীনতা।

ক. বৈশেষিকতাবাদ নয়

ঐশী অভিপ্রায় আর মূল্য অভিন্ন বলে হৃদয়ঙ্গম করার ফলে মূল্যের যেসমস্ত উৎসকে সাধারণত আদর্শ বলে উপলব্ধি করা হয়, যেমন গেত্র, জাত, দেশ, এবং সংস্কৃতি–এ জাতীয় সকল বিশেষ সংস্থা থেকে মূল্যকে পৃথকভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা দান করে। যেহেতু কেবল আল্লাহই আল্লাহ, অন্য সকল সত্ত্বাই সৃষ্টি এবং সত্ত্বা বা বাস্তবতার দুটি শ্রেণী পরস্পর পৃথক, সেজন্য সকল সৃষ্টিই সমভাবে সৃষ্টিধর্মী। এর অর্থ এই যে, আল্লাহর একত্ব যখন সত্য এবং মূল্যের একত্ব হিসেবে উপলব্ধি হয়, তার অর্থ এই দাড়ায় যে, মূল্য সকলের জন্যই মূল্য এবং সে কারণে তা স্বাধীনভাবে অন্য সকল নিরপেক্ষ নৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং নৈতিকতা ভিত্তিক পেশা সৃষ্টির সত্য বলে ঘোষিত। সেকারণে সকলের ক্ষেত্রেই তা সমান কার্যকর। ঠিক যেমন প্রকৃতিতে আল্লাহর সৃষ্ট প্যাটার্ণসমূহ সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার ফলে সৃষ্টি হয়ে উঠে একটি সুশৃংখল জগত, সে কারণে মানুষের জন্য আল্লাহর অভিপ্রায় সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নৈতিকতামূলক পেশার ক্ষেত্রে এক মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের বৈষম্য মূল্যের একত্বের জন্য ক্ষতিকর। যেমন তা পরিণামে আল্লাহর একত্বের জন্যও ক্ষতিকর হয়ে উঠে। তাই মূল্য তথা নৈতিক অনুজ্ঞা সকলের জন্য একই। এর দাবী অথবা বাধ্যবাধতা, এর যা হওয়া উচিত, বা করা উচিত তা মানব জাতির কোন একটি অংশের জন্য সীমিত হতে পারেনা।[১৯]

---

১৯. তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দেবে এবং নিজেরা তা থেকে বিরত থাকবে? অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝনা? (২: ৪৪)। পুরুষ হউক, নারী হউক যেই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বসে সৎকর্ম করে, তাকেই আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করবো এবং তাহাদিগকে তাহাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেবো (১৬: ৯৭)। আল্লাহ মানুষ যে সৎকর্ম অর্জন করে তার অণু পরিমাণ পূণ্য থেকেও কাউকে বঞ্চিত করেন না, বরং উহাকে দ্বিগুণ করেন, আল্লাহ তার নিকট হতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন। (৪: ৪০)। ... তাদের অধিকাংশ পরামর্শে কোন

www.icsbook.info

ইসলামী সমাজের এই মৌলনীতি থেকে দুটি ফল অনিবার্য হয়ে উঠে। প্রথমত, কখনো এবং কোন অবস্থায়ই ইসলামী সমাজ একটি গোত্র, জাতি, প্রজাতি বা দলের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করতে পারেনা। নিশ্চয়ই এর সূচনা হবে কোথাও, কাউকে না কাউকে অবলম্বন করে এবং নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য নির্দিষ্ট একটা পন্থায়, তা স্ট্র্যাটেজি বা কৌশলের বিবেচনায়। তার পছন্দমত যে কোন সীমাবদ্ধতা তা আরোপ করতে পারে। কিন্তু মৌলনীতির দিক দিয়ে, কখনো তা অন্যের জন্য নিজের দরজা বন্ধ করতে পারেনা। এবং গোটা মানবজাতিকে নিজের আলিঙ্গনে আনয়ন করার পূর্ব পর্যন্ত কখনো তা থেমে যেতে পারেনা। যদি কখনো তা কোন মানুষকে তার দলে যোগদানের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করে তাহলে এ সমাজ তার অস্তিত্বের যুক্তি হারিয়ে ফেলবে। এই সমাজের সদস্যভুক্ত হবার অধিকার এবং যোগ্যতা হচ্ছে একটি স্বাভাবিক জন্মগত অধিকার, যা তাকে দেওয়া হয়েছে সৃষ্টি হিসেবে, তার সত্তারই বদৌলতে। দ্বিতীয়ত, ইসলামী সমাজকে এমনভাবে সম্প্রসারিত হতে হবে যাতে করে গোটা মানবজাতি তার মধ্যে স্থান পায়। যতদিন না ইসলামী সমাজ তা করেছে এবং তাতে সফল হয়েছে, ততদিন তার বিরাম নেই। সমাজের ইসলামের এই দাবী এবং সে কারণে ইসলামের পরিমন্ডলে তার বৈধতার দাবীও আল্লাহর আহ্বানকে সক্রিয়ভাবে গ্রহণে স্বীকৃতির মাধ্যমেই বাস্তব হয়ে উঠে।[২০] এই যে আহ্বান তা কেবল অস্তিত্বের জন্য আহ্বান নয়, প্রাচুর্যের জন্য নয়, এবং ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ অর্জনের জন্য নয়, কিংবা কিছু সংখ্যক মানুষের ইসলামী অস্তিত্বের জন্য নয়। বরং এই আহ্বান হচ্ছে সকল মানুষ, সকল দেশ এবং সকল কালকে রূপান্তরের আহ্বান। ইসলামী সমাজ একাধারে উপায় এবং লক্ষ্য। যখন তা সবকিছুকে নিজের মধ্যে স্থান দিতে সক্ষম হয় তখনই তা লক্ষ্য হয়ে উঠে।

সমাজের উপযোগবাদী তত্ত্বসমূহ বা হিতবাদী ধারণা ইসলামের দাবীর বিপরীত। কেননা এই সব তত্ত্বে সমাজকে দেখানো হয় বৈষয়িক উর্দ্ধতনের হাতিয়ার রূপে, স্পেশালাইজড শ্রম এবং অতিরিক্ত আরাম আয়েশের উপায় হিসেবে, যদিও ইসলামী সমাজের বিকাশে এগুলো নিশ্চিত কতিপয় উপাদান, তবু এই সব অর্থে সমাজের ব্যাখ্যাকে লঘুকরণ বা অতি সহজীকরণের বিভ্রান্তিতে নিক্ষপণের সামিল।[২১] অন্য

কল্যাণ নাই, তবে কল্যাণ আছে যে দান খয়রাত করে সৎকর্ম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় তার পরামর্শে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় কেউ তা করলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেবো (৪:১১৪)।

২০. রসূল, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং বিশ্বাসীগণও, তাদের সকলেই আল্লাহতে, তাঁর ফেরেস্তাগণের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের ও তাঁর রসূলগণে ঈমান এনেছে। তাঁরা বলে, আমরা তার রসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। আর তারা বলে আমরা শুনেছি ও পালন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমার ক্ষমা চাই এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট (২:২৮৫)।

২১. Harold A. Larrabee, Reliable Knowledge (New York : Houghton Miffin Company, 1945), pp. 305-6.

www.icsbook.info

যেসব থিওরী সমাজের 'নির্বাচিত জাতিত্ব' রেস, ভাষা এবং সংস্কৃতির যুক্তিতে সম্প্রসারণ চায়না, তারা হচ্ছে আপেক্ষিকতাবাদী। এগুলো ইসলামের বিশ্বজনীনতা এবং তৌহীদ দুইয়েরই বিরোধী।

উপরে উল্লেখিত এই দুটি পরিণাম সম্বন্ধে ইতিহাসের গোটা পরিসরেই মুসলমানদের ধারণা সুস্পষ্ট থেকেছে। সকল মানুষ একটি মাত্র এবং একই যুগল থেকে সৃষ্টি হয়েছে... কুরআনের যে আয়াতটিতে একথা ঘোষিত হয়েছে তাতে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এবং জাতিতে রূপদান করা হয়েছে, এজন্য যে, তারা করবে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং একে অপরকে কাজে লাগাবে।[২২] এই আয়াতটি এবং এই ধরনের বহু আয়াত যেমন প্রত্যেকের মুখে উচ্চারিত হয়েছে, তেমনি উচ্চারিত হয়েছে বিদায় হজ্জে।[২৩]

মহানবীর ঘোষণা : "সমস্ত মানুষ এসেছে আদম থেকে এবং আদমের সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে। তাই কোন আরব কোন অনারবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারেনা– কেবল মাত্র নেককর্ম এবং সৎকর্মপরায়ণতা ব্যতিরেকে।"[২৪]

ইসলামী সমাজের এই সব ইঙ্গিতময় মৌলনীতির স্পষ্ট বিরোধী গোত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদ তাদের বুনিয়াদের দিক দিয়ে অভিন্ন। যদিও একের গোত্র, অন্য মতের জাতীয়তার থেকে অনেক বেশী সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র, উভয়েরই দাবী হচ্ছে, কেবলমাত্র একটি গ্রুপের সদস্যদের জন্য মূল্য হচ্ছে মূল্য; কেননা তাদের যুক্তিতে মূল্য বলতে যা বুঝায় তা সৃষ্টি করে গ্রুপ, গ্রুপ হচ্ছে মূল্যের উৎস বা স্রষ্টা। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিণামে, প্রত্যেকটি গ্রুপই যদি চায়, নিজ নিজ আদর্শে নিজের মূল্য খাড়া করার অধিকারী হয়। কারণ গ্রুপনেস বা গোষ্ঠীত্ব যে কেবল একটি গোষ্ঠীরই অধিকারভুক্ত তা কখনো প্রমাণ করা যায়না। যেহেতু এটি হচ্ছে চূড়ান্ত মানদন্ড, তাই একটি গোষ্ঠী যে সব লোক নিয়ে গঠিত তাদের যে কোন সংখ্যক ব্যক্তি একই অধিকার দাবী করতে পারে। তাই আপেক্ষিকতাবাদের অপরিহার্য তাৎপর্যই হচ্ছে বহুত্ববাদ এবং ভাবনার দিক দিয়ে এর অবশ্যম্ভাবী তাৎপর্য হচ্ছে পার্থক্য বা ভিন্নতা, যার উপরে কোন সেতুবন্ধী তোরণ নেই, যা পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত গ্রুপগুলোর জন্য বৈধ হতে পরে। এক্ষেত্রে যদি কোন আকস্মিক সাদৃশ্য অথবা দুটি দৃষ্টিভঙ্গির অভিন্নতার দ্বারা বিরোধের মীমাংসা না হয়, কিংবা এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বেচ্ছায় মেনে না নেয় তাহলে সংঘর্ষ একেবারেই

---

২২. হে মানবজাতি আমরা তোমাদেরকে পুরুষ ও রমনী করে সৃষ্টি করেছি। আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারী হতে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে সবচেয়ে সৎপরায়ণ (৪৯ : ১৩)।

২৩. এ ধরনেরই বহু আয়াত রয়েছে কুরআনুল কারীমে যাতে তারা বিশ্বাসী এবং সৎকর্ম করে, কিংবা ধর্মনিষ্ঠ ও সৎকর্মপরায়ণ, তাদের সাফল্য ঘোষণা করে, যারা মানব জাতির সাধারণ নিন্দাবাদ বা সাধারণ অবমাননকর বর্ণনা থেকে মুক্ত।

২৪. Duwaydar ... *Suwar* .. p. 593

www.icsbook.info

অনিবার্য হয়ে উঠে। এখানে এই ধারণাটি সক্রিয় যে গ্রুপই হচ্ছে তার মূল্যগুলোর চূড়ান্ত উৎস এবং সে কারণে গ্রুপকে অতিক্রম করে এমন কোন মানদন্ড নেই যা বৈধ, যার আলোকে বিরোধী দলগুলোর মধ্যকার সমস্যা ও পার্থক্যগুলো দূর করা যেতে পারে। একারণেই সংঘর্ষ অনুমান দ্বারা অসমাধ্য। যদি নিজ নিজ অর্থে বিরোধী প্রত্যেকটি দল সংঘর্ষকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করে, তেমন অবস্থায় ad baculum ছাড়া আর কোন সম্বলই থাকেনা, যার ফলে এক গ্রুপ কর্তৃক অপর গ্রুপের পরাভব বা ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। অবশ্য আপেক্ষিকতাবাদী মূল্যতত্ত্বে বিজয়ী, যে তার প্রতিপক্ষকে পরাভূত করেছে তার জন্য কোন শাস্তির অবকাশ নেই। যেহেতু সেই গ্রুপটি কেবলমাত্র একটি সংহত গ্রুপ হবার কারণেই নিজের লক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষা করতে সঙ্গম হয়েছে, তাই এই গ্রুপের অন্তর্গত যে কোন সদস্যেরই সমান অধিকার আছে, ভিন্ন লক্ষ্যে, নিজেকে একটি ভিন্ন গ্রুপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার। বৃহত্তর গ্রুপটির তার নিজের দলছুট ক্ষুদ্র উপ-গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করার জন্য শক্তি প্রয়োগ ছাড়া আর কোন অস্ত্র থাকেনা। ফলে অচিরে সমাজের কাঠামোই ধ্বসে পড়ে। আরব দেশে ইসলাম ঠিক যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল সপ্তম শতকে, তারই অনুরূপ বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী অথবা একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন বংশ, পরস্পরের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয়, অন্তহীন এবং নৈরাজ্যজনক, সমাধানের অতীত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। রিফর্মেশন পরবর্তী ইউরোপের ইতিহাস মোটেই এর থেকে তেমন ভিন্ন কিছু নয়, যদিও দ্বন্দ্বে লিপ্ত দল উপদলগুলো ছিল আকারে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃহত্তর।

আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ইসলামে এক মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের বৈষম্যের কোন অবকাশ নেই। ইসলামী সমাজ একটি মুক্ত সমাজ এবং প্রত্যেক মানুষই এই সমাজ গঠনকারী একজন সদস্য হিসেবে অথবা জিম্মিরূপে এতে যোগ দিতে পারে (চুক্তিবদ্ধ)। দ্বিতীয়ত ইসলামে সমাজ অবশ্যই নিজেকে এমনভাবে সম্প্রসারণের জন্য চেষ্টিত হবে যাতে গোটা মানবজাতি হতে পারে এর অন্তর্গত, অন্যথায় এই সমাজের ইসলামী সমাজ হবার দাবী ধোপে টিকবে না। অবশ্য এ সমাজ একটি মুসলিম সম্প্রদায় হিসেবে টিকে থাকবে, অন্য একটি ইসলামী অথবা অ-ইসলামী সম্প্রদায় কর্তৃক আত্মীভূত হবার অপেক্ষায়।

খ. সবকিছুই প্রাসঙ্গিক

সমাজের ক্ষেত্রে আত্-তৌহীদের দ্বিতীয় প্রায়োগিক তাৎপর্য ইসলামী সমাজের দৃঢ় সংকল্পকে মানব জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগ, দিক ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। সকল শুভই আল্লাহর ইচ্ছা বা মূল্যের অন্তর্গত, যেখানেই তা পাওয়া যাকনা কেন, এবং শুভ নিশ্চয়ই সর্বত্র বিদ্যমান যা জীবনের প্রত্যেকটি শাখায় পাওয়া যায় বা পাওয়া যেতে পারে। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত সূচিত হয় যে, ঐশী অভিপ্রায় বা আল্লাহর ইচ্ছা, সমাজ যেখানেই পৌছুতে সক্ষম হউক না কেন, সকল ক্ষেত্রেই তার বাস্তব রূপদানের জন্য এবং সেই ক্ষেত্রটিকে উন্নতর স্তরে নিয়ে যাবার

www.icsbook.info

জন্য কাজ করবে।[২৫] এর অর্থ এ নয় যে, সমাজ তার লক্ষ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য বিষয়াদির কোন স্তর বিন্যাস করেনা, এবং সমাজ তার সমগ্র শক্তির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ 'দাওয়া', দেশরক্ষা, শিক্ষা বা অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য নিয়োগ কবলে, তাতে কেউ আপত্তি তুলবেনা।

ইসলামী আইনশাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্র মানুষের কর্মকে সুবিধাজনকভাবে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছে : বাধ্যতামূলক, নিষিদ্ধ, অনুকূলে সুপারিশ প্রদত্ত, প্রতিকূলে সুপারিশ প্রদত্ত এবং নিরপেক্ষ। ইসলাম পাবলিক আইন অর্থাৎ শরীয়া প্রবর্তন করেছে প্রথম দুটি ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় জোড়াটির ক্ষেত্রে ইসলাম মহানবীর ব্যক্তিত্ব ও তার সাহাবাগণের আচরণের উপর ভিত্তি করে একটি ব্যবহারিক আদর্শ পেশ করেছে এবং তার অনুসারী নারী-পুরুষ সবাইকে তা অনুসরণ করতে বলেছে, দ্বিতীয় জোড়াটির অনুকরণে। অধিকন্তু ইসলাম লোকগাথা, কাব্য, দরবারী জাকজমক এবং গণ কাযাবলীর মাধ্যমে জীবন যাপনের একটি শৈলী বিকশিত করেছে। এ সব যারা ভঙ্গ করে তাদের বেলায় দমন এবং তিরস্কারের মাত্রার দিক দিয়ে এই ব্যবস্থাগুলো যদিও একে অন্যের থেকে পৃথক এবং যারা এগুলো মেনে চলে, তাদের প্রশংসা এবং সম্মানের ক্ষেত্রেও এগুলো যেসব কর্মকাণ্ডকে শাসন করে, তার সঙ্গে ইসলামের প্রাসঙ্গিকতার ধারণার দিক দিয়ে এগুলো এক। যে কোন ইসলামী সমাজই ইসলামী হওয়ার তার দাবী থেকে বঞ্চিত হবে যদি সে তার কর্মকান্ডকে একটি কিংবা দুটি বিভাগের মধ্যে সীমিত রাখবার চেষ্টা করে। এমতাবস্থায়, এটি পর্যবসিত হবে একটি পাবলিক কর্পোরেশন-ক্লাবে অথবা একটি সোসাইটিতে, যার যৌক্তিকতা হচ্ছে তার সদস্যদের এক বা একাধিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক চাহিদার চরিতার্থতা। ইসলামী সমাজ একটি পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণ সমাজ, কারণ এটি একটি আদর্শিক সমাজ। এ সমাজ নিজের জন্য যে বিধান দিয়েছে, তা রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যকর হবে ইসলাম তা আশা করে, তাই সমাজের জন্য টোটালিজম কেবল একটি অভিকাঙ্ক্ষিত নয়, রাষ্ট্রের জন্য (খিলাফত) একটি প্রশাসনিক পলিসিও বটে।

এ ধরনের পূর্বাপর সঙ্গতি পাশ্চাত্য সমাজে অনুপস্থিত, কারণ সেখানে সমাজ এবং রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা প্রদত্ত হয়েছে। যেখানে পাশ্চাত্য সমাজগুলো আসলে, তাদের নাগরিকদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এবং নবাগতদের নিজস্ব সংস্কৃতির আওতায় আনার জন্য, বিপুল ক্ষমতা খাটিয়ে থাকে, সেখানে তাদের মর্যাদা তাদের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রেই কেবল সীমিত থাকে, যার প্রধান হেতু হচ্ছে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, চার্চ এবং গণমানুষের মধ্যে সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস। পরিণামে তাদের জন্য সংবিধান ভিত্তিক নিয়মতান্ত্রিকতার মানে হচ্ছে রাষ্ট্র কেবল

---

২৫. এধরনেরই বহু আয়াত রয়েছে কুরআনুল কারীমে যাতে তারা বিশ্বাসী এবং সৎকর্ম করে, কিংবা ধর্মনিষ্ঠ ও সৎকর্মপরায়ণ, তাদের সাফল্য ঘোষণা করে, যারা মানব জাতির সাধারণ নিন্দাবাদ বা সাধারণ অবমাননাকর বর্ণনা থেকে মুক্ত (২২: ৪১)।

www.icsbook.info

ন্যূনতম সেই পরিমাণ রাজনৈতিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে, যা অভ্যন্তরীণ শক্তি প্রতিষ্ঠা, বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশ রক্ষা এবং জনকল্যাণের প্রয়োজনে ন্যূনতমসেবার ব্যবস্থা করার জন্য আবশ্যক।[২৬] কেবলমাত্র অতি সাম্প্রতিক কালেই রাষ্ট্র কর্তৃক দুঃস্থ ও নিঃস্বদের কল্যাণ সাধন, মানুষের আমোদ-প্রমোদ এবং অবসর বিনোদন, বুনিয়াদী শিল্পসমূহ ও সেবা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ধারণা জন্ম নেয়।[২৭] অতীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত হতো সেই মূলনীতিটি এই যে, প্রাক সামাজিক, প্রাকৃতিক অবস্থা হচ্ছে শুভ ও কল্যাণকর, আর এ জন্যই সংবদ্ধ সমাজ কর্তৃক তার কর্মকান্ডে হস্ত ক্ষেপের কোন প্রয়োজন নেই, কেননা এই ধরনের হস্তক্ষেপ মন্দ ও অকল্যাণকর, আর একারণেই এর নিয়ন্ত্রণের জন্য কেবল ন্যূনতম শক্তিরই প্রয়োজন।[২৮] শেষোক্ত এই মতটি যা অধিকতর কমন তা সংশয়বাদীর এই দাবীর ফলে প্রবলভাবে উৎসাহিত হয় যে, শুভ বা কল্যাণ অজেয়, আমরা যা পাচ্ছি তাতো কেবল কামনা বাসনা ও নৈতিক লক্ষ্যের বিভিন্নতা। আর এজন্যই আপেক্ষিকতাবাদ, এবং অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যাবেনা। এই তত্ত্ব জুলুমশাহীর একমাত্র বিকল্প। এই যুক্তিভিত্তিগুলোর কোনোটিই ইসলামের এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত নয় যে, সমগ্র প্রকৃতি শুভ, কল্যাণকর এবং নির্দোষ, ঐশী নমুনার বাস্তবায়নের জন্য প্রকৃতির নতুন রূপদান আবশ্যক এবং ঐশী অভিপ্রায় বা কল্যাণ যুক্তি ও ওহী উভয়ের মাধ্যমেই জ্ঞেয়। প্রকৃতিকে নতুন করে এই রূপদান করতে গিয়ে মানুষ সঠিক কাজ করতে পারে, জুলুম করতে পারে, এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই সে নিজেই নিজের কাজের জন্য দায়ী।

গ. দায়িত্ব

সমাজ্যের জন্য তৌহীদের তৃতীয় ব্যবহারিক তাৎপর্য হচ্ছে দায়িত্বের মৌলনীতি। সমগ্রতাবাদ সব সময়ই হয়ে উঠতে পারে সমূহবাদ বা একদলবাদ, যে ব্যবস্থায় রেজিমেন্টেশন এবং যৌথ মালিকানা সমাজকে তার নৈতিক মূল্য অর্জনের প্রয়াস থেকে বঞ্চিত করে। তাই এই ধরনের অবনতিকে রোখার জন্য আর একটি মৌল নীতি আবশ্যক।

ইসলাম আমাদের বলে প্রত্যেক মানুষই হচ্ছে মুক্তাল্লফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত)। আল্লাহর অভিপ্রায় বাস্তবায়নের জন্য তার এই তাকলিফের মূল্যে রয়েছে প্রকৃতিগতভাবে অর্জিত সেই অবদান, যাকে বলা হয় সমাজ সংহতি (আল আসাবিয়া) যাতে সমগ্র মানব জাতির সঙ্গে তার অংশ রয়েছে। এই সহজাত অথচ শিক্ষণীয় সংহতি চেতনা হচ্ছে সেই বৃত্তি, যার সাহায্যে সে তার স্রষ্টাকে চেনে এবংতার অভিপ্রায়কে নিজ জীবনের অনুসরণীয় কর্তব্য বলে হৃদয়ঙ্গম করে। তাই ইসলাম যে কেবল প্রত্যেককে তার কাজের জন্য দায়ী বলে ঘোষণা করে তাই নয়, বরং দ্ব্যর্থহীনভাবে এ ধারণাকে

---

২৬. বর্তমান গ্রন্থকারের *Christian Ethic)* গ্রন্থে, সপ্তম অধ্যায় ২৪৮ পৃষ্টায় সমাজের সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রাসঙ্গিকতার বিশ্লেষণ দেখুন।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৯৩-২৯৪।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৬।

www.icsbook.info

অস্বীকার করে যে, শিশু কিংবা স্বাস্থ্যগতভাবে অক্ষম ছাড়া কোন মানুষ এই কর্ম প্রয়াস থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। এর দাবী এই যে, প্রত্যেক মানুষ সম্পূর্ণ সজ্ঞানে নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও বোঝা গ্রহণ করবে এবং সেই দায়িত্ব পালনে তার সাফল্যের অনুপাত অনুসারে ইসলাম তাকে সম্মান দিয়ে থাকে। আল্লাহ মানুষকে যে আমানত দিয়েছেন তার প্রকৃতি থেকেই তা অনিবার্য হয়ে উঠে। নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন একটি পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারতেন, যেখানে মূল্যের উপলব্ধি হয় অপরিবর্তনীয়ভাবে প্রাকৃতিক আইনের অনিবার্যতা সহকারে। আসলেই তিনি এমন একটি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যার নাম প্রকৃতি– কেবলমাত্র মানুষকেই তিনি রূপ দিয়েছেন ভিন্নভাবে, তাকে দিয়েছেন স্বাধীনতা ঐশী অভিপ্রায়কে পালন বা লংঘন করার জন্য এবং এভাবে তাকে তার প্রত্যেক কাজের জন্য দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতা দিয়েছেন। এ দায়িত্ব হচ্ছে নৈতিকতার সারনির্যাস, কেননা যেখানে এই নৈতিকতা অনুপস্থিত সেখানে মানুষের কোন নৈতিক মূল্য থাকতে পারেনা এবং ঐশী অভিপ্রায়ের উচ্চতর ও বৃহত্তর অংশ সেখানে বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনা। পরিণামে ঐশী অভিপ্রায় ব্যর্থ হবে। কিন্তু যে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ হয় তিনি আত্ তৌহীদের এক অতিক্রমী পরম নিঃশর্ত পরম আল্লাহ নন।

সামগ্রিক এবং বিশ্বজনীন হলেও ইসলামী সমাজ কর্তৃক মূল্যের বাস্তব রূপায়ণ অবশ্যই দায়িত্বপূর্ণ হতে পারে, যদি তাকে নৈতিকতার দিক দিয়ে যোগ্য হতে হয়। কুরআন দায়িত্বের ব্যক্তিগত প্রকৃতির উপর গুরুত্ব দিয়েছে এবং ভাল কিংবা মন্দের জন্য অন্য কেউ সেই দায়িত্ব পালন করতে পারে তার সকল সম্ভাবনা অস্বীকার করেছে।[২৯] এ জন্য কুরআন ঘোষণা করেছে যে, কোন জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ চলবেনা।[৩০] এবং কর্মকর্তার স্বেচ্ছায় দায়িত্ব গ্রহণের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে প্রত্যেক মানুষকে তার প্রতিটি ধর্ম সংগত কর্মের পূর্বাহ্নে তা সম্পাদনের জন্য নিয়্যত করতে হবে (ব্যক্তিগত অন্তর্গত সিদ্ধান্ত)।

দায়িত্বের জন্ম হয় নৈতিক দৃষ্টি থেকে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষণ থেকে সে সবের ঔচিত্য ও কর্তব্যকে তাদের যথাযথ স্থান অনুযায়ী হৃদয়ঙ্গম থেকে। কারণ মানুষের উপর কিছু করার জন্য বল প্রয়োগ করা হতে পারে, কিন্তু কখনো জবরদস্তি করে কিছু তাকে প্রত্যক্ষ করাতে পারেনা; নৈতিক দায়িত্ব নিজেই তার নিশ্চয়তা বিধান করে। যে ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করা হয়েছে সেখানে দায়িত্ব অনুপস্থিত এবং কার্যত নৈতিকতাকে লংঘন করা হয়েছে, কিন্তু মূল্যের প্রত্যক্ষণ বল প্রয়োগে সম্ভব নয়, একথা স্বীকার করে নিলেও

---

২৯. আল্লাহর কাছ থেকে এইমাত্র যে ওহী নাযিল হয়েছে যে কেউ তা অনুসরণ করেছে, সেই-ই সুপথে পরিচালিত, এর প্রতিফল সে পাবে, এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তার মূল্য তাদেরকেই দিতে হবে, আমি তোমাদেরকে জোর করে আমার অনুসরণ করার জন্য প্রেরিত হইনি (১০ : ১০৮)। কেউ অন্যের কর্মের জন্য দায়ী নয় (১৭ : ১৫)। যে কেউ অণু পরিমাণ ভাল কিংবা মন্দকর্ম করবে তার বিচার তদনুসারে হবে (৯৯: ৭-৮)।

৩০. দ্বীনের ব্যাপারে জোর জবরদস্তি নেই (২: ২৫৬)। তুমি কি অন্যের উপর জোর জবরদস্তি করবে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য (নিশ্চয়ই না) (১০: ৯৯)।

www.icsbook.info

নিশ্চয়ই শিক্ষার মাধ্যমে ধারণার সাহায্যেই হউক অথবা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধ বস্তুর সাহায্যেই হউক, শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মূল্যের প্রত্যক্ষণ অর্জনে উৎসাহিত করা, সহায়তা দান সম্ভব। এতে করে নিম্নবর্ণিত ইসলামী সমাজের কাজের সংজ্ঞা মিলে।

আল্লাহর অভিপ্রায় যেসব মূল্য সৃষ্টি করে, সমগ্র মানবজাতি যাতে সেগুলো প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং প্রত্যক্ষ করার পর কার্যকর করতে পারে তাতে গোটা মানবজাতিকে সাহায্য করা মহত্তম এবং শ্রেষ্ঠতম অর্থে ইহাই হচ্ছে শিক্ষা ইসলামী সমাজ হচ্ছে আকারে একটি মহাজাগতিক পাঠশালা, সেখানে প্রত্যেকটি প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিক্ষণীয়– এই উদ্দেশ্যে যে, এধরনের শিক্ষা পরিণামে মূল্যের যে বাস্তব রূপায়ণ ঘটাবে তা যেন দায়িত্বপূর্ণ এবং সে কারণে নৈতিকতাপূর্ণ হয়। কারণ কেবল এভাবেই ঐশী অভিপ্রায়ের উচ্চতর স্তরগুলো বাস্তবে রূপায়িত হবে।

সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে আত্-তাওহীদের এই হচ্ছে তাৎপর্য। এর ফলে এই তাৎপর্যগুলো থেকে জন্ম নেয় উম্মাহ, একটি যৌথ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নাগরিক সংস্থা, যা ভূমি, জন নরগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির মধ্যে সীমিত নয়, বরং তা বিশ্বজনীন, সামাজিক এবং তার মিলিত জীবনে যেমন, তেমনি তার প্রত্যেকটি সদস্যের জীবনেও দায়িত্বশীল; এবং এই জাগতিক জীবনে প্রত্যেকটি মানুষের সুখ শান্তি অর্জনের জন্য দায়ী দেশকালে আল্লাহর অভিপ্রায়ের প্রতিটি বাস্তব রূপ দানের জন্য দায়িত্ববান।

www.icsbook.info

অষ্টম অধ্যায়

উম্মাহর মৌলনীতি

১. পরিভাষা

ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা একটি একক অনন্য ব্যবস্থা; পাশ্চাত্য ভাষাগুলোতে পরিচিত কোন পরিভাষাই ইসলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। ইংরেজী ভাষায় social order বা সমাজ ব্যবস্থা দ্বারা একটি মূল্য বা মৌলনীতি পদ্ধতি বুঝায়, যা সমাজ জীবনকে শাসন করে; মূল্য কিংবা নীতির যে কোন পদ্ধতির ক্ষেত্রেই এই অভিধা প্রযোজ্য। কারণ যা বিশৃংখলা বলে বর্ণিত হতে পারে তাও সামাজিক জীবনের একটি রূপ বা ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। তাই পুঁজিবাদী, গণসাম্যবাদী, গণতান্ত্রিক, ফ্যাসিষ্ট সমাজ ব্যবস্থা বলা যেমন নির্ভুল, তেমনি ইংরেজ, মার্কিন, ফরাসি, চীনা বা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা বলাও সঙ্গত। যখন আমরা social শব্দটির প্রসঙ্গে আসি, যা society শব্দ থেকে নিস্পন্ন একটি বিশেষণ, তখন এর তাৎপর্যটি আরো সীমিত হয়ে পড়ে। society এই শব্দ বা পরিভাষাটি দ্বারা বুঝায় স্বতঃপ্রবৃত্ত কতগুলো মানুষের একটি দল, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট কতিপয় লক্ষ্য অর্জন। (জার্মানরা যাকে আরো সঠিকভাবে বলে সমাজ (*Gesellschaft*)। একে কমিউনিটি বা সম্প্রদায় অর্থে বুঝলে চলবেনা, যা কিছু-সংখ্যক মানুষের ইচ্ছা বহির্ভুত একটি দল, যারা ভাষা, জাত, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ভূগোলের দিক দিয়ে এক বা সদৃশ। জার্মানরা এদেরকে বলে *Gesellschaft* সম্প্রদায় বা সম্মিলিত সংস্থা। সোসাইটি এবং কমিউনিটি একই হতে পারে বা ভিন্নও হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফরাসী এবং ইংরেজদের ক্ষেত্রে এই দুয়ের অর্থ একই। কিন্তু জার্মান, শ্লাভ এবং চীনাদের ক্ষেত্রে তা এক বা অনুরূপ নয়। কমিউনিটি সদস্যত্ব স্বাভাবিক এবং অনিবার্য করে তোলে অভিবাসন ন্যাচারালাইজেসন এবং নিয়মিতভাবে সংস্কৃতির অন্তর্গতকরণের মাধ্যমে সদস্যত্ব অর্জিত হয়। বিপরীতপক্ষে, সোসাইটির সদস্যপদ তাৎক্ষণিক, কারণ এই সদস্যতা হচ্ছে একটি সিদ্ধান্তের ফল। এজন্যই প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সদস্যপদ গ্রুপের সকল সদস্য কর্তৃক সমভাবে ব্যবহৃত কোন নাম বা শ্রেণীর দ্বারা সীমিত হয়ে থাকে। এই ধরনের শ্রেণী বা নাম একটি সমবায় গৃহায়ণ সমিতির সদস্যদের আর্থিক স্বার্থ থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক মূলের সমুদয় পরিসর পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে– যখন আমরা গ্রুপের অন্তর্গত কোন শ্রেণী বা গ্রুপকে বুঝাতে চাই;[১] রাজনৈতিক সত্তা কদাচিৎ একটি সমাজ

---

১. আধুনিক কালে পাশ্চাত্য জগতে এর মোকাবেলার জন্য একটি সাধারণ প্রয়োজন ও সিদ্ধান্ত বিভিন্ন সংস্থার ব্যবস্থা করেছে যেমন বাণিজ্যিক কোম্পানিসমূহ, কর্পোরেশনস এবং সকল রকমের সমবায় সমিতিস্বরূপ আর্থিক সংস্থাসমূহ (বাকিতে পণ্য বিক্রয়, ব্যয় সংকোচ, ভোক্তাগণ, গৃহায়ণ, বেচাকেনা ইত্যাদি। কিন্তু কখনো কোন রাষ্ট্রের জন্য নয়, এটি সম্পূর্ণভাবেই এথনিক বৈশিষ্ট্যের

www.icsbook.info

বলে গণ্য হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে (যেমন- সুইজারল্যান্ড, যুগোশ্লোভিয়া, এবং সাবেক (USSR) এদের সকলেরই সূচনা সাম্প্রতিককালে এবং এরা বিশেষ উপাদানের ফল। প্রায় সকল রাজনৈতিক সত্তাই কমিউনিটির সঙ্গে অভিন্ন। তাদের এই মিল সামগ্রিক না হলেও প্রায় সামগ্রিক। একারণে রাজনৈতিক অস্তিত্বের 'জাতি' অভিধা যৌক্তিকতা লাভ করে। এ কারণে পাশ্চাত্যের রাজনীতিতত্ত্বে রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট চতুঃসীমার মধ্যে একটা অঞ্চল বলে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব, যে চতুসীমার মধ্যে একটা কমিউটি বাস করে, যার কর্মকান্ড এমন একটি সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক শাসিত হয় যে তার সিদ্ধান্ত বলবৎ করতে ক্ষমতা রাখে।[২]

ইসলামে কমিউনিটির অনুরূপ দুটি শব্দ হচ্ছে শা'ন্ত এবং কওম। এদুটি পরিভাষার অর্থ ক্ষুন্ন না করে, অর্থাৎ অভিধায় নির্দেশিত জনগোষ্ঠীর চৈতন্যকে আঘাত না করে, এই পরিভাষা দুটোকে সোসাইটি বুঝাতে ব্যবহার করা যাবে না।[৩] আরব, তুর্কী এবং পার্সিয়ানরা প্রত্যেকে একটি শা'ন্ত বা কওম-যদি আমরা এর দ্বারা এককে অন্য থেকে আলাদা কমিউনিটি বুঝাতে চাই, যদি ভাষা ও রীতিনীতি, ভূগোল এবং বংশ লতিকার দিক দিয়ে তাদের পার্থক্যের উপর জোর দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু আলাদা বা পৃথক পৃথকভাবে এগুলো সোসাইটি নয়, কেননা এই শ্রেণীত্ব কেবল তাদের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য নয়, বরং একই সঙ্গে মালয়, ভারতীয়, হাউস, বান্টু এবং শ্লাভ সকলের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। এই সকল সম্প্রদায় এবং আরো অনেকে, যারা ইসলামের পরিমন্ডলভুক্ত এবং এর সংস্কৃতি ও সভ্যতায় অংশীদার বলে দাবী করে তারা, ইসলামের এক এবং অভিন্ন উম্মাহ বা সোসাইটির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উম্মাহ হচ্ছে একটি বিশ্বজনীন সোসাইটি বা সমাজ, যার সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সম্ভাব্য ব্যাপকতর বৈচিত্রের জাতিগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়সমূহ।[৪] তবে ইসলামের প্রতি তার অঙ্গীকার, তাকে একটি বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থার বলয়ে একত্র করে। বিষয়টি এ কারণেই আরো জটিল হয়ে উঠে যে, প্রতিটি মুসলমান সম্প্রদায়ই ক্ষুদ্র আকারে একটি উম্মাহ। কেননা বিশ্বউম্মাহ যতদিন না বিধিসম্মতভাবে এমন একটি সরকার বা সংস্থার রূপ গ্রহণ করছে, যা ইসলামিক আইনকে বলবৎ করতে পারে, বিশ্বউম্মাহর প্রতিনিধিত্ব

উপর নির্ভর করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণ এবং সে কারণে চিরন্তন, দ্রঃ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (Glencoe Illinois. The Free Press 1962) পৃঃ ৩৯৩।

২. পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে ইহাই রাষ্ট্রের চিরাচরিত এবং ক্লাসিক্যাল সংজ্ঞা। ইহা ইসলামী রাষ্ট্রের বিপরীত। কারণ, ইসলামী রাষ্ট্র অঞ্চল এবং এথনিক সংস্কৃতিক ধর্মীয় বা রাজনৈতিক চৌহদ্দির দ্বারা সীমিত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপঃ 't George H. Sabine. *A History of Political Theory.* (New York : Henry Holt and Co 1947) পৃষ্ঠা 746-65, Ges James B. Hastings, *Encyclopedia of The Social Sciences,* s.v. "The State".

৩. Al Zubaydi, *Taj al Arus.* vol. 9

৪. ইহাই তোমার উম্মাহ, এক, ঐক্যবদ্ধ এবং পরস্পর অন্তর্নিহিত এবং আমি তোমাদের প্রভু এবং আমারই ইবাদত কর (২১: ৯২)

www.icsbook.info

করতে পারে, কার্যকরভাবে বা তার পক্ষে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে, ততদিন বিশ্বউম্মাহর পক্ষে কথা বলা এবং কাজ করার জন্য প্রতিটি উম্মাহই আবশ্যকভাবে এবং আইনত দায়ী। এর কারণ, এই বাস্তবতাকে ইসলামই সংস্কৃতি ও সভ্যতার, সামাজিক পার্থক্য ও শ্রেণীকরণের, সকল ব্যক্তিগত ও প্রায় সকল সামাজিক আন্ত ঃসামাজিক কর্মকান্ডে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যমানগুলো সরবরাহ করে। এ কারণে, ইসলামের ভিত্তিতে এ সব চিহ্নিতকরণের যৌক্তিকতা অনেক বেশী, কেননা কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নয়, বরং বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের অংশীদার হিসেবেই তাদের এই পরিচয়। তাদের নিজ নিজ কমিউনিটি যে সব উপাদানের কারণে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধারণ করে সেগুলো অস্বীকৃত হয় না। কিন্তু ইসলাম তাদের জন্য যার ব্যবস্থা করে সেগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন হওয়ায়, সেগুলোকে স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং তাদের যথাযথ স্থানে সেগুলো স্থাপন করা হয়।

উম্মাহ শব্দটি অনুবাদ করা যায়না; এটিকে এর মূল ইসলামী আরবীর রূপেই অবশ্য গ্রহণ করতে হবে। এটি 'জনগোষ্ঠী' বা 'জাতি' বা 'রাষ্ট্রের' সমার্থক নয়। এই শব্দ ও পরিভাষাগুলো সব সময়ই নিরূপিত হয় race, ভূগোল জাতি ও ইতিহাস, অথবা এগুলোর কোন সংমিশ্রণ দ্বারা। অন্যদিকে উম্মাহ হচ্ছে দেশ বা অঞ্চল অতিক্রমী, যা মোটেই ভৌগোলিক বিবেচনার দ্বারা নির্ধারিত নয়। এর এলাকা কেবল সমগ্র পৃথিবী নয় বরং গোটা সৃষ্টি। উম্মাহ কোন নরগোষ্ঠীর দ্বারা সীমিত নয়। উম্মাহ, race বা নরগোষ্ঠীকে অতিক্রম করে যায় এবং সমগ্র মানবজাতিকে এর বাস্তব অথবা সম্ভাব্য সদস্য বলে গণ্য করে। উম্মাহ রাষ্ট্রও নয়, কারণ তা সকল রাষ্ট্রকে অতিক্রম করে বিশ্বরাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহণ করে, যার মধ্যে স্থান পেতে পারে অনেকগুলো 'রাষ্ট্র'। একইভাবে উম্মাহর উপাদানগুলো নিয়েই গঠিত হয় উম্মাহ– যদিও সেগুলো কোন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের আওতায় নাও পড়ে, এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রের অন্ত র্ভুক্তও না হয়। উম্মাহ এক ধরনের জাতিসংঘ, যার থাকবে একটি দৃঢ় এবং সামগ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ, একটি বিশ্ব সরকার, একটি বিশ্ব সামরিক বাহিনী, তার সিদ্ধান্ত সমূহ বলবৎ করার জন্য। উম্মাহ হচ্ছে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা এবং যে-আন্দোলন এই সমাজ ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে বা এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করে, তা হচ্ছে উম্মাহতন্ত্র।[৫]

২. উম্মাহর প্রকৃতি

ক. নৃতত্ত্বকেন্দ্রীয়তার বিরুদ্ধে

ইসলামের সমাজব্যবস্থা বিশ্বজনীন, গোটা মানবজাতি এর অন্তর্গত, কেউই এর বাইরে নয়। মানুষ মানুষ বলেই এবং তার জন্মের জন্যই প্রত্যেক ব্যক্তি হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থার

---

৫. দেখুন লেখকের On Arabism: *Urubah and Religion : An Analysis of the Fundamental Ideas of Arabism and of Islam as its Highest Moment of Consciousness* (Amsterdam: Djambaton 1962) অধ্যায়-৬।

www.icsbook.info

প্রকৃত বা সম্ভাব্য সদস্য, তাকে রিক্রুট করার দায়িত্ব হচ্ছে বাকি সকল সদস্যের।[৬] পরিবার, গোষ্ঠী এবং জাতিতে মানুষের স্বাভাবিক বিভাগকে, ইসলাম আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহর নির্দেশিত ব্যবস্থা বলে স্বীকার করে।[৭] তবে এই ধরনের গ্রুপকে মানুষের চূড়ান্ত রূপ বলে ইসলাম স্বীকার করেনা, যে-রূপকে ভাল এবং মন্দের একটি চূড়ান্ত মানদন্ড গণ্য করা হয়ে থাকে। ইসলামে পরিবারের কানুনী ধারণায় সকল আত্মীয়-স্বজনই অন্তর্ভূক্ত, যারা যতো দূরেরই হউকনা কেন, একে অন্যের সঙ্গে কোন না কোনভাবে বংশ সূত্রে সম্পর্কিত। কেবল আইন নয়, ইসলাম তাদের পারস্পরিক উত্তরাধিকারগত সম্পর্কও নিয়ন্ত্রণ করে, এবং আইনের সমর্থ্যন দান করে। এ যেমন সত্য, তেমনি ইসলাম গোষ্ঠী এবং জাতির বৃহত্তর গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত করে একে অপরের পরিপূরক ও সাহায্যকারী শক্তি হিসেবে সকলের কল্যাণে কাজ করার জন্য।[৮] ব্যক্তিবর্গ অথবা গ্রুপ হোক সকল মানুষের উপর স্থান হচ্ছে আইনের। নৃতাত্ত্বিক ভিন্নতা ও বৈচিত্র হচ্ছে একটি বাস্তব বিষয়, ইহা কিছুটা অতিশয় বাঞ্ছিত বিষয় বটে, আর এটুকু বাদ দিলে ইসলাম একে একটি বাস্তব বিষয় বলেই মনে করে, যার স্থান আইনের নির্দেশের এখতিয়ারে। নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যখন নৃতত্ত্ব সর্বস্ব হয়ে উঠে, ইসলাম তাকে কুফর বা ধর্মত্যাগ বলে নিন্দা করে। কারণ এতে করে আইনের এবং ভাল মন্দের ভিন্নতর একটি উৎস স্থাপিত হয়, যেমন খোদ নৃতাত্ত্বিকতা; আইনতত্ত্বের দিক দিয়ে নৃতাত্ত্বিক বিবেচনা মোবাহ (অনুমোদনযোগ্য) এর আওতার মধ্যে পড়ে এবং একদিকে তা হারাম (নিষিদ্ধ) মাকরূহ বলে গণ্য, অন্য দিকে তা ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) এবং মানদুব (সুপারিশকৃত, অনুমোদিত)।

ইসলাম নৃতত্ত্বের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নয়, যা অতোদুর অগ্রসর হতে পারে যে, এ নিজ খলিফা নির্বাচিত বা যা তার নিজস্ব রাষ্ট্র গঠন করতে পারে। আল-মাওয়ার্দীর সময় থেকে এই অবস্থান বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে।[৯] অনুকরণ সম্পূর্ণ শরীয়াহ সম্মত হয়, যতক্ষণ তা এইরূপ অনুসরণ একটি নৃতাত্ত্বিক সার্বভৌম সত্তার উপরই কেবল নির্ভর করে, সমগ্র উম্মাহর সঙ্গে একমত হয়ে শান্তি ও যুদ্ধের দায়িত্ব পালনের

---

৬. শরীয়ার বাধ্যতামূলক প্রকৃতি ঐশী নির্দেশের ক্ষেত্রে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য, ব্যতিক্রমহীনভাবে এবং কোন বৈষম্য না রেখেই, কারণ ইসলামী মূল্যসমূহের লক্ষ্য হচ্ছে সকল মানুষ। এজন্য মুসলমান কর্তৃক সকল মানুষকে ইসলামে যোগ দেবার জন্য আহ্বান করা উচিত, কারণ মুসলমান ইসলামী ওহীর এই আদর্শিক উপাদানগুলো সম্পর্কে নিজেরা সচেতন। এই বিষয়টির আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, এই গ্রন্থকারের "On the Nature of Islamic Dawah," *Intenational Review of Mission,* vol. 65, No. 260 (October 1976)।

৭. হে মানবজাতি, আমরা তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছি, তোমাদেরকে জাতি এবং গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ ও সদাচারী সেই-ই আল্লাহর কাছে উত্তম (৪৯ : ১৩)।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. একাধিক খেলাফতের বৈধতা আল আশআরী সমর্থন করেছিলেন এবং আল-মাওয়ার্দি নিন্দা করেছিলেন, যাই হউক, সে সময়ে ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদদের অভিমত প্রায় ঐক্যমতে উপনীত হয়েছিলো– সহনশীলতার অনুকুলে। প্রশ্নটি ছিল কর্ডোভার উম্মাইয়া খিলাফত ও মিশরের ফাতেমী খিলাফতের।

www.icsbook.info

কর্তব্য এবং এভাবেই তার কর্মকান্ডকে পরিচালিত করার দায়িত্ব– যাতে করে অন্যের মন্দ নিবারণ করা যেতে পারে এবং তাদের কল্যাণ সাধন সম্ভব হয়। এই পন্থাগুলো ছাড়া ইসলাম কোন বৈশেষিকতাকে বরদাশত করেনা এবং এর বিরুদ্ধে যেখানে এবং যখনই বৈশেষিকতা মাথাচড়া দিয়ে উঠে, সকল মুসলমানের উপর সকল শক্তি নিয়ে জেহাদ করার ধর্মীয় দায়িত্ব অর্পণ করে।[১০] ইসলামী আইনের উৎস যেহেতু ঐশীসম্ভূত অর্থাৎ আল্লাহই যেহেতু এই আইনের উৎস, তাই এই আইন সকলের জন্য সমান, ঠিক যেমন আল্লাহ একক, তিনি সকল সৃষ্টির এবং নিশ্চয়ই সকল মানুষের আল্লাহ। তাই তার আইন এক এবং অভিন্ন। কারও প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব নেই, তার আইনে কোন ব্যতিক্রম নেই। ইসলাম নৃতত্ত্বকেন্দ্রীয়কতাকে বিচ্যুতি গণ্য করে। কারণ পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে আল্লাহর অসীম সত্ত্বার উপর আক্রমণ। আল্লাহ যদি পরম সত্য চূড়ান্ত বিচারক হন, (অর্থাৎ চূড়ান্ত নীতি, মানদন্ড ও উৎস হন) তাহলে সকল সৃষ্টির মোকাবিলায় তার অবস্থান এক এবং অভিন্ন হবে। কোন নৃতাত্ত্বিক গ্রুপ বা গোষ্ঠীকে তার প্রিয় বলে গণ্য করা, অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভিন্ন গণ্য করা তার আইনের ক্ষেত্রে, তার বিশ্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, তার পুরস্কার ও শাস্তি দানের পদ্ধতির বেলায়, কার্যতঃ তার পরমতা বা লোকোত্তরতাকে ক্ষুন্ন করা। পরম সত্য একাধিক এ দাবী স্বতঃবিরোধী এমনি দাবী যে একটি ক্ষুদ্র মনেরও তা বিবেচনার অযোগ্য। একই কথা খাটে নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদের প্রত্যেকটি বিভিন্নতার ক্ষেত্রে, তা মানবিকই হউক, যেমন eudaemonism (এরিষ্টটলের একটি মতবাদ, সুখ হচ্ছে যুক্তিশাসিত সক্রিয় জীবনের ফল) কিংবা সংস্কৃতিকই হউক, যেমন হিতবাদ, রাজনৈতিক উদারনৈতিকতাবাদের এংলো-স্যাকশন ঐতিহ্য, এবং জাতীয়তাবাদ অথবা[১১] প্রোটাগরিও মতবাদ, যেমন সুখবাদ, ' ত্যের নতুন সনাতন ধর্মই হউক।

খ. বিশ্বজনীন

প্রবনতা বা চরিত্রে দিক দিয়ে ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা বিশ্বজনীন,[১২] যদিও বর্তমানে তা কোন না কোন জাতি থেকে, কয়েকটি জাতির একটা গ্রুপ থেকে বা কতগুলো ব্যক্তির একটি দল থেকে এই প্রবণতা নিঃসৃত হয়ে থাকে, তবুও এটি এমন একটি চরিত্র বা প্রবণতা যা গোটা মানবজাতিকে ধারণ করতে চায়। তাই ইসলামের মৌলনীতির দিক দিয়ে বলতে গেলে কোন আরব, তুর্কী, পার্সিয়ান, পাকিস্তানী অথবা

---

১০. এবং বিশ্বাসীদের দুটি দল যদি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদের মধ্যে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা কর, এর পরও যদি দু'দলের কোন একটি আগ্রাসন চালায়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তাদের বোধোদয় হয় এবং দুইয়ের মধ্যে সুবিচারের ভিত্তিতে মীমাংসা করে দাও, ন্যায় পরায়ণ হও এবং সুষম আচরণ কর, কারণ আল্লাহ ন্যায়চারীকে পছন্দ করেন (৪৯ : ৯)।

১১. দ্রঃ এই গ্রন্থকারের প্রবন্ধ On the Metaphysical Status of Values in the Western and Islamic Tradition, *Studia Islamica,* Fascicle xxviii 19681, pp 29-62

১২. মুমিনেরা অবশ্যই পরস্পর পরস্পরের ভাই, তারা সবাই মিলে একই ভ্রাতৃ সমাজ (৪৯ : ১০) ... এই তোমাদের উম্মাহ এক, ঐক্যবদ্ধ ও অবিচ্ছেদ্য এবং আমি তোমাদের প্রভু, আমারই ইবাদত কর (২১: ৯২)।

www.icsbook.info

মালয় সমাজ ব্যবস্থা থাকতে পারেনা, কেবল একটি মাত্র সমাজ ব্যবস্থা থাকবে– তা হচ্ছে ইসলামী সমাজব্যবস্থা। অবশ্য যে কোন একটি দেশ বা গ্রুপের মধ্যে ইসলামী সমাজব্যবস্থার সূচনা হতে পারে। কিন্তু তা উর্ধারোহন করে অনৈসলামিক হয়ে পড়ে যদিনা তা সমগ্র মানব জাতিকে তার পরিমন্ডলে আনয়নের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে যায়। কিশ্ব সম্প্রদায়ের আদর্শ হচ্ছে ইসলামের আদর্শ, যার অভিব্যক্তি ঘটেছে বিশ্ব উম্মায়। ইহা সময়ের সাথে সংগতিবিহীন একটি মধ্যযুগীয় নিরংকুশ চরম আদর্শ নয়। পশ্চিমা জগতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের আদর্শ দেড় হাজার বছর বলবৎ ছিল রোমানদের 'ইমপেরিয়াম মুন্ডি' (বিশ্ব সরকার) থেকে রিফর্মেশন পর্যন্ত। ফরাসী বিপ্লবের এনলাইটেনমেন্টের দৃষ্টিতে আবার এর চেষ্টা করা হয়েছিল এবং তার পরে আবার চেষ্টা করা হয় গণতন্ত্র এবং কমিউনিজমের বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। এই সব ঘটনার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এর আদর্শের শত্রুদের বৈশেষিক জাতীয়তাবাদী ও নৃতাত্ত্বিক নাশকতামূলক কার্যের দ্বারা আদর্শটি বিকৃত, লংঘিত, ও নিহত হয়েছে এবং তাকে সমাধিস্থ করে রাখা হয়েছে। এই সব আন্দোলনের কোনটিই বিশ্বজনীন আদর্শের প্রতি শত্রুতাভাবাপন্ন নয়। অথবা আদর্শ হিসেবে এগুলো যে প্রকৃতপক্ষে আদর্শের বিরোধী তেমনভাবেও এগুলোকে বর্ণনা করা যায়না। সংস্কার আন্দোলনের সময় যে সব এথনিক শক্তি, তাদের রাজা রাজড়াদের চারপাশে জনগণকে সংঘবদ্ধ করেছিল, তারা রোমান চার্চ কর্তৃক আদর্শ বিকৃতির বিরোধী ছিল, এবং জাতীয়তাবাদী যে সব শক্তি ফরাসী বিপ্লবে যুক্তি কর্তৃক আদর্শ বিকৃতির মোকাবেলা করেছিল, তারা ছিল ইম্পেরিয়াল ফ্রান্সের পচন দূষণের বিরোধী। একইভাবে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই আদর্শের বিপর্যয় ঘটে ইহুদীবাদ ব্যর্থ ও নব্য উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র ও জোট চালের কারণে। অন্য কথায়, আদর্শটি ব্যর্থ হয়, আদর্শের প্রতি সত্যিকার আনুগত্যের অভাবে, এই আদর্শের অনুসারীদের স্নায়ুতন্ত্র অচল হয়ে যাবার কারণে। আদর্শের প্রতি পশচাত্য জনগণের বিশ্বাস অবশ্য অব্যাহতই থাকে। কিন্তু সমসাময়িক কালের সংশয়বাদের হস্তে চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটেছে এই আদর্শের, কেননা এই সংশয়বাদে কোন কিছুই যে পবিত্র নয়, শুধু তাই নয়, কোন কিছুরই কোন সঠিক বা সুনির্দিষ্ট মানও নেই।

গ. সমগ্রতাতত্ত্ব

ইসলামী সমাজব্যবস্থা একটা সামষ্টিক সমাজব্যবস্থা এই অর্থে যে, মানুষের কর্মকান্ডের প্রত্যেকটি যুগের জন্যই ইসলাম প্রাসঙ্গিক। এই সমাজব্যবস্থার বুনিয়াদ হচ্ছে আল্লাহর অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায় প্রত্যেকটি সৃষ্টির ক্ষেত্রেই অপরিহার্যভাবে প্রাসঙ্গিক, কেননা আল্লাহ প্রতিটি সৃষ্টিকে দিয়েছেন তার গঠন, একটি কাঠামো, একটি বিশেষ কর্ম।[১৩]

---

১৩. (কুরআন ২৫ : ২) ইসলামের বিশ্বজনীনতা এই সত্যে উদ্ভাসিত যে, মানুষ হিসেবেই সকল মানুষকে উদ্দেশ্য করে ইসলামের বিধি বিধানগুলো ঘোষিত হয়েছে। এর সামগ্রিকতাও সুস্পষ্ট এই সত্যে যে, যেখানে ইসলাম মানুষের জীবনের কোন আচরণের জন্য বিশেষভাবে কোন আইন

www.icsbook.info

মানুষ তাদের দৈহিক, বক্তিগত সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির দিক দিয়ে অবশ্যই আল্লাহ প্রদত্ত একটি বিধানের অধিকারী, যা পালন করা তাদের দায়িত্ব। তাদের কোন কাজই আল্লাহর অভিপ্রায়কে এড়িয়ে যেতে পারেনা, তারা তাদের চেষ্টা সাধনের কোন ক্ষেত্রেই নিজেদের জন্য এমন কোন লক্ষ্য বা প্রকল্প স্থির করতে পারে না, যা শরীয়তের ওয়াজিব ও হারাম ক্যাটাগরির আওতায় পড়েনা। অধিকন্তু, মোহাব (অনুমোদনযোগ্য) ক্ষেত্রটি, যা ইসলামের বাঞ্ছনীয় বিষয় দ্বারা যথাসম্ভব অধিকৃত, তা বিকশিত মানসিকতা এবং মার্জিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। সুস্পষ্ট বিধান ছাড়া (নিয়ম হচ্ছে অনুমতিযোগ্যতা), কোন কিছু নিষিদ্ধ হতে পারেনা।[১৪] আইনের এই বিধান হচ্ছে নিষিদ্ধ বিষয়ের সীমাকে অন্যায় এবং অবৈধভাবে সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে একটি নিবৃত্তিমূলক আইন– তবে জ্ঞাত তথ্যাদি বিচারের মাধ্যমে– এসবের অজ্ঞাত কোন কিছুর মূল্য বিচারের বিরুদ্ধে নয়। ইসলামের আইনসমূহের ব্যাখ্যা, সিদ্ধান্ত, প্রবর্তনা, সম্প্রসারণ এবং অজ্ঞাত তথ্যের অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিদ্যমান ও অস্তিত্বশীল সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে এসবের প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্টিত করার প্রয়াস, যেমন মূল্যবান তেমনি আবশ্যক। অন্যথায় চূড়ান্ত পর্যায়ে শরীয়ত আল্লাহর অভিপ্রায়ের যে সামগ্রিক ব্যাপকতার উপর দাঁড়িয়ে আছে, তা সংশয়ের বিষয় হয়ে উঠবে। এই সত্যের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে সেই সমাজব্যবস্থাই হচ্ছে সর্বোত্তম সমাজব্যবস্থা, যা মানুষের কর্মকান্ডের সম্ভাব্য সমস্ত কিছুকে সুবিন্যস্ত করে, সম্ভাব্য কম সংখ্যক বিষয়কে নয়; এবং সেটি হচ্ছে উত্তম গভর্ণমেন্ট, যা সবচেয়ে বেশী শাসন করে, সবচেয়ে কম নয়। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী সমাজব্যবস্থা কেবল একটি ক্লাব এবং শিক্ষিত সমাজ, একটি ব্যবসা বাণিজ্যের চেম্বার, একটি ট্রেড ইউনিয়ন, একটি ভোক্তা সমবায় সমিতি বা পাশ্চাত্য অর্থে একটি রাজনৈতিক দল নয়। এ সমস্তই ইসলামী সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত এবং আরো অধিক এর এখতিয়াভুক্ত। যেমন, হাসান আল বান্না এই যুক্তিতে বলতেন যে, সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর অভিপ্রায়ের প্রাসঙ্গিকতার কারণেই ইসলামী সমাজব্যবস্থার এই ব্যাপকতা।[১৫]

ইসলামী সমাজব্যবস্থার সমগ্রত্ব কেবলমাত্র সকল দেশ ও কালের মানুষের বর্তমান কমকান্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বরং এ সব কর্মকান্ডের কর্তা যে সকল মানুষ এবং

প্রণয়ন করেনি, সেক্ষেত্রে তার দায়িত্ব অর্পণ করেছে মুসলিম সমাজের উপর, মুসলমান তার প্রাত্যহিক জীবনের সকল কর্মকান্ড এবং সমস্যার ক্ষেত্রে ওহী বা প্রত্যাদেশের প্রয়োগ করতে বাধ্য। আল্লাহ যেরূপ কুরআনে ঘোষণা করেছেন (৬: ৩৮) সে মতে উজতিহাদ হচ্ছে সকল মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক একটি বিশ্বজনীন দায়িত্ব।

১৪. এটি হচ্ছে আইন প্রণয়নের সাধারণ মৌলনীতির অন্যতম (Al-qawid al – kullah) Subhi al Mahmasani: *Falsafat al Tashri fi al Islam* (Beirut, Dar al-Ilm al Malayin, 1380/1961) পৃষ্ঠা 261 ff. আবদাল ওয়াহহাব খাল্লাফ এগুলোকে বলেছেন, "Al qawaid al usuliyah al tashriiyah" এর সাধারণ নীতিমালা, বলে থাকেন। দ্রঃ তার *Ilm al Usul al Fiqh* (Cairo : Dar al Qalam 1392/1972)pp 197 ff.

১৫. Ishaq Misa al Husayni, *Al Ikhwan al Musliman* (Beirut : Dar Beirut al Tibaah wa al Nashr 1955)p. 79

www.icsbook.info

যাদেরকে ইসলাম এর অপরিহার্য সদস্য বলে গণ্য করে তাদের সকলেই এ সমাজব্যবস্থার শৃংখলার অন্তর্গত। যেখানে ইসলাম সকল মুসলমানকে তার সকল প্রোগ্রাম ও প্রকল্পের বাধ্যতামূলক সদস্য বলে দাবী করে, সেখানে এ দাবীও করে যে অমুসলমানরাও হচ্ছে এর সম্ভাব্য সদস্য, যাদেরকে ইসলামী সমাজের সদস্য হবার জন্য দাওয়াত জানাতে হবে। তাই ইসলাম সমাজব্যবস্থার কোন শেষ সীমা নেই, কেননা এ পৃথিবীতে জীবন এবং কর্মকান্ড হচ্ছে অন্তহীন। কাজেই দায়িত্ব এই যে, যা কিছু বিদ্যমান বা চলমান তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে–উদ্দেশ্য: অস্তিত্বশীল বা গতিশীল প্রত্যেকটি সত্ত্বা। নারী পরুষ নির্বিশেষে, বা তাদের প্রত্যেককে আল্লাহর অভিপ্রায়ের অধিকতর এবং উৎকৃষ্টতর পূর্ণতা পালনকারী করে তোলা।[১৬] ফালাহ হচ্ছে এ দুনিয়াকে আল্লাহর একটি জান্নাতে প্রকৃত রূপান্তর, যা হচ্ছে কুরআনের 'ইস্তিমার আল-আরদ', (এই ধারণাটির প্রকৃত মানে-পৃথিবীর পুনর্গঠন) এবং মানবজাতিকে বীর, প্রতিভা ও আউলিয়াতে উন্নীতকরণ, যাতে করে আল্লাহর ঈপ্সিত নক্সা বা নমুনা সার্থক হয়। আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে তা করতে গেলে তা ফালাহ হবেনা। ফালাহ্ দাবী এই যে, এই রূপান্তর সাধনের কর্মকান্ডগুলো আল্লাহর আইনকে পালন করে, কেননা এই কর্মকান্ডগুলোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের মধ্যে ফারাহ্র রূপায়ন।

ঘ. স্বাধীনতা

ইসলামী সমাজব্যবস্থা একটি স্বাধীন সমাজব্যবস্থা। যদি শক্তি বলে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা জনগণের উপর জবরদস্তির মাধ্যমে তার কর্মসূচি কার্যকর করতে চায় তাহলে সেই সমাজব্যবস্থা তার ইসলামী কক্ষ থেকে বিচ্যুত হবে। রেজিমেন্টেশন তো আবশ্যক হতেই পারে; কিন্তু তা বৈধ হতে পারে যদি তা কেবল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই সীমিত থাকে। এর পূর্বে, ইসলামে রেজিমেন্টেশন প্রবর্তনের ক্ষেত্রেই সূরার (শূরামর্শ) সিদ্ধান্ত আবশ্যক এবং রেজিমেন্টশন যে কোন অবস্থায় কেবল সাময়িক এবং বিশেষ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। যখন রেজিমেন্টেশনই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায় এবং নীতিগতভাবে জোর জবরদস্তির উপর নির্ভর করা হয়, তার ফল ঐশী নমুনার সফল বাস্তবায়নও হতে পারে, কিন্তু এ এমন এক ধরনের বাস্তবায়ন যার মূল্য হচ্ছে উপযোগীতামূলক, নীতিসঙ্গত নয়; কারণ এ বাস্তবায়ন নৈতিকতাসম্পন্ন হতে হলে এই প্রয়াসে যারা অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে তা করতে হবে স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে, মূল্যের প্রতি বা সংশ্লিষ্ট ঐশী নমুনার প্রতি ব্যক্তিগত অঙ্গীকার হেতু একটা স্বাধীন সিদ্ধান্ত হিসেবে।[১৭] এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উপযোগীতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ

---

১৬. কিভাবে আমরা কিছুই বাদ দেইনি, সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং বিচার দিবসে সকলকে আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে বিচারের জন্য (৬: ৩৮)।

১৭. আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সত্যসহকারে,' যে কেউ এ কিতাব দ্বারা চালিত হতে চায়, সেতো তা করে তার নিজের কল্যাণের জন্যই আর যে কেউ ভ্রান্ত পথে চলে তাতে তো তার নিজেরই ক্ষতি হয়। হে মোহাম্মদ, তুমি এ সত্য প্রচার ও সতর্ক করা ছাড়া অতিরিক্ত কিছু করতে পারনা (৩৯ : ৪১)।

www.icsbook.info

উভয়েরই বাস্তবায়ন ইসলামের লক্ষ্য। কিন্তু নৈতিকতাকে বাদ দিয়ে উপযোগীতাকে ইসলাম সহ্য করেনা এবং এর প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন করেনা। ইসলামের দৃষ্টিতে দুটি একই সঙ্গে রূপায়িত হলেই তা হয় যথার্থ বাস্তবায়ন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কুরআনের এই শিক্ষা দিয়েছেন সুস্পষ্ট ভাষায়। মানুষকে সৃষ্টি করা হচ্ছে– এই ইঙ্গিত পেয়ে ফেরেস্তারা, যারা কোন অন্যায় করতে পারেনা, কেবল আল্লাহর আদেশ পালন করে, তারা আপত্তি করে বসল, 'তাহলে কি আপনি (হে আল্লাহ) এমন কোন প্রাণীকে সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন যে দুর্নীতি, ঝগড়া ফ্যাসাদ ও খুনাখুনি করবে, অথচ আমরা আপনার স্তুতি ও প্রশংসায় নিয়্যত আছি? আল্লাহ জবাবে বললেন, আমার একটি উদ্দেশ্য আছে যা তোমরা জাননা।[১৮] মানুষেরা যদি ফেরেস্তাদের মত মন্দ কর্মে অক্ষম হত, তাদের কর্মকান্ড অবশ্যি আল্লাহর প্রত্যেকটি ইচ্ছা বা নির্দেশকে পালন করতে পারতো– কিন্তু তারা নৈতিক জীব হতোনা। নৈতিকতা হচ্ছে আল্লাহর অভিপ্রায়ের শীর্ষবিন্দু। তাহলে নিশ্চয়ই মানুষের কাছ থেকে দাবী করা হয় তার সর্বোত্তম অংশ, কারণ যে অভিপ্রায়ের মধ্যে নৈতিকতার নির্দেশনা নেই তা ঐশী অভিপ্রায় হতে পারেনা, তা স্ববিরোধী হয়ে পড়বে। কুরআনের অন্য একটি আয়াতে একই সত্যের উপর প্রথমোক্ত আয়াতটি থেকে আরো নাটকীয়ভাবে এবং একইরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় জোর দেওয়া হয়েছে– "আমরা আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং পর্বতসমূহের উপর আমাদের আমানত অর্পণ করেছিলাম" আল্লাহ বললেন। "কিন্তু তারা ভয়ে তাতে সম্মত হলনা, মানুষ তা বহন করল।"[১৯] আসমানে এবং জমিনে আল্লাহর অভিপ্রায় প্রাকৃতিক আইনের অনিবার্যতায় কার্যকর হচ্ছে, আকাশ ও পৃথিবীর কোন সৃষ্টিই তা পালন করতে বা লংঘন করতে পারেনা স্বাধীনভাবে। তাই তাদের এই রূপায়ণ নৈতিকতামন্ডিত নয়। কেবলমাত্র মানুষই নৈতিক সত্ত্বা, কারণ আল্লাহর নির্দেশনা পালনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সে-ই স্বাধীন, এজন্য কেবল মানুষই আল্লাহর 'আমানত' বহন করে।[২০] মূল্যের বাস্তবায়নের জন্য মানুষকে জবরদস্তিভাবে এই রূপায়ণে বাধ্য করা না হলে, এর মানে অবশ্য এই হবে যে, মানুষ যাতে স্বেচ্ছায় এতে অংশগ্রহণ করতে পারে, তার জন্য তাদেরকে দাওয়াত করতে হবে। এর অর্থ এই যে, মূল্য বাস্তবায়ন নৈতিকতামন্ডিত হতে হলে, তার তাৎপর্য এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা যে, মানুষকে শিখাতে হবে এবং তার মধ্যে এ প্রত্যয় সৃষ্টি করতে হবে যে, মূল্যগুলো হচ্ছে স্বতঃসিদ্ধভাবে মূল্যবান এবং ঐশী নির্দেশনাগুলো হচ্ছে বাঞ্ছিত

---

১৮. এবং যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বললেন, তিনি আদম সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন এবং পৃথিবীতে তাকে তাঁর প্রতিনিধিরূপে স্থাপন করবেন, তখন ফিরিশতারা বলল, আপনি কেন পৃথিবীতে এমন এক প্রাণীকে সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন সে রক্তপাত ঘটাবে এবং খারাপ কর্ম করবে; অথচ আমরা আপনার ইবাদত এবং নিত্য আপনার মহিমা কীর্তন করি। আল্লাহ জবাব দিলেন, আমার অন্য একটি লক্ষ্য আছে, যা তোমরা জাননা (২: ৩০)।

১৯. আমরা আমাদের আমানত-আকাশমন্ডল, পৃথিবী এবং পর্বতমালার উপর অর্পণ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাতে ওরা ভীত হয়ে পড়ে এবং সে আমানত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, অবশ্য মানুষ সে আমানত গ্রহণ করে এবং বহন করে (৩৩: ৭২)।

২০. প্রাগুক্ত।

www.icsbook.info

নমুনা। এতে করে, ইসলামী সমাজব্যবস্থা বিশাল পরিসরে একটি সেমিনার বা পাঠশালা হয়ে উঠে, যেখানে গভর্ণমেন্ট এবং নেতৃত্বের কাজ হচ্ছে শিক্ষাদান, শিক্ষিত করে তোলা, বিশ্বাস জন্মানো, অভীষ্ট স্থিরকরণ, জ্ঞানদান ও পরিচালনা।

ঙ. মিশন

উম্মাহ প্রকৃতির কোন আকস্মিক উদ্ভব নয়, এর অস্তিত্ব নিজের জন্য নয়, এবং সদস্যদের জন্য তো নয়ই, কেবল মাত্র আল্লাহর অভিপ্রায়ের একটি মাধ্যম হিসেবেই এর অস্তিত্ব, যা উম্মাহর মাধ্যমে দেশ ও কালের মধ্যে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। এ হচ্ছে আল্লাহর চূড়ান্ত ওহীর ছক, তার অভিপ্রায়ের একটি মাধ্যম। এ হচ্ছে সেই বিন্দু যেখানে জগতের সঙ্গে ঐশী সত্তার মিলন ঘটে। এখানে জগতের সূচনা করা হয়েছে– ঐশী লক্ষ্য রূপায়নের পথে তার অন্তহীন অগ্রযাত্রায়। আল কুরআন যেমন স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, উম্মাহর অস্তিত্ব এই জন্যই যাতে আল্লাহর কালাম হতে পারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।[২১]

৩. উম্মাহর অন্তর্গত প্রাণশক্তি

ক. উম্মাহ্কে বাদ দিয়ে ইসলামের অস্তিত্ব নেই।

আল্লাহ তায়ালা আদেশ করছেন "তোমাদের মধ্যে এক উম্মাহ্ হোক যে আহ্বান করবে কল্যাণের দিকে, পুণ্যকর্মের নির্দেশ দেবে এবং মন্দকর্ম নিষেধ করবে। যারা তা করে তারাই সফলকাম" (পবিত্র কুরআন ৩: ১০৪)। স্পষ্টতই মুসলমানরা আদিষ্ট হয়েছে নিজেদেরকে উম্মাহ্তে পরিণত করতে অর্থাৎ একটি সামাজিক সংস্থারূপে গঠিত হতে– একটি বিশেষ পন্থায়। আল কুরআনের পাঠ আমাদের দেয় এমন আদেশ নির্দেশের 'ইল্লাহ' বা ইল্লাত (প্রয়োজনীয় যুক্তি), অর্থাৎ 'কল্যাণের দিকে আহ্বান এবং পুণ্যকর্মের তাকিদ দিতে ও মন্দকর্ম বারণ করতে।" অবশ্য এই ইল্লাহ হচ্ছে একমাত্র চূড়ান্ত কারণ বা পরম লক্ষ্য, উম্মাহ্ যা সাধন করবে। এর চাইতে একটি নিম্নতরো চূড়ান্ত কারণ বা যুক্তি (এবং সে কারণে নিমিত্তস্বরূপ কারণ) হচ্ছে এই সত্য বা বাস্তবতা যে, উম্মাহ্ই কল্যাণের দিকে আহ্বান এবং পুণ্যকর্মের নির্দেশ ও মন্দ কর্মের নিষেধ সম্ভব করে তোলে। উম্মাহ্ হচ্ছে মুসলিমের অধিকার ও কর্তব্যের উৎস এবং এ সংস্থার বা সংগঠনের মধ্যেই এসব অধিকার অর্জন ও কর্তব্য সম্ভব হতে পারে।

মহানবী (সা.) এই বিধান দিয়েছেন, "কোনো দেশে বা স্থানে তিনজন মুসলমান থাকতে পারেনা, তাদের মধ্যে একজনকে ইমাম বা নেতা নির্বাচন না করে। যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিকারসমূহ সংরক্ষণ, আল্লাহর নির্দেশাবলী কার্যকরকরণ, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, হুদুদ বা আইনের সীমা বাস্তবায়ন এবং এ পৃথিবীতে এ অন্যজগতের

---

২১. তোমরা যদি মোহাম্মদ (সা.) কে সাহায্য না কর, তাতে কিছু আসে যায়না, কারণ আল্লাহ তাঁকে এই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবিশ্বাসীদেরকে অবনমিত করেন এবং আল্লাহর বাণীকে উচ্চতম মর্যাদা দান করেন, তিনি সর্ব ক্ষমতাসম্পন্ন এবং জ্ঞানময় (৯:৪০)।

www.icsbook.info

সুখ শান্তি পরিপূরণ, তাই তাদের জন্য নিজেদেরকে একটি উম্মাহ্ বা একটি সুসংবদ্ধ সমাজে সংগঠিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই– যে উম্মাহ্র থাকবে নিজস্ব সরকার।[২২]

কেউ কেউ আপত্তি উত্থাপন করে বলতে পারেন, ব্যক্তিগত মূল্যসমূহের বাস্তবায়নের জন্য উম্মাহ্ আবশ্যক নয়। পক্ষান্তরে তারা এ দাবী প্রবলভাবে করতে পারে যে, মূল্য যেহেতু তখনই সর্বোচ্চ যখন তা গোপন থাকে, তাই সমাজ এ ধরনের রূপায়ণকে নষ্ট করে দেয়। মুসলিম হিসেবে আমাদের জবাব এই যে, এ দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে একটি খৃষ্টান দৃষ্টিভঙ্গি। নিশ্চয়ই ইসলাম বক্তিগত মূল্যসমূহের তাগিদ দেয়, সমষ্টিগতভাবে যে মূল্যগুলোকে বলা হয় ইখলাস, (নিয়্যত, সিদ্ক, ইব্তিগা, ওয়াজহু আল্লাহ, তুহুর, আমানত ইত্যাদি), কিন্তু সমভাবেই ইসলাম সন্যাসব্রতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে (কুরআন ৫৬ : ২৭)। এর অনন্যতা এখানেই যে, ইসলাম দাবী করে, কোনো ইখলাসই বিশ্বাসযোগ্য নয়, যদি না দেশ ও কালের মধ্যে তা দৃষ্টিগ্রাহ্য কর্মরূপে প্রতিভাত হয় এবং সেই সঙ্গে সমগ্র সমাজের উপর তা ইসলামের তাগিদে রূপান্তরিত হয়। খ্রীষ্টান ধর্মে সমাজ ও রাষ্ট্র হচ্ছে সীজারের এলাকা (মসিহ ২২: ২৭, মার্ক ১২ : ১৭, লুক ২০ : ২৫), লিখিত সুসমাচারের শ্লোকের উপর ভিত্তি করে খৃষ্টান ধর্ম ঐতিহ্যগতভাবে এই বিশ্বাস করে এসেছে। সমাজের ক্ষেত্রে যাতে প্রাসঙ্গিক এবং ব্যবহার্য হতে পারে এজন্য খৃষ্টান নীতি-দর্শনের পরিসর বৃদ্ধির জন্য জোরে শোরে চেষ্টা শুরু হয় রিফর্মেশনের পরে থেকে এবং ক্যালভিনের মতবাদকে ধরে নেওয়া হয় আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসেবে। কিন্তু এসবই সংখ্যাগুরু লোকজনের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয় এবং কখনো তা বিশ্বাসের অংশ হতে পারেনি, কেবলমাত্র তাদের নিজস্ব দলীয় মতবাদের অনুসারীদের দৃষ্টিতে ছাড়া। ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের পর যখন মানুষের উপর শোষণ, নির্মমতা ও অধ:পতনের চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হলো, কেবল তখনি খৃষ্টান বিবেক জাগ্রত হয়, সামাজিক সম্পর্কে ও জন আইনের রূপায়ণের সঙ্গে খৃষ্টের প্রাসঙ্গিকতা সম্প্রসারিত করার জন্য। কেবলমাত্র গত বিশ, ত্রিশ বছরের মধ্যেই এবং প্রধানত রেসিজম, কম্যুনিজম এবং দুটি বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার ফলেই এই উদ্যোগ তখন সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠে। তা সত্বেও খৃষ্টান মন-মানসিকতা সরাসরি উম্মাহ্-সদৃশ একটি খৃষ্টান নীতি শাস্ত্রকে স্বীকার করে নেয়নি। যেখানে রাজনৈতিক ও সামাজিক পর্যায়ে খৃষ্টের আবশ্যিকতা অনুভূত হয় সেখানেও খৃষ্টের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে এ দাবী

---

২২. আমরা আমাদের রসূলগণকে পাঠিয়েছি, প্রয়োজনীয় প্রমাণসহ। আমরা তাদের প্রতি নাযিল করেছি কিতাব এবং দিয়েছি মিজান (ন্যায় বিচারের তৌলদন্ড) যাতে করে মানুষ পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আমরা তাদেরকে দিয়েছি লৌহ যা বিশাল ক্ষমতার একটি হাতিয়ার, যাতে করে তার দ্বারা মানুষের প্রতি তার ফায়দা কার্যকর হতে পারে এবং যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সহায়তা করতে ইচ্ছুক এবং তারা রসূলগণকে তা করতে পারে। আল্লাহ সর্ব শক্তিমান এবং উচ্চতম মর্যাদার অধিকারী (৫৭ : ২৫)। হে মোহাম্মদ, আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি কিতাব, সত্য সহকারে যাতে তুমি তার প্রত্যাদিষ্ট-ন্যায়দন্ড অনুসারে মানুষের প্রতি ন্যায় বিচার করতে পার (৪৫: ১০) ... এবং তাদের মধ্যে বিচার কর, যে মোহাম্মদ, তোমার প্রতি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার সাহায্যে এবং তাদের কুসংস্কার অনুসরণ করনা (৫ : ৪৯)।

www.icsbook.info

দ্ব্যর্থবোধক, কেননা, এ দাবী মতে, খৃষ্ট হচ্ছেন, পৃথিবীতে সিজারগণ যা করেন তার বিপরীত। এ কখনো সিজারগণের কি করা উচিত[২৩] সে বিষয়ে খৃষ্টকে কিছুই বলতে দেখেনা।

ইসলামের সমস্ত কিছুই আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং সবকিছুই ধর্মীয় নির্দেশের পরিসরের মধ্যে পড়ে। বস্তুতঃ উম্মাহ্ হচ্ছে সকল পুণ্যকর্ম ও নৈতিকতার অপরিহার্য শর্ত। এজন্যই আল্লাহ মুমিনদের বর্ণনা করেছেন "সেই সব নারী ও পুরুষরূপে যারা একে অন্যের রক্ষক– যারা একে অন্যকে সৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং মন্দকর্মে নিষেধ করে" (পবিত্র কুরআনে ৯:৭১)। আরো সরাসরি তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন "সৎকাজে এবং পুণ্য অর্জনে একে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করতে (পবিত্র কুরআন ৫:৩)। অপরপক্ষে আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দেন মন্দকর্মে একমত না হতে এবং পরস্পরের বিরোধীতা করতে, অপরাধ বর্জন ও আগ্রাসন বন্ধের জন্য (পবিত্র কুরআন ৫:৩)। শিক্ষামূলকভাবে তিনি সেই সব লোককে, অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন, যারা তাদের মধ্যে, যে সব মন্দকর্ম চলছিলো একে অপরকে তা নিষেধ করেনি (কুরআন ৫:৭৯)। এজন্যই মহানবী (সা.) বলেছেন, "যেখানে মানুষ, যারা একটি মন্দকর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেখে এবং তা পরিবর্তনের জন্য কোনো চেষ্টা করেনা– আল্লাহ তাদের উপর শাস্তি নাযিল করবেন।" এবং তিনি এ যুক্তিতে তার বিচারের ব্যাখ্যা করেছেন যে, পাপ বা মন্দ কর্ম যখন গোপনে করা হয়, তা যে মন্দকর্ম করে, কেবল তারই ক্ষতি করে, কিন্তু যখন তা প্রকাশ্যে করে এবং কেউ তা নিষেধ করে না, তখন তা সকলেরই ক্ষতি করে।[২৪]

উম্মাহ্র আরো যৌক্তিকতা পাওয়া যেতে পারে, নীতিশাস্ত্রীয় চেতনা এবং ব্যক্তিগত নীতিদর্শনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে। প্রথমটি থেকে এ তথ্য উদঘাটিত হয় যে, নৈতিক নির্দেশ হচ্ছে এমন একটি জিনিস যা কেবলমাত্র নৈতিকতার অধিকারী কারক বা কর্তা, প্রকৃতি ও অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের আওতার মধ্যে অবস্থান করে এবং তার নিজের জীবন যাপন করে, কেবলমাত্র তার থেকেই তা পাওয়া যেতে পারে, তার মধ্যেই ব্যবহৃত হতে পারে এবং কেবলমাত্র তার পটভূমিকাতেই তার মানে হতে পারে। আল্লাহর খেদমত হচ্ছে তাঁর ইচ্ছার বাস্তবায়ন এবং ঐশী অভিপ্রায় যেহেতু সেই সব মূল্য বা মৌলনীতি, যা সবকিছুকে মূল্যবান করে তোলে, তাই এ থেকে এ সিদ্ধান্ত সূচিত হয় যে, মানুষকে যদি আল্লাহর বন্দেগী করতে হয় তাকে অবশ্যই আন্ত ঃমানবিক সম্পর্কের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে, যার মাধ্যমেই কেবল নৈতিক মূল্যগুলোর বাস্তব রূপদান সম্ভব। ঠিক যেমন উপযোগী কিছুই মূল্যসমূহের বাস্তব রূপদানের জন্য দেশকালে চৌহদ্দিভুক্ত পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি দেহ বিমুক্ত আত্মার আবশ্যকতা-অর্থহীন, ঠিক তেমনি নৈতিকতার বাস্তবায়ন মানুষের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য, বন্ধুত্ব, বিবাহ, পড়শী, জাগতিক দ্রব্যাদির উৎপাদন ও ভোগ, যুদ্ধ ও শান্তি, বিচার ও রায়, মিশন ও শিক্ষা, অবকাশ ও নান্দনিক উপভোগ ভ্রাতৃসম্পর্কের ব্যাপারে

২৩. Barth, *Against the Stream* pp. 29-31.

২৪. Ismail ibn Kathir *Tafsir al Quran al Azim* (Beirut: Dar al Ma 'rifah, 1388/1969) s.v Quran 5: 79, vol. 2, pp 83-84

www.icsbook.info

অন্য মানুষের সাথে সম্পর্কহীন একজন গৃহত্যাগী, সাধু সন্যাসীর কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। নৈতিক মূল্যগুলো হচ্ছে একটি অতিক্রমী-দিব্য অবস্থায় কতগুলো আদর্শ সার নির্যাস মাত্র, যদিনা সেগুলো এধরনের আন্তঃমানবিক সম্পর্কের মধ্যে বাস্তবে রূপায়িত হয়। নৈতিকতার পূর্বেই এসব সম্পর্ক স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং এগুলোকে বাদ দিয়ে নৈতিকতা অসম্ভব। এই সব সম্পর্কের প্রত্যেকটি অস্বীকৃতি বা প্রত্যাহারের মানে হচ্ছে এর প্রাসঙ্গিক মূল্যটি, অর্থাৎ যে মূল্যের সঙ্গে ঐ সম্পর্ক হচ্ছে ভিত্তিমূল বা বাহক, তাতেই অবাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ। একজন ব্যক্তি, সন্যাসী বা সাধু, যে নির্জন জীবন যাপন করে, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তার ভিত্তি হচ্ছে মূল্যের এলাকার অবচ্ছেদনের উপর। কেননা এ জীবন পরিচালিত হয় এ নীতির দ্বারা যে, সচেতনতা বা কর্তার খোদ-আত্মা যে মূল্যগুলোর বাহন, দৃষ্টান্তস্বরূপ তার অনন্যতা ও নির্জনতা, কেবল এগুলো নিয়েই মূল্যের জগতে গঠিত, অথবা এসবই হচ্ছে সর্বোচ্চ মূল্যবোধ, যার স্বার্থে অন্য সব মূল্য লংঘন করা যায়। এর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে অন্যান্য মূল্যের অস্তিত্ব বিষয়ে সুস্পষ্ট অন্ধতা, একটা জবরদস্তি মূল্যগত ও দ্বৈতবাদ বা বর্জনকর মতবাদ। শেষোক্তটি হচ্ছে অন্যান্য মূল্যের প্রকৃত চালিকা শক্তি সম্পর্কে সংবেদনশীলতা, তাদের স্তরবিন্যাস সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, প্রকৃতপক্ষে যা মূল্যতাত্ত্বিক চূড়ান্ততারই অস্বীকৃতি। এতে বিষয়ের কিছু নেই যে, নিঃসঙ্গ প্রতিটি মানুষ, বিখ্যাত সাধু সন্যাসীগণ এবং ইতিহাস বিশ্রুত সন্যাসীগণ সকলেই কঠোর, অসংযমী এবং প্রায়শঃ নির্দয় জীবন যাপন করেছেন।[২৫]

যখনই ব্যক্তিক অর্থে নৈতিক পরিসরের সংজ্ঞা দেওয়া হয়, এর অনিবার্য পরিণতি ঘটে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদে, যার যৌক্তিক সমাপ্তি ঘটে আত্মপ্রচারে। কারণ চূড়ান্ত বিশ্লেষণে অবশ্যই তা নির্ভর করবে নৈতিক কর্তার অভ্যন্তরীণ নির্ধারণসমূহ বা উপাদানগুলোর উপর, যার বিচারক কেবল তার নিজের বিবেকই হতে পারে। নৈতিক ব্যক্তি বা এজেন্ট কামনা করতে পারে সর্বোচ্চ এবং মহত্তম পরার্থবাদী আদর্শ। ইচ্ছা যে কারণে নৈতিক হয়ে উঠে তা ধারণার দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত উপাদানটির মহত্ব বা পরার্থপরতা নয়, বরং ইচ্ছা করতে গিয়ে তার নিজের বৃত্তি যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে তার উপরই তা নির্ভর করে তার ব্যক্তিগত যে অভ্যন্তরীণ প্রতিজ্ঞা নৈতিকতা গঠন করে, তার এই অগ্রাধিকার বা সংকীর্ণ বৈশিষ্ট্যই তাকে করে তোলে আত্মপ্রচারশীল, সর্বক্ষণ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। যদি এ দাবী করা হয় যে, নিজেকে নিয়ে আবিষ্টতার মূলেও রয়েছে পরার্থপরতার প্রবর্তনা, যেমন দেখা যায় আত্মঈপ্সিত দৃষ্টান্তের মধ্যে, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, যেহেতু নৈতিক এজেন্টের আচরণ যতই প্রকৃতি এবং অন্য মানুষের সঙ্গে বেশী করে সংশ্লিষ্ট হবে, ততই তার নিজের কিংবা মানবজাতির আচরণ সম্পর্কে, যে দৃষ্টান্তের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, জড়িত না হয়ে সেই দৃষ্টান্ত অর্জনের প্রবণতা দেখা যাবে। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে সকল যুগের এবং জাতির দরবেশ এবং

২৫. William James. *The Variety of Religious Experience* (New York: Mentor Books, New American Library, 1953) pp. 269 ff pp 276 ff.

www.icsbook.info

সংসারবিরাগী সাধুসন্তদের নৈতিক অভ্যন্তরীণ প্রতিজ্ঞার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই সব দরবেশ ও সাধুসন্ত, যাদের মধ্যে দেখা যায় পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার নৈতিকতার দ্বারা জগৎ বিমুখতা, জগৎ বর্জন ও দেহকে নিগ্রহ। এটি সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে, ইসলাম একটি ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের ধর্ম, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের ধর্ম, প্রাত্যহিক এবং অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের জালের মধ্যে অবস্থান করে, একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং পরস্পর প্রভাবিত হয়, অন্য মানুষ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং অন্যেরাও তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়, তাকে বাদ দিয়ে ইসলাম সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে মহানবীর (সা.) মশহুর উক্তি, "ধর্ম হচ্ছে অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক, ব্যবহারের বিষয়", হচ্ছে এ পৃথিবীতে অন্য মানুষদের বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার ইসলামী প্রবণতার প্রকাশক।[২৬] আমরা ইতিপূর্বে যেরূপ উল্লেখ করেছি, সমাজের জন্য 'হাই ইবনে ইয়াকজানের' এই আকৃতি প্রকাশিত হয়েছে, সত্য আবিষ্কারের পর এবং ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের মাধ্যমে, সম্ভাব্য তার সকল সুখ ও আনন্দ লাভের পর।[২৭]

খ. এক এবং একমাত্র উম্মাহ্

আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের এই উম্মাহ্ একটি মাত্র উম্মাহ্" (কুরআনুল করিম ২১ : ২৯), ২৩ : ৫৩)। এই ঘোষণার দ্বারা আল্লাহ বলতে চেয়েছেন, মুমিনদের থাকবে একটি মাত্র উদ্দেশ্য, একটি ভিত্তিপ্রস্তরস্বরূপ মূল্যমান যা, তাদের সমস্ত কর্মপ্রায়াসকে স্থাপন করে একটি সর্বপরিবৃত তাৎপর্যের অধীনে, যা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত। উম্মাহ্-এক এবং সবসময়ই তা একই থাকবে, কেননা আল্লাহ এক এবং তার ইবাদত এক ও অবিভাজ্য। কুরআন এবং মহানবীর সুন্নায় লিপিবদ্ধ এবং শরীয়ায় বাস্তবরূপে প্রতিফলিত, মানব জাতির জন্য আল্লাহর অভিপ্রায় সকল স্থানে এবং সকল সময়ে এক এবং অভিন্ন। তার অভিপ্রায় হচ্ছে সকল মানুষের জন্য এবং তার দৃষ্টিতে সকল মানুষ হচ্ছে সম্পূর্ণ সমান। তিনি বিশেষ কোন ব্যক্তি বা জাতির কাছ থেকে কম বা বেশী প্রত্যাশা করেন না, যা তিনি প্রত্যাশা করেন অন্য সকলের কাছে থেকে। তাই উম্মাহ্র এই একত্ব হচ্ছে ধর্মীয় এবং নৈতিক; জৈবিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ভাষাগত বা সাংস্কৃতিক নয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) ইহুদীদেরকে একটি উম্মাহ্ বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও তারা মুসলমানদের সঙ্গে একই অঞ্চলে বসবাস করতো এবং একই রাজনৈতিক, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক গ্রুপের অন্তর্গত ছিলো। যেহেতু তাদের আদর্শ ধর্মীয় এবং নৈতিক উভয়েই পৃথক, সে কারণে তিনি তাদেরকে একটি উম্মাহ্ বলে গণ্য করতেন। ইসলাম জীববিদ্যা, ভূগোল, রাজনীতি, ভাষা অথবা সংস্কৃতির ভিত্তিতে কোন উম্মাহ্ স্বীকার করেনা, কেবল ধর্মের ভিত্তিতে উম্মাহ্ স্বীকার করে। এজন্য আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে সুপরিচিত ন্যাশান, জাতিগোষ্ঠী (race) রাষ্ট্র, মহাদেশ– এই স্তরবিন্যাসগুলো ইসলামে স্বীকৃত নয়।

---

২৬. অথবা বরং 'ধর্ম হচ্ছে অন্যকে ভাল কাজ করার পরামর্শ দান।"

২৭. Ibn Tufayl, *Havy ibn Yaqzan* tr. Goorge N. Atiyah in *A Source Book in Medeval Political Philosophy*, ed Ralph Lerner and Muhsin Mahdi (Glenceo Il : The Free Press 1936)

www.icsbook.info

একথা বলার তাৎপর্য এ নয় যে, উম্মাহ্র ধর্মীয় ঐক্য এধরনের ভিন্নতর ঐক্যগুলোর দ্বারা কার্যকর করা যায় না বা এগুলো পরিপূরক হিসেবে কাজ করেনা। স্থান ও ভূগোলের ঐক্য, ভাষা এবং সংস্কৃতির ঐক্য, জৈবিক জন্ম এবং জনগোষ্ঠীর ঐক্য, ধর্মীয় ঐক্যের সহায়তা করতে পারে এবং কার্যত করেও থাকে। "ইসলামী আইনের একটি মূলনীতি হচ্ছে ঘনিষ্ঠতর আত্মীয় স্বজনেরা, মানুষের সৎকর্মে অধিকতর হকদার।"[২৮] ইসলাম বলতে চায় যে, ধর্মীয় এবং নৈতিক উপাদানকে ডিঙিয়ে ব্যক্তি মুসলমান বা মুসলিম গ্রুপের আচরণ কিছুতেই দৈহিক নৈকট্যের দ্বারা নির্ধারিত হতে দেওয়া হবেনা। আল্লাহ বলেছেন, "আমি সকলকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ এবং এক রমণী থেকে এবং তোমাদেরকে ভিন্ন গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে ভাই-ভাই হিসেবে মেলামেশা করতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই হবে মহত্তম যে সবচেয়ে পুণ্যবান (কুরআনুল করীম ৪০ : ১৩)। স্পষ্টতই দৈহিক নৈকট্যের স্থান, সৎগুণ ও নেক কর্মের নীচে, নৈতিক যোগ্যতা এবং ব্যক্তিগত মেধার তুলনায় এর স্থান গৌণ, মূখ্য নয়।

তাই উম্মাহ্ জন্ম, ভূগোল এবং ভাষার বিষয় নয়। এগুলো হচ্ছে মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ এবং তজ্জন্য অপরিহার্য। একটি ধর্মীয় এবং ভ্রাতৃসমাজ হিসেবে উম্মাহ্ হচ্ছে ব্যক্তিবর্গের একটি স্বাধীন জামাত, যার লক্ষ্য, তাদের নিজেদের জন্য এবং মানব জাতির মধ্যে সকল মূল্যের জগত বাস্তবায়ন, যা ঐতিহ্যিক ইসলামী পরিভাষায়, "উভয় বাসস্থানে সুখ ও শান্তি, এ জীবনে এবং পরজীবনে।" মানুষ একটি অন্ধ সুযোগে উম্মাহ্র মধ্যে জন্মগ্রহণ করেনা, বরং একটি বুদ্ধিমান যুক্তিবাদী সত্ত্বা হিসেবে তার উম্মাহকে সে বেছে নেয় এবং তাতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়। উম্মাহ্ একটি সম্প্রদায় নয়, একটি সমাজ; প্রকৃতিগতভাবে ইহা একটি সম্প্রদায় নয়, বরং স্বেচ্ছায় গঠিত একটি সম্প্রদায়, একটি সমাজ।

ঠিক প্রথম হিজরার পরে ইসলামী আন্দোলন যখন শুরু হল, সে সময়ে সম্প্রদায়ের সহজ রূপ, গোত্র এবং সাম্রাজ্য, যা জাতিগোষ্ঠী, ভাষা সংস্কৃতি ও ইতিহাসের উপর স্থাপিত একটি রাজনৈতিক সমাজ, তার অস্তিত্ব ছিল এবং এগুলোর তরক্কি হচ্ছিল, ইসলাম উভয়কেই ধাক্কা দিয়ে ধূলিসাৎ করে। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করে একটি বিশুদ্ধ সমাজ, ধর্মীয় ও নৈতিক বিধানের অধীনে একটি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এবং তাতে যোগদানের জন্য গোটা মানবজাতিকে আহ্বান করে। মানুষের সামাজিক ইতিহাসে এটি ছিল, এখনো রয়েছে মহত্তম নবধারা। এটা সত্য যে, সম্পূর্ণভাবে ধর্ম এবং নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছে খৃষ্টান ধর্ম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে খৃষ্টানত্বের জন্য অপরিহার্য ধর্মীয় এবং নৈতিক উপাদানকে পর্যবসিত করা হয়েছে ন্যূনতম বিন্দুতে; অর্থাৎ ধর্মের অনির্বচনীয় পরীক্ষামূলক সাধনা এবং ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের বিশুদ্ধতম নৈতিকতায়। এ উভয়ই ব্যক্তিগত, গোপন বা অভ্যন্তরীণ এবং

---

২৮. *Al aqrabun awla bt al ma'ruf.* এটি হচ্ছে আইন প্রণয়নের একটি সাধারণ নীতি।

www.icsbook.info

এর সম্পাদন, বিচার ও মূল্যায়নের জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ব্যক্তির বিবেক বুদ্ধির উপর এবং যে মুহূর্তে একে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ্য, সার্বজনিক বা সমাজভিত্তিক উপাদান অর্পণ করা হল, সে মুহূর্তেই রাজত্ব ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো এবং অংশত তা ফিরে গেল, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে স্থাপিত প্রাচীনতর সামাজরূপে। খৃষ্টান ধর্মের প্রথম দিকের বিভাগগুলো, যা ঘটেছিল নাইসিয়া এবং কেলসিডনে, প্রধানতই তা সংশ্লিষ্ট ছিল উচ্চতর মাত্রায়, এক দিকে সেমেটিক অন্যদিকে সাধারণ মানুষের গ্রীক, দল উপদলবাজীর মধ্যে। একইরূপে, ১০৫৮ খ্রীষ্টিয় শতকের মহামতবিভেদ ছিল প্রাচ্য বনাম প্রতীচ্যের মধ্যে। চূড়ান্ত পর্যায়ে ষোল শতকের সংস্কার আন্দোলনে জার্মান, ইংরেজ, ফরাসী, ইতালীয়, ও ডাচদের জাতিগত প্রবণতাগুলোই, ব্যক্তিগতভাবে মনস্তত্বের দিক দিয়ে বিব্রত ক্যাথলিক সন্যাসী লুথার তাঁর আশ্রম গুরুদের কাছে যে ৯৫টি থিসিস উপস্থাপন করেছিলেন, সেগুলোর ফল নির্ধারণ করেছিল।[২৯]

তাই ইসলামে উম্মাহ্র অভ্যন্তরে কোনো ধর্মীয় বিভেদ এবং কোনো নৈতিক স্বাধীনতা বা বিভাগ বৈধ নয়। উম্মাহ্র ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্নতাও বেদাআত, কারণ ধর্মীয় ও নৈতিক অর্থে উম্মাহ্ হচ্ছে সন্দেহাতীত ভাবেই একটি এক শিলায় তৈরী স্তম্ভের মত ব্যবস্থা। এর বিপরীত কিছুতে বিশ্বাসের মানেই হচ্ছে এমন সব ধর্ম পালন ও এমন সব নৈতিক নীতি অনুসরণ যা ইসলাম থেকে ভিন্ন, স্পষ্টত:ই তা অযৌক্তিক এবং হাস্যকর। অধিকন্তু ইসলামের অভ্যন্তরে ধর্মীয় নৈতিক বিভিন্নতা অনুমোদন করার মানেই হচ্ছে তাওহীদকে পরিত্যাগ করা, যে তাওহীদ হচ্ছে সকল সত্য জ্ঞানের একত্বের মূলনীতি। এ হবে সত্যের প্রতি দুটি ভিন্ন দাবীর সহাবস্থান অনুমোদন করার নামান্তর। এই বিচার মোটেই যৌক্তিক নয়, কেননা এখানে যে সমস্যাটি বিরাজ করছে তা দাবী এবং প্রতিদাবীর সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা নয়, বরং সেতুবন্ধের মত বুদ্ধির সাহায্যে সত্যের অধিগম্যতার সম্ভাব্যতা মেনে নেওয়া, যার অর্থে দাবী এবং প্রতিদাবীর মধ্যে বিরোধের সমাধান হতে পারে এবং বিভিন্নতা দূর করা যেতে পারে। নিশ্চিতভাবে ইসলাম পরমসত্যের বহুত্বের বিরোধী, সত্য সম্পর্কে মতের বিভিন্নতার বিরোধী নয়। ইসলামের দাবী অনুসারে মতামত হতে হবে দায়িত্বশীল। ইসলাম নিজের পথ নির্ধারণে এ দায়িত্ব পালনের জন্য ইজমার ব্যবস্থা করেছে (ঐক্যমতের ব্যবস্থা করেছে)। ইসলামী আইন শাস্ত্রে উম্মাহ্র প্রত্যেকটি ঐক্যমতকে সৃজনশীল উদ্ভাবনশীল ব্যাখ্যাতা কর্তৃক লংঘন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তৎসঙ্গে ইসলাম এ বিধানও দিয়েছে যে, ব্যাখ্যাকারকে এর জন্য উম্মাহ্র ঐকমত্য চাইতে হবে, অন্যথায় তা বেদাআত হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হবে।

যাহোক, ধর্মীয় নৈতিক দিক দিয়ে উম্মাহ্ এক, একথা বলার তাৎপর্য এ নয় যে, উম্মাহ্ কোনো প্রশাসনিক বিভাগ স্বীকার করেনা। বস্তুত দক্ষতার প্রয়োজনে ও স্বার্থে, উম্মাহ্র মধ্যে যতগুলো প্রশাসনিক বিভাগ প্রয়োজন উম্মাহ্র অভ্যন্তরে ততগুলো বিভাগই

---

২৯. Henry Bettenson -এর ডকুমেন্টস গ্রন্থটি চার্চের আইডিয়েশনাল ইতিহাসের খুটিনাটির জন্য পড়তে পারেন।

www.icsbook.info

সম্ভব। শাফেয়ী মাযহাব রমাজানের প্রথম দিন নির্ধারণের জন্য ঈদুল ফিতর এর দিন নির্ণয়ের জন্য, এবং যাকাত তহবিলের বিতরণের জন্য, ২৪ ফার্সাখ এর ইউনিট (১৯২ কিলোমিটার) স্বীকার করে।[৩০] আজ সংগতভাবেই এ যুক্তি উত্থাপন করা যেতে পারে যে, যোগাযোগ টেকনোলোজিতে অসাধারণ উন্নতির ফলে সারা পৃথিবী একটি মাত্র প্রদেশ হয়ে উঠেছে। যাহোক জনপ্রশাসন কেবলমাত্র যোগাযোগের একটি বিষয় নয়। বলা যেতে পারে দক্ষতা ও সেবার দাবী অনুসারে উম্মাহ্ অবশ্যই বিভাজ্য।

এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, উম্মাহ্র একটি বিভাগের মধ্যে প্রশাসনিক স্বায়ত্বশাসন সেই বিভাগকে আইন প্রণয়নের স্বায়ত্বশাসন দান করেনা। ইসলামে আইন প্রণয়ন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহ বা শরীয়ত দ্বারা শাসিত। এই পদ্ধতিতে সাধারণ নীতিমালাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের প্রয়োগ থেকে। সাধারণ নীতিমালার মধ্যে কোন পরিবর্তন স্বীকার করা হয়না, কারণ এ নীতিমালা আল্লাহ কর্তৃক জারীকৃত এবং যুক্তিগ্রাহ্য। মানুষের সৃজনশীলতার প্রয়োজন সেখানেই হয় যেখানে একটি নীতি বা মূল্যকে আচরণের নির্দিষ্ট মূর্ত নির্দেশে রূপদানের প্রয়োজন হয়। যাকে বলা যায় আইনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা দানের প্রয়োজন হয়, এবং প্রয়োজন হয় সেই সব নির্দেশনা পালন ও কার্যকর করণের। কেবলমাত্র মহানবীর (সা.) প্রদত্ত নির্দেশই আদর্শ, অবশ্য পালনীয়। ঐশী নির্দেশ অনুসারে তা ঘোষিত হয়েছে, "নবীর সুন্নাহর মধ্যে যে কেউ আল্লাহর সাহায্য চায়, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর আদর্শ (৩৩:২১)।" অন্য সকলের জন্য প্রদত্ত ব্যবস্থা নির্দেশই হচ্ছে একটি মানবিক প্রয়াস, যাকে কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং উম্মাহর ঐক্যমতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

উম্মাহ্র যে কোন প্রশাসনিক বিভাগের সৃজনধর্মী প্রয়াস, তার নির্দেশনার ক্ষেত্রেই হোক অথবা কার্যকারণের বেলায়ই হোক তা ইসলামিক আইনে একটি তর্কের বিষয়; এই আইনের বৈধতা সম্পর্কে পৃথিবীর মুসলমানদের প্রত্যয়ী করে অথবা মুসলিম বিশ্বের জনমত যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে, এবং বিতর্কের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, তখন তা বর্জন বা পরিবর্তন করে এই প্রয়াসকে সার্বজনীনতা দান হচ্ছে প্রশাসনিক বিভাগের দায়িত্ব।[৩১]

আমাদের কালকে বাদ দিলে, উম্মাহ্ তো সমগ্র ইতিহাসকালে ছিল একটি মাত্র শিলার দ্বারা তৈরী স্তম্ভের মত একটি ঐক্য; কেননা সব সময়ই তা এক বা অভিন্ন ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত হয়েছে। রাজনৈতিক দিক দিয়ে কেবলমাত্র খোলাফায়ে রাশেদীন এবং উমাইয়া আমলে (১০-১৩১ হিজরা/৬৩২-৭৪৯ খ্রীষ্টিয় সন) উম্মাহ্ ঐক্যবদ্ধ ছিল, একটি অধি-রাজত্বের অধীনে, এর ইতিহাসের বাকি সময়টুকুতে ১২০০ বছরেরও

---

৩০. Abd al Rahman al jaziri: *Al Fiqh ala al Mahab al Arba' ah* (Cairo: Al Matalaah al Tijariah al Kubra, n.v) Beginning of Remadan And Shawwal vol. I pp 584-85

৩১. ইহাই একমাত্র পথ বলে মনে হয়, যাতে করে গতিশীল এবং সৃজনধর্মীয় ইসতিহাদের সমন্বয় সাধিত হতে পারে একই রকম বাঞ্চনীয় একমত ও ঐক্যমতের লক্ষ্যের সঙ্গে। এ দুটি মূল্যমানই ইসলামের বিশ্বদৃষ্টির এবং এর আদর্শ পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

www.icsbook.info

অধিক কালের মধ্যে উম্মাহ্ বিভক্ত হয়ে পড়েছে বহু রাজনৈতিক বিভাগে; কিন্তু আইনের একত্ব ছিল তার চেয়ে দৃঢ়তর। এই আইন মুসলিম বিশ্বকে দিয়েছে তার বিভিন্ন অনুষ্ঠান, তার নৈতিক, ভিত্তি, এর জীবনে, এবং সংস্কৃতির রীতি ও ভঙ্গি, সকল জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির মুসলমানদেরকে এই আইন এক এবং অভিন্ন আদর্শে শিক্ষাদান করেছে এবং একই আদর্শে নিবেদিত একটি ভ্রাতৃ সমাজের মধ্যে তাদেরকে সংহত করেছে। ইসলামী আইনের অভিন্নতা ও একত্ব, ইসলামের ইতিহাসের চৌদ্দশ' বছরের খণ্ডন ও বিচ্ছিনতার আশংকা মোকাবেলা করেছে সাফল্যের সঙ্গে, তৎসঙ্গে বৈদেশিক শক্তির বিজয়কেও ঠেকিয়েছে। যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যেতে পারে, বিশ্বব্যাপী মুসলিম ঐক্যের সর্বাগ্রবর্তী শক্তি এবং মেরুদন্ড উভয়ই হচ্ছে শরীয়ত, এই সত্য ও বাস্তবতাই উম্মাহ্কে করে তুলে একটি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃসমাজ, যেখানে সকল মানুষই হচ্ছে তার সদস্য, মূলত জন্মগতভাবে এবং কার্যত এই আইন বিশ্ব ভ্রাতৃসমাজে প্রবেশ করার স্বাধীন ব্যক্তিগত নৈতিক সিদ্ধান্তের বদৌলতে।[৩২]

গ. উম্মাহ্গত ঐক্য ও সংহতির প্রকৃতি

১. সর্বব্যাপকত্ব

এটা আশা করা যায় যে, ইসলাম যে জীবনের একটি সামগ্রিক সর্বব্যাপক ব্যবস্থা ও পদ্ধতি তা প্রমাণের কোন আবশ্যকতা নেই। ইসলাম পৃথিবীকে পবিত্র-অপবিত্র, পাক-নাপাক এই দুই ভাগে ভাগ করেনা, জীবনকে ধর্মীয় এবং ধর্ম নিরপেক্ষ বলে স্বতন্ত্র গণ্য করেনা। মানুষকে পৌরোহিত্য ও পৌরোহিত্য-বহির্ভূত শ্রেণীতে পৃথক গন্ডীভূক্ত করেনা। ইসলাম এ সকল বিভাগকে কৃত্রিম, অস্বাভাবিক, অযৌক্তিক গণ্য করে। ইতিহাসের বিচারে এ সমস্তই অমুসলিম ট্রাডিসনের আওতাভুক্ত, খৃষ্টান ট্রাডিসনের অংশ ইম্পেরিয়াল রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবাদাস খৃষ্টান ধর্মের ট্রাডিসন। আর এই ইম্পেরিয়াল রোমেই খৃষ্টান ধর্মের জন্ম হয় ও তার অবয়ব নির্মিত হয়।

বস্তুত: ধর্ম দর্শনের সঙ্গে ইসলাম প্রাসঙ্গিক অর্থাৎ পরাবিদ্যার সর্বোচ্চ নীতিমালার সঙ্গে যেমন ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা বিদ্যমান, তেমনি তা ব্যক্তিগত প্রাত্যহিক জীবনের ছোটখাট খুটিনাটির ক্ষেত্রেও তা প্রাসঙ্গিক। পবিত্র কুরআনেই আমরা সত্তার দ্বৈতরূপের স্বীকৃতি পাঠ করি : বাস্তব সৃষ্টি এবং সীমায়িতক্রমী স্রষ্টা, প্রকৃতি এবং মানবভাগ্য, মানুষের স্বাধীনতা এবং দায়িত্ব সকল সৃষ্টির কারকত্ব, নিমিত্তত্ব এবং নমনীয়তা, বিশ্বজগতের নিয়ম শৃংখলাবদ্ধতা, সত্য ও মূল্যের একত্ব, এবং একই ভাবে আমরা পাঠ করি, অভিবাদনের জবাবে উৎকৃষ্টতর অভিবাদনের আদেশ (কুরআন ৪ : ৮৫), কোন গৃহে প্রবেশের আগে, প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনার (কুরআন ২৪ : ২৬-২৮), অন্যদের চিৎকার না করে মোলায়েম ভাষায় সম্বোধনের, (কুরআন ৩১ : ১৯)।

---

৩২. এখানে শরীয়াহ-এর অখণ্ড ভূমিকা এবং সোলোনের আইনের মধ্যে একটি সমান্তরাল রেখা টানা যেতে পারে। সোলোনের এই আইন ঈজিয়ান সাগরের চারদিকে বসবাসকারী ছড়ানো ছিটানো গ্রীকদেরকে একই সাংস্কৃতিক ঐক্যের মধ্যে আনয়ন করেছিল।

www.icsbook.info

কুরআন এবং সুন্নাহ মিলিতভাবে আচার-আচরণ, রাজনীতি, অর্থনীতি, নৈতিক নীতিমালা এবং সমাজপদ্ধতির একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা আমাদেরকে দিয়েছে। এটা সত্য যে, কুরআন আমাদেরকে সকল খুঁটিনাটি দেয়নি, কিন্তু দিয়েছে সকল মৌলনীতি এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে কিছু খুঁটিনাটি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোন একটি বিষয়ে মর্মকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য, অন্য ব্যাপারের চাইতে বেশী খুঁটিনাটি দেওয়া হয়েছে এবং সুন্নাহও তাই করেছে। কিন্তু ইসলামের পবিত্র গ্রন্থের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ তায়ালা কিংবা তার নবী (সা.) যে সব খুঁটিনাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি, সেগুলোর বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও বিশেষ রূপদানের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মুসলমানদের উপর। নিশ্চয়ই মুসলমানরা যোগ্যতার সঙ্গেই দায়িত্ব পালন করেছে এবং সামগ্রিক আইন ব্যবস্থা বিশদরূপ তৈরী করেছে মানুষের ইতিহাসে, তেমনটি যা আর কোথাও হয়নি।[৩৩] এই সামগ্রিক ব্যাপকত্বের তাত্ত্বিক ভিত্তি এই স্বতঃসিদ্ধ যে, মানুষের প্রত্যেকটি কর্মের মধ্যেই নিহিত রয়েছে, কোন না কোন মূল্যের সম্ভাবনা, যেহেতু উম্মাহ্‌র লক্ষ্য হচ্ছে এই মূল্যের বাস্তবায়ন, তা থেকে এই সিদ্ধান্ত সূচিত হয় যে, যেখানেই এই বাস্তবায়নের সম্ভাবনা দৃশ্যমান হয়ে উঠবে, সেখানেই উম্মাহ্ তা বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টিত হবে। এর তাৎপর্য এই যে, মানুষের প্রত্যেকটি কর্মকান্ডের ব্যাপারে উম্মাহ্‌র কিছু না কিছু বক্তব্য থাকবেই। যেহেতু ইসলামী আইন এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, তাই উম্মাহ্‌র কোন প্রশাসনিক বা বিচার বিষয়ক পরিসরের বাইরে কোন কার্যই পড়েনা।

২. বৈষয়িকতা বা অন্তর্স্থিত বিষয়াদি

যে কোন একত্বের সামগ্রিক প্রকৃতি, আনুষ্ঠানিক বা বিমূর্ত হতে পারে। বস্তুত, ব্যাপকতা যত বেশী হবে, একত্ব ততই বেশী শরীরী হয়ে থাকে। এবং একটি সমগ্র ধর্ম বা বিশ্বদৃষ্টি কিংবা নীতিমালাকে কয়েকটি বিমূর্ত শব্দের মধ্যে পুরে দেওয়া যেতে পারে-যা সবকিছু বোঝাতে গিয়ে কিছুই বুঝায় না। ইসলামের সামগ্রিক ব্যাপকত্ব বৈষয়িকতা বা উপাদানকে বর্জন করে অর্জিত হয়নি। পক্ষান্তরে, এর মোকাবেলায় দাঁড় করিয়েছে নিরেট উপাদান অর্থাৎ নীতিসম্মত প্রতিটি বাঞ্ছিত বিষয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট আইনগত ব্যবস্থা ও নির্দেশ এবং যেখানে বিষয়টি আইনের বহির্ভূত সেখানে দিয়েছে মানুষের কর্মকান্ডের প্রত্যেকটি এলাকা ও কর্মের দিশারী হিসেবে বিশেষ মূলনীতি (dicta)।

উপাদান বা আধেয় বর্জিত সামগ্রিকত্বের দৃষ্টান্ত বহু। হিন্দু অনুধ্যানী চিন্তাবিদ সূর্য্যের

---

৩৩. ইসলামী আইনের দুটি চূড়ান্ত উৎস হচ্ছে কুরআন এবং সুন্নাহ। বিশাল সুপরিসর শরীয়াহ এর বিধি ব্যবস্থার অবয়বের মধ্যে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক নৈতিকতার সকল অঞ্চলই পড়ে। স্পষ্টতই দুটি মূল উৎসের কোনটির সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে ইসলামের কোন বিধি ব্যবস্থাই বৈধ বলে গণ্য হবেনা।

www.icsbook.info

নীচে এবং সূর্য্যকে ছাড়িয়ে সমস্ত কিছুই বোঝান 'ওম' শব্দ দ্বারা; আমাদের সুফী অনুধ্যানী অনুরূপভাবে 'হু' শব্দ দ্বারা তা ব্যক্ত করেন। দার্শনিকদের জন্য সমস্ত কিছু বোঝায় এমন একটি ফর্মুলার দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া একটি আকর্ষণীয় ব্যাপার। অবশ্য দুঃখজনক সত্য এই যে, এ রকম এক স্বর বা ধ্বনি বিশিষ্ট মূল পরিভাষার প্রভাবে মানুষ, পুণ্যময় আধ্যাত্মিকতা থেকে শুরু করে সকল প্রকার পাপকর্ম এবং পৌত্তলিকতার পথে বিচরণ করেছে। হিন্দু এবং সুফী উভয়ই জানে এই পরিভাষা এধরনের বিচ্যুতি থামাবার শক্তি রাখে না। একইভাবে, যেখানে হযরত ঈসার প্রাথমিক লক্ষ্যই ছিল শিলীভূত নিষ্প্রাণ আইন সর্বস্বতা ভেঙ্গে ফেলা, অর্থাৎ ইহুদীদের আক্ষরিকতার উৎসাদন, সেখানে তাঁর শিষ্যরা যা স্থির করল তা মূলত নৈতিক এবং ঐশিক অন্তর্দৃষ্টিকে একটি পরম পদ্ধতিতে সঞ্চারিত করার প্রয়াস, যেখানে সমস্ত নৈতিকতাই অন্তর্গত মানসিক বিষয়। হিন্দুর পরাতাত্ত্বিক একমাত্র বুলি 'ওম' স্থলে খৃষ্টানরা প্রতিষ্ঠিত করল লাভ বা প্রেম, যে নৈতিক শ্রেণীতে পড়ে সমস্ত কিছুই। অগাষ্টিনের "আল্লাহকে ভালবাস এবং তোমরা যা ইচ্ছা কর" হয়ে দাঁড়াল সকলের জন্য এক হিতোপদেশ, যা যে কোন ব্যক্তি, যে কোন উদ্দেশ্যের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য ব্যবহার করতে পারে।

আমাদের অবশ্যই এ বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ হচ্ছেন ধর্মের একজন চমৎকার ইতিহাসবিদ, যিনি ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো জানেন এবং ধর্মের ত্রুটিগুলো প্রত্যক্ষ করেন। যার প্রমাণ মেলে কুরআনুল করিমের বহু আয়াতে। এজন্য এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ইসলাম, যার আবির্ভাব হয়েছে ঐতিহাসিক ধর্মগুলোর সংস্কাররূপে, তাতে আল্লাহ আমাদেরকে কেবল এক বা একাধিক সাধারণ নীতি দান করেন নাই, বরং দিয়েছেন নৈতিকতার নির্দিষ্ট বিষয়স্বরূপ উপাদান বা আধেয় এবং বিশেষ আদেশ ও নিষেধ, যেখানে বিশেষ উপাদান বা আধেয় অনুপস্থিত সেখানে ইসলামের বিধান হচ্ছে অনুসন্ধান করে তা বের করা এবং প্রতিষ্ঠিত করা মানুষের কর্তব্য।

স্পষ্টতই ইসলাম যেহেতু সামগ্রিক, এবং উপাদান বা আধেয়ের ধারক, তাই ইসলাম হচ্ছে এক শিলায় নির্মিত বিশাল স্তম্ভের মতই একক। এর লক্ষ্য হচ্ছে খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিষয়ে সম্পূর্ণ একটি পদ্ধতি গড়ে তোলা, যাতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবন হবে নিয়ন্ত্রিত। অমুসলমানরা শরীয়ার সমালোচনা করেন, কারণ শরীয়াহ হচ্ছে সম্পূর্ণ (অর্থাৎ সামগ্রিক)।[৩৪] তাঁরা ঠিকই বলে থাকেন, ইসলামের সামগ্রিকত্ব এবং আধেয়ত্ব এক সন্দেহাতীত বাস্তবতা, কিন্তু এর মধ্যেই রয়েছে ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য, এর অনন্যতা ও মূল্যও।

---

৩৪. William Mac Neil. *The Rise of the West* (Chicago University Press. 1964) s.v "The Shariah"

www.icsbook.info

৩. গতিশীলতা

সংজ্ঞার দিক দিয়ে মনোলিথিক ব্যবস্থা হচ্ছে বর্জনধর্মী একটা ব্যবস্থা, যা চার দিক থেকে আবদ্ধ এবং বিদেশী অপরিচিত বা নতুন সকল উপাদানের ক্ষেত্রে রুদ্ধদ্বার, কোন কিছুকেই গ্রহণ করতে বা বুকে স্থান দিতে রাজী নয়। এই হচ্ছে প্রাচ্যবিদের শরীয়ার সামগ্রিকত্ব ও উপাদানের যে সমালোচনা করে থাকেন তার সারমর্ম। তারা বলে থাকেন, শরীয়াহ তার ইতিহাসের একটি একমাত্র প্রকৃত মহৎ মুহূর্তেই, অর্থাৎ যখন তা তার পূর্ণতায় পৌছেছিল তখনই, একটি পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে, তার লক্ষ্যে উপনীত হয়েছিল। যখন এই শীর্ষ বিন্দুতে সে পৌছল তখনই শুরু হয় অবক্ষয়, তার নিম্নগতি, কারণ এর মধ্যে নিজেকে বার বার পুনর্জীবিত করার যে শাশ্বত চরিত্র রয়েছে তাকে তা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু মনোলিথিক পদ্ধতি নতুন নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য বদলাতে পারেনা এবং এজন্য তা অবশ্যই নতুন প্রবর্তনার বিরোধিতা করতে বাধ্য হবে এবং প্রত্যেকটি পরিবর্তনাই হচ্ছে 'বেদায়াত', এটিও একটি বৈধ সমালোচনা; কিন্তু সে সমালোচনা শরীয়ার সমালোচনা নয়, মুসলিম ফকীহ ও তাদের অনুসরণকারীদের সমালোচনা; যাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবেই শরীয়ার বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। আসলে আমাদের মধ্যযুগের পূর্বপুরুষগণই ইসলামকে এই পথে তুলে দিয়েছিলেন। তারা ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে দেন, এবং ঘোষণা করেন, প্রথম ইজমা হবে সালাফের ইজমা, (সালাফ মানে আদি প্রজন্ম), অর্থাৎ সাহাবাদের ইজমা, নবীর সহচরদের ইজমা, যাতে করে কোন বেদায়াত প্রবর্তিত হতে না পারে। আজ আমরা তাদের সময়ের প্রয়োজন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পারি এবং তাদেরকে ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু আজকের মুসলমানদের জন্য তাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ হাস্যকর।

ফিকাহ্-উসুলের যে সব পন্ডিত মধ্যযুগে শরীয়াহ-এর স্পষ্ট রূপদান করেছিলেন এবং তাকে উন্নীত করেছিলেন পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে তারা এর মধ্যে আইনের স্বয়ংক্রিয় নবরূপ অর্জনের সূক্ষ্মতম যন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করতে যত্নবান ছিলেন।[৩৫] তারা মুসলমানদের দিয়েছিলেন সহীহ আইন এবং তার সঙ্গে দিয়েছিলেন তাকে নতুন রূপদানের প্রতিষ্ঠান ও উপায়সমূহ, এবং তা যতোটা সহীহ ছিল তার চাইতে তাকে আরো নিখুঁত করতে অথবা সকল সময় ও সকল কালের জন্য আইনের এই সম্পূর্ণতা প্রাসঙ্গিকভাবে যাতে কার্যকর হতে পারে তা বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন। আধুনিক কালে স্বল্প কয়েকটি

---

৩৫. Self-renewal যন্ত্রটি খুঁটিনাটির জন্য পড়া যেতে পারে উসুল আল ফিকাহর উপর যে কোন পাঠ্য পুস্তকে, আল ইসতিহাদ, আল কিয়াস, আল ইসতিহসান, আল মাসালিহ, আল মুরসালাহ লাহ, শিরোনামের অধীনে তোমরা কৃপণ হয়োনা, বদ্ধমুষ্টি হয়োনা এবং অমিতব্যয়ী হয়োনা, যেন তোমরা তোমাদের সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে তোমরা নিজেরাই না সর্বহারা হয়ে পড় (১৭ : ২৯)।

www.icsbook.info

প্রয়াস ছাড়া মুসলমানরা শরীয়াহ-এর নবায়নের এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটির কোন ব্যবহারই করেনি (অর্থাৎ ইজতিহাদ, কিয়াস, ইজমা, ইসতিহসান, আল মাসালিহ, আল মুরসালাহ ইত্যাদি)। সেই যন্ত্রটির বিশ্লেষণের স্থান এটি নয়, তবে যে তত্ত্বগত বুনিয়াদের উপর তা দাঁড়িয়ে আছে তা অবশ্যই বিচার করে দেখতে হবে।

ইসলাম হচ্ছে সোনালী মধ্যপন্থার ধর্ম : "এবং এভাবে আমি তোমাদেরকে (মুসলমানদেরকে) করেছি উত্তম মধ্যপন্থী উম্মাহ যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য হতে পার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত এবং রাসূল হতে পারেন তোমাদের জন্য প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত" (কুরআন ২ : ১৪৩)। এই নীতি বিশেষ এবং নির্বিশেষ, বিশ্বজনীন এবং নির্দিষ্ট বিশেষিতেক ও উপাদানপূর্ণ, মনোলিথিক, এবং বহুমুখী, ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং বিশেষাত্মক উভয়ই, এবং ইহাই এর শক্তি। ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে সাধারণ আইন এবং তার সঙ্গে আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছে যেখানে প্রয়োজন সেখানে তা ভঙ্গ করতে। অর্থাৎ যখন সাধারণ আইনে বিধৃত একটি মূল্যকে অনুসরণের ফলে, একটি উচ্চতর মূল্য লংঘিত হয়, চুরি, নরহত্যা, শূকর মাংস ভক্ষণের বিরুদ্ধে কুরআনের নির্দেশমালা, সালাত, রোজা, পিতামাতার জন্য সম্মান, এমনকি হজ্জ সম্পর্কে কুরআনের বিধানসমূহ এসবই এবং আরো বেশী ক্ষেত্রে লংঘন করা যেতে পারে, যখন এই আদেশ নির্দেশের পালন একটি উচ্চতর ইসলামী মূল্যকে লংঘন করে অথবা এধরনের মূল্যের বাস্তবায়নকে বিঘ্নিত করে। কেবলমাত্র যে নীতিটির ক্ষেত্রে ইসলামে কোন ব্যতিক্রম নেই, তা হচ্ছে তাওহীদ। "আল্লাহ শিরকের অপরাধ কখনো ক্ষমা করেননা, কিন্তু যাকে ইচ্ছা তিনি এর চাইতে কম গুরুতর যে কোন পাপ ক্ষমা করে দেন" (কুরআন ৪ : ৪৭, ১৫৫)। ইসলামের আদেশ– নির্দেশের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের অবকাশের মধ্যেই রয়েছে ইসলামের গতিশীলতা। যদি বিগত শতকগুলোতে মুসলমানরা এই চাবিগুলো ব্যবহার না করে নিজেদেরকে বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ করে রেখে থাকে, এ জন্য কেবল মুসলমানদেরকেই অপরাধী সাব্যস্ত করতে হবে, আর কাউকে নয়। এছাড়া আর কোনো নীতিই চূড়ান্ত ও অলংঘনীয় নয়, ইসলাম হচ্ছে ভারসাম্যের ধর্ম। যেমন তা শিল্পের ক্ষেত্রে, সাহিত্যসহ এর সকল শিল্পের বেলায় যা গড়ে উঠেছে তাওয়াজুন (ভারসাম্য) এর এই নীতির উপর, তার খোদ মূল্যতত্ত্বই হচ্ছে পরস্পরবিরোধী দুটি মূল্যের সূক্ষ্ম মিশ্রণের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য স্থাপন। ইবনে তাইমিয়া কি সুন্দর করেইনা তাঁর *আল সিয়াসা আল শরীয়াতে* বলেছেন "ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম, যে বেশী করে এবং যে কম করে, তাদের মধ্য স্থলে যার অবস্থান।" এই গুণটিই নিজেকে *দ্বীনিউল ফিতরাত* (আল্লাহর দ্বীন, স্বভাব ও যুক্তির দ্বীন, ভারসাম্যের দ্বীন এবং সোনালী মধ্যপন্থা) বলে দাবী করার যোগ্যতা দান করে ইসলামকে। ইসলামের এই তাওয়াজুন তথা ভারসাম্য সোনালী মধ্যপন্থা এবং গতিশীলতার একটি অতুলনীয় অভিব্যক্তি। আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহর (সা.) জবাবে যখন, ইসলামের একটি উৎসাহ

www.icsbook.info

উদ্দীপনা নিয়ে কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে বলেছিলো, "এখন থেকে আমরা আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি দিন রোজা রাখবো, সরারাত বন্দেগী করবো এবং আমরা কখনো আমাদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করবোনা"– মহানবী তখন বললেন, "কিন্তু আমিতো বছরের কিছু সংখ্যক দিনে রোজা রাখবো, বাকি দিনগুলোতে খাওয়া দাওয়া করবো। আমি ইবাদত করবো এবং নিদ্রাও যাব, এবং আমি স্ত্রীলোকদের বিবাহ করবো, যারা আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে চাইবে না তারা আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হবেনা।" তালিকা করা যায়না এমন বহুসংখ্যক আয়াতে কুরআন আমাদেরকে বলেছে, সেই সব মুল্যগত উপাদানের মোকাবেলায় যুক্তিগ্রাহ্য কান্ডজ্ঞান হিসেবে ইসলামের সারমর্ম- যে উপাদানগুলোর মধ্যে কল্যাণ এবং অকল্যাণ উভয়েরই সমান সম্ভাবনা, পৃথিবীর সকল শুভ বস্তুই এর মধ্যে পড়ে।[৩৬] কুরআন এরমাত্র কয়েকটি উল্লেখ করেছে "যেমন রমণী, শিশু, স্বর্ণ-রৌপ্য, অশ্বরাজি, গৃহপালিত জীবজন্তু এবং ক্ষেত খামার।" এবং এভাবে মানবমনে পৃথিবীর সঙ্গে যে সবের সম্পর্ক তখন ছিলো এবং এখনো সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে, সেগুলোকে একত্রিত করেছে (৩: ১৪)। বহু সংখ্যক আয়াতে এগুলো অমঙ্গলকর বলে ঘোষিত হয়েছে এবং মুসলমানদেরকে এসব সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিয়েছে। অথচ (৭ : ৩১) আয়াতে এগুলো ঘোষিত হয়েছে কল্যাণকররূপে এবং এসব অর্জনের জন্য মুসলামনদের প্রয়াসকে সমর্থন করা হয়েছে। মূল নিয়ামক নীতিটি দেওয়া হয়েছে (৯:২৫) আয়াতে, যেখানে তিরস্কার করা হয়েছে ভ্রান্ত শ্রেণীবিভাগকে, 'আল্লাহ ও তাঁর নবীর উপর এ শ্রেণীবিভাগকে, মানুষ কর্তৃক প্রাধান্য দানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে... আত্মনিয়োগের উপরে। স্পষ্টতই সোনালী মধ্যপন্থার মানে হচ্ছে দুটি অ-মূল্যের মধ্যবর্তী পন্থা; কিন্তু তা এক এবং অভিন্ন মূল্যের অনুসরণের ক্ষেত্রেও একটি ভারসাম্য যার মধ্যে সমন্বয় ঘটে, অন্য সকল মূল্যের নয়, যা প্রত্যেকটিকে দেয় তার যথোচিত প্রাপ্য।[৩৭]

৪. আঙ্গিকতা

উম্মাহ্র ঐক্য হচ্ছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গময় একটি জীবদেহের ঐক্যের মত; অর্থাৎ উম্মাহ্ হচ্ছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গময় একটি দেহের মত যার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একে অন্যের সঙ্গে এবং সমগ্রের উপর পরস্পর ও আলাদা আলাদাভাবে নির্ভরশীল। একটি অঙ্গ যখন নিজের কাজ করে, তখন তা যেমন অন্যান্য অঙ্গের জন্যও কাজ করে, তেমনি তা নিজের প্রয়োজনে সমগ্রের জন্যও কাজ করে। উহা যখন নিজের কাজ করে, তখন ইহা বিভিন্ন অঙ্গের প্রত্যেকের জন্য কাজ করে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সফলকাম বলে বর্ণনা

---

৩৬. কৃপণতা ও অতি বদান্যতা বা আতিশৈয্যের মধ্যবর্তী সোনালী পন্থার উপর ইসলামের উচ্চকণ্ঠ গুরুত্বের ঘোষণা মেলে আল কুরআনে (১৭ : ২৯)।

৩৭. See the Phenomental nalysis of Contradictory Values in Nicolary Hartaman. *Ethics* Abyev Stanton Coin (New York Macxmillan 1932) vol. 2. section 2

www.icsbook.info

করেছেন, "যাদের সম্পদে তারা অভাবগ্রস্থ ও বঞ্চিতের অধিকার স্বীকার করে" (৫ : ১৯)। এবং মহানবীর উম্মতদের বর্ণনা করেন এভাবে যে "তারা অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে কঠোর, কিন্তু নিজেদের বেলায় একে অন্যের প্রতি কোমল ও দয়ালু; এ এমন একটি ভ্রাতৃসমাজ যাতে আল্লাহকে কেন্দ্র করে একে অন্যের প্রতি পারস্পরিক ভালবাসার দ্বারা তাদের হৃদয় ঐক্যবদ্ধ হয়েছে" (৪৮ : ২৯)। মহানবী (সা.) মোক্ষম কথা বলেছিলেন, যখন তিনি উম্মাহকে বর্ণনা করেন "একটি সুস্থিত সংহত ইমারতরূপে, মজবুত ইমারতরূপে, যার প্রত্যেকটি অংশ অন্য সকল অংশকে ধরে রাখে, মজবুত করে এবং তাকে তুলনা করেন একটি দেহের সঙ্গে যার একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে সমস্ত দেহই নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে কাতর হয়।" উম্মাহ্কে একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গময় জীবন্ত দেহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এই শেষ হাদীসটিতে, যা সম্ভবত ইসলামী সমাজের সবচেয়ে যথোচিত বর্ণনা। অঙ্গ প্রত্যঙ্গময় দেহ হচ্ছে জীবন্ত এবং বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ নিয়ে এর অস্তিত্ব হচ্ছে এর সত্যিকার জীবন। অর্থাৎ সমগ্র দেহকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যেঙ্গের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সমগ্র কর্তৃক অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর নিরবচ্ছিন্ন লালন পালনের মধ্যেই এই জীবন্ত দেহের জীবন নিহিত। অঙ্গময়তা বা আঙ্গিকতা জীবনের কেবল একটি গুণমাত্র নয়, বরং এটিই জীবন। উম্মাহ্ যদি এই বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে অন্যকিছু হতে চায়, তাহলে তা আবার ফিরে যাবে মরুভূমির ইসলাম-পূর্ব গোত্রবাদে। এমনকি সেই ব্যবস্থাও গোত্রের অঙ্গময়তার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, কারণ এই অঙ্গময়তা বাদ দিয়ে এর অস্তিত্ব সম্ভব ছিলনা; গোত্রের এ ধারণাকে কেবলমাত্র সম্প্রসারিত করা হয়েছে যাতে সমগ্র মানবজাতি তার আওতায় আসতে পারে। তাই এই অঙ্গময়তাকে বা উম্মাহর প্রয়োজনকে অস্বীকার করার মানেই হচ্ছে ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বকে শুভ মনে করা। এমনভাবে তাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন বলে মনে করা, যার ফলে, কেবল যে ইসলামই অসম্ভব হয়ে পড়ে তা নয়, বরং সমভাবে সভ্যতা, প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের জীবনই অসম্ভব এবং অচিন্ত্যনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করা যেতে পারে, কারণ এই নির্ভরশীলতাকে বাড়িয়ে এমন একটি বিন্দুতে পৌছুনো যেতে পারে, যেখানে একটি বৃহত্তর অঙ্গ বা যন্ত্রের চাকার কেবল একটি খাঁজ বা দাঁতে পরিণত করা যেতে পারে মানব ব্যক্তিকে, যাতে সেই খাঁজে, তথা ব্যক্তির নিজের বিকাশে আত্মপূর্ণতা এবং সুখের কোন অবকাশই থাকেনা। গোত্র প্রাধান্যের মানেই হউক কিংবা নগর, জাতি অথবা বিশ্বসম্প্রদায়ের জমানাই হউক, রেজিমেন্টেশন এবং যৌথখামার ও মালিকানা প্রথার অভিশাপ সব সময়ই মানুষের চেতনায় একটি দুর্বহ পাষাণ ভারের মত চেপে বসেছে। এখানেও আবার ইসলাম তাওয়াজুন অর্থাৎ সোনালী মধ্যপন্থার ব্যবস্থা দিয়েছে এবং তা ব্যক্তি ও গ্রুপ উভয়েরই সাফল্য অর্জনের লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয়েছে। খ্রীষ্টান ধর্মের চূড়ান্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ এবং ইহুদী ধর্ম ও ইসলাম-পূর্ব চূড়ান্ত

www.icsbook.info

গোত্রবাদের মধ্যে ইসলাম প্রকৃত প্রস্তাবে একটি মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সুবিস্তৃত পরিসরের মধ্যে, মধ্যবর্তী স্থলে উভয় মূল্যের অবস্থিতি ঘোষণা করে এবং সেই পরিসরের শেষ প্রান্তের অ-মূল্যকে অস্বীকার করে।

ঘ. সম্ভাবনা

উপরে বর্ণিত এধরনের একটি উম্মাহ্ যে কেবলই সম্ভব তা নয়, বলতে গেলে এই হচ্ছে ইতিহাসের সফলতার একমাত্র শর্ত। এই উম্মাহ্র নীতির কোন না কোনটিকে বাস্তবায়িত না করে কোন সমাজ এবং কোন ধর্মই, কোন গোত্র এবং কোন রাষ্ট্রই, কোন সাম্রাজ্য এবং কোন ইতিহাসই কখনো সৃষ্টি হয়নি, বা সফল হয়নি। উম্মাহ্র মৌলনীতি যত বেশী অনুসৃত হয়েছে তত বেশী এবং তত স্থায়ী হয়েছে এই বাস্ত বায়ন। উম্মাহর আদর্শ যত কম অনুসৃত হয়েছে, সাফল্য হয়েছে তত বেশী সাময়িক বা ব্যর্থতা হয়েছে তত বেশী বৃহৎ। এমনকি খোদ শয়তানের সাফল্যের জন্য উম্মাহ্র নীতিমালা একটি নিশ্চয়তা, যদিও তা সাময়িক। যদি শয়তান এবং তার বাহিনী উম্মাহ্র আদর্শের প্রয়োজনীয় শর্তগুলো পূরণ করে সে এবং তার বাহিনী অবশ্যই সফল হবে, যদিও মানবজাতির ইতিহাসে তাদের সাফল্য চূড়ান্ত বা সিদ্ধান্তমূলক হতে পারেনা। জায়নবাদীরা যেমন সফল, ফার্দিনান্দ এবং ইসাবেলা, যাদের অধীনে স্পেনীয়রা আমাদেরকে বহিষ্কার করেছিল তারাও সফল, স্পেন থেকে তারা এবং ব্রিটিশ, ফরাসী, ইতালীয়, ডাচ ইত্যাদি যারা আমাদের দেশকে আমাদের ভূমিকে কলোনী বানিয়েছিল, এমনকি হিংস্র তাতাররা যারা লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছিল এবং আমাদের মহত্তম এবং বৃহত্তম নগরীগুলোকে ভস্মীভূত করেছিল, তারা সকলেই সফল হয়েছিল, কারণ, তারা ছিল বা রয়েছে অধিকতর উম্মাহ্পন্থী, অতীতের কিংবা বর্তমান কালের মুসলমানদের থেকে অনেক বেশী। এখানেই আমাদের দুর্বলতা, আধুনিক সাহিত্যে বারবার এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, "এর কারণ কি? যখন কোন মুসলমান 'ওয়া ইসলামা' বলে চিৎকার করে, কেউই সাড়া দেয়না?" এর জবাব হচ্ছে আমাদের মধ্যে উম্মাহ্র অনুপস্থিতি, উম্মাহ্ ব্যবস্থার ধারা এবং মৌলনীতিগুলোকে পূরণ করার ব্যাপারে আমাদের ব্যর্থতা।

কাজেই, অনিবার্য প্রশ্নটি হচ্ছে এই ঃ কি করে আমরা মুসলমানদের মধ্যে উম্মাহ্র আদর্শ সৃষ্টি করবো? উম্মাহ্ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ধরে নিয়ে এবং উম্মাহ্র শিক্ষা তথা ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান রয়েছে একথা স্বীকার করে নিয়ে আমরা বাস্তব প্রশ্নটির মোকাবেলা করতে পারি। উম্মাহ্র লক্ষ্যকে ক্রমান্বয়ে কি করে আমরা কার্যকর ও প্রসারিত করতে পারি, প্রশ্নটি যতই বাস্তব হউক, এই প্রশ্নের উপরই সুফীগণ তাদের সমস্ত প্রতিভাকে নিঃশেষ করেছিলেন চূড়ান্ত লক্ষ্য বিস্মৃত হয়ে। ইবনে বাজা এদের এই ভুল ধরতে পেরে লিখেছিলেন গবেষণা-মূলক গ্রন্থ *'রিসালাত*

www.icsbook.info

তাদবির আল মোতাওয়াহ্‌দ' যার জন্য, চিন্তাধারার ইতিহাসবিদ হিসেবে আমরা উদ্ভাবন করতে পারি একটি পরিভাষার "সমাজভিত্তিক সুফীবাদ"। আধুনিক কালে সেনুসিয়াহ আন্দোলন এই ধরনের উম্মাহ্‌ভিত্তিক সুফীবাদের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছেছিল।

দুই, মুসলমানের মধ্যে উম্মাহর সামগ্রিক একাত্মতাবোধ, কী করে আমি সৃষ্টি করতে পারি, সে প্রশ্ন তো আসলে দু'জনের মধ্যে কী করে আমি একটি রাসায়নিক মিলন সৃষ্টি করতে পারি, তা জিজ্ঞাসা করা। এধরনের রাসায়নিক সম্পর্কের ফলই হচ্ছে 'তাহাবুব' (পারস্পরিক ভালবাসা) 'আত্ তাওয়াসী' ওয়া আত্তানাহী' (পরামর্শদান) 'আত্তায়াখী' (ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপন) আত্তাওয়াউন (সহযোগিতা) আত্তায়ালুমস (শিক্ষাদান) আত্তাজাউয (মেলামেশা), আত্ তাওয়াসী (শান্তনাদান), আত্ তাসাদুক ওয়া তাত্তানউস (বন্ধুকরণ), কী ধরনের ক্রিয়া এবং নিষ্ক্রীয়তা, বাস্তবতা অথবা অবাস্ত বতা, কর্মতৎপরতা অথবা নিষ্কর্মতা, উম্মতের এই বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে, যা একবার অস্তিত্বে এলেই, এই মূল্যগুলো সূচিত হবে এবং এভাবে উম্মাহ্‌র জন্ম হবে। সংক্ষেপে দুই বা ততোদিক ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিভাবে এই পারস্পরিক ভালবাসা সৃষ্টি করা যেতে পারে, ইহাই প্রশ্ন। মানুষের মধ্যে এ রূপান্তর সৃষ্টি করা মানুষের কাজ নয়, বরং আল্লাহর দায়িত্ব, কুরআনের শতাধিক আয়াতে যা ঘোষিত হয়েছে,[৩৮] কারণ শ্রেয়র দিকে যে কোন রূপান্তর ও উম্মতের ধারণার দিকে যে কোন উন্মুখতার তিনিই হচ্ছেন গ্রন্থকার। এক্ষেত্রে মানুষ যা করতে পারে, তা হচ্ছে তার প্রস্তাবনার সামর্থ্য অর্থাৎ বাস্ত ব ও বৈষয়িক প্রেক্ষিত সৃষ্টি করা, যার মধ্যে ঐশী উদ্যোগ কার্যকর হতে পারে। ইহা নিশ্চয়ই সম্ভব যে, ঐশী কর্মের জন্য এধরনের মানসিক প্রস্তুতি কখনো কোন ফল উৎপাদন নাও করতে পারে। কিন্তু একথা সেক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে মানবিক উদ্যোগ হচ্ছে স্পর্ধিত, অবজ্ঞাপূর্ণ এবং নিজের সমৃদ্ধে অযথাই অতি আস্থাবান, কিন্তু যখন এই উদ্যোগ মিশ্রিত হয় ঐশী ক্ষমতার বিনীত স্বীকৃতির সঙ্গে, তখন তা সফল না হয়ে পারেনা। অন্যথায় যে কোন মানবিক ক্রিয়ার জন্য ঐশী আদেশ অসার হয়ে পড়ে এবং একইভাবে তা হয়ে দাঁড়ায় অহংকৃত।

আমরা তাহলে আমাদের প্রশ্নটিকে নতুন করে গঠন করতে পারি। ঐশী উদ্যোগের জন্য কি বিশেষ কর্ম বা পরিস্থিতি, বস্তুগত প্রেক্ষিত বা পটভূমিকা হতে পারে? এখানে একমাত্র সম্ভাব্য জবাব এই যে, এই মানুষগুলো একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হবে– আল্লাহকে স্বীকার করবে এবং একত্রে তার ইবাদত করবে, যুগ্মভাবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার

---

৩৮. উপরে উল্লেখিত শব্দগুলো যে সব আয়াতের অন্তর্গত তার জন্য পড়ুন মোহাম্মদ বারাকাত রচিত *Al Murshid ila Ayat al Quran al Karim* (Cairo Al Malataba al Hashimyah 1957)

www.icsbook.info

সন্ধান করবে, একত্রে স্পর্শগ্রাহ্য সুনির্দিষ্ট ফলের জন্য কাজ করা ও তা অর্জন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে খাওয়া দাওয়া উৎসব করা, উপভোগ করা এবং নিজেদের মধ্যে বিয়ে-শাদী করা। যদি এই কাজগুলো সম্পাদিত হয় অকপটে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যতাড়িত না হয়ে, তাহলে এ বিশ্বাস নিশ্চয়ই করা যায় যে, এগুলো সৃষ্টি করবে উম্মাহ্র বন্ধন। অন্য কোন পন্থায়ই এ বন্ধন সৃষ্টি করবেনা। অনুমেয় যে স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে ইসলামী সমাজের বৈঠক ও জলসাগুলোর পদক্ষেপ এই লক্ষ্যেই; বিশ্বব্যাপী ইসলামী সংঘ, সমিতি ও কেন্দ্রগুলোর জুমার জামাতগুলোও তা-ই। অবশ্য এখন পর্যন্ত এসবই খন্ডিত, অনিয়মিত, বিরল, অপরিকল্পিত, অনিয়ন্ত্রিত এবং অসম্পূর্ণ। আমরা এখন পর্যন্ত যা করতে পেরেছি তার চাইতে অনেক বেশী করা আমাদের জন্য আবশ্যক অর্থাৎ উম্মাহ্র জলসা ও জামাতগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান।

এই উদ্দেশ্যে এই পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে যে, যে কোনো মুসলিম যে নিজেকে নেতৃত্বের জন্য সম্ভাবনাপূর্ণ মনে করে, যে ইসলামের প্রতি এমন একটি অঙ্গীকারাবদ্ধ বলে গণ্য করে, যা তার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক স্বার্থকে অতিক্রম করে যায়, সে একজন আমিল হবে। (একজন প্রতিষ্ঠাতা, একজন সংগঠক *urwah wuhqa* এর নেতা [১০ জন বয়স্ক মুসলমানের একটি জামাত, যাতে তার পরিবারের লোকজনও থাকবে।] একটি *urwah wuhqa* এর একটি উদ্দেশ্য এবং একটি শর্তই হচ্ছে ইসলাম। আমেল ১০ জন সদস্যকে চিহ্নিত ও আহ্বান করে, সে এই ১০ জনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য একে অন্যের মধ্যে যোগাযোগের এবং নিজেদের ও উম্মাহ্র বৃহত্তর সংস্থাগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। আমিল তার নিজের উরুয়াতে শুক্রবারের মাগরিবের জামাতের ব্যবস্থা করে যেখানে তিন থেকে চার ঘন্টা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রশিক্ষণ চলে। অপরিহার্যভাবেই এই সান্ধ্যজামাতের অন্তর্ভুক্ত থাকে এশার সালাতের জামাত, কুরআনের কিছু অংশের পঠন, ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু বিষয় আলোচিত হয় এবং শেষ পর্যায়ে কিছু খাবার ব্যবস্থা করা হয় ও সামাজিক আদান প্রদান হয়। এই চারটি আইটেমই সম্পূর্ণ আবশ্যক। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে তার মধ্যে যেন কোন কাঠিন্য এবং একঘেঁয়েমী না থাকে। কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামী জ্ঞানের অনুশীলন, খাদ্য এবং সামাজিক আদান-প্রদান এই শেষোক্ত তিনটি আইটেম আনুষ্ঠানিক সালাত বাদ দিলে, হতে পারে অসংখ্য রকমে বৈচিত্র্যপূর্ণ। যত শীঘ্র সুবিধাজনক এবং সম্ভব সান্ধ্যজামাত অনুষ্ঠিত হবে অপর একজন সদস্যের গৃহে। এভাবে প্রত্যেক সদস্যের বাড়ীতে সান্ধ্যজামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় যখন একটি নির্দিষ্ট উরুয়ার প্রত্যেক সদস্যের বাড়ীতে পর্যায়ক্রমে সান্ধ্যজামাত অনুষ্ঠিত হয়।

www.icsbook.info

উরুয়ার সদস্য নির্বাচন করতে গিয়ে আমিলকে অবশ্যই তার নিজের বাড়ী থেকে সদস্যের বাড়ীর দূরত্ব বিবেচনা করতে হবে। ইসলামে ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক মিল জাতীয় ও গোত্রগত পটভূমিকা এবং সংস্কৃতির স্তর বৈষম্যের কোন ভিত্তি হতে পারেনা। ইসলামী সমাজের একটি শক্তি ছিল এবং সবসময় শক্তি হবে এই বৈশিষ্ট্য যে, এ সমাজ একটি উন্মুক্ত সমাজ, বহুগোষ্ঠীর সমাজ, সংস্কৃতিগতভাবে বৈচিত্রমুখী, রং-কানা, এবং প্রজন্মগত বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত। সান্ধ্য জামাতে বয়স্ক সদস্যদের মতই শিশুগণ এবং পিতামহ ও পিতামহীরা হবে আবশ্যিক অংশ। যেখানে অনীহা, আলস্য, অবাধ্যতা, মতবিরোধ বা বিরুদ্ধতা দেখা দেয়, তা সান্ধ্যজামাত সম্পর্কেই হউক বা নগরী, রাষ্ট্র অথবা জাতীয় পর্যায়ে মুসলিম কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে হউক, সেখানে আমিলের আপন ন্যায়বোধ, তার উৎসাহ, সান্তনা, উদ্যোগ, নেতৃত্ব ব্যক্তিগত দায়িত্বের উপরই একমাত্র নির্ভর করে।

উরুয়া-ভ্রাতৃসমাজগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্তির সঙ্গে প্রয়োজন হবে সেগুলোকে সংগঠিত করা, তাদের প্রয়োজনগুলোর পরিকল্পনা তৈরী করা এবং সেই সব প্রয়োজন পূরণ করা। একের অভিজ্ঞতায় শরীক হবে অন্যেরা এবং মেধা, তথ্য, প্রভাব, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং নেতৃত্বের সাধারণ মুসলিম ভাণ্ডারে কমবেশী সময়ের ব্যবধানে অবশ্যই গঠন করবে সমগ্রভাবে ইসলামী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। এখানে পৌঁছেই আন্দোলন গ্রহণ করতে পারে নেতৃত্বের বিশাল বোঝা, আমিলদের জন্য বিভিন্ন সময়ে সেমিনার সংগঠন করতে হবে যাতে করে তারা একে অন্যের সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতায় শরীক হতে এবং অধিকতর সফলভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য তারা প্রশিক্ষিত হতে পারে। একটি ভৌগোলিক ইউনিটের অন্তর্গত ইসলামী নেতৃত্ব উরুয়ার জন্য দিতে পারে একটি "সপ্তাহের জন্য মুদ্রিত পাঠ", যাতে কুরআনের অংশ থাকবে নির্দিষ্ট-যাতে করে নির্বাচিত আয়াতগুলোর মাধ্যমে ইসলামের একটি পদ্ধতিবদ্ধ রূপ প্রতিফলিত হবে এবং তৎসঙ্গে সর্বত্র মুসলমানদের জীবন যে সব ঘটনায় আক্রান্ত তার মোবাবেলার ইঙ্গিত থাকবে।

উরুয়ার সংখ্যা যতই বাড়তে থাকে এবং আন্দোলন যতই বিস্তৃত হতে থাকে ততই নতুনতর সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন হবে। দশটি *'উরুয়া'* মিলে হবে একটি *'উমরা'*, দশটি *উমরা* নিয়ে গঠিত হবে একটি *'জারিয়া'* এবং দশটি জাবিয়া নিয়ে একটি 'জামাত'। সংগঠনের এই প্রত্যেকটি পর্যায়ে একটি প্রশাসনিক অঙ্গসংগঠন প্রতিষ্ঠিত হবে সংশ্লিষ্ট উরুয়াগুলোর আঞ্চলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণের জন্য। যা সংগঠন করতে হবে তা অস্তিত্বে আসার পরই সংগঠন এবং কাঠামো নির্মাণ করতে হবে। আমাদের অলসভাবে ব্লাকবোর্ডের উপর কাঠামো তৈরি করলে চলবেনা বরং লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে কাঠামোগুলো গড়ে উঠে ক্রমবর্ধমান বাস্তবতা

www.icsbook.info

থেকে। সর্বত্রই আমাদেরকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, কি করে এ বাস্তবতাগুলো সৃষ্টি করা যায়। পুনরাবৃত্তিস্বরূপ উত্তর এই যে, প্রত্যেক মুসলমানকে তার সহযাত্রী মুসলমানদের সঙ্গে নির্দোষ কাজগুলো করতে হবে– সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইবাদতের ক্রিয়াকলাপে, নিরবচ্ছিন্নভাবে ইসলামী শিক্ষার অনুশীলনে এবং কল্যাণের
বিস্তারে ও মন্দের প্রতিরোধে *(আল আমর বিল মারুফ ওয়া আল নাহি আন আল মুনকার)*।

www.icsbook.info

নবম অধ্যায়

পরিবার প্রথার মূলনীতি

১. পৃথিবীতে পরিবার প্রথার অবক্ষয়

ক. সমতা

কমিউনিষ্টগণ সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবারের বিলোপ সাধন করে তার স্থলে কম্যুন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিল। কমিউনিষ্টরা মানব জীবনের সেই আদর্শ অবস্থাকেই চিত্রিত করেছিলো যাতে মানুষ একসঙ্গে ডরমিটরীতে বাস করে, মেসের হলে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে এবং সন্তান-সন্ততিকে রাষ্ট্রের সন্তান বলে গণ্য করে। অনেক কম্যুন সৃষ্টি হয়েছিল বটে, কিন্তু কমিউনিষ্টরা শীঘ্রই 'বুঝতে পারলো ব্যক্তিগত সংগঠনের এই যৌথ পদ্ধতি ব্যর্থ হতে বাধ্য, তাই চিরাচরিত পরিবারের রূপটিতে থাকলো সাধারণত বাবা মা তাদের সন্তানের প্রতি ভালবাসা স্নেহ ও স্বাভাবিক মমতা বশে যে সব কর্তব্য পালন করে থাকেন, রাষ্ট্র তার অনেকগুলো দায়িত্ব গ্রহণ করায় পরিবারের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে, কেবল মাত্র তাদের শৈশবের নির্ভরশীলতা এবং সাহচর্যের স্মৃতি ছাড়া এমন আর কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যার উপর পরিবারের সদস্যরা তাদের সম্পর্ক গড়ে তুলবে।[১]

পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার জীবিকা ও চাকুরীর সন্ধানে বিশাল নগর কেন্দ্রিক জনসমষ্টির দিকে জনতার ধাবিত হওয়ার ফলে প্রত্যেকেই হয়ে পড়েছে নাম পরিচয়হীন। নারী পুরুষের মেলামেশা, শিথিল নৈতিকতা, নারীদের আর্থিক স্বাধীনতা, এক ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ এবং সহজাত আত্মস্থ প্রকৃতির চিরাচরিত যথেচ্ছার, সব কিছু মিলে পারিবারিক বন্ধনে ধস নামাতে সাহায্য করে। বর্তমান শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যথেচ্ছার এবং অবাধ যৌন মেলামেশার মধ্যে পরিবার প্রথার যে কি অধঃগতি হয়েছে তার করুণ অবস্থার প্রকাশ দেখতে পাই। এই মুহূর্তে নগরীগুলোতে যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করছে তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশী অবৈধ সন্তান। পরিবার হয়ে উঠেছে জন্তুর পরিবার। এই অর্থে যে কেবলমাত্র ততক্ষণই এর অস্তিত্ব আবশ্যক যতক্ষণ শিশুরা দৈহিকভাবে অসহায় এবং বাবা মা'র নিরবচ্ছিন্ন যত্ন মনোযোগ প্রয়োজন। যে মুহূর্তে তারা বালেগ হয় তখনই বৈষয়িক প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় এবং পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে পড়ে। কেবল তাই নয় তার চেয়েও খারাপ, গৃহের বাইরে বাবা মার কর্ম ব্যস্ততা, তাদের মনস্তাত্বিক ক্লান্তি ও অবসাদ ও গৃহের বাইরে

---

১. দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন Norman W. Bell Ges Ezra F. Vogel. eds. *The Family* (Glencoe. Illinois : The Free Press 1960) অধ্যায়-৪।

www.icsbook.info

আবেগ পূরণের জন্য মানসিক চাপ, সন্তান সন্ততির অতি অল্প বয়সে পারিবারিক বন্ধন শিথিল করে দেয়, পরিবার বলে দীর্ঘকাল যা পরিচিত ছিল কার্যত তা এখন মুমূর্ষ অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় ধুকছে।[২]

নৃতত্ত্ববিদেরাও পরিবার প্রথার পতনে সাহায্য করছে, এই শিক্ষা প্রদান করে যে, মানুষের ভিন্নতর সমাজ ও সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব, যেমনটি জীবজন্তু ও আদিম নরনারীদের মধ্যে সাফল্য অর্জন করেছে। মানুষের অবস্থা বিবেচনা করতে গিয়ে তারা যে ক্রমাগতই জন্তু জগতের উল্লেখ করে থাকে তাতে মানুষের মগজ ধোলাই হবার ফলে, তারা এখন ভারতে শুরু করছে যে, জন্তুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্যগুলো হচ্ছে অস্বাভাবিক, এবং ভিন্নতর মানবিক সংঘ, যেমন মাতৃতন্ত্র ও একই সঙ্গে বহুপতি গ্রহণ প্রথার নিয়ম, ইত্যাদির কল্পনা-সর্বস্ব থিওরীর বন্যা পরিবার প্রথাকে চিরাচরিত সম্মানের স্থান থেকে বিচ্যুত করতে সাহায্য করে।

গোটা কমিউনিষ্ট বিশ্বে এবং পাশ্চাত্য জগতে পরিবার প্রথার এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে, যা বর্তমানে সমাজের সাধারণ অবক্ষয়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। নৈতিকতার অবক্ষয়, সমাজ সংহতি এবং পুরুষ পরম্পরায় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার অবক্ষয়ের উপর যেমন এই পরিবর্তন প্রভাব ফেলেছে, তেমনি এই পরিবর্তনকে প্রভাবিতও করছে। কোনটি কারণ কিংবা কোনটি ফল একথা ধর্তব্যের মধ্যে না এনেই সভ্যতা এবং পরিবার প্রথা মনে হয় একই সঙ্গে টিকে থাকবে, না হয় ধ্বংস হবে। যেহেতু মুসলিম বিশ্ব এবং অবশিষ্ট তৃতীয় বিশ্ব, কমিউনিজম এবং পাশ্চাত্য মতবাদের ধ্বংসকর আঘাত থেকে তাদের আত্মপরিচয়ে নিজস্বতা রক্ষা করে চলেছে, সে কারণে এই সব সমাজে এখনো পরিবার প্রথা তার মর্যাদার আসন নিয়ে টিকে আছে। ইসলামী সংস্থার টিকে থাকার সম্ভাবনা বৃহত্তর, কারণ তা ইসলামিক আইনের দ্বারা বলবৎ এবং আত্-তৌহীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দ্বারা স্থিরীকৃত, যা ইসলামী ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সারকথা।

২. সমাজের একটি গঠনমূলক একক হিসেবে পরিবার প্রথা

মানুষের পক্ষে আল্লাহর উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য প্রয়োজন এই যে, মানুষ বিয়ে-শাদি করবে এবং সন্তান জন্ম দেবে এবং একসঙ্গে বসবাস করবে এবং এভাবে মানবিক সম্পর্কের নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করবে, যেখানে মানবিক সিদ্ধান্ত এবং কর্মের মাধ্যমে ঐশী অভিপ্রায়ের নৈতিক দিকটি সার্থক হবে। এই নাট্যমঞ্চটিতে রয়েছে চারটি স্তর যথা সে নিজে, পরিবার, গোত্র বা জাতি বা জনগোষ্ঠী এবং বিশ্বজনীন উম্মাহ্। প্রথম স্তরটির আবশ্যকতা স্বতঃপ্রকাশিত, যে কোন নৈতিকতার যে কোন রকমের পরিপূরণের জন্য আবশ্যক হচ্ছে নিজের অহমের সঙ্গে কর্তার একটি নৈতিক সম্পর্কে প্রবেশ। সেই অহমকে বোঝা, তাকে রক্ষা করা ও তার বিকাশ সাধন এবং তাকে নৈতিক মূল্যের

২. William F. Kenkel. *The Family in Perspective* (New York : Meredith Corporation. 1973).

www.icsbook.info

সিদ্ধান্তের অধীনে স্থাপন আবশ্যিক। কেননা, এগুলোই হচ্ছে শর্ত, যা বাদ দিলে সৃষ্টিই বাধাগ্রস্থ হবে। তৃতীয় স্তরটি অর্থাৎ গোত্র জাতি বা রেস আবশ্যক নয়, এর প্রকৃতি উম্মাহ্রই মত। একারণে যে গোত্র, জাতি বা রেস্ অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের সঙ্গে কোন জৈবিক সম্পর্ক নেই, কিংবা সম্পর্কটি এত দূরের যে, তা কোন তাৎক্ষণিক অনুভূতির বিষয় নয়, কল্পনার বিষয়মাত্র। এই পরিপ্রেক্ষিতে গোত্র, *জাতি বা রেস) স্তরটি কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রণপ্রবণ, কেননা উম্মাহ্র সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক থাকতে পারে তার সঙ্গে নতুন কিছুই যোগ না করে। এর কাজ হচ্ছে সেই সম্পর্ককে গোত্র (জাতি বা রেস) সদস্যদের মধ্যে সীমিত রাখা এবং যেন সেই সদস্যপদ আর কাউকে না দেওয়া হয় সেই বিধি নিষেধ কার্যকর করা।[৩] এর বিপরীতে উম্মাহ্ সম্পর্ক সৃষ্টি করে ধর্ম বা আদর্শের ভিত্তিতে এবং জন্ম বংশ নির্বিশেষে, ভাষা ইতিহাস বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সদস্যপদ সম্প্রসারিত ক'রে। উম্মাহ্র সম্পর্ক হচ্ছে অধিকতর মানবিক এবং তা ব্যক্তির মর্যাদা সংরক্ষণ করে, যেখানে গোত্র (জাতি বা রেস) সম্পর্ক এই মর্যাদাকে লংঘন করে, জন্মের উপর তার সংকীর্ণতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই জন্যই ইসলাম মানবিক সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে গোত্র, জাতি, রেসকে উম্মূলিত করে এবং তার স্থলে স্থাপন করে বিশ্বজনীন উম্মাহ্।[৪] প্রাক-ইসলামিক জাহিলিয়া ও পশ্চাৎপদতার যুগে গোত্রতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। রোমান এবং পার্সিয়ান সাম্রাজ্যে গোত্রতন্ত্র ছিল রোমান ও পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের প্রবল মানদন্ড। এই দুটি সাম্রাজ্য ছিল ইসলামের পূর্ববর্তী, যার অবসান ঘটিয়েছিল ইসলাম। এই দুটি সাম্রাজ্য মানুষের কর্মকান্ডে এমন সব অপকর্মের জন্য দায়ী ছিল যার জন্যে তাদেরকে নির্মূল করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল।

এর ফলে, কেবলমাত্র পরিবারই রয়ে গেল চূড়ান্ত সামাজিক ইউনিট হিসেবে, যার একপার্শ্ব ধারণ করে আছে ব্যক্তি এবং অন্য পার্শ্ব ধারণ করে আছে বিশ্বজনীন উম্মাহ্। মহাজাগতিক ব্যবস্থায় এর গুরুত্বের উপর কুরআন জোর দিয়েছে এভাবে, ইহা আল্লাহর একটি নিদর্শন, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে পরস্পরের যুগল সৃষ্টি করেছেন, এবং তোমাদের মধ্যে প্রেম ও তারুণ্যের সৃষ্টি করেছেন।[৫] ইসলাম যৌনজীবনকে নিন্দা

---

৩. তোমাদের এই উম্মাহ্ এক, ঐক্যবদ্ধ এবং সুসংহত এবং আমি তোমাদের রব, কাজেই আমার দাসত্ব কর (২১:৯২) ... তোমাদের মধ্যে হউক এমন এক উম্মাহ্ যা মানুষকে সৎ কাজের দিকে আহ্বান করে, সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কর্ম নিষেধ করে, এরাই সফলকাম (৩:১০৪)।

৪. তোমাদের এই উম্মাহ্ এক, ঐক্যবদ্ধ, অবিভাজ্য, আমি তোমাদের একমাত্র রব। আমাকে ভয় কর। তা সত্বেও মানুষ নিজেদেরকে দল উপদলে বিভক্ত করে এবং প্রত্যেকে নিজের জবস্থান নিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে। কিন্তু তারা তাদের বিভ্রান্তিতে ও কেবল অল্প সময়ই স্থায়ী হবে (২৩: ৫৪)। জাহিলিয়ার দিনগুলোর মত অবিশ্বাসীদের অন্তর উত্তেজনা ও বিক্ষোভে কম্পিত হয়, কিন্তু আল্লাহর নবী এবং বিশ্বাসীদের হৃদয় স্বীকৃতিতে ও আত্মপ্রত্যয়ে স্বস্তিভোগ করে। "কারণ তারা এর উপযুক্ত এবং এর জন্য নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী... আল্লাহ সবকিছু অবগত"। আল্লাহ তাদেরকে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা হচ্ছে পবিত্রতা ও সৎকর্মের দায়িত্ব (৪৮ : ২৬)।

৫. ইহা আল্লাহর এক নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে, তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের মধ্যে আনন্দ পেতে পার এবং তিনি তোমাদের ও তাদের মধ্যে মহব্বত ও করুণা সৃষ্টি করেছেন। যারা চিন্তা-ভাবনা করে, তাদের জন্য এটি নিশ্চয়ই একটি মহাসাক্ষ্য (৩০:২১)।

www.icsbook.info

করে না বরং একে নিষ্পাপ, প্রয়োজনীয় এবং কল্যাণকর মনে করে; এবং কেবল এর অনুমতি দেয়না, বরং এই নির্দেশ দেয় যে নর এবং নারী এ সম্পর্কের মাধ্যমে নিজেদের সার্থকতা খুঁজে নেবে।[৬] যাই হউক, বিবাহের লক্ষ্য পূরণের জন্য, কেবলমাত্র যৌন সম্পর্ককে একমাত্র বিষয় বলে স্বীকার করেনা। যে বিবাহ কেবলমাত্র যৌন সম্পর্ক, যা রোমান্টিক ভালবাসার লক্ষ্য, ইসলাম তাকে ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ঘোষণা করে।[৭] বিয়ের ফলে সৃষ্টি হয় এক বিশাল জটিল মানবিক সম্পর্ক যেগুলো নৈতিক নির্দেশমালার একটি বড় অংশের উপকরণ। পরিবারের সদস্যদের প্রতি ব্যক্তির প্রথম কর্তব্যগুলোর মধ্যে পড়ে প্রজনন, স্নেহপ্রেম, সমর্থন, সুপরামর্শ, পথনির্দেশ, শিক্ষাদান, সাহায্য এবং বন্ধুত্ব। কুরআনে সমাজ সম্পর্কিত আল্লাহ তা'লার নির্দেশগুলোর মধ্যে অতিশয় প্রাধান্য পেয়েছে জুল-কোর্বা (খেশ, স্বগণ) শ্রেণীটি।[৮] সংক্ষেপে একথা বলা যায় যে, ঐশী অভিপ্রায় বাস্তবায়নের জন্য ইসলাম পরিবারকে অপরিহার্য মনে করে। এই ধরনের বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে তাওহীদের কথা চিন্তা করা যায় না। কারণ আল্লাহকে এক এবং একমাত্র ইলাহ্রূপে স্বীকার করার মানেই হচ্ছে তাঁরই স্বীকৃতি যাঁর ইচ্ছা এবং আদেশ হচ্ছে মানুষের ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয়, যা মানুষের জন্য কল্যাণকর এবং মানুষের লক্ষ্য। তাওহীদকে অনুসরণ করার মানেই হচ্ছে আল্লাহর আদেশ যে বাধ্যতামূলক সে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং এই অভিজ্ঞতার মানেই হচ্ছে সব আদেশের মধ্যে যে সব মূল্য নিহিত আর সেসব বাস্তবে অস্তিত্বশীল উপাদানের মাধ্যমে সেগুলোকে রূপায়িত করার উপায় অনুসন্ধান। এর সমস্ত কিছুই যুক্তির দিক দিয়ে পরস্পর যুক্ত এবং একে অন্য থেকে অবিচ্ছেদ্য। অন্যগুলোকে পূরণ না করে কেবল কোন একটিকে পূরণ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ যে কেবল এইসব মূল্যের বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন তা নয়, তৎসঙ্গে তা করার জন্য পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছেন এবং কি কি উপকরণ আবশ্যক তারও উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে পরিবার এবং পরিবার প্রথা যে সবের জন্ম দেয় সে সমুদয়। উভয়ের প্রয়োজনীয়তা যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। আল্লাহ যে বিশেষ করে এসবের উল্লেখ করেছেন তাতেই এগুলোর যৌক্তিক আবশ্যকতার সমর্থন মেলে। তাই পরিবারকে বাদ দিয়ে তাওহীদের অস্তিত্ব থাকেনা।[৯]

---

৬. তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদেরই, যেন তোমরা পবিত্রভাবে তাদের সঙ্গে মিলিত হও, তাদের সঙ্গে যখন ইচ্ছা তোমরা মিলিত হও, কিন্তু তৎপূর্বে কিছু সৎকর্ম করে নাও; আল্লাহকে ভয় কর ও স্মরণ রাখ যে, তার সম্মুখে তোমাকে দাঁড়াতে হবে। হে নবী, বিশ্বাসীদের জন্য শুভ সংবাদ দাও (২:২৩) এবং তারা যদি আপোষ মীমাংসা চায়,তাহলে তাদের স্বামীদের জন্য উত্তম হবে তাদেরকে আবার গ্রহণ করা। দয়া ও মমতার দিক দিয়ে রমনীদের একই অধিকার আছে পুরুষদের উপর, যেমন আছে পুরুষদের তাদের উপর (২:২২৮)।

৭. তোমাদের স্ত্রীগণের সাথে ভাল ব্যবহার কর এবং তাদের প্রতি সদয় হও, কারণ তারা তোমাদের অংশীদার এবং ওয়াদাবদ্ধ সাহায্যকারীনী। স্মরণ রাখ যে, তোমরা তাদেরকে তোমাদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছো এবং কেবল আল্লাহর সম্মতি নিয়ে, আল্লাহর আমানত হিসেবে তোমরা তাদের ভোগ করেছো। (Haykal. *The Life of Mohammad* "Farewell Pilgrimage" p. 446)

৮. সাক্ষী হিসেবে দ্রষ্টব্য একমাত্র বহু সংখ্যক আয়াত যাতে 'qurba' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে (২: ৭৭, ৪ : ৭) ইত্যাদি।

৯. পরিবার হচ্ছে একমাত্র এলাকা যেখানে কুরআন সাধারণ নীতিমালা ও চূড়ান্ত খুঁটিনাটি বিধি বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক গণ্য করেছে, যা আমরা দেখতে পাই বিবাহ, তালাক, ও

www.icsbook.info

৩. সমসাময়িক সমস্যাসমূহ

ক. সমতা

আল্লাহ যে নরনারীকে তাদের ধর্মীয়, নৈতিক এবং নাগরিক অধিকারের বেলায় কর্তব্য ও দায়িত্বের দিক দিয়ে সমান করে সৃষ্টি করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই।[১০] তবে স্বল্প কয়টি ব্যতিক্রম আছে এবং সেগুলো পিতা এবং মাতা হিসেবে তাদের দায়িত্ব ও কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ধর্মীয় পর্যায়ে আল্লাহ তাদের সমতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন ৩ : ১৯৫, ৯ : ৭১-৭২ এবং ১৬ : ৯৭ সংখ্যক আয়াতে। এই আয়াতগুলোই তাদের নৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠিত করে। নাগরিক সমতার বিষয়ে ৬০ : ১২, ৫ : ৩৮, ২৪ : ২ এবং ৪ : ৩২ সংখ্যক আয়াতগুলোতে ঘোষিত হয়েছে। ৪ : ৩৪ সংখ্যক আয়াতের ভিত্তিতে ইসলাম অসাম্য সমর্থন করে, এই দাবী বিশ্লেষণ করলে বিচারে টিকেনা। প্রথমত এর সম্পর্ক কেবল পারিবারিক ঘরোয়া সম্পর্কের ক্ষেত্রে, একই আয়াতের বাকি অংশে এর প্রমাণ রয়েছে, যে অংশটি প্রথম অংশটি প্রয়োগের শর্তের সঙ্গে সম্পর্কিত– যা সমস্তটুকুই ঘরোয়া পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ক। সাধারণত অবাঞ্ছিত সাধারণীকরণের পথ প্রশস্ত করার জন্য যুক্তি তর্ক থেকে আয়াতের এই অপর অংশটি বর্জন করা হয়ে থাকে। এই সম্পর্কের বেলায় পুরুষের নিশ্চয়ই অগ্রবর্তীতা রয়েছে কেননা পিতৃতান্ত্রিকতাই পরিবারিক জীবনের একমাত্র রূপ যা মানব জাতি নিজেই পরীক্ষা করেছে সৃষ্টির শুরু থেকে এবং পালন করে এসেছে। পরিবার হচ্ছে একটি গৃহ, যার ডিফেন্সের প্রয়োজন হয় এবং যাকে রক্ষা করার জন্য গৃহের বাইরে সার্বক্ষণিক সংগ্রামের আবশ্যক হয়। স্পষ্টতই পুরুষ এ দায়িত্ব পালনের জন্য রমনীর চেয়ে প্রকৃতিগতভাবেই অধিকতর ক্ষমতাবান। দ্বিতীয়ত, অসাম্যের যারা ওকালতি করে তাদের ধারণায় এই আয়াতটির ব্যাখ্যা হচ্ছে উপরে উল্লেখিত যে সব আয়াত ধর্ম, নৈতিকতা ও নাগরিক জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলোতে নরনারীর সাম্য প্রতিষ্ঠা করে, সেগুলোর বিপরীতে তার প্রতিস্থাপন।

খ. ভূমিকার ভিন্নতা

ইসলাম মনে করে নারী এবং পুরুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে পৃথক অথচ পারস্পরিক পরিপূরক দায়িত্ব পালনের জন্য।[১১] মাতৃত্ব, পরিবারের যত্ন এবং ছেলেমেয়েদের লালন পালন, এসব দায়িত্ব ও কর্ম, এবং পিতৃত্ব, পরিবারের রক্ষণ, জীবিকা অর্জন। আর

উত্তরাধিকার সম্পর্কিত কুরআনের আইন কানুন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে (যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে)। কুরআন কেবল সাধারণ নীতিমালা দিয়েছে এবং অতি সামান্য খুঁটিনাটি বিধি-বিধান দিয়েছে, কিংবা মোটেই কোনো খুঁটিনাটি বিধান দেয়নি।

১০. পুরুষ বা নারী যে কেহ হউক, যে ঈমান আনয়ন করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে, তাকে দেওয়া হবে একটি মহৎ জীবনের মর্যাদা এবং তারা যে সব সৎকর্ম করেছে তার অনুপাতে তাদেরকে উপকৃত করা হবে। (১৬:৯৭)।

১১. আল্লাহ কাউকে কাউকে যা দিয়েছেন এবং কাউকে কাউকে যা দেননি, তোমরা ঈর্ষাবশত তা কামনা করোনা। পুরুষ এবং নারী প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে যে কর্ম করেছে তার কর্মের দায়িত্ব তারই। আল্লাহর কাছে তার প্রাচুর্য থেকে প্রার্থনা কর, তিনি সবকিছু জানেন (৪:৩২)।

www.icsbook.info

সামগ্রিক দায়িত্বের জন্য, পুরুষ এবং নারীর মধ্যে পৃথক দৈহিক মনস্তাত্বিক এবং আবেগাত্বক গঠন আবশ্যক। ইসলাম এই ভিন্নতর পার্থক্যকে নর-নারী উভয়ের অস্তিত্বের সার্থকতার জন্য আবশ্যক বলে শ্রদ্ধা করে।[১২] ভূমিকার স্বাতন্ত্র্য, বৈষম্য বিচ্ছিন্নকরণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। উভয় ভূমিকাই একইভাবে ধর্মীয় এবং নৈতিক আদর্শের বা মানদন্ডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; এবং উভয়ের পক্ষে আবশ্যক, নারী কিংবা পুরুষের সাধ্যমত সকল বুদ্ধি, মেধা, শক্তি ও প্রচেষ্টার প্রয়োগ। একইভাবে ভূমিকার এ ভিন্নতা নারী এবং পুরুষের কর্মকান্ড যেখানে নিজের সীমা ডিঙ্গিয়ে অন্যের এলাকায় প্রবেশ করে, সেই সব এলাকা সম্পর্কে কিছু বলেনা, যেমন বলেনা অন্য সব এলাকা সম্পর্কে, যেখানে নিজের এলাকা থেকে অপর এলাকায় প্রবেশের কথা উঠেনা। যেখানে প্রকৃতিগত মানসিক প্রবণতার কারণে তা বাঞ্ছনীয় বা প্রয়াজনে তা উপযোগী মনে হয়, সেখানে নারী এবং পুরুষের কর্মকান্ড একে অপরের এলাকায় অনুপ্রবেশ করতে পারে, আল্লার প্রকৃতিতে ভূমিকার যে ভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা লংঘন না করে। অন্যথায় কুরআন রমণীদেরকে যে সব নাগরিক অধিকার দিয়েছে সেগুলো দিতনা, এবং এসব নাগরিক অধিকার সম্পর্কে কেউ কখনো কোন প্রশ্ন তোলেনা।

গ. প্রদর্শনী এবং গৃহবন্দীত্ব

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তায়ালা চাননি, মুসলিম মহিলারা পর্দার অন্তরালে অথবা হারেমের চৌদেয়ালের মধ্যে সমাজ থেকে আলাদা হয়ে শুটি পোকার খোলসের মধ্যে নিজেকে বন্দী করবে, বরং এই সাক্ষ্যই রয়েছে যে, তাদের সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণের অধিকার থাকবে যেমনটি দেখতে পাই ৬০ : ১২ সংখ্যক আয়াতে, অধিকার থাকবে জনজীবনে অংশ গ্রহণের, যেমনটি উল্লেখিত হয়েছে ৯ : ৭১-৭২ সংখ্যক আয়াতে, এমনকি যুদ্ধ বিগ্রহে, যার উল্লেখ রয়েছে ৩ : ১৯৫ সংখ্যক আয়াতে। স্পষ্টতই এ ধরনের অংশগ্রহণ বোরকা এবং সমাজ বিচ্ছিন্নতার বিপরীত, এবং মুসলমান মহিলাদের জন্য অচিন্ত্যনীয়। ইসলাম যা পরিহার করার জন্য সবচেয়ে যত্নবান তা হচ্ছে সেই ধরনের প্রদর্শনী যা নৈতিকতাহীনতা ও ব্যভিচারের পথে পরিচালিত করে।[১৩] এখানে দুটি আদেশ রয়েছে, একটি সাধারণ আদেশ যা নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য সমান গুরুত্বের সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে, যদিও বা পুরুষের জন্য অধিকতর গুরুত্বের সাথে আলোচিত না হয়ে থাকে, কেননা পুরুষের কথা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে।[১৪] দ্বিতীয় আদেশটির বিষয়, স্ত্রী লোকের যা উপরে উল্লেখিত যথা

---

১২. তাদের রব্ব। তাদেরকে এই উত্তর দিয়েছেন যে, তাদের কোন সৎকর্মই তিনি নষ্ট হতে দেবেন না। পুরুষই করুক কিংবা স্ত্রীলোকেই করুক, তারা একে অন্য থেকে সৃষ্ট (৩: ১৯৫)।

১৩. (হে রমনীগণ) প্রাক ইসলামী রমণীদের মত তোমরা নিজেদেরকে প্রকাশ করোনা (৩৩ : ৩৩)। হে মোহাম্মদ, বিশ্বাসী পুরুষগণকে বল, তারা তাদের সততা রক্ষা করার জন্য যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত করে, এটি হচ্ছে তাদের জন্য শোভন পবিত্র পন্থা লক্ষ্য কর তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। বিশ্বাসী মহিলাগণকেও বল, তাদের সতীত্ব রক্ষা করার জন্য, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত করে এবং তাদের অলংকার কিংবা সৌন্দর্যের, যা স্বভাবতই ব্যক্ত, তাছাড়া অন্য কিছু তারা যেন প্রদর্শন না করে (২৪ : ৩০-৩১)।

১৪. প্রাগুক্ত।

www.icsbook.info

২৪ : ৩০-৩১ সংখ্যক একই আয়াতে বিদ্যমান। একথা সত্য যে কুরআন স্ত্রীলোকদেরকে তাদের গা ঢাকতে বলেছেন। কিন্তু কুরআন প্রকাশ্যে সেই সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে তা থেকে রেহাই দিয়েছে যেগুলো মহিলারা তাদের ইসলাম-নির্দেশিত পেশা এবং ভাগ্য পরিপূরণ করতে হলে প্রথা অনুসারে অনাবৃত রাখতে বাধ্য। নারীর সৌন্দর্য ও অলংকারের ইচ্ছাকৃত প্রদর্শনী পুরুষকে প্রলুব্ধি করে এবং সে কারণে তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, তবে যারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং যে সব প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ সংশ্লিষ্ট মহিলার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেনা, যেমন তার পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, অথবা চাচা, মামার ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর নয়।[১৫] ইসলামে প্রলোভন পরিহার করে চলা একটি উচ্চ নৈতিক আদর্শ। এর সঙ্গে সমাজে তার রমনীর ইসলামী দায়িত্ব পালনের কোন সম্পর্ক নেই, আসলে, মহানবীর সময় থেকে দেখা গেছে মহিলারা এই সব ইসলামী দায়িত্ব নিরবচ্ছিন্নভাবে পালন করেছেন, এমনকি পবিত্র কাবাগৃহে তাদের মুখ, হাত ও পা খোলা রেখে।

ঘ. শাদী এবং তালাক

সকল নারী এবং পুরুষের জন্য শাদী হচ্ছে একটি ধর্মীয় এবং নৈতিক নির্দেশ।[১৬] উচ্চ যৌতুকের দাবী, গৃহের অভাব, শিক্ষা এবং চাকুরী, নারী এবং পুরুষ কারোরই বিয়ের পক্ষে বাধা বলে গণ্য হওয়া উচিত নয়। পশ্চাত্য জগতে এগুলো প্রতিবন্ধক হয়ে উঠছে, কারণ পশ্চিম বৈষয়িক সাফল্যের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় এবং পাশ্চাত্যের লোকেরা যৌন পবিত্রতার উপর কোন গুরুত্বই দেয় না। যেহেতু পারিবারিক ইউনিট আনবিক একক, এজন্য বিয়ের পূর্বেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা দম্পতির জন্য আবশ্যক। এর বিপরীত ইসলামী পরিবার হচ্ছে একটি সম্প্রসারিত মডেল, যার মধ্যে বাবা, মা, দাদা, দাদী, পুরুষ এবং তাদের পুত্র সন্তান-সন্ততিগণ সকলেই অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু শরীয়ার বিধান মতে রমণীরা তাদের স্বামীদের সাহায্য ও সমর্থন লাভের অধিকারী, অথবা তারা যাদের উপর নির্ভরশীল তাদের সাহায্য সহযোগিতায় যেহেতু পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুসরণে ইসলাম বয়স্ক পুরুষের উপর রমণীদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব অর্পণ করে, সেজন্য বেশীর ভাগ মুসলিম পুরুষ এবং নারী তরুণ বয়সে বিয়ে করে। তারা বিয়ের পূর্বে পুরুষের ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সামর্থ্যকে বিয়ের প্রশ্নে অপ্রাসঙ্গিক গণ্য করে। দুর্ভাগ্যক্রমে এক আশংকাজনক হারে মুসলিম তরুণরা পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণায় দীক্ষিত হয়ে পড়েছে; এর ফল এই হয়েছে যে, ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস এবং এভাবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখা, তাদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এ একটি দুঃখজনক করুণ পরিণতি। প্রথমতঃ ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কোন মন্দ

---

১৫. রমণীগণ কেবলমাত্র তাদের স্বামী ও পিতামাতাগণ ছাড়া আর কাউকে তাদের সৌন্দর্য এবং অলংকার প্রদর্শন করবেনা (২৪ : ৩১)।

১৬. ইহা তার একটি নির্দশন যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের মধ্যে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন মহব্বত ও দয়ামায়া, যারা চিন্তাভাবনা করে, তাদের জন্য এগুলো হচ্ছে তাৎপর্যপূর্ণ ও নিদর্শন (৩০ : ৩১)।

www.icsbook.info

জিনিস নয়, কিন্তু এর পেছনে যে মূল্য কাজ করছে তা নিশ্চয়ই মন্দ হতে পারে। এই নীতিকে গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে একটি জড়বাদী বিশ্বদৃষ্টিকে অপরিহার্য আদর্শরূপে পূর্বাহ্নে স্বীকার করে নেওয়া এবং এর অনুসরণের অর্থ হচ্ছে সম্প্রসারিত পরিবারের স্থলে আনবিক পরিবারকে শ্রেষ্ঠতর মনে করা। এটিও প্রকারান্তরে অতিরঞ্জিত ব্যক্তি-স্বতন্ত্রবাদ ও মন্ময়তার পরিণতি। ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্ছৃংখলতা এবং শৃংখলা আনয়নে অসাধ্যতার পূর্বশর্ত। দ্বিতীয়ত বিয়ে স্থগিত রাখা নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রলোভনের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। বিয়ে হচ্ছে সতীত্ব ও সৎগুণের ঢালস্বরূপ। তৃতীয়ত প্রশস্ত সম্প্রসারিত পরিবারে অল্পবয়সে বিয়ের ফলে দম্পতির জন্য কোন অসম্ভব দাবী দাওয়া জন্মায়না। নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই স্কুলে যোগদান বা কর্মক্ষেত্রে যাওয়া সম্ভব, কেননা তাদের অনুপস্থিতিতেও সবসময়ই পরিবার চালানো এবং ছেলে মেয়ে লালন পালনের জন্য ঘরে থাকবে স্নেহময় আত্মীয় স্বজন। তাই ইসলাম সকল মুসলমানকেই বিয়ে করার এবং যৌবনের প্রথম দিকে বিয়ে করার ও সবসময়ই প্রশস্ত সম্প্রসারিত পরিবারে জীবন যাপনের নির্দেশ দেয়।

ঙ. প্রশস্ত সম্প্রসারিত পরিবার

আল্লাহ তায়ালা পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার প্রশস্ত সম্প্রসারিতরূপে। শরীয়াহ পরিবারকে আঁটা সাঁট করে বেঁধেছে আইনের মাধ্যমে যাতে আশ্রিতদের বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের ভরণ পোষণ বাধ্যতামূলক– এবং যাদের মধ্যে উত্তরাধিকার বন্টন আবশ্যক।[১৭] সাধারণভাবে বলা যায় যে, যে কোন স্বজনই আশ্রিত, তার সম্পর্কটি যত দূরেরই হইক না কেন, যদি সে অভাবগ্রস্ত হয় এবং সংশ্লিষ্ট আত্মীয়টির চাইতে নিকটতর কোনো বয়স্ক সমর্থ পুরুষ আত্মীয় তার না থাকে। দাদা-দাদী, নাতী-নাতনি, পিতৃব্য এবং তাদের সন্তান সন্ততির অগ্রাধিকার রয়েছে। রক্ত সম্পর্কিত বা agnate স্বজনেরা জ্ঞাতি সম্পর্কিত বা cognate স্বজনের চাইতে অগ্রাধিকার পায়। কার্যত মুসলমান পরিবার, কুড়িজন বা সমসংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত, যারা সকলে বাস করে একটি বহুকেন্দ্রিক প্রাঙ্গনে, যাদের একটি মাত্র রান্নাঘর এবং একটি মাত্র দেওয়াল থাকে, যেখানে মুরব্বীজনের চারপাশে সকল সদস্যরা জমায়েত হয় এবং মেহমানদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হয়।

মুসলিম পরিবারের মধ্যে জোনারেশন গ্যাপ বলে কিছু নেই, কারণ তারা সকলে একত্রে বাস করে। এভাবে তরুণদের সমাজবদ্ধতা ও সাংস্কৃতিক অন্বয় সব সময় সম্পূর্ণ হয়, যাতে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রবহমানতা নিশ্চিত হয়, সম্ভাব্য স্বল্পতম অপমিশ্রণের সাথে। এখানে অতীত অবিকৃতভাবে সম্পর্কিত থাকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে। সম্প্রসারিত পরিবারের আর একটি সুবিধা এই যে, এই পরিবার

---

১৭. শরীয়াহর যে কোন কিতাব দেখুন (যেমন ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের খুঁটিনাটির জন্য আল যাজিরির *আল ফিকহ আল মাযাহাব আল-আরবাসা।*

www.icsbook.info

যখনই এর কোন সদস্যের প্রয়োজন হয় তৎক্ষণাৎ তাকে সাহচর্য দিয়ে থাকে এবং বিদ্যমান মেজাজ অনুসারে সাধারণ পছন্দ ও নির্বাচনের অবকাশ থাকে প্রচুর। সবসময়ই কেউ না কেউ প্রস্তুত থাকে, এক সঙ্গে খেলাধুলা করার জন্য, হাসি মশকরা করার জন্য, আলোচনা করার জন্য, এক সঙ্গে চিন্তা করার জন্য, এক সঙ্গে ক্রন্দনের জন্য এবং আশা করার জন্য। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য এ হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্ব শর্ত। একটি প্রশস্ত পরিবারে কখনো একটি শিশুর অভাব নেই। একটি বয়স্ক লোকের অভাব নেই, একটি মহিলার অভাব নেই। অন্য সকলের চেয়ে একজন প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞের অভাব নেই।

একথা সত্য, সম্প্রসারিত পরিবার তার সাফল্যের উপর শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা এবং পারস্পরিক ত্যাগ আরোপ করে। কোনো কোনো সময় তা ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে কমিয়ে দেয়। কিন্তু জীবন এবং এই পৃথিবী আমাদেরকে নিয়মানুবর্তিতা ও ত্যাগ ছাড়া আমাদের জীবন চালানোর অনুমতি দেয়না। ব্যক্তি মানুষের জন্য এ পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু নিশ্চয়ই নিজেকে নিয়মানুবর্তী করা এবং অন্যের জন্য, পরহিতার্থে কোরবানী করা ভাল কাজ। আমাদের জন্য সর্বোত্তম হচ্ছে গৃহে আমাদের যারা ভালবাসে এবং আমরা যাদের ভালবাসি, তাদের হাতে নিয়ম শৃংখলা শিখি, অপরিচিতদের হাতে নয়।

চ. পেশাজীবি মহিলা এবং ইসলামী শ্রমিক

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত মুক্তি অর্জনের জন্য কোন না কোন পেশার মাধ্যমে এত বিপুল সংখ্যক মুসলমান মহিলা পাশ্চাত্যের অনুকরণে পেশার অনুসন্ধানে ব্যস্ত যে, এ সমস্যার ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান কি সে সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক।

বিপুল পরিমাণে সংখ্যাগুরু মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে অতি সামান্য সন্দেহের অবকাশ আছে, অথবা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, তারা গৃহিনী এবং মাতা হিসেবে একটি সার্বক্ষণিক স্থায়ী পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে এধরনের পেশার জন্য অনেক বেশী প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়, গৃহের বাইরের যে, কোন পেশার চাইতে এই পেশাকে রান্না বান্না এবং গৃহস্থালীর টুকিটাকি কাজ বলে বর্ণনা করা একটি মহৎ পেশাকে বিকৃত করা মাত্র। এই পেশাতে বৃদ্ধ তরুণ নির্বিশেষে সকল মানুষের যত্ন নেয়া একটি স্বাভাবিক দায়িত্ব। বলা বাহুল্য পৃথিবীতে এটিই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ। এজন্য আবশ্যক পরিণত প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, শিল্প কুশলতা, সৃজনশীলতা, সদ্যপ্রস্তুত রসবোধ এবং অভিজ্ঞতা, যা ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ব। অবশ্যই ব্যক্তির জন্য প্রশিক্ষণ হচ্ছে একটি সার্বক্ষণিক ব্যাপার, গৃহপরিচালনার নিয়মানুবর্তিতার ক্ষেত্রেই হউক, অথবা শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, ইতিহাস, মনস্তত্ব এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই হউক।

পরিবার গঠন, সন্তান জন্মদান ও সন্তান লালন পালন একটি বিশ্বজনীন পেশা হলেও, এ সত্য অনস্বীকার্য যে, এই সব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রমণীর সারাজীবনের কর্মশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়না। সম্প্রসারিত পরিবারের সদস্য হিসেবে তার নিজের

www.icsbook.info

দিক থেকেই হউক, অথবা তার স্বামীর দিক থেকে হউক, স্ত্রীলোক পায় তার সহকারী এবং সেই কারণে অধিক পরিমাণ অবকাশ। তার সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা দুই বা তিন যুগের বেশী স্থায়ী হতে পারেনা। তার জীবন হতে পারে আরো তিনযুগ দীর্ঘস্থায়ী। এটা কি যুক্তিসঙ্গত যে মুসলিম মহিলা এই মূল্যবান সময় ব্যয় করবে পারিবারিক খোশগল্প এবং পরচর্চায়, যখন ইচ্ছা করলে তারা উম্মাহ্কে সাহায্য করতে পারে, তাদের মেধা এবং ক্ষমতা দিয়ে? একইভাবে এও হতে পারে, এমন সব মহিলাও থাকতে পারে যাদের জীবনে বিবাহের সৌভাগ্য ঘটেনা বা যারা সন্তান ধারণ করতে পারেনা, এবং একটি সম্প্রসারিত পরিবারে জীবন যাপনও যাদের জন্য সম্ভব নয়। ইসলাম তাদের জীবন সম্পর্কে কি চিন্তা করে?

প্রত্যেক পুরুষের মতই প্রত্যেক রমণীকেও তার মেধা এবং সর্বোৎকৃষ্ট বৃত্তি অনুসারে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের দায়িত্ব পালন ও উম্মাহ্র কল্যাণ সাধন করতে হবে। আজকের দিনে এই নির্দেশ দ্বিগুণ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করতে হবে, কেননা উম্মাহ্র অবক্ষয় হয়েছে এবং কার্যত উম্মাহ্ এখন সুপ্ত, ঘুমন্ত। কাউকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া যায়না বা অব্যাহতি দেওয়া উচিত নয়। আমাদের বর্তমান অবস্থার দাবী এই যে, প্রত্যেক মহিলাকে কমপক্ষে তার জীবনের একটা অংশে হতে হবে পেশাজীবি মহিলা। এই সময়টি হতে পারে তার ছাত্রী জীবনকালে, সে যদি সম্প্রসারিত পরিবারে বাস করে, তাহলে তার মাতৃত্বের সময় অথবা তার মাতৃত্বের কাল অতিক্রান্ত হবার পর।

তার প্রথম কাজ হচ্ছে একজন ইসলামিক কর্মী হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ, ইসলামী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতি তার মন মানসকে জাগ্রত করা এবং তার দ্বারা তার মন মানসের পরিপুষ্টি, ইসলামিক ক্রিয়া কলাপের নিয়মানুবর্তিতা অর্জন করা এবং তার অনুশীলন। তদুপরি ইসলামী আন্দোলন তাকে এ দায়িত্ব অর্পণ করবে তা বহনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। অন্যান্য মুসলমানদেরকে জাগ্রত করা এবং শিক্ষাদানের জন্য তাকে অর্জন করতে হবে কলা কৌশল ও দক্ষতা এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগের জন্য তাদেরকে সংহত করা। এবং নগর ও গ্রামের সামাজিক কর্মকান্ডের জন্য যে সব দক্ষতা প্রয়োজন নিজের মধ্যে সেগুলো বিকশিত করতে হবে। তার সামাজিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে তাকে ইসলামী দায় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে এবং মুসলমানরা আল্লাহ এবং উম্মাহ্র প্রতি যে দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য, শিক্ষা এবং মহৎ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদেরকে সেই সব দায়িত্ব পালনে তৎপর করে তুলতে হবে। বাস্তবে ক্রিয়া-কান্ডের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রই নারীর জন্য উন্মুক্ত, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তার প্রয়োজন অবিসম্ভাবিত। এমন সব পেশা রয়েছে যেগুলো কেবল নারীদের দ্বারাই পরিচালিত হতে পারে। তবে বর্তমান প্রজন্মে নারীদের ক্রিয়া কর্ম সংহত করার জন্য যে প্রয়াসই চালানো হউক না কেন, মুসলিম সমাজের তার চাইতে অনেক বেশী প্রয়োজন রয়েছে মুসলিম মহিলা কর্মীদের।

www.icsbook.info

দশম অধ্যায়

রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি

তাওহীদ ঘোষণা করে যে, "তোমাদের উম্মাহ্ একটি মাত্র উম্মাহ্, যার প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ। তাই তাঁর উপাসনা এবং ইবাদত কর।[১] মুমিনগণ যে একটি মাত্র ভ্রাতৃসমাজ, যার সদস্যরা আল্লাহর উপর ঈমান এনে পরস্পরকে ভালবাসবে, যারা একে অপরকে ন্যায়বিচার করতে ও ধৈর্য্যশীল হতে পরামর্শ দেয়,[২] যারা ব্যতিক্রমহীনভাবে সকলে একত্রে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়না।[৩] যারা একসঙ্গে বসে পরামর্শ করে, সৎকাজে উৎসাহ দেয় এবং মন্দকার্য নিষেধ করে[৪] – যার পরিণতিতে আল্লাহ এবং তার রাসূলকে মেনে চলে[৫]–এ সমুদয়ই হচ্ছে সমাজের বিষয়ের তাওহীদের প্রাসঙ্গিকতা।

উম্মাহ্র স্বপ্ন এক, তেমনি এক হচ্ছে অনুভূতি অথবা ইচ্ছা এবং কর্ম, উম্মাহ্র সদস্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মনোভঙ্গিতে, তাদের চরিত্রে ও তাদের বাহুতে, চিন্তার একটা ঐক্যমত রয়েছে। উম্মাহ্ হচ্ছে এমন একটি মানসিক ব্যবস্থা যা মন, হৃদয় এবং বাহু, এই তিনের ঐক্যমতে ঘটিত। এ একটি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃসমাজ, যা বর্ণ যেমন স্বীকার করেনা, তেমনি স্বীকার করেনা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়। এর দৃষ্টিতে সকল মানুষই এক, কেবলমাত্র সদাচারণ ও ধার্মিকতার মানদন্ড দ্বারা যার পরিমাপ হবে।[৬] এর কোন সদস্য যদি জ্ঞান, ক্ষমতা, খাদ্য বা আরাম আয়েশ অর্জন করে, তার কর্তব্য হচ্ছে অন্য সবাইকে তাতে শরীক করা, যদি কোন সদস্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সাফল্য বা সমৃদ্ধি অর্জন করে, সে অবস্থায় তার কর্তব্য হবে, অন্যেরাও যাতে প্রতিষ্ঠিত, সফল ও সমৃদ্ধশালী হতে পারে , সেজন্য সাহায্য করা।[৭] এটি এমন একটি মানবিক ব্যবস্থা, যার সদস্যরা

---

১. তোমাদের এই উম্মাহ্ এক, ঐক্যবদ্ধ এবং অবিভাজ্য এবং আমি তোমাদের রাব্ব, তোমরা আমার বন্দেগী কর (২১ : ৯২)

২. (মানবজাতি ক্ষতিগ্রস্থ) তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, একে অপরকে সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে এবং ধৈর্য্যশীল হতে আদেশ করেছে (১০৩: ৩) ...যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং ধৈর্য্য ও দয়া দাক্ষিণ্যের নির্দেশ দেয় (৯০:১৭)।

৩. আল্লাহ রজ্জু দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা, স্মরণ কর তার অনুগ্রহের কথা, তোমাদের মিলনের কথা, যখন তোমরা ছিলে একে অপরের শত্রু এবং তোমরা হয়ে উঠলে পরস্পরের ভাই এবং যখন তোমরা ধ্বংসের অতল গহ্বরে কিনারে উপনীত হয়েছিলে এবং তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছিলেন, এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে দেখান তার নির্দশন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার (৩:১০৩)।

৪. তোমাদের মধ্য থেকে একটি উম্মাহ্ হউক, যে সৎকাজের দিকে আহ্বান করবে, সৎ কাজের নির্দেশ দিবে, মন্দ কাজ নিষেধ করবে। প্রকৃতপক্ষে তারাই সফলকাম (৩:১০৪)।

৫. আল্লাহ এবং তাঁর নবীকে মেনে চল, যদি তোমরা প্রকৃতই মুমিন হও (৮ : ১)।

৬. আল্লাহর দৃষ্টিতে সেই মহত্তম তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে পুণ্যব্রতী, সবচেয়ে সদাচারী (৪৯:১৩)

৭. তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর সৎকর্মে ও পুণ্যকাজে, মন্দকর্মে ও সীমা লংঘনে নয় (৫:২)।

www.icsbook.info

উম্মাহ্‌র মূল্যায়ন ও নীতিমালা দ্বারা নিজের জীবন শাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এবং অন্য সকল মানুষের জীবন যাতে অনুরূপ নীতিমালার দ্বারা শাসিত হয় তার জন্য চেষ্টা করে। তারা বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দা হতে পারে, এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্য হতে পারে, তারা উম্মাহ্‌র সদস্য বলে এই সদস্যপদ সমস্ত বৈষম্য ও পার্থক্যের উপর শরীয়াকে দেয় চূড়ান্ত কর্তৃত্ব। উম্মাহ্‌র ভিত্তি প্রজাতির (race) উপর নয়, অঞ্চল বা ভাষার উপর নয়, রাজনৈতিক এবং সামরিক সার্বভৌমত্বের উপর নয়। অতীত ইতিহাসের উপরও নয়, এর বুনিয়াদ হচ্ছে ইসলামের উপর। নর-নারী নির্বিশেষে যে কেউ ইসলামকে তার ধর্ম বলে গণ্য করে এবং চায় যে, এর আইন কানুন দ্বারা তার জীবন শাসিত হবে, সে বাস্তবে এবং কার্যত উম্মাহ্‌র একজন সদস্য, দ্বারা শাহাদার আইনগত চাহিদার এই হচ্ছে অর্থ। তাছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনটা আবশ্যক নয়। এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে কোন ব্যক্তিই শরীয়াহ কর্তৃক স্বীকৃত সকল অধিকার, সকল সুযোগ সুবিধা ভোগের অধিকারী হয়ে উঠে এবং নিজেকে শরীয়াহ্‌র সমস্ত দায়িত্বের অধীনে স্থাপন করে।

ব্যক্তি মুসলমান পৃথিবীর যে কোন স্থানে বাস করতে পারে এবং সেই দেশের আইনের প্রতি আনুগত্যশীল হতে পারে, যতক্ষণ না সে সব আইন জীবনের সেই সব ক্ষেত্রে শরীয়ার বিরোধিতা করে, যার দ্বারা তার নিজের জীবন প্রভাবিত হয়। যখন যে অঞ্চলে সে বাস করে, তার আইন কানুন যদি ইসলামের বিপরীতে তার জীবনকে প্রভাবিত করে, তখন একটি ইসলামিক অঞ্চলে হিযরত করার বিকল্প তার থাকে। অথবা ইসলামিক কিংবা ভিন্নতর কোন বাহ্য উদ্দেশ্য পূরণের আশায় সে তার নিজের জীবনে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সহ্য করে যেতে পারে। তার পক্ষে উম্মাহ্ হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য নয়। অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তি মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে অন্য সকলকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত করা, নিজের অঞ্চলে উম্মাহ্‌কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। দেশের আইন হিসেবে শরীয়াহ্‌র প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে তার কর্তব্য।

১. তাওহীদ এবং খিলাফত

উপরে যে উম্মাহ্‌র সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, সে উম্মাহ্ হচ্ছে আল্লাহ ইচ্ছা পূরণের জন্য বিশ্ব পুনর্গঠন বা বিশ্ব সংস্কারের বাহন। এ হচ্ছে সৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র খিলাফত, কেননা মানুষের বিষয়ে সৃষ্টির সূচনা লগ্নে প্রদত্ত এই ভবিষ্যত বাণী অবশ্যই সম্প্রসারিত হবে উম্মাহ্ পর্যন্ত এবং তার যুক্তি হচ্ছে পূর্ববর্তী অংশে উল্লেখিত যুক্তিসমূহ। সমভাবে উম্মাহ্ একটি রাষ্ট্র, সার্বভৌমত্বের অর্থে এবং সার্বভৌম শক্তির জন্য যে সব অঙ্গ ও ক্ষমতা সার্বভৌমত্বকে বলবৎ করার জন্য দাওয়াত হিসেবে নয়। ইসলামী ঐতিহ্যের জন্য খিলাফত হচ্ছে নিকটতর এবং তাওহীদের ঘনিষ্ঠতর, যে তাওহীদ একটি সরাসরি এবং কুরআনি সিদ্ধান্ত।[৮] দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'দাওয়াত' একটি আধুনিক ধারণা যার

৮. খিলাফাহ, খুলাফাহ, খালায়েফ, ইয়াস্তাখলিফুকুম প্রভৃতি শব্দগুলোর দ্বারা কুরআনের আয়াতে এর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

www.icsbook.info

অবস্থান কুরআনের প্রতিনিধিত্ব বা খিলাফতের ধারণা থেকে সবচাইতে দূরতম ব্যবধানে। আর খিলাফতের এই ধারণাটি হচ্ছে উম্মাহ্র মূল শর্ত। আমরা যখন খিলাফত উল্লেখ করতে রাষ্ট্রকে বুঝাই তখন উম্মাহ্ এবং পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রের মৌলিক পার্থক্য আমাদের মনে রাখতে হবে। তাই উম্মাহ্র সার্বভৌমত্ব বলবৎ করার ক্ষেত্রে খিলাফতই হচ্ছে উম্মাহ্। এই সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে না হলেও উম্মাহ্র প্রতিনিধিত্ব এর দ্বারাই গঠিত। খিলাফতের বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা রাষ্ট্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে তৌহীদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে চাইছি। খিলাফত হচ্ছে ত্রিমুখী ঐক্যমত্য– দৃষ্টির ঐকমত্য, ক্ষমতার ঐকমত্য এবং উৎপাদনের ঐকমত্য।

ক. ইজমা আর-রুইয়াহ্ বা দৃষ্টির ঐকমত্য

ইজমা আর-রুইয়াহ্ বা দৃষ্টির ঐকমত্য হচ্ছে মানসিক ঐক্য বা চৈতন্য এবং এর রয়েছে তিনটি উপাদান। প্রথম হচ্ছে, যে সব মূল্যায়ন নিয়ে আল্লাহর ইচ্ছা ঘটিত সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান এবং তাদের বাস্তব রূপায়ন ইতিহাসে যে আন্দোলন সৃষ্টি করেছে, সে বিষয়ে জ্ঞান। স্পষ্টতই ইহা পদ্ধতিবদ্ধ এবং ঐতিহাসিক, দৃষ্টির উপাদানগুলো প্রকৃতিগতভাবেই অপরিসীম, অন্তহীন। তাই সমস্ত কিছু সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টির প্রয়োজন নেই, কেবলমাত্র তার সার নির্যাসেরই প্রয়োজন হতে পারে এবং প্রয়োজন হওয়া উচিত। এটি হচ্ছে একটি কাঠামো, একটি পদ্ধতি, স্তরে স্তরে বিন্যাস এবং সিদ্ধান্তের জন্য আবশ্যক যার পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন, যা একবার আয়ত্ব হলে এক জনের পক্ষে সমন্বিততার মধ্যে যা হারিয়ে গিয়েছিল, তা আবিষ্কার করা এবং প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়। মূল্যমানের পদ্ধতিবদ্ধ জ্ঞান সম্পর্কে এ হচ্ছে বিশেষ করে সত্য। আর এই জ্ঞানের উৎস হচ্ছে প্রত্যাদেশ অর্থাৎ কুরআন এবং সুন্নাহ এবং যুক্তি, বুদ্ধি এর নিজস্ব প্রক্রিয়ার উপলব্ধির মাধ্যমে, ন্যায়শাস্ত্র ও জ্ঞানতত্ত্ব এবং সাধারণভাবে সত্য সম্পর্কে উপলব্ধি (পরাতত্ব) নিসর্গ সম্পর্কে উপলব্ধি (প্রকৃতি বিজ্ঞান), মানুষের সম্পর্কে জ্ঞান (নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ব এবং নীতিশাস্ত্র), এবং সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান (সমাজ বিজ্ঞানসমূহ)। প্রত্যাদেশের ক্ষেত্রে যেমন নয়, তেমনি বুদ্ধির ক্ষেত্রে দৃষ্টির একাডেমিক ফল আবশ্যক নয়, যা উপাদানের পদ্ধতিগত ধারণা নিয়ে গঠিত, বরং তা হতে হবে ইনটুইটিভ্ স্বজ্ঞালব্ধ, অর্থাৎ এমন একটি উপলব্ধির আলোর অভিজ্ঞতা হতে হবে যা, যে কোন অঞ্চলকে আলোকিত করতে পারে, দৃষ্টির জন্য ইসলামের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক এমন একটি ছবি প্রতিষ্ঠিত করে।[৯]

একদিকে ইতিহাসে ইসলামী মূল্যমানসমূহ যে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল, সেই আন্দোলন এবং ইসলামী মূল্যমানগুলোর বাস্তবায়ন সম্পর্কে জ্ঞান মুখ্যত একটি অভিজ্ঞতার বস্তু।[১০] এ জন্যই প্রথম দিকের মুসলমানরা মহানবী সম্পর্কে সকল বিবরণ

---

৯. তোমাদের মধ্য থেকে একটি উম্মাহ্ হউক যে সৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কর্ম বারণ করে, প্রকৃতপক্ষে তারাই সফলকাম (৩: ১০৪)

১০. ইসলামী আইন-কানুনের কংক্রীট রূপদান ও বাস্তবায়নের এই ত্যাগীদের ইসলামে এবং ইউটোপিয়াবাদী ধর্মগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীতে, একটি বাস্তব ধর্ম হিসেবে ইসলাম খ্যাতি অর্জন করে।

www.icsbook.info

এবং তাঁর সাহাবাদের জীবন থেকে আহরিত ঘটনাবলী জানার জন্য অবিরাম চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই এধরনের চাহিদা দেখা যায়, কারণ অনুসারীদের জন্য তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ধারণা কি করে একটি কংক্রীট রূপে প্রকাশ পায় তার জ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যমান বাস্তবায়নের বিশেষ উপাদানগুলো তাদের ছাত্রদের উপর একটি সার্থক এবং বাঞ্চনীয় শিক্ষকীয় প্রভাব বিস্তার করে। এগুলো তাদের পদ্ধতিগত অধ্যয়নের উপাদানগুলো থেকে সহজে বোঝা এবং স্মরণ রাখা যায়। যাই হোক খিলাফতের জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গির উৎপাদন আবশ্যক তার জন্য উভয়টিই সমরূপে আবশ্যক।

মূল্যমানের পদ্ধতিগত উপলব্ধি এবং ইতিহাসে সেগুলোর রূপায়ণ, এ দুটি বিষয় নিয়ে সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমানের জ্ঞানের অভাবে এবং বর্তমান কি করে সেগুলোকে নতুন করে বাস্তবায়িত করতে পারে, সেই জ্ঞান ছাড়া প্রায় এখন অসম্পূর্ণ। যেহেতু খিলাফত পশ্চাৎমুখী হতে পারে এবং বর্তমানের মধ্যে বাস করতে পারে এবং ভবিষ্যতেও কার্যকর হবে, সেজন্য বর্তমানের সঙ্গে মূল্যমানকে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক। স্থির করতে হবে বাস্তবে অস্তিত্বশীল কোন উপাদান কোন মূল্যমানকে বাস্তবায়িত করবে সেগুলো রূপায়নের বেলায় কেমন করে বর্তমান অবস্থাগুলো মূল্যমানসমূহের শ্রেণীর উপর প্রভাব বিস্তার করে।

এখানে ইজমা আর-রুইয়াহর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাকে ধর্মীয় জ্ঞানের একটি উৎস বলে ধরা হয়েছে। রাসূলুল্লাহর এই হাদিস, "আমার উম্মাহ্ অসত্য বা মিথ্যার ব্যাপারে একমত হবেনা, উম্মাহ্র জনমতের উপর প্রায় একটি পবিত্রতা আরোপ করেছে। তা সত্বেও এ কোন অনড় মত নয় বরং সব সময়ই উন্মুক্ত।[১১] এই উন্মুক্ততাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে ইজতিহাদে, যা কেবল সামর্থ্য নয়, বরং প্রত্যেক বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মুসলমানের কর্তব্য, ইসলামী সত্য ও মূল্যমানের সমগ্র পরিসর বা তার কোন অংশকে নতুন করে আত্মসাৎ করা। প্রকৃতিগতভাবেই ইজতিহাদ গতিশীল এবং সৃজনধর্মী এবং তার স্বগুণেই উপলব্ধিক্ষম মনের কাছে খুবই আবেদনশীল। ইজতিহাদকেও রাসূলুল্লাহ এই হাদীসে অভিনন্দন যোগ্য বলে গণ্য করেছেন, "যে কেউ ইজতিহাদ করে একটি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয় সেও একটা সৎ কাজ করলো। যে কেউ ইজতিহাদ করে সত্যে উপনীত হয়, সে দ্বিগুণ পূণ্য লাভ করে।" ইজতিহাদ এবং ইজমা সম্মিলিতভাবে সৃষ্টি করে একটি দ্বান্দিক গতি, যা চিন্তার রাজ্যে ইসলামী গতিশীলতা গঠন করে। কারণ ইজমা যেখানে উপলব্ধি লাভের প্রয়াসে চূড়ান্ত বলে গণ্য হয় সেখানে তা ক্রমাগতই লংঘিত হয় ইজতিহাদের সৃজনধর্মী শক্তির বলে। অন্যপক্ষে, যেখানে ইজতিহাদ উপলব্ধির সর্বোচ্চ বাঞ্ছিত লক্ষ্য বলে

---

১১. ইসলামে জনকণ্ঠ বা জনমতকে কখনো আল্লার কণ্ঠের সমান গণ্য করা হয়নি, বরং জনকণ্ঠ বা জনমত সবসময়ই আল্লাহর নির্দেশের অনুবর্তি ও অধীনে রয়েছে, জনমত যখন আল্লাহর আদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তখনই তা বাধ্যতামূলক এবং যখন আল্লাহর বাণী থেকে ভিন্নপথ অবলম্বন করে তখনই তা নিন্দনীয় হয়।

www.icsbook.info

পবিত্র বলে গণ্য হয় সেখানে তা সকল মুসলমানকে এর বৈধতা সম্পর্কে বিশ্বাসী করার প্রয়োজনে তা হয় নিয়ন্ত্রিত, সংশোধিত এবং সমালোচিত অর্থাৎ সকলের দ্বারা তা (ইজমা) সমর্থিত হবার প্রয়োজনে।

খ. ইজমা আল-ইরাদা বা ইচ্ছার ঐকমত্য

ক্ষমতার ঐকমত্য হচ্ছে ইচ্ছার মিল বা ঐক্য এবং এর দুটি উপাদান আছে– আল আসাবিয়া (সামাজিক সংহতি) যার বলে মুসলমানরা বিভিন্নি ঘটনা এবং পরিস্থিতিতে একইভাবে আল্লাহর আহ্বানের প্রতি সম্মিলিত আনুগত্যে সাড়া দেবার জন্য নিজেরা অঙ্গীকার করে এবং 'আন-নিজাম', সিদ্ধান্তের বাস্তব রূপদানে সামর্থবান, মুসলিমদের কাছে পৌঁছাতে এবং তাদেরকে সংঘবদ্ধ করতে এবং সাংগঠনিক এবং যৌক্তিক কাঠামো মূল্যমানের ঔচিত্যতাকে ব্যক্তির গ্রুপ ও তাদের নেতাদের কর্তব্যের রূপদানে পারঙ্গম।

'আল আসাবিয়া' দৃষ্টিগত ঐক্যের সমান বা ফল নয়। এই ধরনের ঐকমত্যের দ্বারা আসাবিয়াকে সমৃদ্ধ ও তাৎপর্যপূর্ণ করা যেতে পারে। আসলে এই ধরনের ঐকমত্য ছাড়া আসাবিয়ার অস্তিত্ব অসম্ভব, কেননা যেখানে কোনো ব্যাপারে ঐকমত্য নেই, সেখানে কখনো সংহতি অর্জিত হতে পারে না। দৃষ্টিগত ঐকমত্যের চাইতেও আসাবিয়ার চাহিদা আরো বেশী, এর অভিব্যক্তি ঘটে আন্দোলনের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা ঘোষণার সিদ্ধান্তে। বলতে গেলে উম্মাহ্র অর্ণবজানে নিজের ভাগ্য সমর্পণ করতে এবং পরে আহ্বানে সাড়া দিতে– অর্থাৎ আহ্বান বা দাওয়াতে ইতিবাচক 'হ্যাঁ' বলতে এবং দাওয়াতে যা কিছু চায় ইতিবাচকভাবে সম্পাদন করতে।

খোদ্ এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি নির্মিত হয় একটি দীর্ঘ মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ার উপর, যে প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি নিজেকে উম্মাহ্র সঙ্গে অভিন্ন রূপে দেখতে পায়, যার পরিশেষে তার চৈতন্য হয়ে উঠে বাস্তবায়নমুখী এবং মানুষ নিজেকে উম্মাহ্র ঐতিহাসিক ঘূর্ণাবর্ত ও সূচীমুখ হিসেবে খিলাফতের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখে। এই মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া শিক্ষা এবং অনুশীলনের বিষয়বস্তু হতে পারে। যেখানে তা হয় সেখানে এই প্রক্রিয়া হয়ে উঠে মার্জিত এবং সমৃদ্ধ। তবে জন্মের মাধ্যমেও প্রকৃতিগতভাবে এর আবির্ভাব হতে পারে এবং গোত্র বা গোষ্ঠীর বদ্ধ পরিবেশে তা লালিত পালিত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া হয়ে উঠবে বিচার বুদ্ধিহীন। অন্ধ আবেগে নিজেকে গোত্র বা জাতের সঙ্গে একাত্ম গণ্য করার এই অর্থে ইবনে খলদুন আসাবিয়াকে সমাজ সংহতির ভিত্তি বলে ঘোষণা করেছিলেন।[১২] যেহেতু ইসলামে এই বাস্তব উপাদানগুলো অতিক্রান্ত হয়েছে তাওহীদের আদর্শের দ্বারা সে কারণে ইসলামের আসাবিয়া হবে একটি নতুন প্রক্রিয়ার, একটি নতুন সংস্কৃতির ফল (আল্লাহর অভিপ্রেত আদলে সক্রিয় ও নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজের চেহারা বদল করা)। তাই আসাবিয়া হবে

১২. Abd al Rahman ibn Khaldun. *Al Muqaddimah* (Cairo: Matbaut Mustafa. Muhammad n. d) pp. 127 if.

www.icsbook.info

ইচ্ছাকৃত লালিত-পালিত, বিকশিত এবং পরিণত। কেবলমাত্র প্রকৃতিগতভাবে একটি অনৈচ্ছিক বিকাশ নাও হতে পারে, ইউরোপীয় রোমান্টিসিজমের জাতীয়তাবাদী অনভূতির সঙ্গেও একে এক করে দেখা যাবেনা যা প্রায় বর্ণিত হয় অচেতন, অনৈচ্ছিক, অবর্ণনীয়রূপে অন্তর্গত এবং গূঢ় বলে, প্রকৃতপক্ষে যা গোত্র গোষ্ঠীতন্ত্রের আসাবিয়া। ইসলামী আসাবিয়া ইচ্ছাকৃত, পরিস্কারভাবে তাওহীদের সকল তাৎপর্যের পূর্ণ প্রভায় উম্মাহ্র ভাগ্যের সঙ্গে, নিজেকে অভিন্ন গণ্য করার অঙ্গীকার এবং তাতে অংশগ্রহণ। এ দৃষ্টান্ত পাই আমরা এর বিশুদ্ধতমরূপে মক্কায় হজ্জ যাত্রীদের সম্মিলিত ধ্বনিতে যখন তারা কাবা ঘর তাওয়াফ করে অথবা যখন আরাফার দিকে ধাবিত হয়; *"লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক"*, (তোমার আহ্বানে, হে প্রভু, এখানে আমরা হাজির, তোমার আহ্বানে) আর এ হচ্ছে বহু শতাব্দী ধরে যে ভৌগোলিক বা গোত্র গোষ্ঠী ধর্মী বা সংস্কৃতিতে বৈশেষিকতা খাস পাশ্চাত্য জাতীয়তার চরিত্র শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার সম্পূর্ণ বিপরীত।[১৩]

যেহেতু আসাবিয়া ভূমন্ডলের একটি বিস্তৃত অঞ্চলে বিস্তৃত বিশ্বজনীন উম্মাহ্-গঠনকারী একটি উপাদান সে কারণে আল আসাবিয়া মুসলমানের ব্যক্তিগত মুহূর্তের একটি সত্য মাত্র হতে পারেনা। পরিস্থিতি এবং ঘটনায় সাড়া দিতে গিয়ে মুসলমান যখনি সক্রিয় হতে ইচ্ছা করে বা বাধ্য হয় তখন তা একটি অবাধ তরঙ্গোচ্ছাস হিসেবে কাজ করতে পারেনা; এরূপ কাজ হবে জগৎব্যাপী বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির জনক। আসাবিয়া ইসলাম সম্মত এবং সে কারণে দায়িত্বশীল হতে হলে শৃংখলার অধীন, অবশ্যই হবে নিয়ম গভীরতা ও দিশার দিক দিয়ে এবং অন্য সকল মুসলমানের সঙ্গে সমবায়মূলক ক্রিয়াকান্ডের সঙ্গে নিজেকে অভিন্নভাবে যুক্ত করার জন্য শৃংখলার অধীন। এটাই হচ্ছে আন-নিজামের রূপ, যে বিষয়ে তাওহীদের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ইজমা-প্রথা মুসলমানদের তৈরি করেছে। এই নিজামের দিকে লক্ষ্য করে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা ভালভাবেই জানতেন যে, প্রত্যেক মুসলমানকে হতে হবে অক্ষরজ্ঞান এবং সাহিত্যের রুচীসম্পন্ন তাকে কুরআনের বৃহৎ অংশ সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞান রাখতে হবে, নবী চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে এবং সাহাবাদের জীবন জানতে হবে, তার গৃহের নিকটবর্তী জামাতে এবং ইবাদতে অংশগ্রহণ করতে হবে– (অর্থাৎ অন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা এবং ইবাদত করতে হবে– আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি নিকটবর্তী মসজিদে। সালাতের সময় যে মুসলমানদের কাঁধ পরস্পর স্পর্শ করা উচিত, এই তাগিদের মানে এই যে, এতে করে, একের কাছে অপরের অস্তিত্ব জীবন্ত হয়ে উঠবে, একের সঙ্গে অপরের পারস্পরিক সম্পর্ক ও পরিচয় এবং শব্দটির আক্ষরিক অর্থে বৃহত্তর উম্মাহ্র সঙ্গে সহযোগিতার উপলব্ধি বাস্তব হয়ে উঠবে, যাতে করে আল্লাহ যে সকলের প্রভু এবং মালিক ইবাদতকারীর চেতনায় তা মুদ্রিত হয়ে যায়। এ সমস্তই পরিকল্পিত হয়েছে খিলাফতের আনুষ্ঠানিক সংগঠনের প্রস্তুতি হিসেবে। সেকালে মসজিদ ছিলো

---

১৩. দেখুন এই গ্রন্থকারের (*Christion Ethics* Chap 1 Vll "Urubah and Religion pp. ff.

www.icsbook.info

এবং একালেও তা হওয়া উচিত ইসলামী কর্মতৎপরতার কেন্দ্র, ইসলামের আবশ্যিক কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু, কারণ মসজিদে মুসলমানরা দৈনিক মিলিত হত, তাওহীদের বন্ধনে তার সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে একটি জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করতো এবং লাভ করতো আধ্যাত্মিক, নৈতিক, রাজনৈতিক জীবনীশক্তির দৈনিক বরাদ্দ। এই খোরাক সরবরাহ করা যায় এবং প্রকৃতই তা সরবরাহ করা হতো যে কোন মুসলিম কর্তৃক, যার অধিকতর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছিলোতার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবার, যাতে খোদ খলিফাকেও বাদ দেওয়া হতোনা। আল্লাহর আদেশ পালন করতে গিয়ে "আল্লাহ তায়ালার দিকে আহ্বান কর মানুষকে প্রজ্ঞা এবং অধিকতর সুন্দর যুক্তির মাধ্যমে।"[১৪] এবং রাসূলুল্লাহর (সা.) নসিহত প্রদানের আদর্শে স্বাধীনভাবে প্রদত্ত পরামর্শ, যে নসিহতের আদর্শকে ইজতিহাদের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।[১৫] সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে এই সম্পর্ক ও সংসর্গ রূপ নেবে জুম্মার সালাতে যেখানে ইমামের খুৎবা হচ্ছে একটি গঠনমূলক স্তম্ভসদৃশ। খুৎবার বিষয়বস্তু হবে বর্তমান পরিস্থিতি, মুসলমান সমাজকে যে সব সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে সেসবের উপরই খুৎবা দেবেন ইমাম। খুৎবাতে যে কুরআন এবং হাদিসের কিছু উল্লেখ থাকে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ইসলামী প্রজ্ঞার বক্তব্য পেশ করা এবং এভাবে তার প্রাসঙ্গিকতা ঘোষণা করা। আমির (শাসক) নিজেই যে জুম্মার সালাতের ইমাম হবেন, এই প্রথার উদ্দেশ্য ছিলো কার্যকর করার জন্য সপ্তাহের আলাপ আলোচনা থেকে যে ঐক্যমতের সৃষ্টি হয় তার সুস্পষ্ট রূপদান কিংবা ঐকমত্য অর্জিত না হলে নেতৃত্বকে ঘিরে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং উপস্থিত প্রশ্নের আবশ্যক বিচার ও প্রতিবাদের ব্যবস্থা করা। ইসলামের এ সমস্ত ইবাদত পৃথিবী এবং মানুষের বাস্তব রূপান্তর, যে উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে খোদ কুরআন,[১৬] পৃথিবীস্বরূপ আল্লাহর জমিদারীতে রায়ত এবং কৃষকের বাস্তব খিদমত, মরুভূমিকে খুঁটি করে উপনিষদীয় গুরুর, তথা সন্যাসীর, শারীরিক কসরত, তথা যোগ সাধন নয়, কোন ধর্মীয় ঐতিহ্যের আত্মনিগ্রহ, বিশ্বের অস্বীকৃতি এবং ইতিহাস প্রত্যাখ্যান নয়।

গ. আমলের ইজমা বা কার্যের ঐকমত্য

কার্যক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখিত সমস্ত প্রস্তুতির চূড়ান্ত শীর্ষ হচ্ছে ইজমা আল-আমাল। এ

---

১৪. তোমরা রবের পথের দিকে আহ্বান কর, প্রজ্ঞা ও শোভন প্রচারের মাধ্যমে, অবিশ্বাসীদের সঙ্গে সংলাপে সবসময় শ্রেষ্ঠতর এবং শোভনতর যুক্তি উত্থাপন কর (১৬ : ১২৫)।

১৫. শাসকের বৈধ সমালোচনাকে উৎসাহিত করার জন্য মহানবী বলেছেন, "যে কেউ শাসকের জবাবদিহি বাধ্য করার প্রয়াসে মারা যায়, সে শহীদের মৃত্যুবরণ করে" এবং কোন জাতি যখন দেখে একটি শাসক জবরদাস্ত স্বৈরশাসন চালাচ্ছে এবং তাকে থামাবার জন্য চেষ্টা করছেনা তখন সে জাতি এমন একটি অপরাধ করে যার জন্য সে আল্লাহর কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হয়ে পড়ে।

১৬. আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের পরিবর্তনের চেষ্টা করে (১৩: ১১), তারাই সদাচারী যারা পৃথিবীতে তাদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হলে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, সৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং মন্দকর্ম নিষেধ করে, চূড়ান্ত পর্যায়ে সমস্ত কিছুর প্রত্যাবর্তন আল্লাহর নিকট (১২: ৪১)।

www.icsbook.info

হচ্ছে ইজমা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠা ঔচিত্যের রূপ। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা ইজমা-ইজতিহাদ দ্বন্দ্বের চিরন্তন গতিশীলতার মতই কখনো নিঃশেষ হতে পারেনা। মানুষকে তার বেহেস্তের অধিকার অর্জনের প্রয়াসে, দেশকালের মধ্যে আল্লাহর ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করা এমন একটি প্রয়াস কেবল বিচার দিবসই যতি টানতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে উম্মাহ্র বৈষয়িক চাহিদাগুলো পূরণের ব্যবস্থা, এর প্রত্যেক সদস্যকে এমন একটি শিক্ষাদান যাতে করে তার পূর্ণ আত্মপরিচয় সম্ভব হবে। আরো রয়েছে উম্মাহ্র সফল প্রতিরক্ষার জন্য বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার বৈষয়িক ও নৈতিক উপায়ের ব্যবস্থা করা এবং তৎসহ সারা পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় রূপায়ণের জন্য নৈতিক ও বৈষয়িক উপায়ের ব্যবস্থা।

আল্লাহর অভিপ্রায়ের সার নির্যাস হচ্ছে উম্মাহ্র বৈষয়িক চাহিদা পূরণ এবং সে কারণে তা ধর্মের ও মর্মকথা। যেহেতু তার খিদমত করার জন্য আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন[১৭] এবং আল্লাহর জমিনে রায়ত-কৃষকের মত এই দায়িত্ব পালন করতে বলেছেন[১৮] তাতে করে ইহা অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ চান মানুষ জমি চাষ করবে, প্রকৃতির উপাদান এবং শক্তিগুলোকে ব্যবহার করবে এবং তার খুশীমত সভ্যতার বিকাশ ঘটাবে।[১৯] এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করতে গিয়ে কুরআন দারিদ্রকে শয়তানের অঙ্গীকার বলে বর্ণনা করেছে।[২০] এবং ধর্মের সঙ্গে ক্ষুধার্তের খাদ্য দান এবং দুর্বলের রক্ষণকে অভিন্ন গণ্য করেছে।[২১] বিশেষ করে মানুষ যখন আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন করে,[২২] তখন মানুষের খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের স্বাভাবিত প্রতিফল এই যে, সে সৃষ্টির মাধুর্য এবং আনন্দ উপভোগ করবে। মেসোপটেমীয় দৃষ্টিতে মানুষের সৃজনের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে আল্লাহর জমিনে স্থাপন করা হয়েছে, তাঁর ভৃত্য হিসেবে। কিন্তু মানুষের এই সৃজন কর্মই হচ্ছে সংঘবদ্ধ কৃষিকর্ম, বাঁধ তৈরী, সেচ এবং

---

১৭. আমি জ্বীন এবং মানবজাতিকে আমার ইবাদত ছাড়া জন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি (৫১ : ৫৬)।

১৮. হে জনগোষ্ঠী, আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তোমাদেরকে স্থাপন করেছেন যাতে তোমরা পৃথিবীতে বাস করতে পার। অতএব তার ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর নিকট অনুতাপ কর, তিনি হচ্ছেন প্রভু, তিনি নিকটেই আছেন এবং তিনি দয়ালু (১১ : ৬১)।

১৯. যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করবেন যেমন তিনি দিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে তিনি তাদের নিকট থেকে যা গ্রহণ করেছিলেন তাদের সেই ধর্মকে শক্তিশালী করবার জন্য তিনি কথা দিয়েছিলেন এবং তাদের আতংক ও নিরাপত্তহীনতাকে আত্মবিশ্বাস ও নিরাপত্তায় পরিণত করতে। তদের কাজ হচ্ছে তাঁর ইবাদত করা এবং কোনো কিছুতেই তাঁর শরীক না করা, যারা ঈমান আনেনা তারা অন্যায়চারী (২৪ : ৫৫)।

২০. দারিদ্র হচ্ছে শয়তানের প্রতিশ্রুতি, শয়তান তোমাদেরকে অশ্লীল ও পাপকর্ম করতে নির্দেশ দেয়, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন, তার দয়া ক্ষমা ও অনুগ্রহের, তিনি সবকিছু জানেন। তিনি প্রাচুর্যময় (২: ২৬৮)।

২১. তুমি কি দ্বীনের অস্বীকারকারীদের দেখেছো, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি সে এতিমকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, যে মিসকিনকে খাদ্য দানে নির্দেশ দেয়না (১০৭ : ১-৩)।

২২. বল হে মোহাম্মদ, আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য যে সব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা দিয়েছেন, কে তা নিষিদ্ধ করেছে? বল, এই পৃথিবীতে এগুলো মুমিনদেরই জন্য এবং পরকালে তারা এগুলো উপভোগ করবে। এরূপে আল্লাহ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন (৭: ৩২)।

www.icsbook.info

পানি নিষ্কাশন, খাল, খনন শস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, পিরামিড, মন্দির নির্মাণ, লিখন ও হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে গ্রাম-সরকার, নগরী, প্রদেশ, জাতি এবং বিশ্ব পর্যায়ে সরকার প্রতিষ্ঠার সূচনা। সংক্ষেপে আল্লাহর এই সৃজন কর্মই হচ্ছে বিশৃংখলা থেকে সৃষ্টিকে শৃংখলার অধীনে আনয়ন এবং শৃংখলাবদ্ধ জগতের সৃষ্টি।[২৩]

সেমিটিক মন কখনো সংসারত্যাগীর সংসার বর্জন বা আত্মনিগ্রহের অর্থ বুঝতে সক্ষম নয়, ইহা কখনো কাম ও প্রজনন, খাদ্য ও আরাম আয়েশকে স্বাভাবিক পাপ বলে গণ্য করেনা। এর দৃষ্টিতে পাপ হচ্ছে এসবের অপব্যবহার, কখনো প্রকৃতির বিষয় হিসেবে এগুলো পাপ নয়। খ্রীষ্টান ধর্ম বস্তুর সকল ভীতিসহ যে গ্নষ্টিক (gnostic) ঐতিহ্যকে উত্তরাধিকারস্বরূপ গ্রহণ করে, তাই খ্রীষ্টান আন্দোলনে সংসার বর্জন ও আত্মনিগ্রহের বীজ বপন করে। ইসলাম অবশ্যই শ্রম বা উপবাসের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুটি ঃ আত্মসংযমের অনুশীলন এবং অভাবগ্রস্তের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি। একই আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর খাদ্য, পানীয় এবং আনন্দের মাধ্যমে অবশ্যই ভাঙ্গতে হবে রোজা।

খলিফাকে যদি মানুষের বৈষয়িক চাহিদা অবশ্যই পূরণ করতে হয় যা প্রত্যাশা করা হয় খলিফার কাছ থেকে, তাহলে প্রশ্ন উঠবে মানুষের এই বৈষয়িক চাহিদা কি পরিমাণ হলে যথেষ্ট হবে। ন্যূনতম চাহিদা সহজেই নির্ণয় করা যায়; সে চাহিদা হচ্ছে সকল মানুষের জন্য দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি এবং শিশু মৃত্যুর প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য যা প্রয়োজন তাই হচ্ছে ন্যূনতম চাহিদা। কিন্তু সর্বোচ্চ চাহিদা নির্ণয় করা অসম্ভব কেননা প্রকৃতির ব্যবহারের সীমা অথবা প্রকৃতির খাদ্য উৎপাদনের ক্ষমতা নির্ণয় করাযায়না। এদুটিই হচ্ছে মানুষের কল্যাণের জন্য, আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতি বা তার পদ্ধতি মধ্যে যে নিয়ম প্রবর্তন করেছেন সেগুলোর উপর মানুষের কর্ম প্রসারণশীল কর্তৃত্বের বিষয়।[২৪] কুরআন আমাদেরকে জানাচ্ছে আসমানে এবং জমিনে যা কিছু আছে সমস্তই আমাদের কল্যাণের জন্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে কেউ রাত্রে গৃহপ্রত্যাবর্তন করে যখন তার একদিনের পথে কোথাও একটি মাত্র মানুষও ক্ষুধার্ত থাকে, সে আল্লাহকে কষ্ট দিয়েছে।" এবং দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) ঘোষণা করেছিলে "আমি ভয় করি যে, বিচার দিবসে নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদেরকে দায়ী করবেন, প্রত্যেক খচ্চরের জন্য যা হোচট খায় বা পড়ে যায়, খিলাফতের সবচেয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল মেরামতহীন ভাঙ্গাচুড়া রাস্তায়।[২৫]

---

২৩. Pritchard. *Ancient Near Eastern. Tests* 60

২৪. আসমানে এবং জমিনে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুই তোমাদের অধীন করেছে যারা চিন্তা করে এবং বিচার করে, তাদের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন (৪৫ : ১৩) ... আল্লাহই মাদের জন্য ধরিত্রীকে করেছেন বশীভূত, তোমাদের উদ্দেশ্য সাধন ও কর্মের জন্য তাই পৃথিবীছড়িয়ে পড়, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে ভক্ষণ কর এবং স্মরণ রাখ যে তার কাছেই তোমাদের ফিরতে (৬৭ : ১৫)।

২৫. Mohammad Husayn Haykal-Al Faruq Umar (Cairo Matbaat M 364) vol 2 p-200.

www.icsbook.info

নিশ্চয়ই ইসলাম অন্য সকল ধর্মের মতই দান খয়রাতের নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম দান খয়রাতকে বলে সাদাকা (শাব্দিক ভাবে যার অর্থ হচ্ছে সত্যপরায়ণতার একটি খন্ড যার দ্বারা ইসলাম একে একজনের ঈমানের সত্যতার অভিব্যক্তি এবং সূচক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়)। কিন্তু সকল ধর্মের চাইতে স্বতন্ত্রভাবে ইসলাম ব্যবস্থা করেছে যাকাতের, যা বার্ষিক শতকরা আড়াই ভাগ হিসেবে একটি সম্পদ কর এবং তা আদায় করা হয় রাষ্ট্রীয় আইনের অনুমোদনক্রমে। ইসলাম যে একে যাকাত বলে (মাধুর্য বা মিষ্টতা) এর দ্বারা ইসলাম বোঝাতে চায় যে, আমরা যদি আমাদের সম্পদে আমাদের সঙ্গী সাথীদের অংশীদার না করি, তাহলে বছরে সে সম্পদ হয়ে উঠে তেতো। অধিকন্তু ইসলাম বঞ্চিতদেরকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, তাদের জন্য ভিক্ষা, দান বা অপমানজনকভাবে ছুঁড়ে মারা কোনো রুটীর টুকরো নয়, বরং এ হচ্ছে বিত্তবানের সম্পদে তাদের হক, তাদের অধিকার।[২৬] ইসলাম একচেটিয়া ব্যবসা যেমন নিষিদ্ধ করেছে, তেমনি নিষিদ্ধ করেছে মজুতদারী এবং মানুষের উপর মানুষের শোষণের প্রধান হাতিয়াররূপ সুদকে উচ্ছেদ করেছে।[২৭] পক্ষান্তরে যেখানে ইচ্ছা এবং সর্বত্র আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানের জন্য মানুষকে নির্দেশ দিয়েছে।[২৮] এদেরকে সেই প্রকৃতপক্ষে অনুগ্রহ প্রাচুর্যের সন্ধানে দেশ দেশান্তরে যেতে বলেছে, তবে আল্লাহর নৈতিক বিধানের আওতায়, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবঞ্চনা, চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন বা লুটপাট না করে এবং এভাবে একবার প্রাচুর্য অর্জনের পর সেই বিপুল সম্পদের কোন অংশ কিংবা তার বহুগুণ বৃদ্ধিতে ক্ষতি প্রদান করে তিক্ততা দূর করে মধুর করে তুলতে হবে। এবং এভাবে সাদাকাতারা এই বৃত্তির অধিকারীর সত্যবাদিতা প্রমাণ করতে হবে।[২৯]

উম্মাহ্র প্রত্যেকটি সদস্য যাতে পৃথিবীতে আল্লাহর নিয়ামত অর্জন ও ভোগ করতে পারে তার জন্য যা যা সব কিছু করাই অবশ্য খিলাফতের দায়িত্ব। কিন্তু এই লক্ষ্য মহৎ এবং আবশ্য হলেও যে মুহূর্তে একে মানবজীবনের একমাত্র বা চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে গণ্য করা হ তখনই তা পর্যবসিত হয় পাশবিকতায় এবং অধঃপতনে, যাতে মানুষের ব্যক্তিত্বেরটে বিকৃতি এবং গোটা ঐশী অভিপ্রায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।[৩০]

---

২৬. এবং তারা তাদোম্পদে দরিদ্র ও বঞ্চিতের অধিকার স্বীকার করে (৫১ : ১৬)

২৭. (দুর্ভাগ্য তাদের) সম্পদ পুঞ্জীভূত করে এবং মনে করে যে, তাদের সম্পদ অমরতা দান করবে (১০৪: ২-৩) আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন (২০২: ২৭৫)

২৮. যখন সালাত সমাপ্ত হয়, তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান কর এবং আল্লাহকে বার বার স্মরণ কর যাতে তোমরা প্রকৃতই সফলকাম হতে পার (৬২ : ১০)। (হে মোহাম্মদ) তাদেরকে একটি অংশ গ্রহণ কর অভাবগ্রস্থকে দেবার জন্য। এবং তাতে তাদের অন্তরের সৎকর্মশীলতা দৃঢ় হবে। তাদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা কর, তাদের জন্য তোমার প্রার্থনা, তাদের জন্য সন্তুষ্টি করবে আত্মবিশ্বাস, কারণ আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (৯:১০৩)।

২৯. যাকাতের আদেশসম্বলিত কুরআনের আয়াত অসংখ্য। দেখুন Barakat. Al Murshid... Zakah. বিশেষ করে কুরআন ৯ : ১০৩)।

৩০. প্রকৃতপক্ষে অন্য সকলোকে বাদ দিয়ে কোনো একটি মূল্যের অনুসরণ হচ্ছে সেই মূল্যের উপর একটি জুলুম। এবং শাসন এই ধরনের কোনো একটি মূল্যের অনুসরণে বাড়াবাড়ি যা মূল্য অনুসরণের প্রয়াস তার উদ্দেশ্য দুটিকেই দূষিত করে এবং সেগুলোকে মূল্যহীন করে তোলে।

www.icsbook.info

মানুষের বৈষয়িক প্রয়োজনগুলো নির্দোষ এবং বস্তুতই উত্তম; সম্ভাব্য উচ্চতম মাত্রায় এগুলোর পরিপূরণ আবশ্যক। কিন্তু জীবনের গোটা বৈষয়িক দিকটি যেগুলো রক্ষা করবে, সেগুলো ব্যক্তি বা সমগ্রভাবে উম্মাহ্র আধ্যাত্মিক মর্মের উপায় বা বাহন মাত্র। বৈষয়িক অর্জনকে চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে গণ্য করার মানে হচ্ছে আধ্যাত্মিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করা।

এ হচ্ছে এরূপ দাবীরই নামান্তর যে, আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে একটি শূন্য বিষয়, আচার অনুষ্ঠান ও মনস্তাত্ত্বিক আত্মরূপান্তরের দেহ বিযুক্ত জীবন, যা বস্তুগত জীবন অনুসন্ধানের বিকল্প। ইসলামে আধ্যাত্মিক জীবন হচ্ছে তিনটি পর্যায়ের, যা একই সঙ্গে অনুসরণ করতে হবে। এর প্রথম পর্যায়টি হচ্ছে, উম্মাহ্র সাধারণ বৈষয়িক কাজকর্মে ব্যক্তির অংশগ্রহণ। এর মাধ্যমে মানুষের নিজের বৈষয়িক প্রয়োজনকে উম্মাহ্র কাজকর্মের প্রয়োজনের অধীনে স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে দুটি পর্যায়ে নিজের এবং অন্যদের শিক্ষার জন্য প্রয়াস; যেমন প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব মানুষের জন্য প্রকৃতির ব্যবহারকে অধিকতর সম্ভব এবং সহজসাধ্য করে তোলে; এবং ইজমা ইজতিহাদের দ্বান্দ্বিকতা হয়ে উঠতে পারে গতিশীল, সৃজনধর্মী এবং ঐশী অভিপ্রায়ের আরো উঁচু হতে উঁচুতর ক্ষমতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে। তৃতীয় স্তরটি হচ্ছে নন্দনতাত্ত্বিক সৃষ্টি, যাতে উম্মাহ্র আকুতি এবং জীবনরূপ পায়– কারণ উম্মাহ্ মূল্যবান বা ঐশী অভিপ্রায়কে বাস্তব এবং রূপায়িত করে তুলে ইতিহাসের পরিক্রমায়।

ইজমা ইজতিহাদের (উৎপাদনের মতৈক্য) দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে উম্মাহ্র প্রত্যেক সদস্যের জন্য এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করা যার বদৌলতে পূর্ণ আত্মপরিচয় অর্জন সম্ভব হয়।[৩১] আল্লাহর বান্দা হিসেবে কোনো ব্যক্তি তার পেশাকে উপলব্ধি করেনা, যদি না তার ব্যক্তিগত সম্ভাবনা ও ক্ষমতার চূড়ান্ত বিকাশ ও সম্ভাব্য পূর্ণতম ব্যবহার হয়। এধরনের ব্যক্তি নিজেকে অসুখী বলে মনে করবেনা এবং এধরনের ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি ব্যর্থ সমাজ হবেনা, কিন্তু মেধার পূর্ণ ব্যবহার না হলে, শক্তি অব্যবহৃত থাকলে এবং উৎসাহ উদ্দীপনা অপূর্ণ থাকলে, উম্মাহ্র গন্ডীর বাইরে আত্মউপলব্ধির প্রলোভন অথবা খিলাফতকে ক্ষতিগ্রস্থ এবং ব্যর্থ করার প্রবণতা থেকেই যাবে। খিলাফতকে দুটিই করতে হবে : "প্রয়োজন সৃষ্টি করা অর্থাৎ সদস্যদের মধ্যে সত্য সম্ভাবনা জাগ্রত করা এবং সেগুলোর পরিপূরণের উপায়ের ব্যবস্থা করা।" যদি পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে তা ব্যর্থ হয় সে পাবে এমন একটি উম্মাহ্ যা অজ্ঞ এবং অজাগ্রত ও অর্বাচীন লোকদের নিয়ে গঠিত, যদি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা ব্যর্থ হয়, তাহলে তা দেশ ত্যাগের

---

৩১. পাঠ কর তোমার রবের নামে যিনি স্রষ্টা (৯৬ : ১) ... পাঠ কর তোমার প্রভু মহিমান্বিত, তিনি লিখতে শিখিয়েছেন, তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে আগে কখনো জানতনা (৯৬ : ৩-৫)। মুমিনগণের একসঙ্গে যুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়, তাদের কিছু সংখ্যকের উচিত ধর্মের অনুসরণের জন্য এবং এর নিয়ম কানুন আদেশ নিষেধের চর্চার জন্য গৃহে অবস্থান করা কারণ তাদের সাথীরা যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে শিক্ষাদানের জন্য তদের প্রয়োজন হবে, যেন তারা পাপ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে (ধর্মের নির্দেশ মত) (৯ : ১২২)

www.icsbook.info

মাধ্যমে নিজেকে শূন্য ও ধ্বংস করার পথ উন্মুক্ত করে দেবে, অথবা অভ্যন্তরীণ নাশকতামূলক কাজের মাধ্যমে এবং বহি:শত্রুর আক্রমণ এবং বিদেশীদের শোষণের মাধ্যমে আত্মবিন্যাসের পথ উন্মুক্ত করে দেবে।

উৎপাদনের ঐকমত্য চরিতার্থ করার জন্য খেলাফত অবশ্যই উম্মাহ্কে ঐক্যবদ্ধ করবে, শত্রুর আক্রমণ থেকে উম্মাহ্র কার্যকর প্রতিরক্ষার জন্য, প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করবে।[৩২] কোনো সদস্যই স্বেচ্ছাসেবী নয়। বরং সকলেই বাধ্যতামূলকভাবে তালিকাবদ্ধ সৈনিক, যখন উম্মাহ্র মূল অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে, অথবা পৃথিবীতে আল্লাহর বাণীকে সবার উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাদের সার্ভিস প্রয়োজন।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ইজমা আল-আমালের এই দিকটির দ্বারাই উম্মাহ্র সর্বোচ্চ সাফল্য স্থিরীকৃত হয়, অর্থাৎ পৃথিবীকে ইসলামের জীবন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করায় এর অবদান নির্ণিত হয়। পেশা বা বৃত্তির এই দিকটি উম্মাহ্কে সেই স্তরে উন্নীত করে যেখানে পৌছানোর পর সে মানুষের ইতিহাসের এবং বিশ্ব ইতিহাসের মোকাবেলা করতে পারে। এই পর্যায়ে উম্মাহ্র সাফল্য হচ্ছে আল্লাহর দৃষ্টিতে উম্মাহ্র চূড়ান্ত যৌক্তিকতা।

২. তাওহীদ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা

ক. ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব ঃ দু:খজনক কতগুলো বাস্তবতা

মুসলিম বিশ্ব আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর কালামকে সবার উপরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি মহাসম্ভাবনাপূর্ণ শক্তি। কেননা এই মুহূর্তে মুসলিম বিশ্বে বাস করছে আটলান্টিক থেকে পূর্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে একশত কোটির বেশী মানুষ এবং তা এখন ইউরোপ এবং আমেরিকাতে শিকড় গাড়তে ও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। তার নিজের জন্য এবং পৃথিবীর জন্য একটি দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আল্লাহর অভিপ্রেত লক্ষ্যে মুসলিম বিশ্ব এখনো তার ক্ষমতার বিকাশ ও ব্যবহার থেকে দূরে। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম বিশ্ব তার নিজের ক্ষমতা, নিজের বিকাশের জন্য প্রয়োগ, স্বদেশে তার ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যর্থ প্রয়াস ও অমুসলমানদের স্বার্থে গঠনমূলক প্রচেষ্টায় সেই সব শক্তির অপচয়ের মধ্যে একটি অনিশ্চিত ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে।

মুসলিম দেশগুলোর সংবিধানের অধিকসংখ্যকই ঘোষণা করে যে, রাষ্ট্রের ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। কেবলমাত্র একটি দেশই, সৌদি আরব, এই ঘোষণাকে গুরুত্বের সঙ্গে ঘোষণা করেছে, যার লক্ষণ হচ্ছে রাষ্ট্রে শরীয়াহর কার্যকরণ। অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর কিছু সংখ্যকের, যেমন– পাকিস্তান ও কুয়েতের, স্থান এর পরেই, কারণ এই সব দেশের

---

৩২. তোমাদের সর্বশক্তি নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবার জন্য তৈরী হও। তোমাদের অশ্বারোহী যোদ্ধাগণকে এভাবে বিন্যস্ত কর, যাতে আল্লাহর শত্রুগণ এবং তোমাদের শত্রুগণ ভীত হয় এবং অন্যেরাও ভীত হয়, যাদের তোমরা হয়তো জাননা, কিন্তু আল্লাহ জানেন। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে যা কিছু ব্যয় কর, সমস্ত কিছুই তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তোমাদের পুরস্কারসহ এবং তোমাদের প্রতি অবিচার করা হবেনা (৮: ৬০)।

www.icsbook.info

সংবিধান ঘোষণা করেছে ইসলাম হচ্ছে রাষ্ট্রের এবং উম্মাহ্‌র মূল শর্ত। তবে এর সঙ্গে তারা যোগ করেছে পাশ্চাত্য বর্ণনামূলক এসব ধারণা যে, তারা যে জাতি বা রাষ্ট্র এর কারণ তারা একটি জাতি গোষ্ঠী, একটি অঞ্চল এবং সার্বভৌমত্ব সমবায়ে তাদের জাতি বা রাষ্ট্র গঠিত। এটি এমন একটি বিবেচনা যাতে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে ইসলাম অসম্পূর্ণ বলে গণ্য। তৃতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রয়েছে মিশর, মরক্কো এবং সুদান ইত্যাদি, যারা ইসলামকে কেকের উপর বরফের একটি আবশ্যক আস্তর বলে গণ্য করে, যে কেকটির অন্তর্গত কাঠামো এবং বিন্যাস গঠিত পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারণার দ্বারা, ইসলামী ধ্যান ধারণার দ্বারা নয়। জাতীয়তাবাদ নামক এক নতুন শুউবীয়া বা গোত্রবাদ পাশ্চাত্য ধরনের (রক্ত এবং মাংসের) রোমান্টিসিজম দ্বারা নির্ধারিত হয় অভিবাসন, এবং ন্যাচারালাইজেসনের আইন কানুন, নেতাদের সক্রিয় রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও অন্যান্য শিক্ষিত শ্রেণীর জীবন আচরণের রূপ এবং নিজেদের সামাজিক প্রতিকৃতি যা জনগণের শিক্ষা এবং প্রেরণার জন্য পরিকল্পিত ও প্রচারিত হচ্ছে। এমন কোন মুসলমান দেশই নেই যা মদীনায় রাসূলুল্লাহর সমগ্র সময়ে মহানবীর সমাজ যে নিরবিচ্ছিন্ন মবিলাইজেশন ও সতর্ক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে সেই মবিলাইজেশন ও সতর্কতার মধ্যে নিজেকে পরিচালিত করেছে। এবং সম্ভবত মুসলিম বিশ্বের সবচাইতে নিকৃষ্ট দিক হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে তার দেউলিয়াপনা। এমন কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সবচাইতে নিকৃষ্ট দিক হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে তার দেউলিয়াপনা। এমন কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব কোথাও নেই যা পাঁচ বছর বয়স্ক মুসলিম শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং তার সম্ভাবনাপূর্ণ বিকাশে তাকে উম্মাহ্‌র নিকট প্রত্যর্পণ করে। পৃথিবীকে রূপান্তরিত করার জন্য মুসলিমদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের কোন সুযোগ সুবিধা আমাদের নেই সে সুযোগ সুবিধা নেই ঐশী নক্সার আদলে উপাদান উপকরণকে রূপ দেওয়ার এই চেতনায় যে, সেই ঐশী নক্সাই হচ্ছে তার ব্যক্তিগত জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। পি. এইচ, ডি অথবা এম. ডি, গ্রাজুয়েটদের মোট সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষিত ইমিগ্রান্ট এবং হতাশ বসবাসকারীদের হার ভয়ংকরভাবে অনেক উচ্চে, এর পরিসরে অন্যপ্রান্তে শিক্ষিতদের সঙ্গে অশিক্ষিতদের সর্বোচ্চ হার আতংকজনক।

মুসলমানরা যে দীর্ঘদিনের নিদ্রা থেকে জেগে উঠতে শুরু করেছে তাতে বিচলিত হবার কিছু নেই। তাদের সমাজগুলো আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে যে দুর্বল অথবা তাদের রাষ্ট্রগুলো যে নিষ্ক্রীয়তা ও আলস্য থেকে পৃথক ধ্বনি তুলে এলোমেলোভাবে পা ফেলে দাঁড়াচ্ছে তাতেও বিচলিত হবার কিছু নেই। বিচলিত হবার বিষয় হচ্ছে উম্মাহ্‌র এই মুহূর্তে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের এই সন্ধিকালে মুসলিম নেতাদের উম্মাহ্ সম্পর্কে দূরদৃষ্টির অভাব। আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে এই দূরদৃষ্টির অভাবের ফল এবং ইসলামী নাগরিকদের গড়ে তোলার চেষ্টার সম্পূর্ণ অভাব, যে নাগরিকেরা ইসলামী আদর্শের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কারণ সে একবিংশ শতাব্দীতে নিজের পরিচয় সম্পর্ক সজাগ।

www.icsbook.info

খ. রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিশ্রুতি

কোনো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুসলিমই এই শতাব্দীতে উম্মাহ্‌র দুঃখজনক ব্যর্থতাগুলো সম্পর্কে মুসলিম রাজনৈতিক নেতারা সাধারণত যে সব কৈফিয়ত দিয়ে থাকেন, সেগুলো বোঝেনা বা গ্রহণ করেনা এবং কেউ এ যুক্তি গ্রহণ করেনা যে, খিলাফতের নেতাদের উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বেই জনতার মধ্য থেকেই আসতে হবে। যে এলিট শ্রেণীর এ বিষয়ে উৎকৃষ্টতর জ্ঞান আছে নিশ্চয়ই তাদের অস্তিত্ব রয়েছে এবং তারা সংখ্যায় প্রচুর। ইতিহাসের এই মুহূর্তে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, মুসলিম উম্মায় ইচ্ছা-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তাকে গতিশীল করে তোলা। এবং কেবল তখনই তা সম্ভবপর হতে পারে, যখন নেতারা প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন, কর্তা হিসেবে ইতিহাসের গতিধারায় হস্তক্ষেপের বিপজ্জনক ভূমিকায়, এর বোগী বা কর্ম (object) হিসেবে নয়।[৩৩]

মুসলিম উম্মাহ্ কর্তৃক ইতিহাসের হস্তক্ষেপের সূচনা হয় গৃহেই, খিলাফতকে নির্মাণ করার ধৈর্য্যপূর্ণ অবিচলিত প্রয়াসের মাধ্যমে যা বর্তমান কোন মুসলিম রাষ্ট্রেই বিদ্যমান রয়েছে বলে মনে হয়না। যেখানে নোঙ্গর ফেলতে হবে তার একটি সাময়িক বুনিয়াদ সম্পর্কে নিশ্চিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই খিলাফতকে অবশ্যই সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে মবিলাইজ করার জন্য চেষ্টিত হতে হবে, এবং মার্চ করে অগ্রসর হবার জন্য ডাক দিতে হবে। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য খোদ খিলাফতের বিলুপ্তি ছাড়া তার কোন প্রয়াসই বাহুল্য বলে গণ্য হওয়া উচিত নয়। খিলাফতের কর্মচারী ও পরিচালকদেরকে কোরবান করা যেতে পারে বা কোরবানী করা উচিত, যদি কোরবানী ছাড়া অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রগতি সম্ভব না হয়। যে মুহূর্তে উম্মাহ্ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াবে সেই মুহূর্তে আবু বকরের খিলাফত আবার আয়ত্বে এসে যাবে আর তা হবে সর্বকালের মহত্তম মুহূর্ত।

---

৩৩. (হে বিশ্বাসীগণ) আল্লাহ যা ইতিহাসেই নির্ধারণ করেছেন তা ছাড়া আর কিছুই তোমাদের উপর আপতিত হবেনা, তিনি আমাদের রব, আমরা মুমিনগণ সবসময়ই তার উপর নির্ভর করবো। বল তোমরা কি আমাদের জন্য দুটি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষা করছো (শাহাদাত এবং জান্নাত, অথবা যুদ্ধে বেঁচে থাকা এবং শত্রুর উপর বিজয়) এবং আমরা প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দিবেন সরাসরি নিজ পক্ষ হতে অথবা আমাদের হস্তের দ্বারা (৯: ৫১-৫২)।

www.icsbook.info

একাদশ অধ্যায়

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলনীতি

পাকিস্তানের আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ ইকবাল, আধুনিক কালে ইসলামের নামে সর্ব প্রথম এই দাবীর জন্য সম্মানিত যে, "রাজনৈতিক ক্রিয়াকান্ড হচ্ছে ইসলামের আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তি"।[১] তখন থেকে বিশ্বব্যাপী মুসলমানেরা এই সত্যের ব্যাপারে নিজেরা প্রত্যয়শীল হয়েছে এবং সর্বদা ইকবালের এই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করে চলেছে গর্বের সঙ্গে। ইসলামের নামে ইকবালের সমমযাদা সম্পন্ন একজন ইসলামী চিন্তাবিদের স্থান এখনো শূন্য রয়েছে, যিনি দাবী করবেন "অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ড হচ্ছে ইসলামে আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তি।" মুসলমানরা তখন এই নতুন সত্য সম্পর্কে সহজেই প্রত্যয়শীল হয়ে উঠবে, যেমন তারা প্রত্যয়শীল হয়ে উঠেছিলো ইকবালের বক্তব্য সম্পর্কে। এই পয়েন্ট তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবেনা, যেমনটি তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি ইকবালের উক্তির বিষয়বস্তুটি। অন্য কথায়, খৃষ্টান ধর্ম যেখানে চার্চ ও ষ্টেটের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, সেক্ষেত্রে ইসলাম ঘোষণা করে চার্চের দাবী হচ্ছে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, এবং তার সুস্বাস্থ্য হচ্ছে ধর্মের সার নির্যাস, আর একইভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডও। উম্মাহ্‌র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং তার উত্তম স্বাস্থ্য হচ্ছে ইসলামের সারকথা।[২] ঠিক যেমন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে বাদ দিলে ইসলামের আধ্যাত্মিকতার অস্তিত্ব থাকেনা।[৩]

ইসলামের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য অন্য সকল ধর্ম থেকে ইসলাম স্বতন্ত্র্য; কেননা ইসলামের মত আর কোন ধর্ম এত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়ভাবে রাজনৈতিক ক্রিয়াকান্ডের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেনি, প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়া ছাড়া, যেখানে রাজতন্ত্র হচ্ছে পবিত্র। কিন্তু এগুলো প্যাগান বা পৌত্তলিক বলে নিন্দিত। একইভাবে, ইসলামের মত আর কোন ধর্ম নিজেকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত করেনি

---

১. M. Iqbal. Reconstruction of Religious *Thought in Islam* (Labore : Sh. Muhammad Asraf. 1977) Lecture V.

২. স্মরণ কর যে, আদ জাতির পতনের পর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি করেছিলেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তোমাদেরকে ক্ষমতা দিয়েছিলেন এর সমতল অঞ্চগুলোতে চাষাবাদ করতে, প্রাসাদ তৈরী করতে ও বসবাসের জন্য খোদাই করতে। স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে যে নিয়ামত দিয়েছিলেন সেগুলোর কথা। তোমরা দূর্নীতি বিস্তার করোনা এবং পৃথিবীকে কলুষিত করোনা (৭ : ৭৪) ... হে কওম কেবল আল্লাহর ইবাদত করো, আল্লাহ ছাড়া কোন ইল্লাহ নেই। তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং জমিনে বসবাস করতে দিয়েছেন। অতএব তার নিকট তোমরা অনুশোচনা কর এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর (১১ : ৬১)।

৩. তাদের সম্পদে (ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা) দরিদ্র এবং বঞ্চিতজনের হক স্বীকার কর (১১ : ১৯) ... তোমরা কি দ্বীন বা হিসাব নিকাশ যে অস্বীকার করে তার কথা বিবেচনা করে দেখেছো? সেইত এতিমকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, সেইত মিসকিনকে অনুদানে উৎসাহিত করেনা (১০৭ : ১-৩)।

www.icsbook.info

কমিউনিজম ছাড়া, যেখানে বস্তু স্থান গ্রহণ করেছে আল্লাহর, আর এটি এমন একটি আদর্শ যাকে মুসলমানরা এক ধরনের শিরক বলে নিন্দা করে থাকে। এ কথা সত্য, ইসলাম বিপজ্জনকভাবে এই দুই চরম অবস্থার কাছাকাছি অবস্থান গ্রহণ করে, কিন্তু ইসলাম এদের থেকে এতটা স্পষ্টভাবেই স্বতন্ত্র যে এর সান্নিধ্যে মোটেই কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেনা। রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিষয়ে আলোচিত পূর্ববর্তী অধ্যায়ের মত এই অধ্যায়টি স্পষ্ট করে তুলতে চায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে তৌহীদের অপরিহার্য সম্পর্কটি, যে সম্পর্ক গঠন করে ইসলামের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সার নির্যাস।[৪]

১. বস্তু ও আধ্যাত্মিকতার অপরিহার্য যুগ্ম অগ্রাধিকার

ক. খ্রীষ্টান ধর্ম থেকে ভিন্নরূপে

মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এর কয়েক শতাব্দী পূর্বে হযরত ঈসা একটি ঐশী বাণী প্রচার করেছিলেন, যাতে মানুষ কেবল উদরপূর্তি করে বাঁচেনা, এই পরম গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি ব্যক্ত হয়।[৫] ম্যাথু এবং লুক, যারা গস্‌পেলগুলো লিখেছিলেন, তাঁরা হযরত ঈসার এই বক্তব্যকে শয়তানের একটি প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন, যে আল্লাহর তথাকথিত পুত্র হিসেবে সে হযরত ঈসার ক্ষমতাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিল, যেন তিনি এক দুর্বল মুহূর্তে মরুভূমির পাথরগুলোকে রুটিতে পরিণত করেন, কেননা বিরাট প্রান্তরে চল্লিশ দিন উপবাস করার পর তিনি তখন ক্ষুধার্ত। এই উক্তিটিকে হযরত ঈসাকে আল্লাহর পুত্র হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিতকরণ এমনই অবান্তর যে, এতে করে মূল বক্তব্যটি থেকে আমাদের মনোযোগ অন্যত্র সরানোর কোন প্রয়োজনই হয়না, কারণ শয়তানের এ চ্যালেঞ্জ ব্যতিরেকেও বক্তব্যটি সুন্দর এবং বৈধ যে মানুষটি চল্লিশ দিন উপবাস করেছে কূলে ম্যাথু কোন অতিরঞ্জন না করে দাবী করেছেন, তার জন্য রেডিমেড রুটি হবে চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ, আল্লাহর পুত্রত্ব নয়। হযরত ঈসার যে জবাব তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন, তা মানুষ কেবল রুটি খেয়ে বেঁচে থাকে–একথার সরাসরি প্রত্যাখান নয়, বরং শর্তযুক্ত এই দাবীরই অস্বীকৃতি যে মানুষ কেবল ভাত রুটি খেয়ে বেঁচে থাকে।

হযরত ঈসার প্রত্যাখান যদি বৈষয়িক জীবনের সরাসরি প্রত্যাখ্যান হতো তেমন অবস্থায় এই ঘোষণা কোন সেমেটিক মনের ঘোষণা হতে পারতোনা। বরং তা হতো একটি হেলেনিক মনের রায়, এবং সম্পূর্ণভাবে নিজেরই বিরুদ্ধ-মান-দীক্ষিত, কারণ, হোমারিক মন প্রথমে প্রকৃতির সঙ্গে ঐশী সত্ত্বাকে অভিন্ন কল্পনা করে এবং তৎপর

---

৪. আমরা এই আয়াতগুলো উদ্ধৃত করছি, এসবের প্রভূত গুরুত্বের জন্য। এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, আয়াতগুলো ঘোষণা করে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া, দরিদ্রকে খাদ্য দানের সাহায্য না করার অর্থই হচ্ছে খোদ দ্বীনকে অস্বীকার করা, সমগ্র দ্বীনকে মতবাদ, মূলমন্ত্র, নীতিদর্শন, বিধি বিধান, সারনির্যাস– সমস্ত কিছুই।

৫. কিন্তু হযরত ঈসা (আ.) জবাব দিলেন, 'কিতাব বলে, মানুষ কেবল রুটি খেয়ে বেঁচে থাকেনা, বরং আল্লাহ যা বলেন, তার প্রত্যেকটি শব্দ তার জন্য প্রয়োজন' (ম্যাথু ৪ : ৪)।

www.icsbook.info

নিজের সৃষ্টির ব্যাপারে হতাশ হয়ে নিজের বিরুদ্ধেই দন্ডায়মান হয় সম্পূর্ণ বিপরীত গ্নাষ্টিসিজমে (Gnosticism) এবং দাবী করে যে, প্রকৃতি ও বস্তুর সম্পূর্ণ বিরোধী হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা।[৬] গসপেলের অন্যান্য যে সব অনুচ্ছেদে বস্তুজগতের এ ধরনের নিন্দা ব্যক্ত হয়েছে, যেমন ম্যাথু ৬:১১ (সংকলিত), সেগুলো নির্দেশিত হয়েছিলো গ্নষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা, অবশ্য সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটিতে দ্বীন-আল-ফিতরাতের বৈশিষ্ট্যসূচক একটি নৈতিক ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে, কারণ এতে বস্তুর নিন্দা করা হয়নি, বরং নৈতিকতার লংঘনকে নিন্দা করা হয়েছে। এতে সরাসরি এ দাবী অস্বীকৃত হয়েছে যে, মানুষ কেবল ভাত রুটি খেয়ে বেঁচে থাকে। সে কারণে এতে আমরা দেখতে পাই এক হেলেনিক জগতে একটি বিশেষ সেমেটিক সম্ভবতঃ নবুয়তি মনোভঙ্গির প্রকাশ।

অবশ্য খ্রীষ্টান ইতিহাসবিদদের হাতে হযরত ঈসার এই বক্তব্যটি বস্তুবাদ বিরোধী একটি আদর্শের ভিত্তি হয়ে দাড়ায়। ক্রমে তা হয়ে উঠে বস্তু, বিশ্বজগৎ এবং ইতিহাসের সম্পূর্ণ নিন্দা। এই ইতিহাস গড়ে তুলে সন্যাসবাদ, রাজনৈতিক বৈরাগ্যবাদ ও কৃচ্ছব্রতের এক মানব সংসর্গ বর্জনকারী নৈতিকতা, কালে তা হয়ে উঠলো এক নতুন ধার্মিকতার রণহুংকার যা হযরত ঈসার ধর্মকে রূপান্তরিত করলো খ্রীষ্টবাদে-ইমপেরিয়াল রোমান চার্চের পল, আথানাসিয়ূসা, তার্তুলিয়ান এবং অগাষ্টিনের ধর্মে।[৭]

হযরত ঈসাকে পাঠানো হয়েছিলো ইহুদীদের কাছে, তাদের ডাহা বস্তুবাদের বিলোপ সাধনের জন্য এবং তাদেরকে তাদের রাব্বিরা আইনের যে কঠোর নিগড়ে বন্দী করেছিলো তা থেকে মুক্ত করার জন্য। তাই তার সমাধানে আধ্যাত্মিকতার উপর, অভ্যন্তরীণ ও ব্যক্তিগত উপলব্ধির উপর নতুন করে গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক হয়ে পড়েছিলো, কেননা রাব্বিদের আক্ষরিক রক্ষণশীলতার কারণে এগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছিলো বা লোপ পেয়ে গিয়েছিলো। তাঁর অনুসারীগণ তাঁর প্রচারিত আদর্শকে বিকৃত করে, আরেক চূড়ান্ত রূপ দেয় যার ভিত্তি হচ্ছে বস্তু, বহির্জগত, পাবলিক ও সামাজিক জীবনের অধঃপতন ঘটানোর উপর। এই আন্দোলনের অপব্যবহৃত, অস্থানে স্থাপিত মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ালো মানুষ কেবল ভাত রুটি খেয়ে বাঁচেনা, এই বক্তব্য।

খ. ইসলামের জবাব

১. ইসলাম এবং বিভিন্ন ধর্ম

বিস্তৃততর বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবী যে অনড় স্থবিরতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ইসলাম প্রকৃতপক্ষেই তার ব্যূহভেদ করে তা অতিক্রম করে যায়, কেননা পৃথিবী তখন বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো ভারতীয় ধার্মিকতা এবং হেলেনীয় ধার্মিকতার মধ্যে। ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব দাবী করে বিশ্বব্রহ্মান্ড নিজেই পরম সত্য (ব্রাহ্মণ), তার আদর্শরূপে নয় বরং তার বাস্ত বায়িতরূপে, ব্যক্তিরূপে এবং বিশেষরূপে যা ইসলামের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত।[৮] পরমাত্মা

---

৬. Hans Jonas.*The Gnostic Religions* (Boston Beacon Press 1958). p-46

৭. দেখুন গ্রন্থকারের *Cristian Ethics*. part-11.

৮. Ismail R. al Faruqi, *Historical Atlas....* পৃষ্ঠা ২৩৭-৮

www.icsbook.info

ব্রহ্মণের বাস্তবরূপ বাস্তবায়ন অবাঞ্চনীয়। পরিণামে ধর্মীয় নৈতিক নির্দেশ গণ্য হল সৃষ্টির বাস্তব জগত থেকে পরিত্রাণ লাভ, যেহেতু বাস্তব সৃষ্টিজগত মন্দ রূপে বলেই তা নিন্দনীয়। পরম ব্রহ্মাতে নির্বানই পরিত্রাণ বয়ে আনে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, বস্তুজগতের অনুশীলন, অর্থাৎ প্রজনন, খাদ্য ও শিক্ষার জন্য মানুষের মোবিলাইজেশন, যাতে করে পৃথিবীকে বাগানে সুশোভিত করা হয় এবং ইতিহাস নির্মিত হয়, এ সবই হবে, নিশ্চিতভাবে পাপকর্ম, কেননা এতে করে সৃষ্টিকর্ম সম্প্রসারিত, গভীর বা প্রলম্বিত হয়। স্পষ্টতই এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যা খাপ খায় তা হচ্ছে ব্যক্তিতান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম এবং সংসার বৈরাগ। উপনিষদের এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিকে জৈন মতবাদ এবং থার্বেদা বৌদ্ধ ধর্ম অবিচলিতভাবে অনুশীলন করে আসছে।[৯] হিন্দুধর্ম এই দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে অভিজাত বা উচ্চ বর্ণের হিতের জন্য। এ ধর্ম একটি লোকপ্রিয় ধর্মতান্ত্রিকতা প্রচার করে যাতে বর্ণেতর শ্রেণীর লোকগুলো কেবলমাত্র পরবর্তী জীবনে তাদের দুঃখ-লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাবার আশা করতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে তাদেরকে তাদের জীবনের নির্দিষ্ট অবস্থানে থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিশ্রম করতে হবে তারা যে তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য পূরণ করছে তজ্জন্য কোন আনন্দ বা তৃপ্তি এ জীবনে ভোগ না করেই।[১০] অনুরূপভাবে, মহাযন বৌদ্ধধর্ম এই দৃষ্টিভঙ্গিকে রেখেছে পটভূমিতে এবং তার ধর্মতান্ত্রিকতাকে গড়ে তুলেছে চৈনিত-জাগতিক নৈতিকতার ভিত্তিতে এবং বোধীসত্তগণকে (মানবিক পূর্ব পুরুষ, যাদেরকে ত্রাণকর্তায় রূপান্তরিত করা হয়েছে) নিয়োগ করেছে জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা থেকে মানুষকে ত্রাণ করার জন্য।[১১]

হেলেনিজমের মধ্যে মিশরীয় এবং গ্রীক ধর্মের ও মিত্রইজম ও নিকটপ্রাচ্যের রহস্য-সর্বস্ব কাল্টগুলোর উপাদানসমূহ মিশিয়ে হেলেনিজম হযরত ঈসার সেমেটিক আন্দোলনকে গ্রাস করে যে আন্দোলন ইহুদী ধর্মের আইনগত কাঠিন্য এবং নৃতত্ত্ব-কেন্দ্রীয়তাকে সংস্কার করতে চেয়েছিলো। একারণে, যে গ্রীক-মিশরীয় উপাদান জগতের সঙ্গে আল্লাহকে অভিন্ন গণ্য করেছিলো, তা রেখে দেওয়া হল, কিন্তু তাকে সংশোধন করে অবতারবাদের মতবাদের রূপ দেওয়া হল। এই মতবাদে আল্লাহ হয়ে উঠলেন মানুষ এবং মানুষকে দিল আল্লাহর সঙ্গে অংশগ্রহণের ক্ষমতা। আর একারণেই সাম্রাজ্যের দলিত জনসমাজের প্রতি সৃষ্টি হল বিতৃষ্ণা ও তাচ্ছিল্য, বস্তু এবং বিশ্বের নষ্টিক ঘৃণা এবং মিত্রইজম ও ইহুদীবাদের পরিত্রাণ বিষয়ক প্রত্যাশা। এসব কিছু মিলে ঐতিহাসিক খৃষ্টান ধর্মকে দিল তার এই রায় যে, সৃষ্টি হচ্ছে পতিত, পৃথিবী হচ্ছে মন্দ, রাষ্ট্র ও সমাজ হচ্ছে শয়তানের কর্মকান্ড এবং নৈতিক জীবন হচ্ছে ব্যক্তিগত ও বিশ্বের সঙ্গে তা কোন সম্পর্ক রাখেনা।[১২]

---

৯. ঐ।
১০. *Nos: Man's Religions* পৃষ্ঠা ১০৩-৪.
১১. ঐ, পৃষ্ঠা ১৫৫।
১২. দেখুন এই গ্রন্থকারের *Christian Ethics*, pp. 193 ff.

www.icsbook.info

ইসলাম এ ব্যাপারে যে স্বচ্ছতা অর্জন করে তা জীবনপ্রদ। এতে করে ভারত এবং মিশর উভয়ের এই দাবীকে পরিহার করে যে, ব্রহ্ম এবং পৃথিবী এক. স্রষ্টা ও সৃষ্টি অভিন্ন-তা মিশর এবং প্রাচীন-গ্রীসের মত সৃষ্টির স্বার্থেই হউক এবং ভারতের মত স্রষ্ঠার প্রয়োজনেই হউক। এতে করে মেসোপটেমিয়ার যে দৃষ্টিভঙ্গি স্রষ্টা ও সৃষ্টির এবং আল্লাহর জমিনে ভৃত্য হিসেবে মানুষের একান্ত প্রয়াসের কথা বলে, তার ফলে উপকৃত হয় ইতিহাস, তাই ইতিহাস আবার নতুন করে সমর্থন পেল। ইসলাম এতে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করে এই প্রাচীন প্রজ্ঞা, যাকে কুরআন বলেছে দীনুউল ফিতরাত, তারই স্বরূপ বা রূপায়ণ হিসেবে।[১৩]

এই পটভূমিকাতেই রাসূলুল্লাহ (সা.) কে প্রতিষ্ঠিত করেন আল্লাহ ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য এবং বস্তু ও আত্মার মধ্যে সঠিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য। আমাদের নবী (সা.) কী শিক্ষা দিয়েছিলেন, তিনি যে বাণী পেশ করলেন তার সার নির্যাস কী ছিলো?

২. তাওহীদের তাৎপর্য : জাগতিকতাবাদ

চলুন আমরা শুরুতেই ইসলামের মৌল নীতিমালার দিকে বা তার ধারণাগুলোর দিকে তাকাই। ইসলামের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সার হচ্ছে তৌহীদ, অর্থাৎ এই স্বীকৃতি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ)। পরাতাত্ত্বিক বা অধিবিদ্যার মৌলনীতি হিসেবে, তৌহীদের, বিশেষ করে ইসলামী বৈশিষ্ট্যটির সেকারণে নতুনত্ব হচ্ছে এই বিবৃতির নেতিবাচক দিক। যার প্রতি উলুহিয়ত বা প্রভূত্ব আরোপিত, সে আল্লাহ নয়, 'আল্লাহ ছাড়া' এই ঘোষণাটি ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং প্রাকইসলামী আরবদের আল্লাহর সহিত শরীক করার মূলে আঘাত করে। এতে করে ইসলাম নতুন উদ্দেশ্য সাধন করে : সেটি এই স্বীকৃতি যে, আল্লাহই হচ্ছেন বিশ্বজগতের একমাত্র স্রষ্টা এবং এই সাম্য প্রবর্তন যে, সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা, সকলেরই রয়েছে সৃষ্টিসূলভ মনুষ্যত্বের একই রূপ, মৌলিক গুণাবলী এবং একই জাগতিক মর্যাদা।

তাওহীদের রয়েছে আরো একটি দিক-মূল্যতাত্ত্বিক দিক। লাইলাহা ইল্লাল্লাহ-এ দাবার অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন একমাত্র এবং চূড়ান্ত মূল্যের উৎস, আর সব কিছুই হচ্ছে উপকরণ, যার মূল্য নির্ভর করে আল্লাহর বিচারে এর মূল্যত্বের উপর, যার কল্যাণকরত্বের পরিমাপ হয় চূড়ান্ত ঐশী শুভত্বের বাস্তবায়ন দ্বারা। এর অর্থ এই যে, আল্লাহ হচ্ছেন সকল কামনা বাসনার চূড়ান্ত লক্ষ্য। তিনি এক, কেবলই একক প্রভূ। যাঁর অভিপ্রায়, যা কিছু অস্তিত্বশীল সে সমস্ত ঔচিত্যই হচ্ছে তার অভিপ্রায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ হচ্ছে একজন ভৃত্য, যার পেশা এবং ভাগ্য হচ্ছে আল্লাহর দাসত্ব, বা ঐশী অভিপ্রায় পূরণ, অন্য কথায় দেশকালের মধ্যে মূল্যের বাস্তবায়ন।

---

১৩. তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর, আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর প্রকৃতির কোন পরিবর্তন নেই। এই হচ্ছে সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা (৩০-৩০)।

www.icsbook.info

নিশ্চয়ই পূর্বেও আল্লাহকে মানুষ ভালবেসেছে এবং তাকে মান্য করেছে। অবশ্য ভারতীয় ধর্মে তাঁকে নৈব্যক্তিক ব্রহ্মারূপে মানুষ ভালবেসেছে এবং মান্য করেছে, বস্তু জগতের বিপরীত হিসেবে এবং এভাবে জগতকে অস্বীকৃতির মাধ্যমে। মিশরীয় এবং গ্রীক ধর্মে আল্লাহকে লোকে ভালবেসেছে এবং মান্য করেছে, খোদ বস্তুজগত হিসেবে এবং সে কারণে জাগতিক পেশার সাথে সংগতি স্থাপনের মাধ্যমে। কেবলমাত্র ধর্মের সেমেটিক প্রবাহেই মানুষ আল্লাহকে ভালবেসেছে এবং মান্য করেছে অ-প্রকৃতি, এবং বস্তুর নির্বস্তুক প্রভু হিসেবে। কিন্তু সেমেটিক প্রবাহটি রাব্বি নিয়ন্ত্রিত ইহুদী মতবাদে, বন্ধ জলায় নতুন চিন্তাভাবনার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। আরবদেশে নিজেকে নিঃশেষ করেছে রোমান্টিকতা ও সুখবাদের মধ্যে এবং মিত্রইজম ও হেলেনিজিমের সঙ্গে মিশিয়ে গঠন করেছে রোমান খ্রীষ্টিয় ধর্ম, হযরত ঈসার মুক্তি আনয়নকারী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ থেকে।[১৪] তাই সেমেটিক প্রবাহকে তার মৌলিক অবস্থায় পুনরায় স্থাপনের জন্য তৌহীদ ছিল অপরিহার্য অর্থাৎ সৃষ্টি অথবা দেশকাল যে মাধ্যম, যে উপকরণ যার মধ্যে ঐশী অভিপ্রায় হবে বাস্তবায়িত। নিশ্চয়ই তা শুভ এবং তার শুভত্ব হচ্ছে মৌলিক পদার্থের শুভত্ব, যা ঐশী অভিপ্রায়ের অবয়ব নির্মাণ বা কংক্রিট রূপদানের জন্য অপরিহার্য রঙ্গমঞ্চ। তাই সৃষ্টির প্রত্যেকটি উপাদানই শুভ এবং সম্ভাব্য সকল বিশ্বের মধ্যে সৃষ্টি সর্বোত্তম, কেবল তাই নয়, ইহা ত্রুটিশূন্য এবং নিখুঁত।[১৫] আসলে নৈতিক দৃষ্টি এবং ক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ যখন সৃষ্টিকে মূল্যায়ন দ্বারা পরিপূরণ করে, তখন তাই হয়ে উঠে সৃষ্টির ঐশী লক্ষ্য[১৬] তাই এর ফলে সৃষ্টির উপাদান বা উপাদানজাত অথবা হিতকরী মূল্যগুলোর উপভোগ নির্দোষ। মূল্যময় জগত হচ্ছে আল্লাহর একটি মনুমেন্ট, মানুষের পক্ষে যার সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ হচ্ছে প্রশংসা এবং ইবাদতের কাজ।[১৭]

---

১৪. দেখুন গ্রন্থাকারের *"Urubbbah and Religions."* 198 ff.

১৫. তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যখন তার আরশ পানির উপর ছিলো, তখন তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, যেন মানুষেরা তাদের আচরণে নিজেদেরকে যোগ্য প্রমাণ করতে পারে (১১:৭) তিনি সৃষ্টি করেছেন জন্ম এবং মৃত্যু যাতে তোমরা তোমাদের আচরণে তোমাদের স্বার্থকতা প্রমাণ করতে পার। তিনি মহা মহিমান্বিত, ক্ষমাশীল। তিনি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন; আবার তুমি তাকিয়ে দেখো, তুমি কোন একটি খুঁত দেখতে পাবেনা, কখনো তুমি কোন ত্রুটি দেখতে পাবেনা। অত:পর তুমি বার বার তাকাও, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে। আল্লাহর সৃষ্টি ত্রুটিমুক্ত সে সম্পর্কে অধিকতর প্রজ্ঞার অধিকারী হও (৬৭ : ৩-৪)।

১৬. তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে এবং যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য তোমাদের কতককে অন্যদের উর মর্যাদায় উন্নত করেছেন। তোমার প্রতিপ্রালক শাস্তিদানে সত্বর এবং তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময় (৬ : ১৬৫৪)।

১৭. আল্লাহ সমুদ্রকে তোমাদের বশীভূত করেছেন, যেন তোমাদের জাহাজগুলো তাঁর অনুমতিক্রমে সমুদ্র অতিক্রম করতে পারে, যেন তোমরা তার নিয়ামত অর্জন করতে পার এবং তোমরা কৃতজ্ঞ হও, নভোমন্ডলে যা কিছু আছে সব কিছু তোমাদের বশীভূত করেছেন, জমিনে যা কিছু আছে সমস্ত তোমাদের প্রতি তার দান, এতে যারা চিন্তাভাবনা করে, তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে (৪৫ : ১২-১৩)। একইভাবে (এই সমস্ত জিনিস) তিনি তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন যেন তোমরা তাঁর মহিমা কীর্তন করতে পার তাঁর হেদায়াতে বা পথ প্রদর্শনের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে পার, যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য সুখবর ঘোষণা করতে পার (২২ : ৩৭) তোমরা কি দেখনা,

www.icsbook.info

পরম সত্যের বাস্তবায়নের জন্য উপকরণ হিসেবে সৃষ্টির প্রত্যেকটি বস্তুকেই দেওয়া হয়েছে উচ্চতর জাগতিক মূল্য। ঠিক যেমন দেশকালের বিভিন্ন বিন্দুর মধ্যে কোন বৈষম্য থাকতে পারেনা, কেবলমাত্র আল্লাহ এই জগতকে মানুষ কর্তৃক রূপান্তরের জন্য যে প্যাটার্ণ ঠিক করে দিয়েছেন, তার উপকরণ হিসেবে এসবের ব্যবহার ব্যতীত, বস্তুজগতের কোন কিছুই মূলত মন্দ নয়।[১৮]

ইসলামের আরো দুটি মূলনীতিঃ ইসলাম জাগতিকভাবে প্রস্তাবকে প্রমাণ করেন ইসলামের কর্মের নৈতিকতা এবং তার পরলোকতত্ত্ব।

ক. জাগতিকতা ও কর্মের নৈতিকতা

তৌহীদ মানুষকে কর্মের নৈতিকতায় অঙ্গীকারাবদ্ধ করে, এমন একটি নৈতিকতা যেখানে সাফল্যের মাত্রার দ্বারা পরিমাপ হয়, কোন কর্ম সার্থক কিংবা অসার্থক কিনা এই নৈতিকতার বিচারে। নৈতিকতাসম্পন্ন কোন মানুষ তার শরীরে এবং তার পরিবেশে দেশ কালের স্রোতকে মোকাবেলা করতে গিয়ে তার দ্বারা সে সাফল্য অর্জন করে। তৌহীদ নিয়্যাতের নৈতিকতা অস্বীকার করেনা, বরং দাবী করে যে, প্রারম্ভিক শর্তগুলো পূরণ করতে হবে কর্মের নৈতিকতা পূরণের প্রয়াসে প্রবেশ করার জন্য। তাই দেশকালের স্রোতে বাধা প্রদান অথবা সৃষ্টির রূপান্তর হচ্ছে প্রত্যেক মুসলিমের নৈতিক কর্তব্য। তাকে অবশ্যই ইতিহাসের এবড়োথেবড়ো অবস্থায় প্রবেশ করতে হবে এবং আনতে হবে বাঞ্ছিত রূপান্তর। আত্মশৃংখলা এবং আত্মকর্তৃত্বের অনুশীলন ছাড়া সে সন্যাসীর গৃহত্যাগী জীবন যাপন করতে পারেনা। তেমন অবস্থায় দেশকালের রপান্তর সাধনে বৃহত্তর সাফল্য অর্জনের জন্য এই অনুশীলন অনুকূল না হলে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হবে অনৈতিক আত্মকেন্দ্রিকতা, কেননা সে অবস্থায় লক্ষ্য হয়ে উঠবে কেবলমাত্র আত্মরূপান্তর- বিশ্বকে রূপান্তরিত করার প্রস্তুতি হিসেবে নয়। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্ম থেকে ছুটি নিতেন, নিজেকে সবার থেকে আলাদা করে জীবনকে নিয়মানুবর্তি করতেন, বিশেষ করে ওহী লাভের পূর্বে। অবশ্যই একথা বলা যায় যে, তাঁর তাহানুসের শীর্ষবিন্দু ছিল ওহী লাভ। সুফিগণ দাবী করেস, মহানবী হেরা গুহায় আল্লাহর সঙ্গে যে সংযোগ স্থাপন করেন তা মানুষের পার্থিব জীবনে সম্ভাব্য উচ্চতম অর্জন এবং গুহা থেকে যে তিনি মক্কায় নেমে এলেন তা ছিল একটি অবতরণ। কিন্তু আমরা জানি যে, আল্লাহই তাকে আদেশ করেছিলেন, কেবল অবতরণ করতে নয়, তাঁর বিরোধীগণ যখন তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছিলো তখন তিনি চাতুর্যের সঙ্গে তাদেরকে ব্যর্থ করে দিয়ে একটি সম্প্রদায় গড়ে তোলার জন্য

আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু তোমাদের অধীনে স্থাপন করেছেন এবং প্রকাশ্য এবং গোপন নিয়ামত বর্জন করেছেন (৩১:২০)।

১৮. তিনি সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকটিকে দিয়েছেন তার পরিমিত, প্রকৃতি ও লক্ষ্য (২৫ : ২) সাত আসমান এবং পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু আল্লাহকে স্বীকার করে এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করে, যদিও কিভাবে তারা স্বীকার করে এবং মহিমা কীর্তন করে তা তুমি নাও বুঝতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সহনশীল এবং ক্ষমাশীল (১৭: ৪৪)।

www.icsbook.info

হিযরত করেন, একটি রাষ্ট্র নির্মাণ করতে এবং তাঁর জাতির লোকদের বৈষয়িক জীবনের উৎকর্ষ সাধন ও তা শাসন করতে।[১৯] হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হতে পারতেন আরেক খ্রীষ্টবাদী ঈসা, যার সম্পর্কে কেবল আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে এবং ক্রুশবিদ্ধ হবার জন্য তিনি নিজেকে তুলে দিতে পারতেন তাঁর শত্রুদের হাতে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ পথ, কিন্তু তা না করে, আমাদের নবী (সা.) মোকাবেলা করেন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বাস্তবতার এবং সৃষ্টি করেন ইতিহাস। তিনি স্বামী ছিলেন, পিতা ছিলেন, ব্যবসায়ী, স্তত্বাধিকারী, রাষ্ট্রনেতা এবং বিচারক, সামরিক নেতা, দাঈয়াহ, ইসলামের প্রতি আহ্বায়ক এবং নবী সবই ছিলেন একসঙ্গে। তাঁর কাছে যে প্রত্যাদেশ এলো সর্বপ্রথমে তিনিই দিলেন যার বাস্তব রূপ, কোনো কিছুকেই হেদায়েত বা পথনির্দেশের বাইরে রাখেননি।[২০] একটি রাষ্ট্র এবং তার শাসনের জন্য আইনের আদালত ছাড়া ইসলাম সম্ভব নয়, কারণ ইসলাম হচ্ছে একটি কর্মের ধর্ম এবং কর্ম হচ্ছে প্রকাশ্য গণকেন্দ্রিক এবং সমাজভিত্তিক– যেখানে নিয়্যতের নৈতিকতা হচ্ছে ব্যক্তিগত এবং বিবেকের গভীর বাইরের অগ্রসর হবার প্রয়োজন নেই।

খ. জাগতিকতা এবং পরজীবনতত্ত্ব

দ্বিতীয়ত ইসলামে পরজীবনতত্ত্ব, ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মের পরলোকতত্ত্ব থেকে মূল্যগতভাবে স্বতন্ত্র। ইহুদী ধর্মের বেলায় আল্লাহর রাজ্য হচ্ছে নির্বাসিত অবস্থায় ইহুদীদের অবস্থার বিকল্প- যারা দাউদের রাজ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলো এবং বর্তমানে দঁড়িয়ে আছে দাসত্ব ও অধঃপতনের চূড়ান্ত স্তরে। তারাই দাউদের রাজ্যকে এভাবে অতীত স্মৃতি-বিধুরতার সঙ্গে তুলে ধরেছে।[২১] খ্রীষ্টান ধর্মের বেলায় এর প্রধান লক্ষ্য ছিলো ইহুদীদের জড়বাদী, বাহ্য এবং ভূমিকেন্দ্রিক নৃতত্ত্বকেন্দ্রিকতার মোকাবেলা। এজন্য খ্রীষ্টানদের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো দাউদের রাজ্যকে আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত করা এবং দেশকালের পরিসর থেকে একে সম্পূর্ণ দূরে রাখা। "আল্লাহর রাজ্য' হয়ে দাঁড়ালো এক "অন্য জগত" এবং এ জগত হয়ে উঠলো সীজার, শয়তান এবং শরীরী শক্তির অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ, "যেখানে কীট-পতঙ্গ এবং মরীচা ক্ষয় করে এবং চোরে সিঁদ কেটে চুরি করে।"[২২] পক্ষান্তরে যা কিছু ঘটে সবই তা কেবল মানুষের মাধ্যমেই ঘটা উচিত, এবং ঘটতে পারে। ইসলাম একটি, কেবল মাত্র একটি রাজ্যই সমর্থন করে, একটি, একটিই দেশকাল স্বীকার করে; যখন তা শেষ হয়ে যায় তখন পুরস্কার এবং বিচার কার্যকরীকরণ, পুরস্কার ও শাস্তির চূড়ান্ত অবস্থা ঘটতে

---

১৯. দেখুন এই গ্রন্থকারের নিবন্ধ, *"On the Raison d'Ere of the Ummah."*

২০. ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই, অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখি উড়েনা যা তোমাদের মত এক একটি উম্মত নয়। আল্লাহর নির্দেশসমূহ সকল প্রাণী এবং সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং তাতে কোন ব্যতিক্রম নেই। অত:পর সকলকে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট হিসাব দিতে হবে (৬ ৩৮)।

২১. দেখুন এই গ্রন্থকারের *Christian Ethics,* 116 ff.

২২. তোমরা পৃথিবীতে সম্পদ পুঞ্জীভূত করোনা, যেখানে কীট পোকার আক্রমণে এবং জং ধরে সম্পদ বিনষ্ট হয় এবং ডাকাতেরা দরজা ভেঙ্গে ঢুকে অপহরণ করে (ম্যাথু ৬ : ১৯)।

www.icsbook.info

পারে। আদ দারুল আখিরাত বা আখিরাত (অন্য পৃথিবী) এই পৃথিবীর বিকল্প নয়। এই পৃথিবীতে অর্জিত আযাব আল-আখিরাত, সওয়াব আল আখিরাত (অন্য পৃথিবীতে পুরস্কার এবং শাস্তি) নেই, এবং তাকওয়ার মাধ্যমে যা অর্জিত হয় তা একটি লোকোত্তর পুরস্কার, নিকৃষ্ট রাজ্যের বদলে বেহতর রাজ্য নয়। তাই বৈরাগ্যের মাধ্যমে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ দ্বারা অন্য পৃথিবীতে প্রবেশ করা বুঝায় না।[২৩] তিনি বলেননি, এই পৃথিবীর মূল্যে অন্য পৃথিবীর সন্ধান কর; তিনি আমাদেরকে পরামর্শও দেননি– এই পৃথিবীকে উপেক্ষা করতে, কিংবা আমাদের চোখের সামনে থেকে তা হারিয়ে যেতে।

এই অংশ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ইসলাম হচ্ছে একটি জগৎভিত্তিক ধর্ম, ইসলামে দেশকাল অবশ্যই এমন একটি রাজ্য যেখানে পরমকে বাস্তব করে তুলতে হবে এবং তা করবে মানুষ। আল ফালাহ "কর্মে উত্তম", এই পরিভাষাটি দ্বারা কুরআন সমগ্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে, যার অর্থ এ ছাড়া অন্য কিছু নয় যে, সৃষ্টির উপাদান উপকরণগুলোকে যেমন– নরনারী, নদনদী, পাহাড় পর্বত, বন বনানী এবং গম চাষের মাঠ, গ্রাম ও শহর, দেশ এবং জনগোষ্ঠীসমূহকে নতুন রূপ দিতে হবে। এই পৃথিবী, এই স্থান ও কালকে মূল্যপূর্ণ করে তোলা, কেবল ধর্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং এই হচ্ছে ধর্মের গোটা কর্মকান্ড।[২৪]

৩. ইসলামী জাগতিকতা এবং মানুষের বৈষয়িক প্রয়াস

ক. নৈতিক মানুষ এবং তার সক্রিয় ব্যক্তিত্ব

ইসলাম জগৎমুখী, দৈনন্দিন বাস্তব কংক্রীট অর্থে এর দ্বারা কি বুঝায়? এর অর্থ এই যে, মুসলিম-প্রকৃত মুসলিম কেবল মুখে মুখে ইসলাম স্বীকারকারী নয়– সে হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যার কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রিত হয় শরীয়ার দ্বারা। এই সব আইনের কোনো কোনটি ব্যক্তি হিসেবে তার সঙ্গে সম্পর্কিত– যেমন সেই সব আইন, যেগুলোর সম্পর্ক প্রথাগত আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে যার দ্বারা তার চৈতন্যের অবস্থা বা তার শরীর প্রভাবিত হয়। যেগুলো তার দেহের উপর ক্রিয়া করে, সেগুলো প্রকৃতিগতভাবেই বৈষয়িক। এগুলো কার্যকর করতে হলে অর্থনৈতিক নিয়ম কানুনের মাধ্যমে কাজ করতে হবে– যেমন নৈতিক ব্যক্তি যা আসলে উৎপাদন করতে পারে, তা উৎপাদন করা এবং তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন করা যাতে করে সেই অতিরিক্ত উৎপন্ন তার নিজের খাদ্য, পোশাক পরিচ্ছদ, আবাস এবং চিকিৎসা সুবিধাদির জন্য সে ব্যবসাতে নিয়োজিত করতে পারে। এক্ষেত্রে তার নৈতিক পুণ্য হচ্ছে, সে আল্লাহর

---

২৩. আল্লাহ তোমাদেরকে এই পৃথিবীতে যা দান করেন তার মধ্যে তোমরা অন্য পৃথিবীতে সন্ধান কর, কিন্তু এই পৃথিবীতে তোমাদের অংশ তোমরা বর্জন করে না, অন্যের কল্যাণ কর যেমন আল্লাহ তোমাদের কল্যাণ করেছেন। পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেওনা, আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না (৩৮ : ৭৭)।

২৪. তুমি কি তার কথা জান যে দ্বীন বা সকল হিসাব নিকাশকে অস্বীকার করে, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে এতিমকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং মিসকিনকে খাদ্য দানে সহায়তা করেনা (১০৩ : ১-৩)।

www.icsbook.info

নিয়ামত অর্জন করতে গিয়ে যে সাফল্য অর্জন করে সম্পূর্ণভাবে তারই আনুপাতিক।[২৫]

ইসলামের নৈতিকতা স্পষ্টভাবে নিষেধ করে ভিক্ষাবৃত্তি, অন্যের পরিশ্রমের উপর পরগাছার জীবন যাপন। আস্-সুন্নাহ, আশ্-শরীফায় আমাদের জন্য বহু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যাতে মানুষের আর্থিক প্রয়াস প্রশংসিত হয়েছে এবং আর্থিক ব্যাপারে হালছাড়া ভাব নিন্দিত হয়েছে।[২৬] শরীয়াতে ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের উপর যারা নির্ভরশীল তাদের বর্ণনা করা হয়েছে নির্দিষ্ট কতগুলো স্পষ্ট শ্রেণী হিসেবে, যেমন শারীরিক প্রতিবন্ধী, বার্ধক্য, শৈশব, নারীত্ব, ব্যাধি ইত্যাদি এবং এভাবে স্বাস্থ্যবান বয়স্ক পুরুষের জন্য অন্য কারও বা রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করাকে অবৈধ গণ্য করা হয়েছে। বস্তুত, কুরআন কঠোরভাবে নিন্দা করেছে দুঃস্থ আশ্রয় প্রার্থীদের, যারা নিজেদের বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য নিজেরাই দায়ী।[২৭]

অন্য যে আইনগুলো মুসলিম চৈতন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, যেমন ইসলামী অনুষ্ঠানগত আচরণাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত আইন কানুনসমূহ, সেগুলো বিশুদ্ধভাবে ব্যক্তিগত অনুশীলনের বাইরে পালনের প্রয়োজন হয়না– যেমন সেই সব কর্মকাণ্ড যেগুলোর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির খাঁটি চৈতন্যের বিষয়। এ বিষয়টি সুপরিজ্ঞাত, যে সালাত দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য কর্মকান্ডের সদাচরণের জন্ম দেয়না অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে মানুষকে সদাচারী করে তোলেনা, সে সালাতের কোনো মূল্যই নেই।[২৮] ইসলামী আইনের সাধারণ উদ্দেশ্যই হচ্ছে অন্য মানুষের জীবনে প্রবেশ এবং মহতের দিকে তাদের প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করা।[২৯] মুসলমান হচ্ছে সন্যাসীর সম্পূর্ণ বিপরীত, সে বৌদ্ধ হউক বা খ্রীষ্টানই হউক, যে কেবল নিজের সাধনার জন্য অন্য মানুষের সংসর্গ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। কারণ তাদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে পরিত্রাণ এবং সাফল্য হচ্ছে চৈতন্যের এমন একটি অবস্থার নাম যা মানুষ কেবল

---

২৫. যখন সালাত সম্পূর্ণ হয়, তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়, এবং তার নিয়ামত অনুসন্ধান কর, আল্লাহকে বার বার স্মরণ কর যাতে তুমি প্রকৃতই সফলকাম হতে পার (৬২ : ১০)।

২৬. সাদাকাহ (যাকাত) দরিদ্র মিসকিদের জন্য, যারা তা আদায় করে তাদের জন্য, এবং তাদের জন্য যাদের অন্তর এখানে ইসলামকে স্বীকার করে নেয়ার অপেক্ষায় রয়েছে, দাসমুক্তি এবং ঋণগ্রস্থদের জন্য, মুসাফিরদের জন্য এবং সাধারণভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে। সাদাকাহ হচ্ছে দ্বীনি কর্তব্য, যার আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ (আল্লাহ সর্বজ্ঞ (৯:৬০)।

২৭. হাদীসকে যেসব শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে অর্ধেকের চেয়েও বেশী মানুষের কাজকর্ম, তার আয় ও সম্পদ ব্যয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত যেমন *Al buyu* (বিক্রয় চুক্তি) Al muzaraah (কৃষিতে অংশীদারীত্ব) জিহাদ (যুদ্ধ অথবা আত্ম প্রয়াস) খাদ্যাদি, পানীয় দ্রব্য, পোশাক আশাক এবং অলংকরণ, জ্ঞান ও জ্ঞানে জ্ঞান ইত্যাদি।

২৮. যারা দু:খ কষ্টের মধ্যে মারা যায় এবং তাদের বিষয়ে ফিরিস্তারা জিজ্ঞাসা করলে বলে, যে তারা দুনিয়াতে অত্যাচারিত হয়েছে, তারা দুর্বল এবং অক্ষম। তাদেরকে বলা হয়, তোমাদের জন্য কি পৃথিবী যথেষ্ট প্রশস্ত ছিলোনা যা থেকে তোমরা এই অবস্থা থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করতে পার। তাই নীরবে, নিষ্ক্রিয়ভাবে, জুলুম এবং দুর্বলতা স্বীকার করে নিয়ে কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তা করা কি তোমাদের জন্য বেহতর ছিলোনা? নিশ্চয়ই তাদের বাসস্থান জাহান্নাম এবং উহা কত নিকৃষ্ট আকাস (৪:৯৭)

২৯. নিয়মিত সালাত পালন কর। সালাত অশ্লীল ও পাপকার্য থেকে মানুষকে রক্ষা করে (২৯:৪৫)

www.icsbook.info

একাই নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারে এবং যার বিচারক সে নিজেই একা। পক্ষান্তরে ভিন্ন মানুষদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ এবং সেখানে কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে সকল কর্মকান্ডকে পরিচালিত করা– আর এটি এমন একটি অবস্থা যা মুসলমানদেরকে সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সঙ্গলিপ্সু সদস্যে পরিণত করে। ইসলামে মহত্তম এবং পবিত্রতম চৈতন্যের, যেমন রসূলুল্লাহ নবুয়্যতি হালের অর্থ ছিলনা– হযরত মুহাম্মদের ব্যক্তিগত উপভোগ বা সম্পর্কের আয়োজন বরং এ ছিলো স্বল্পতম সংখ্যক মানুষের জীবন থেকে শুরু করে দুনিয়ার সকল মানুষের জীবন গড়ে তোলার উপায়।

খ. নৈতিক মানুষ এবং অন্য ব্যক্তিবর্গ

শরীয়ার আইনগুলো যেহেতু অন্য ব্যক্তিবর্গের বিষয়ে মতামত দেয় এবং সেই অন্য ব্যক্তিরা যেহেতু সংখ্যাগুরু, তাই শরীয়ার আইনগুলো আবার দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন– তাদের বাহ্য দেহ সম্পর্কিত আইন এবং তাদের চৈতন্য সম্পর্কিত আইন। দ্বিতীয় শাখার আইনটির পরিসরে যে এলাকা পড়ে, তা হচ্ছে শিক্ষা এবং পরামর্শ দান। মুসলমানরা তাদের উপর যারা নির্ভরশীল তাদেরকে এবং গোটা মানব সমাজকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করতে ও তাদেরকে নিরন্তর সৎ পরামর্শ দিতে বাধ্য, আর এসবই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্দেশিত ঐশী আদর্শের অবসানে, তাদের জীবনে পূরণ করার জন্য, তাদের নির্ধারিত লক্ষ্য। মুসলিম নৈতিক ব্যক্তি কর্তৃক মুসলমানদের শিক্ষা ও পরামর্শ দান, এমনি এক গুরুতর বিষয় যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে পরম সাফল্যের সমার্থক বলে উল্লেখ করেছেন।[৩০]

সৎ কাজের নির্দেশ হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা তার সর্বোচ্চ অর্থে-ইসলামে সকল শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে পুণ্য কর্ম এবং সদাচারণ, সে ধর্ম জ্ঞানের জন্য জ্ঞান অথবা কলার জন্য কলা এইমতবাদকে আদৌ সমর্থন করেন। উপযোগিতা সৃষ্টির জন্য শিক্ষা অর্থাৎ প্রকৃতির ব্যবহার, পণ্য এবং সেনা উৎপাদনের সুস্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে মানুষের বৈষয়িক প্রয়োজন ও সে সব পূরণের সঙ্গে।

পরিশেষে আমরা আসছি, সেই সব আইনের প্রসঙ্গে, যেগুলো অন্য ব্যক্তিবর্গের শরীরী অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত, যেমন অন্য মানুষের বৈষয়িক প্রয়োজন মেটানো। এখানে এসে আমরা আবার মুখোমুখি হই এবং চমৎকৃত হই পবিত্র কুরআনের সকল মানুষের উদ্দেশ্যে ঘোষিত সামগ্রিক ঘোষণায়।[৩১] ধর্ম তার সমগ্র ক্ষেত্রটিকেই এই বৈষয়িক শ্রেণীবিভাগের সমান গণ্য করেছে, যাতে 'এতিমকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়না এবং মিসকিনকে খাদ্য দান করা হয়না।" সংক্ষিপ্ত সুরাটির সমাপ্তি ঘটেছে সেই

---

৩০. আল্লাহ বিশ্বাসীদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, জান্নাতের বদলে, তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে নিধন করে ও নিহত হয়। ... (তারাই সফলকাম) যারা তওবা করে, ইবাদত করে, আল্লাহর প্রশংসা করে, সিয়াম করে, রুকু ও সিজদা করে, সৎ কর্মের নির্দেশ দেয়, অসৎ কার্য নিষেধ করে এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা লংঘন করে না। (হে মুহাম্মদ) বিশ্বাসীগণকে তুমি এই সুসংবাদ দাও (৯: ১১১-১)।

৩১. তোমরা পরস্পরকে সত্যের পক্ষে পরামর্শ দাও এবং ধৈর্যের জন্য উপদেশ দাও (১০৩-৩)।

www.icsbook.info

সব লোকের নিন্দাবাদের মাধ্যমে যারা ইসলামকে অনুসরণ করে বলে দাবী করে এবং তার সমগ্রটুকুই হচ্ছে মুসলিম কর্তৃক অন্য মানুষের প্রয়োজন মিটানোর সমার্থক।[৩২]

ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাস, এই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির এক উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা আমাদেরকে সরবরাহ করে। এটি হচ্ছে যেসব গোত্র রাসূলুল্লাহর ওফাতের পর খিলাফতের কেন্দ্রীয় খাজাঞ্চিখানায় যাকাত দেওয়া বন্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে আবুবকর সিদ্দিকের সার্বিক যুদ্ধ ঘোষণা। এখানে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগটি ঃ তাদেরকে 'আর্-রিদ্যা' অর্থাৎ ইসলাম ত্যাগের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়, যেন ধর্মকেই তারা অস্বীকার করেছে। রাসূলুল্লাহর মতই হযরত আবুবকরও বুঝেছিলেন যে, দীন এবং মানুষের বৈষয়িক চাহিদা পূরণ সমার্থক।

অধিকন্তু ইসলাম নারী এবং পুরুষের জীবনের প্রত্যেকটি দিকের প্রতি গভীর মনোযোগ দেয় এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেছে। ইসলাম তার সামাজিক পদ্ধতিকে গড়ে তোলে ধন বন্টনের বিশেষ দৃষ্টান্তকে কেন্দ্র করে। তাই এ সিদ্ধান্ত না করে পারা যায়না যে, ইসলামে আর্থিক প্রয়াস এবং তার ফল উপভোগ হচ্ছে নৈতিকতার প্রথম এবং শেষ কথা। এই অর্থে ইসলাম প্রকৃত একটি আদর্শ যে, শরীয়াহ এবং তার আইন আমাদের বৈষয়িক সম্পদ বন্টনের একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে, যার আলোকে আমাদের জীবনকে গড়ে তুলতে হবে।[৩৩]

গ. জাগতিকতা এবং Homo Economicus (অর্থনৈতিক মানুষ)

তাই মানুষের যদি তার আর্থিক প্রয়াসের আলোকে সংজ্ঞা দান সম্ভব হয়, তাহলে প্রশ্নের জবাব হবে নিশ্চয়ই ইতিবাচক; মানুষ নিশ্বয়ই একটি আর্থিক জীব, তবে ম্যাক্স ওয়েবারের অর্থে নয়, যাতে মানুষকে গণ্য করা হয় সার্বভৌম অর্থনৈতিক নিয়ম কানুনের দাস বলে, যা তার সকল কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতিগতভাবে অর্থনীতির আইন কানুনগুলো হতে পারে কর্তৃত্বশীল, কিন্তু মানুষ তার নিজের জীবনকে যে আর্থিক প্যাটার্ণের অধীনে স্থাপন করে তা তার নিজের ইচ্ছাকৃত পছন্দের বিষয়। বহু আর্থিক প্যাটার্ণের মধ্যে যে কোন একটির দ্বারা নিজের জীবনকে শাসন করার স্বাধীনতা মানুষের রয়েছে। মানুষ আর্থিক জীব এই অর্থে যে, সে তার নিজের জীবনকে, যে আর্থিক প্যাটার্ণের অধীনে স্থাপন করে, তা তার নিজের প্রকৃতি এবং নিজের সম্পর্কের, তার ধারণার, নিশ্চয়াত্মক।

তাই ইসলাম দ্বীনকে পৃথিবীতে জীবন যাপনের পদ্ধতি বলে গণ্য করেছে। এই উদ্দেশ্য ছাড়া দ্বীন বা ধর্মের আর কোন কাজ নেই, এ হচ্ছে পার্থিব জীবনের একটি আয়তন যা

---

৩২. তুমি কি তার কথা জান যে দ্বীন বা সকল হিসাব নিকাশকে অস্বীকার করে, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে এতিমকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং মিসকিনকে খাদ্য দান করে না, সালাত করে অথচ সালাতের অর্থ কি তার প্রতি মনোযোগ দেয়না? দুর্ভোগ সেই সব ভন্ডের জন্য যারা অভাবগ্রস্থকে সাহায্য দানে বাধা দেয় (১০৭ : ১-৭)।

৩৩. দ্রঃ Muhammad Saqr. *Al Iqtisad al Islam* (Jeddah: Al Ma'had al 'Alam li Abhath al Iqtisad al Islami. 1980).

www.icsbook.info

অতিবাহিত হয় পূর্ণ সার্থকতার সঙ্গে, যখন সেই জীবন নৈতিকতার সঙ্গে অতিবাহিত হয় আল্লাহর নির্দেশের আওতায়, অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতি, নিজের প্রতি এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে। অন্যান্য ধর্ম যেখানে এই পৃথিবীর পরিবর্তে সৃষ্টি করে নিজেদের জন্য একটি গোটা রাজ্য, যাতে পার্থিব জীবনের পর তারা রাজত্ব করে, সেখানে ইসলাম নিজেকে ঘোষণা করেছে এই জীবনের বিবেক বলে।

এই গ্রহে মানুষের জীবন পরিপূর্ণ সাফল্য অথবা কষ্টভোগ করে এক মানুষের প্রতি অন্য মানুষের মনোভঙ্গি ও আচরণ দ্বারা। নিশ্চয়ই বিমূর্ত অর্থে নয়, অন্ততঃ সেই সব পণ্যের বেলায় যেগুলোর কোনো আর্থিক মূল্য নেই। পৃথিবী এবং জঙ্গলের বাসিন্দাদের জীবন সুখের বা কষ্টের হয়না, তার সঙ্গী, মানুষরা তাকে পত্র-পল্লব, ডালপালা ও গাছ-গাছালি দেবার মত উদার হল কিনা, বাতাস এবং পানি দিল কিনা, তার দ্বারা, বরং তখনি সুখের হয় যখন তারা যে প্রাণী শিকার করে তাতে তাকে অংশ দেয়, ঘরদোর তৈরী করার জন্য, কাঠ চেরায় সহযোগিতা করে, কিংবা নদী থেকে ইতিমধ্যে যে পানি বসত গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার দ্বারা। অন্য কথায় দানের যথার্থতার জন্য, যে ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব জাতির কল্যাণ তার প্রয়োজনে ব্যবহারের উপকরণ হতে হলে, অবশ্যই তার লক্ষ্য হতে হবে অর্থনৈতিক মূল্য। মানুষের আর্থিক ব্যবহারের উপর এই পৃথিবীতে জীবনের সার্থকতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে, এজন্যই ধর্ম মানুষের আর্থিক কর্মকান্ডকে নৈতিকতার ও দায়িত্ববোধের আদর্শের পরিমন্ডলে স্থাপন করে। জগৎ সমর্থক সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম ইসলাম স্বভাবতই চায় মানব জীবনকে এভাবে বিন্যস্ত করতে যাতে করে জগতের স্রষ্টা জগতের জন্য যে প্যাটার্ণের পরিকল্পনা করেছেন, তার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এজন্য ইসলামের ডিকটাম বা মূলমন্ত্র হচ্ছে "ইন্না আদ্-দীনা আল মুয়ামালা" (প্রকৃতপক্ষে মানুষ কর্তৃক অন্য মানুষের প্রতি তার ব্যবহারই হচ্ছে ধর্ম)।[৩৪]

২. ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্বজনীনতা

বস্তুগত উপাদানের যে কল্যাণকরতা ও আবশ্যকতা উপরে বর্ণিত ইসলামের ভূমিকার মধ্যে আমরা দেখতে পাই, তা এ যাবত পর্যন্ত দুনিয়ার সকল ধর্ম ও মতবাদের মধ্যে একটি অনন্য ব্যাপার, এবং অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে কোন একটি অংশের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে নয়। ইসলাম দ্বারা এও বুঝায়না যে, অন্য কোন গ্রুপের চাইতে কোন একটি গ্রুপের বেশী কল্যাণ এর লক্ষ্য। গোটা মানব জাতিকেই সম্বোধন করে আহ্বান করা হয়েছে, তোমরা জাগ, বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন করো, প্রাচুর্যময় জীবন লাভের জন্য কঠোরভাবে পরিশ্রম করো এবং চেষ্টা করো, প্রকৃতিকে ব্যবহার করো এবং সৃষ্টির উত্তম জিনিসগুলো উপভোগ করো। বিশ্বজনীন ইসলমী শান্তির কোন অর্থই হবেনা, যদি না তা সকলের জন্য অধিকতর সুখী জীবন আনয়ন করে। এ দাবীগুলো শূন্য গর্ভ ধ্বনিত হবে, যদিনা তা মানুষর বাস্তব জীবনকে উন্নত করার জন্য চেষ্টা

৩৪. ইমাম মুসলিম এবং ইমাম আল বুখারীর রেওয়ায়েত।

www.icsbook.info

করে। কারণ পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা যদি অপরিবর্তিতই থেকে যায় তার আধ্যাত্মিক অথবা রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সার্থকতা সামান্যই যদি ইসলামের দৃষ্টিতে বাস্তব এবং আধ্যাত্মিক বিষয় পরস্পর যুক্ত হয়, তাহলে এর অর্থ এই যে, প্রত্যেকটি মানুষের জীবনেই এই সম্মেলন সত্য এবং আধ্যাত্মিক বা রাজনৈতিক পর্যায়ে মহত্তর পরিবর্তনের দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রস্তাব বাস্তবের উপর অবশ্যই প্রতিফলিত হওয়া উচিত। যে কোন বৈষম্য বা ত্রুটি গোটা ব্যবস্থাটিকেই দূষিত করে তুলবে– সর্বাগ্রে দূষিত করবে আল্লাহর অতিন্দ্রীয়তাকে। ঐশী লালন পালন বা নৈতিক আদর্শের বিষয়বস্তু হিসেবে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন বৈষম্যেরই অবকাশ আল্লাহর অতিন্দ্রীয়তায় নেই। ব্যক্তিগত প্রয়াস নিরপেক্ষভাবে আল্লাহর নিয়ামতের প্রাপক হিসেবেও নয়।[৩৫]

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ইসলামিক তাৎপর্যের এ দুটি প্রধান সূত্র থেকে নিস্পন্ন হয় দুটি মূখ্য মৌলনীতি : প্রথমত কোন ব্যক্তি বা গ্রুপ অন্যকে শোষণ করতে পারবেনা এবং দ্বিতীয়ত, কোন গ্রুপ অবশিষ্ট মানবজাতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারবেনা– গুটি কয়েকের মধ্যে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে গন্ডীবদ্ধ করতে, তা দুঃখ দুর্দশার মধ্যেই হউক বা প্রাচুর্যের মধ্যেই হউক। মানব প্রকৃতি, অভাবগ্রস্তকে যেসব প্রাচীর প্রাচুর্যের অধিকারীদের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে অংশগ্রহণ করতে বাধা প্রদান করে সেগুলোকে স্বভাবতই ভেঙ্গে ফেলতে চায়। তাই, তারা নিজেদেরকে অন্য মানুষের সংসর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার প্রয়াস পাবে, তা আশা করা যায়না। যদি তারা তা করেও, দুঃখ দুর্দশাগ্রস্থ জনতার সিদ্ধান্ত তা হতে পারেনা, বরং সে সিদ্ধান্ত হতে পারে তাদের শাসকদের। সে অবস্থায় জনতা বা জনগণ হয় শোষিত। তাই তাদের বিচ্ছিন্নতা হবে অব্যশই সাময়িক এবং শীঘ্রই তা হয়ে উঠবে বিপ্লবের বিষয়। অন্যপক্ষে যদি স্বতন্ত্রবাদী গ্রুপটি হয় প্রাচুর্যশালী, তাহলে সিদ্ধান্তটি শাসক এবং শাসিত উভয়েরই হবার সম্ভাবনা বেশী। তাদের উদ্দেশ্য হবে, নিজেদের জন্য তাদের প্রাচুর্যের নিরাপত্তা এবং অন্যেরা যাতে অংশগ্রহণ করতে না পারে সেজন্যে বাধা দান।[৩৬] এ হচ্ছে সাদামাটা আত্মস্বার্থবাদ যা একটি গ্রুপ অনুসরণ করে থাকে। মানষের ইতিহাসে এটি একটি অধিকতর সাধারণ ব্যাপার এবং আমাদের উপনিবেশিকতাবাদ, নব্য উপনিবেশিকতাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের যুগে এই আলামতটির ভয়ংকর প্রকাশ মানুষ লক্ষ্য করেছে। পশ্চিম ইউরোপের জাতিগুলো আফ্রিকা ও এশিয়ার সস্তা মজুর এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্যে নিজেদের জন্য গড়ে

---

৩৫. দ্রঃ এই গ্রন্থাকারের *"Divine Transecendence andlits Expression"* World Faith No. 107 (Spring 1997)

৩৬. দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহাই হচ্ছে আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন জাতির সকল আবগারী, কাষ্টম, শুল্ক এবং অভিবাসন আইনের উদ্দেশ্য। তাদের জাতীয়তাবাদী আদর্শসমূহ প্রত্যেকের জন্য এই বিধানই করে থাকে যে, মানবজাতির কল্যাণের উপরে কেবল নয়, বরং মানবজাতির কল্যাণকে অস্বীকার করে উর্ধে স্থান দিতে হবে।

www.icsbook.info

তুলছে এক সুউচ্চ জীবন মান। অধিকার সাম্প্রতিককালে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আমেরিকা এবং পৃথিবী বিভক্ত হয়েছে প্রাচুর্যশীল উত্তর এবং দরিদ্র দক্ষিণের মধ্যে। এক শতাব্দীর অধিককাল ধরে এশিয়া এবং আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শোষণ পুঁজির পাহাড় গড়ে তুলেছে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে, যার ফলে তাদের শিল্প বিকাশ হয়েছে সম্ভব। আজকের দিনের প্রযুক্তির বিপ্লব চিন্তাই করা যেতনা, বিশাল বিশাল খামারে এবং খনিতে কর্মরত লক্ষ লক্ষ এশিয় এবং আফ্রিকান মজুরদেরকে খাটানো না হলে, অসংখ্য জাহাজে করে এশিয়া-আফ্রিকার সম্পদ উৎপাদ হিসেবে, কাঁচামাল বা খনিজ দ্রব্যরূপে অথবা ইউরোপ আমেরিকার অর্ধ-সমাপ্ত উৎপাদ হিসেবে, বহন না করলে।[৩৭]

এটি সম্পূর্ণভাবে ইসলামের বিরোধী একটি কাজ, কেননা, ইসলামে সর্বপ্রথম মৌলনীতি হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষই তার পরিশ্রমের ফল ভোগের অধিকারীঃ "প্রত্যেক লোকের জন্য নর-নারী নির্বিশেষে সে যা অর্জন করে, তাই তার প্রাপ্য, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যে ক্ষতি করে তাই তার অর্জন" (কুরআন ২:২৮৬)। কোন ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে একটি জুলুম যা আল্লাহর কাছে ঘৃণ্য; এটি এমন একটি অন্যায় যার জন্য, জালেমকে অবশ্যই অনুতপ্ত হতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্থের ক্ষতিপূরণ করতে হবে অন্যথায় আল্লাহ তার ক্রোধ এবং শাস্তি এই জীবনে ও পরবর্তী জীবনে নাযিল করবেন অপরাধীর উপর। আল্লাহ সর্বশক্তিমান; তিনিই শাস্তি দিতে পারেন নানাভাবে, কিন্তু তিনি কাজ করেন কারণ পরম্পরার মাধ্যমে এবং কার্যের যথাযথ ফল দান করেন। জুলুম এবং শোষণ এমনই হিংসা এবং বিক্ষোভের সৃষ্টি করে যে, যখন নির্দয় বিপ্লবের মাধ্যমে তার বিস্ফোরণ ঘটে তখন অন্যায়ের হোতাগণ, তাদের প্রতিষ্ঠানাদি এবং তাদের হাতে যা কিছু করেছে সমস্তই ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাদের নাম নিশানা মুছে যায়।[৩৮]

ইহা, প্রকৃতির আইন সম্পর্কে ইতিহাসবিদেরা যা বলেন তা থেকে খুব ভিন্ন নয়। যখন সমাজের একটি অংশ প্রাচুর্যশালী হয়ে উঠে এবং গ্রুপ-স্বার্থসর্বস্বতা, প্রাচুর্যকে নিজেদের মধ্যে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তার প্রতিবেশীদের থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, তখনই তার ধ্বংসের সূচনা হয়। ইহা একটি সমাজের অভ্যন্তরে হউক বা মহাদেশীয় ভূমন্ডলীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সমাজের মধ্যেই ঘটুক, তাতে কিছু যায় আসেনা। প্রকৃতপক্ষে অতীতে যখন যোগাযোগ ছিল মন্থর এবং বিভিন্ন সমাজ একে অন্যের কাছ থেকে আলাদাভাবে তাদের প্রাচুর্য বজায় রাখতে পারতো, তখন এই আইন কার্যকর না হলেও বর্তমানের অবস্থা কিন্তু তা আর নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজ এবং প্রত্যেক

---

৩৭. Isma'il "Abd Allah" *World Chaos or a New Order: A Third World View.* "World Faiths and the New World Order." eds. Joseph Gremillion and William Ryan (Washingtion: The Interreligious Peace Colloquium. 1978) pp. 48-68.

৩৮. এই শতাব্দী পুঁজিবাদী সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত শ্রেণীগুলোর অনেক বিপ্লবের সাক্ষীঃ আগামী শতাব্দী নিশ্চয়ই আরো বেশী কিছু দেবে।

www.icsbook.info

সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণী ও গ্রুপ তাদের নিজ নিজ অর্থনীতির মত একই রূপ স্বাধীন, কারও পক্ষেই দীর্ঘকাল ধরে, তার প্রাচুর্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব ছিলোনা। ইবনে খালদুন, ওয়াস ওয়াল্ড স্পেংলার এবং আর্নল্ড টয়েনবির মত ইতিহাসবিদেরা মানব জীবনের সাধারণ আইনের দৃষ্টান্ত পেশ করে খ্যাতি অর্জন করেছেন, যা প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার যে কোন একজন সাধারণ মানুষ বুঝত, কেবল ধর্মীয় বিশ্বজাগতিক অর্থে।[৩৯]

এ ব্যাপারে উমর ইবুনল খাত্তাব (রা.) এর অন্তর্দৃষ্টি সন্দেহাতীতভাবে উল্লেখযোগ্য। নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটিমাত্র ঘোষণার দ্বারা সকল সীমান্ত শুল্ক প্রাচীর তুলে দেন ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকগুলো বিলোপ করেন। প্রায় এক যুগ আগে মহানবী (সা.) প্রত্যেক গোত্র স্তরে স্তরে যে অসংখ্য ব্যবস্থার দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো এবং লাভের একটা অংশ নিজেরা ভোগ করতো সেগুলো উচ্ছেদ করেন। এর ফলে আরবদের পক্ষে বিকাশ সম্ভব হল এবং পৃথিবীর সাম্রাজ্যসমূহের মোকাবেলা করা সম্ভব হলো এবং তার উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার জন্য একটি সামরিক বাহিনী সৃষ্টি করা সম্ভব হলো, যা তার দাবীর যথাযথতা প্রতিষ্ঠিত করে । ভারত মহাসাগর ও দূরপ্রাচ্য থেকে ব্যবসা বাণিজ্য অবাধে সমগ্র উর্বর অর্ধচন্দ্র এলাকা এবং উত্তর আফ্রিকায় সম্প্রসারিত হল। আসলে শরীয়ার বিধি বিধানের ফলে, তখনো ইসলামী রাষ্ট্রের দুশমন বাইজেনটিয়ানের বিভিন্ন পণ্য ইসলামী প্রদেশগুলোতে অবাধে প্রবেশ করতে এবং সেখান থেকে বেরোতে পারতো। পরস্পর নির্ভরশীলতা যেমন ছিলো আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের একটি বাস্তবতা তেমনি তা ছিল মুসলিম ধর্মীয় চৈতন্যের একটি সত্য। মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন গ্রুপ এবং জাতির আর্থিক ভাগ্য ব্যক্তির ভাগ্যের মতই ছিলো চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহরই হাতে। মুসলমানেরা অর্থনৈতিক ব্যাপারে আল্লাহর প্রকৃতিকে বোঝায় *আর-রিযক* দ্বারা। কুরআনের প্রত্যেক পৃষ্ঠায়[৪০] মুসলমান বার বার পড়ে যে আল্লাহ কতককে রিযিক দান করেন, কতকের রিযিক সংকোচিত করেন, অথবা রিযিক থেকে বঞ্চিত করেন। আমরা পড়ি যে, আল্লাহর কর্ম তাঁরই আনন্দে এবং সন্তোষই হচ্ছে সমস্ত ন্যায় বিচারের সারকথা। মুসলিমের নৈতিকতাবোধ তাকে শিখিয়েছে যে, আল্লাহ কারো প্রতি অবিচার করেন না এবং তিনি প্রত্যেককে দেন তার প্রাপ্য। আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপনের মানেই এ বিষয়ে পূর্ণ একিন যে, রিযিকের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তাঁরই। যদি সে এর বিপরীত বিশ্বাস করে তবে তা হয় আল্লাহর এককত্ব, তার লোকোত্তরতা এবং তার পরম অবস্থানের প্রতি হানিকর, সংক্ষেপে তা তৌহীদেরই অস্বীকৃতি।[৪১]

---

৩৯. যখন কোন জনপদ, নগরী বা সম্প্রদায় ধ্বংসের কাবিল হয়ে পড়ে, তখন এর অভিজাতবর্গ অন্যায় আচরণের সুযোগ পায় এবং অভাবে এবং অবশ্যম্ভাবী সমূহ ধ্বংসকে ডেকে আনে (১৭ : ১৬)।

৪০. Barakat, *Al Murshid.* s.v "Rizq"

৪১. দ্রঃ এই গ্রন্থকারের প্রবন্ধ "Is a Muslim Definable in Terms of His Economic Pursuits?" in Khurshid Ahmed and Zafar Ansari. eds. *Islamic Perspectives :*

www.icsbook.info

তাই মুসলমান তার ধর্মের কারণেই অবাধ অর্থনীতির পক্ষ অবলম্বন করতে বাধ্য। তার জন্য অবাধ বাণিজ্যের পথে কৃত্রিম বাধা নিষেধ নিষিদ্ধ। ভূমন্ডলীয় প্রেক্ষিতে বলতে হয়, প্রোটেকশনিজম বা প্রতিবন্ধকতা আল্লাহ কর্তৃক বিশ্ব শাসিত ধারণার বিরোধী, যদি তার উদ্দেশ্য হয় এমন একটি কৃত্রিম কৃষি ব্যবস্থা বা শিল্পের প্রতিষ্ঠা, যেখানে তা চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ বা প্রাকৃতিক সম্পদ কোনটা নেই; তবে অবাধ বাণিজ্য নীতির উদ্দেশ্য যদি হয় একচেটিয়া ব্যবস্থা বাণিজ্য বা শোষণ, তেমন অবস্থায় তার প্রথম লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানের বিশ্বাস বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং বিক্ষোভে ফেটে পড়বে। এধরনের কোনো নৈতিকতা বিরোধী শিল্প বাণিজ্যের উদ্যোক্তার বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া গেলে ইসলামী আদালত এবং সে আদালতের পিছনের উম্মাহ্ এধরনের কাজকে আল্লাহর নির্দেশের লংঘন বলে গণ্য করবে। উপরের এই আলোচনা বিশেষ করে আজকের দিনে পৃথিবীর বিত্তবান এবং সর্বহারাদের মধ্যে যে উত্তেজনা ও স্নায়বিক চাপ বিদ্যমান, তার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে, কোন দেশে প্রবেশ, মানুষের নাগরিকত্ব লাভ এবং পণ্য ও তহবিলের প্রবেশ ও স্থানান্তরের পথে বিত্তবানগণ বিত্তহীনদের সামনে, তাদের আল্লাহ পৃথিবীর যে স্থানেই রিযিকের ব্যবস্থা করুন সেখানে জীবিকার সন্ধানে মানুষের ইমিগ্রেসনের পথে প্রতিবন্ধকতা স্থাপন ইসলামের দৃষ্টিতে ঘৃণ্যকর্ম।[৪২]

৩. উৎপাদনের নৈতিকতা

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্য। তিনি পৃথিবীতে তাদেরকে করেছেন তাঁর খলিফা এবং সৃষ্টির সমস্ত কিছুকে তাদের অধীনে স্থাপন করেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে মানুষকে আদেশ করেছেন, 'জমিনে বিচরণ করতে'– তার নিয়ামত অনুসন্ধান করতে এবং প্রকৃতিকে ব্যবহার ও উপভোগ করতে।[৪৩] তিনি অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি এবং তার নবী মানুষের কৃতিত্ব অবলোকন করেন গর্বের সঙ্গে।[৪৪] আল্লাহর খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের সার্থকতার জন্য তিনি কর্ম, খাদ্য উৎপাদন, ভূমি উদ্ধার, গ্রাম ও শহর নির্মাণ, সেবা প্রদান, সংস্কৃতি ও সভ্যতা গঠন, নারী ও পুরুষের সন্তান জন্মদান এবং লালন পালন এ সমস্তকেই নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাবার, অব্যাহত রাখার ও শ্রমের ফল উপভোগ করে যাবার ব্যবস্থা

Studies in Honor of Mawlana Sayyid Abu al Ala Mowdudi (Leicester. UK : The Islamic Foundation. 1399/1979) পৃষ্ঠা 183 ff.

৪২. এ প্রসঙ্গে, ইয়েমেনিরা সৌদি আরবে তিন পুরুষ ধরে যে বৈদেশিক মর্যাদা ভোগ করেছে তা বিবেচনা করুন। এ হচ্ছে ইউরোপের আবাদী জাতিগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত, যারা দীর্ঘদিন তাদের দেশে বাস করলে অথবা কাজ করলে যে কোন জনকে নাগরিকত্ব দানে ইচ্ছুক।

৪৩. সালাত সমাপ্ত হইলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করিবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করিবে যাহাতে তোমরা সফলকাম হও (৬২: ১০)।

৪৪. আদেশ করো (হে মুহাম্মদ)ঃ সৎকর্ম করো, তোমরা যে সব সৎকর্ম কর আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন, যেমন তা লক্ষ্য করেন তাঁর নবী এবং সকল মুমিনেরা; নিশ্চয়ই তোমাদের প্রত্যেককে হিসাব নিকাশের জন্য আল্লাহর কাছে হাজির করা হবে, যিনি ব্যক্ত এবং অব্যক্ত সমস্ত কিছুই জানেন। তোমরা যা করেছিলে সে সম্পর্কে তার সত্যরূপ তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন (৯:১০৫)।

www.icsbook.info

করেছেন।[৪৫] এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে এ সমস্তকেই তিনি করেছেন ইবাদত বন্দেগীর ও ধর্মের উপাদান উপকরণ, আল্লাহর সৃষ্টির যৌক্তিকতা।[৪৬] এর সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষ অবশ্যই উৎপাদন করবে। কোনো ধর্ম এবং কোনো মতবাদই কখনো ইসলামের মত প্রবলভাবে বা এত আতিশয্যের সঙ্গে মানষকে কাজ করার তাকিদ দেয়নি।[৪৭] হিযরতের পর মদীনায় প্রবেশ করে মহানবী (সা.) আনসারদের (মদীনার মুসলমান) বললেন, তাদের মুহাজির মুসলিম ভাইদেরকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করতে, যারা মদীনায় হিযরত করেছেন শত্রুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য। বহু মুহাজির আনসার পরিবারে তাদের গ্রহণকে মেনে নিলেন এবং এভাবে নতুন করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার ঝামেলা থেকে রেহাই পেলেন, কেউ কেউ সামান্য ঋণ গ্রহণ করলেন একটা কিছু কাজ শুরু করার জন্য এবং পরে তা ফিরিয়ে দিলেন। তবে রাসূলুল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় গণ্য হলেন তারাই, যারা এতটা আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ছিলেন যে কোন সাহায্য গ্রহণ করলেননা, কোন পুঁজি, যন্ত্রপাতি বা কোন পেশা ছাড়াই তারা ছড়িয়ে পড়লেন খোলা মাঠে– লাকড়ি সংগ্রহ করে, নিজেদের পিঠে বহন করে নগরীতে নিয়ে তা বিক্রী করার জন্য এবং একটু একটু করে তারা নিজেদের জন্য একটি স্থান করে নিলেন ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে।[৪৮]

তাই ইসলাম চায় সর্বাধিক উৎপাদন। ইসলাম প্রত্যাশা করে যে, প্রত্যেকে সে যতটুকু ভোগ করে তার চাইতে বেশী উৎপাদন করবে, সে নিজে যতটুকু সেবা পায় তার চাইতে বেশী সেবা দেবে। ব্যক্তির জীবনে সে সৃষ্টির জন্য কি অবদান রেখেছে তার হিসেবের ভিত্তিতে তার নীট লাভেই সমাপ্ত হওয়া উচিত, বিচার দিবসে প্রত্যেক নর এবং নারীকে বলা হবে পৃথিবীতে তার অস্তিত্বের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য তার খতিয়ান পাঠ করতে।[৪৯] যে ব্যক্তির এ জীবনে তার উৎপাদনশীলতার জন্য কেবল একথা বলতে পারবে যে, তার নিজ প্রয়োজনের বেশী সে উৎপাদন করতে পারেনি, সে মোটেই সানন্দে অভিনন্দিত হবেনা। বরং সে নিন্দিত হতে পারে, তার মানসিকতার কারণে যা তাকে সৃষ্টিতে কোনো অবদান রাখতে দেয়নি, যেমন বৈরাগ্যবাদ, আত্মস্বার্থবাদ, আলস্য অথবা সংশয়বাদ, কিংবা সেই সব ব্যক্তির চরম ও আত্মপ্রতারণা যারা মনে করে পৃথিবী তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে বাধ্য। সেই সব

---

৪৫. আল্লাহই তোমাদের পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন, যিনি মর্যাদায় কতককে কতকের উপর উন্নীত করেছেন। যাতে তোমরা নিজেদেরকে তোমাদের কর্মে নিজেদেরকে যোগ্য প্রমাণ করতে পারো। (১১:৭)।

৪৬. আল্লাহই ছয় দিবসে আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তার আরশ ছিলো পানির উপর (মানব জীবনের সারনির্যাস) যাতে তোমরা তোমাদের কর্মে নিজেদেরকে যোগ্য প্রমাণ করতে পারো (১১:৭)।

৪৭. আমল বা সৎকর্মের উপর কুরআনের তাগিদ সার্বক্ষনিক এবং সর্বব্যাপী।

৪৮. Haykal. *The Life of Muhammad.* 77-78

৪৯. (বিচার দিবসে মানুষকে বলা হবে) তোমার আমলনামা তুমি নিজেই পাঠ করো। অদ্য তুমি যা করেছো তার বিচারক তুমি নিজেই হও (১৭:১৪)।

www.icsbook.info

লোকেরা রয়েছে যারা এতটা ধন সম্পদের অধিকারী যে তারা যথাসময়ের আগেই কর্ম থেকে ছুটি নিতে পারে, কিংবা সেই সব লোক যারা উৎপাদনে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেনা তাদের পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ উত্তরাধিকার লাভ করেছে বলে। যখন এই সব লোক উৎপাদনশীল কাজ কর্ম থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেয় তখনই তারা, তাদের এ কর্মের দ্বারা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দিত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের মতে এসব ব্যক্তি নিজেদেরকে শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করেই উৎপাদন কর্ম থেকে বিরত থাকে। পৃথিবীতে তাদের আশু শাস্তি হবে এই যে, উৎপাদন কর্ম থেকে বিরত থেকে বছরে শতকরা আড়াই ভাগ হিসেবে যাকাত দিতে বাধ্য হবে। এটি এমন একটি ব্যবস্থা যাতে করে ৩৫ বছরে বা এক পুরুষের ব্যবধানে যে কোন মুলধন নিঃশেষ হয়ে যাবে। যেহেতু লোকটি ঐ পুঁজি বা তহবিলের উপর জীবন যাপন করেছে তাই এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আরো অল্পসময়ে পুঁজি শেষ হয়ে যাবে। কোন অবস্থাতেই তাতে এধরনের তহবিল বা পুঁজি ৩৫ বছরের পর টিকে থাকবেনা। তাই এসব ক্ষেত্রে উদ্দীপনা, আগ্রহ আরো বেশী হবে এই তহবিল নিয়ে আবার উৎপাদন কার্যে প্রবেশ করতে, যাতে করে তহবিল বা পুঁজি যেন এভাবে নিঃশেষ হয়ে না যায়। এতে করে তহবিল আরো বাড়বে এবং ব্যক্তির জীবন যাপনের ব্যয় বহনের সহায়ক হবে, কেননা বিনিয়োগ থেকে আয় শতকরা আড়াই ভাগের চাইতে অধিক হবার বেশী সম্ভাবনা।

৪. উৎপাদনের নৈতিক নীতিমালা

(ক) উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত রয়েছে উপকরণ আহরণ এবং সে কৃষি ক্ষেত্রেই হউক বা শিল্প ক্ষেত্রেই হউক, উৎপাদক কর্তৃক উৎপাদনের শক্তিগুলোর ব্যবহার। প্রকৃতির এই ব্যবহার অবশ্যই দায়িত্বপূর্ণ হতে হবে। দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য ইসলাম প্রকৃতির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ক্ষমতা অর্পণ করে সমাজের প্রতি যা তার যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কাজ করে। অবশ্য এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অপচয় বা আতিশয্য স্বীকার করা হয়না। কুরআন এই উভয় ব্যাপারে অপরাধীদের 'শয়তানের ভাই' বলে ঘোষণা করে।[৫০]

কুরআন মুসলমানদের দায়িত্ব দেয় উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রা এ পদ্ধতিতে প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে এবং এই উৎপাদন হতে হবে মানুষের প্রয়োজনের আলোকে যুক্তিসঙ্গত। ইসলামী দায়িত্বের দাবী এই যে, মানুষ কর্তৃক প্রকৃতির ব্যবহারের প্রক্রিয়ায়, প্রকৃতির কোন বিনষ্টি চলবেনা। ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে, প্রাকৃতিক উপাদান, উপকরণ ও শক্তিসমূহ আল্লাহ কর্তৃক আমাদের জন্য প্রদত্ত নিয়ামত।[৫১] এই

---

৫০. এই কৃপণরা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী (১৭:২৭)।

৫১. এবং আল্লাহ তোমাদের গৃহকে করেছেন তোমাদের আবাসস্থল, তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাবুর ব্যবস্থা করেছেন, যা তোমরা ভ্রমণকালে সহজে বহন করতে পারো এবং অবস্থানকালে

www.icsbook.info

নিয়ামত বা দানের অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তার মালিকানা হস্তান্তর করেছেন। এ হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত; মালিক হচ্ছেন আল্লাহ এবং সব সময়ই তিনি মালিক থাকবেন, যেমন মেসোপটেমিয়রা বলতঃ তিনিই হচ্ছেন জমিনের মালিক এবং মানুষ হচ্ছে শুধু ভৃত্য।" এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বটে। তাই আমাদের মৃত্যুকালে অথবা অবসরকালে এই তালুক আল্লাহকেই ফিরিয়ে দিতে হবে– আমাদের উৎপাদনের মাধ্যমে ভূমির আরো উৎকর্ষ ও বৃদ্ধি সাধন করে। ন্যূনতম অবস্থায় তাকে অবিকল এই অবস্থায় ফেরত দিতে হবে, যে অবস্থায় তা গ্রহণ করা হয়েছিলো। কুরআন প্রবলভাবে ঘোষণা করেছে যে, সৃষ্টির সমস্ত কিছু প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহর কাছে।[৫২] বর্তমানে শিল্পায়িত সমাজগুলোতে প্রকৃতির 'ধর্ষণ' এবং তার দূষণ যে মহাব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তা আল্লাহর দান প্রকৃতির দায়িত্বহীন অপব্যবহারেরই ফল। নিজের সাফল্যে মাতাল উম্মত্ত পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য শিল্প উদ্যোক্তাদের বাধ্য করেছে তার উৎপাদন প্রক্রিয়ার ক্ষতির বর্জ্য পদার্থসমূহকে হ্রদে কিংবা নদীতে নিক্ষেপ করতে। বিভিন্ন প্রাণী, উদ্ভিদ এবং মানুষের উপর তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার কথা বিস্মৃত হয়ে ভূমির বুক ফেড়ে ফেলা হচ্ছে খনিজ পদার্থ বের করার জন্য এবং তা রেখে দেওয়া হচ্ছে এমনভাবে যে, তার আর ব্যবহারযোগ্যতা থাকেনা, দেখায় কুৎসিত এবং মানুষ ও পরিবেশের প্রতি সকল রকমের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। "প্রাণী জগতের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্কের ভারসাম্য" এবং পরিবেশ পূর্ণব্যবহারের উপযোগীকরণ ইত্যাদি পরিভাষাগুলো অধুনা পাশ্চাত্য জগতে সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে এদের পৌনঃপুনিক লংঘনের দ্বারা। আমাদের চারপাশে প্রকৃতির প্রতি "ব্যভিচার" করা হচ্ছে। সমুদ্রের প্লাঙ্কটন (সাগর, নদী, হ্রদ ইত্যাদিতে ভাসমান জীবাণু) স্ট্যাটোস্ফিয়ারের ওযোনের (ozone) চেয়ে কম নয়, সমস্ত কিছুই অপচয়সর্বস্ব এবং দায়িত্বহীন উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফলে, যাকে বলা হয় পশ্চিমা শিল্পের পরিকল্পিতভাবে অপ্রচলিত হয়ে পড়ার কারণে অবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। মানুষের ইতিহাসে এই প্রথমবার পুঁজিবাদী শিল্পোদ্যোক্তারা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য পরিকল্পিতভাবে অপ্রচলিত হয়ে পড়ার কথা ঘোষণা করছে। এবং তা করছে বিন্দুমাত্র লজ্জা অনুভব না করেই। স্পষ্টতই বলি বা শিকারের অবস্থান হচ্ছে কর্তৃত্বশীল আদর্শটির মধ্যে যা নিয়মশৃংখলার জন্য প্রয়োজনীয় মনস্তাত্বিক কলা কৌশাল তার অনুসারীদের সরবরাহ

সহজে খাটাতে পারো। তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন, পশম, লোম, কেশ হতে, কিছুকালের জন্য ব্যবহার্য সামগ্রী এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং তোমাদের পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন, তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পোশাক পরিচ্ছদের। ইহা তোমাদেরকে গরম হতে বাঁচায়, তোমাদের জন্য তিনি ব্যবস্থা করেছেন বর্মের যা যুদ্ধে তোমাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ পূর্ণ করেছেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর (১৬: ৮০-৮১)।

৫২. আল্লাহর নিকটই সমস্ত কিছুর প্রত্যাবর্তন (১১:১২৩)। তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তিত হবে সমস্ত কিছু (ধ্বংস তাদের যারা ভেবেছিলো যে তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তন করবেনা (২৮:৩৯) ... আল্লাহর কাছেই তোমাদের চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন (৫:৪৮)।

www.icsbook.info

করতে অসমর্থ, যে আদর্শ ভবিষ্যতের প্রতি কোন দৃষ্টিপাত করেনা, কোন মানদন্ড দেয়না কিংবা একটি বিবেকবোধ জাগ্রত করেনা, যা মুনাফার অতৃপ্ত ক্ষুধার মুখে লাগাম পরাতে পারে। এই যে পুঁজিবাদীর উদগ্র ক্ষুধা, যা তার নিত্য পরিবর্তনশীল লক্ষ্য pereat mundus অর্জনের বেপরোয়া, তার মোকাবেলা করার সামর্থ্য কিছুরই নেই। pereat mundus একটি রূপক পদমাত্র নয়; আক্ষরিক অর্থে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী সম্পর্কে এ সত্য যার উৎপন্ন দ্রব্য হচ্ছে যুদ্ধাস্ত্র, মাদকদ্রব্য, তেজস্ক্রিয় এবং অন্যান্য ক্ষতির দ্রব্যাদি। বহু উৎপন্ন দ্রব্যের কলকারখানার ব্যাপারেও এ সত্য, যাদের উৎপাদন থেকে টকসিক বর্জ্য পদার্থ নির্গত হয়। প্রকৃতির এ ধরনের অপব্যবহার তৌহীদের নৈতিকতার সম্পূর্ণ বিরোধী; এ ধরনের অপব্যবহারের নিন্দা করা হয়েছে সবচেয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই হতে হবে নির্দোষ এবং বিশুদ্ধ, দেখতে হবে এর দ্বারা যেন কোন প্রাণী, উদ্ভিদ বা মানুষ আঘাত না পায়, যেখানে ক্ষতি হয় সেখানে অবশ্যই সে ক্ষতি পূরণ করতে হবে। যেখানে ক্ষতি সাধনকারী শিল্পউদ্যোক্তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করানোর জন্য কোন ব্যক্তি বা গ্রুপ নেই সেখানে প্রকৃতির রক্ষক হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রই অপব্যবহারকারীকে তার অপকর্মের শাস্তি দিতে বাধ্য।[৫৩]

(খ) ইসলামে এটি অপরিহার্য যে, পণ্য ও সেবার উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে প্রতারণা ও জালিয়াতি মুক্ত হবে। এই আয়োজনকে কার্যকর করার দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে হিসাব নামক প্রতিষ্ঠানের উপর। এই কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য শরীয়াহ মুহতাসিবকে দান করেছে পুলিশের ক্ষমতা এবং বিচারের ক্ষমতা। তার ক্ষমতা এবং কর্তব্য ছিল, তার সামনে অভিযোগ আনার পূর্ব পর্যন্ত বসে না থেকে, অপেক্ষা না করে বরং অকুস্থলে ছুটে যাওয়া এবং অবাধ অভিযোগ, সীমালংঘন ও ক্ষতিকর ঘটনাগুলোর অভ্যন্তরে উঁকি দিয়ে দেখা।[৫৪] বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন মুহতাসিবের দায়িত্ব পালন করে থাকে। কিন্তু আজকের দিনেও, মুহতাসিবের দক্ষতা, এসবের স্বরূপ উৎঘাটনের জন্য উদ্যোগ এবং যে তাৎক্ষণিক উপায়ে তিনি এসবের অবসান ঘটাতে পারতেন, তা দেখা যায়না, কারণ আধুনিকতায় শুভ ও কল্যাণের জন্য কোন উৎসাহ উদ্দীপনা নেই, অথচ আল্লাহর বিশ্বাস থেকেই সৃষ্টি হয় এই আগ্রহ উদ্দীপনা।

তাদের খরিদ্দারদেরকে প্রতারণা করার জন্য উৎপাদনকারীদের উদ্ভাবনপটুতা অপরিসীম। পাশ্চাত্য ব্যবসা স্কুলগুলোতে পঠিতব্য বিষয়গুলোর মধ্যে 'প্যাকেজিং'-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা এখন একটি কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার একমাত্র উদ্দেশ্য

---

৫৩. পৃথিবীকে কলুষিত করা ও তার সম্পদ বিনিষ্ট করা যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন তা তার বিপরীত। আনিত ইস্তিমার হতে (পুনর্গঠন বা প্রকৃষ্টতর উন্নতি সাধন (১১:৬১)।

৫৪. Taqiyy al din Ahmad ibn Taymyah *al-Hisab fi al Islam aw Wazifat al Hukumah al Islamiyyah* (Madinah Islamic University Press. n.d)..

www.icsbook.info

উৎপন্ন দ্রব্যটি বিক্রয় করা, খরিদ্দার তা না চাইলেও। এখানে বিজ্ঞাপনের বিষয়টি উল্লেখ্য, যা সম্ভবত উৎপাদন উদ্যোগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষ যেন উপকৃত হয় সেই মহৎ উদ্দেশ্যে তথ্য সরবরাহ না করে, বিজ্ঞাপন হয়ে উঠেছে প্রতারণার সর্বোৎকৃষ্ট কৌশল। মানুষের আত্মশ্লাঘার বিভিন্ন ক্ষুধার প্রতি আবেদন, যৌনতা সুখ এবং আরাম আয়েশের প্রতি আবেদন, স্থূল বস্তুবাদী আত্মসর্বস্বতাবাদী এবং মন্ময় অর্থে সুখ শান্তি ও সন্তোষের নতুন সংজ্ঞা, এসব মিলে বিজ্ঞাপনকে করে তুলেছে অর্থনীতির স্নায়ুকেন্দ্র। এর পরিণামে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নতুন ক্ষুধার চাহিদাসমূহ যা কেবল তাদের মনস্তাত্ত্বিক দুঃখ কষ্টকেই বাড়িয়ে তুলছে। বস্তুত মিথ্যা বিজ্ঞাপন জনতার বিশ্বদৃষ্টিকে বদলে দিয়েছে, বিজ্ঞাপন তাদেরকে, তাদের ঐতিহ্যগত আদর্শ থেকে বিচ্যুত করেছে এবং নতুন আদর্শে দীক্ষিত করেছে যা পরিকল্পিত হয়েছে শিল্পোদ্যোক্তার লাভের প্রয়োজনে এবং উৎপন্ন পণ্যকে আরো বেশী লাভজনক করে তোলার জন্য।

ইসলামে উৎপাদনকারী চারটি মৌলিক নীতির অধীনে কাজ করে, যে নিয়মগুলো তার উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমে তার ধর্ম কিংবা তার আইন কেবলমাত্র মুনাফার জন্য কোন কিছু উৎপাদন করার অনমুতি দেয়না। উৎপাদনের উদ্দেশ্য হবে জনগণের জনহিতকর এবং উপযোগী পণ্যসমূহ উৎপাদন করা, যে প্রক্রিয়ায় মুনাফা হবে একটি উপজাত, প্রধান নয়। দ্বিতীয়ত যে সব বস্তু বা উপকরণ হারাম বা শরীয়াহ কর্তৃক নিষিদ্ধ সেগুলো কিছুতেই উৎপাদন করা যাবেনা, কেবল সেই সব ক্ষেত্র ছাড়া যেখানে তাদের আবশ্যকতা যুক্তিসঙ্গত। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন মানুষের কোন ক্ষতি হতে না পারে। তৃতীয়ত যা উৎপন্ন হয়েছে তা যেরূপে উৎপন্ন হয়েছে সেভাবেই বিতরণের জন্য পেশ করতে হবে, মানুষ যা চাইতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে, উৎপন্ন দ্রব্যটির রূপ বদলিয়ে নয়। প্রতারণার একটি কৌশল হিসেবে প্যাকেজিং চালু রাখা যাবেনা। চতুর্থত তৌহীদের প্রতি উৎপাদনকারীর অঙ্গীকার বা আনুগত্য তার মধ্যে জাগ্রত করে সেই প্রয়োজনীয় বিবেকবোধ যা ব্যক্তির উপর সত্যবাদিতার নীতি অনুসরণের প্রস্তুতি সৃষ্টি করে এবং রাষ্ট্রের শাস্তির তোয়াক্কা না করে তা অনুসরণ করে। ইসলামী আইনে উৎপাদনের নৈতিকতা লংঘিত হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে প্রশাসনিক বিচারের বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে। নৈতিকতা লংঘনের ফলে যারা প্রতারিত বা ক্ষতিগস্থ হয়েছে তাদের ক্ষতি পূরণ ছাড়াও এই সব নীতি লংঘনের বেলায় শপথ ভঙ্গ বা মিথ্যা হলফের ঘটনা হিসেবে প্রত্যেকটি সীমা লংঘনের গুরুত্ব হিসেবে আনুপাতিক শাস্তি বহন করতে হবে, কেননা এই প্রতারণার পাত্র হচ্ছে সকল মানুষ, রাষ্ট্র এবং আল্লাহ নিজে।

(গ) উৎপাদন অবশ্যই হবে লাভজনক প্রয়াস। ব্যক্তিগত প্রয়াস হিসেবে উৎপাদন মুনাফা অর্জনের অভিপ্রায় থেকে মুক্ত হতে পারেনা। লাভ না থাকলে উৎপাদন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে এবং বিনিয়োগ ভিন্ন খাতে চলে যাবে। তৌহীদের দাবী এই যে, মুনাফা

www.icsbook.info

বা লাভ প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের নীতি পালন করা হবে।[৫৫] ন্যায়সঙ্গত দাম কি, ন্যায়সঙ্গত মুনাফা কি, প্রাকসিদ্ধ কোনো জবাব নেই, কেবলমাত্র নির্দিষ্ট পরিস্থিতিসমূহের প্রসঙ্গে এই কংক্রীট জবাব দেওয়া সম্ভব। হঠাৎ-লাভ সংজ্ঞা অনুসারে ইসলামী নীতিবোধের পক্ষে আপত্তিকর নয়, যদি না হঠাৎ লাভের জন্য কৌশল হিসেবে বাজারকে কাজে লাগানো হয় এবং তার লাভ মানুষের জন্য অনভিপ্রেত ক্ষতির কারণ হয়। ইসলাম নীতিগতভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণের বিরোধী। অবশ্যই বিরোধিতার মূল কারণ কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ এবং নৈতিকতা বিরোধী হঠাৎ-লাভ বন্ধকরণ। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ এবং ক্ষতি দুইয়েরই সম্ভাবনা আছে।[৫৬] এই যুক্তিতে ইসলাম উৎপাদক বা ব্যবসায়ীর ক্ষতি নিরোধের জন্য মূল্য বা মজুরি নিয়ন্ত্রণে কম উৎসুক।

পণ্য, উৎপন্ন দ্রব্য বা সেবার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তমূলক বিষয় হচ্ছে মজুরি। ন্যায়সঙ্গত মূল্যের মতই ন্যায়সঙ্গত মজুরি নির্ণয় একই রূপ কঠিন কাজ। তৌহীদ প্রত্যেকটি বয়স্ক ব্যক্তিকেই একটি 'শ্রমিক বা মজুর' গণ্য করে– এমন ন্যূনতম মজুরি যার প্রাপ্য যা তার নিজের এবং পরিবারের জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করবে। ইসলামী রাষ্ট্র সমর্থন করতে পারেনা তার চৌহুদ্দির ভেতরে কর্মরত কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র প্রাণ-ধারণ উপযোগী মজুরি পাবে। যাই হউক, কোন মুসলিম দেশের উৎপাদনকারীকে দেশ কিংবা সমগ্রভাবে উম্মাহ্র নিম্ন পর্যায়ের অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য দন্ডিত করা যাবেনা। এ দায়িত্ব হচ্ছে সমগ্র উম্মাহ্ এবং তার নেতৃত্বের যৌথ দায়িত্ব। যে কোন অবস্থায় ন্যূনতম মজুরি সঙ্গত মজুরি নয়, সঙ্গত মজুরি নির্ধারিত হয় মজুরের প্রস্তুতির ধরন ও মাত্রার দ্বারা, এবং উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার দ্বারা। এ ক্ষেত্রে সরবরাহ-চাহিদার প্রাসঙ্গিকতা সামান্যই, এবং এদুটির প্রভাব কেবল সাময়িকই হতে পারে। কারণ উম্মাহ্র সকল প্রয়োজনের জন্য আবশ্যক প্রশিক্ষণ দান এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মানব সম্পদ সরবরাহ হচ্ছে ফরয-ই-কেফায়া (যৌথ দায়িত্ব)। উম্মাহ্ তার ফরয পালন করলে তাতে সরবরাহ ও চাহিদার প্রভাব অবশ্যই মুছে যাবে। কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে বিদ্যমান সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার আলোকে ন্যায়সঙ্গত মজুরির প্রশ্নটি বিবেনা করতে হবে। ন্যায়সঙ্গত মজুরির প্রশ্ন ছাড়াও অন্যান্য কারণ রয়েছে যা ন্যায়সঙ্গত মূল্যের উপর প্রভাব ফেলে এবং এই ন্যায়সঙ্গত মূল্য পূর্ব নির্ধারিত হতে পারে না।

---

৫৫. ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে কাজ করা; শাসন করা বা বিচার করার কুরআনিক আদেশের সুস্পষ্ট তাৎপর্য ইহাই (আদল, কিসত, জুলুমের উৎসাদন এবং এসব থেকে নিস্পুন্ন বিধিনিষেধ) আরও দ্রঃ *The Muslim World and the Future Economic Order* (London The Islamic Council of Europe 1979) বিশেষ করে দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৫।

৫৬. *Thoughts on Ialamic Economics* (Dacca : Bangladesh. Islamic Economics Research Bureu, 1979 Chaps 1-4 on "Distribution of Wealth"

www.icsbook.info

৫. ভোগের নীতিদর্শন

তৌহীদ থেকে জাগতিকতা স্বীকৃতির যে নীতি অর্জিত হয় তা থেকেই ভোগের বৈধতা জন্মে। ভোগ অর্থাৎ বৈষয়িক মূল্যের ধারণা বা আকাঙ্ক্ষা ও অভাব পূরণ এমন একটি বুনিয়াদী অধিকার যা জন্মগতভাবে সকল মানুষেই প্রাপ্য। এর ন্যূনতম স্তর হচ্ছে গ্রাসাচ্ছাদন বা কোনো রকমের জীবন ধারণ বোঝায় এবং এর উচ্চতর স্তর হচ্ছে এমন একটি বিন্দু যেখানে ভোগ হয়ে উঠে 'তাবজির' (আতিশয্য, অমিতাচার)। ঐ বিন্দুটিকে সেই অবস্থায় বলে বর্ণনা করা যেতে পারে যেখানে বৈষয়িক চাহিদার চেয়ে, বৈষয়িক পণ্য ভোগের পরিমাণ-নির্ধারণের মানসিক কারণগুলো অধিকতর ভূমিকা পালন করে। যেখানে সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবাই মানসিক বিষয় সেখানে আতিশয্য বা অমিতাচারের স্তরকে সেই বিন্দু বলে বর্ণনা করা যেতে পারে, যেখানে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা যেসব আশু চাহিদা সৃষ্টি করে সেগুলোর দ্বারা নির্দেশিত না হয়ে অন্য সব মানসিক চাহিদার দ্বারা ভোগ নির্দেশিত হয়। পূর্বোক্তটির একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে তার জন্য প্রয়োজনীয় বলে নয়, বরং অহমিকা বশে কোন পণ্য ক্রয় করে এবং শেষোক্তটির দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে একটি অর্কেষ্ট্রা অনুষ্ঠানের জন্য একটি টিকেট কিনে, অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য নয়, অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে যাবার জন্য। তৌহীদের আওতায় কোনো ব্যক্তি তার প্রয়োজন মত ভোগ করতে পারে। তার আয়ের বা সম্পদের অবশিষ্ট অংশ তাকে খরচ করতে হবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দানে বা ব্যয়ে কিংবা ব্যবসায়ে। আবার পুনঃনিয়োগ করতে হবে অধিক ধন উৎপাদনের জন্য এবং অন্যদের আয়ও কর্ম সৃষ্টির জন্য। যখন রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হল মুসলমানরা তাদের আয় বা সম্পদের কি পরিমাণ ব্যয় করবে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়, "বল, যা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত।"[৫৭]

এই জবাবের দ্বারা প্রকারান্তরে যেন অমিতাচারকে বর্ণনা করা হয়েছে, বাস্তব চাহিদা মেটানোর পর যা কিছু থাকবে সমস্ত কিছুই দান বা জনহিতকর কার্যে ব্যয় করতে হবে। অবশ্য এই আয়াতে যে চাহিদা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তাতে বর্ধিত উৎপাদন এবং বিনিয়োগ ও শিল্প বাণিজ্যের নতুন উদ্যোগের প্রয়োজনগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরহিত বা পরের উপকারার্থে ব্যয় পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের মত একটি সন্যতন সত্য। পৃথিবীর সকল ধর্ম এবং মানবজাতির কাছে পরিজ্ঞাত সকল নৈতিক ব্যবস্থা পরহিত বা বদান্যতাকে একটি মহৎ গুণ বলে গণ্য করেছে এবং নিজ নিজ অনুসারীগণকে এবং অন্যদেরকে তা চর্চার তাগিদ দিয়েছে। ইসলাম এই ঐতিহ্যকে বহাল রেখেছে এবং তা অনুসরণের জন্য ওহীর একটা বড় অংশ তাগিদ দিয়েছে। অবশ্য ইসলামের বিবেক আরো বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। বদান্যতার আবশ্যকতা লক্ষ্য করে লক্ষ লক্ষ দুস্থ মানুষের চিরন্তন চাহিদা, বৈষয়িক উপকরণের স্বল্পতা এবং যে

---

৫৭. তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে তাদের সম্পদের কতটুকু অংশ তারা অপরের জন্য ব্যয় করবে, বল তোমাদের প্রয়োজন মিটানোর পর যা থাকে তাই (২:২১৯)।

www.icsbook.info

আলস্যের সঙ্গে জনতা সাধারণত তাদের চাহিদা পূরণের জন্য তাদের শক্তিকে প্রয়োগ করে, সেই সব বিবেচনায় যাকাত প্রবর্তনের দ্বারা তৌহীদ দান খয়রাতকে অতিক্রম করে গেছে। ইসলাম দানকে উচ্ছেদ করেনি। পক্ষান্তরে প্রবলতম ভাষায় এর সুপারিশ করেছে এবং তার নামকরণ করেছে সাদাকা। কুরআন একে প্রতিকার বা বিশুদ্ধি[৫৮] বলে বর্ণনা করেছে যা একটি মহাপুরস্কারের পুণ্যবাহী।[৫৯] আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহকে নির্দেশ দিয়েছেন মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের বিশুদ্ধিকরণের উপায় হিসেবে সাদাকা গ্রহণ করতে।[৬০] কুরআন এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। খাস নিয়্যতে কেবলমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাদাকা দেওয়া না হলে একটি নৈতিক মূল্য হিসেবে তা দূষিত হয়ে পড়ে।[৬১]

যাকাত হচ্ছে সম্পদে অংশ গ্রহণের একটি কর, সাদাকা স্বেচ্ছামূলক, তা গ্রহীতাকে সরাসরি দেওয়া যেতে পারে, যে কোন সময়ে এবং যে কোন পরিমাণ কিন্তু যাকাত তা নয়। এটি একটি বাৎসরিক কর যা অবশ্যই রাষ্ট্র বা উম্মাহ্‌র যথাবিধি সঠিক কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে; এর হার হচ্ছে শতকরা আড়াই ভাগ এবং সমস্ত ধনের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। ন্যূনতম সম্পদ, যাকে বলা হয় নিসাব, তা বাদ দিয়ে অতিরিক্ত সমস্ত সম্পদের উপর এই কর– যা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে গচ্ছিত নয় এবং অন্যের সম্পত্তি হয়ে উঠেনি– ব্যবসায়ের সম্পদ মাল এর থেকে বাদ যাবে, বাদ যাবে যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদনের মাধ্যমসমূহ; বাড়ি এবং জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, তবে ব্যক্তিগত সম্পদ নয়, ক্যাশ, অপরিমাপ্য স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পদ নয়। যাকাত অবশ্যই রাষ্ট্রের প্রাপ্য, কারণ যাকাত সংগ্রহ এবং বিতরণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। আট শ্রেণীর লোকের মধ্যে যাকাত বিতরণ করা হবে বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, দরিদ্র, অভাবগ্রস্থ, যাকাত সংগ্রাহক, মুসাফির এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে।[৬২]

---

৫৮. মানুষ কি জানেনা যে আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যারা অনুতপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করে, তাদের গ্রহণ করেন, তাদের দান খয়রাত তিনি সাদরে গ্রহণ করেন, তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯:১০৪)।

৫৯. তাদের সম্পদ থেকে একটি অংশ গ্রহণ কর সাদকারূপে। এগুলো তাদের সম্পদকে পবিত্র করবে এবং তাদের অন্তরের সৎকর্মপরায়ণতা প্রমাণ করবে। তাদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা কর, তাদের জন্য তোমার প্রার্থনা তাদের জন্য আনবে প্রশান্তি এবং আত্মবিশ্বাস, কারণ আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (৯:১০৩)।

৬০. হে মুমিনগণ যাকাত আদায় কর, এই উত্তম কাজের যা কিছু তোমরা করবে তা আল্লাহর নিকট পাবে (২:১১০)।

৬১. হে মুমিনগণ, দানের কথা প্রচার করে এবং ক্লেশ দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করনা যে লোক দেখানোর জন্য ধন ব্যয় করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করেনা। তার উপমা একটি শক্ত পাথর যার উপর কিছু মাটি থাকে। অতঃপর তার উপর বৃষ্টিপাত তাকে ধুয়ে মুছে মসৃণ করে রেখে দেয়। তারা যা কিছু উপার্জন করেছে তার কিছুই তাদের কাজে আসবেনা আল্লাহ অকৃতজ্ঞ সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না (২:২৩৪)।

৬২. সাদাকাহ হচ্ছে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদের জন্য, যারা তা আদায় করে, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য ঋণগ্রস্থদের জন্য, আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী এবং পর্যটকদের জন্য, ইহা আল্লাহর বিধান, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (৯:৬০)।

www.icsbook.info

আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত তার সালাতের সঙ্গে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে যাকাত প্রদান। প্রকৃতপক্ষে সঙ্গে সঙ্গে, কিংবা পরবর্তী আয়াতেই যাকাতের উল্লেখ না করে সালাতের কথা কদাচিৎই উল্লেখ করা হয়েছে।[৬৩] এবং সব সময় বল। হয়েছে "মুমিন তারাই যারা ঈমান এনেছে, সালাত পালন করে ও যাকাত দেয়।"[৬৪] এর আক্ষরিক মানে হচ্ছে 'মিষ্টতা' দান যার দ্বারা এর আধ্যাত্মিক তাৎপর্যটি বুঝায়। অর্জিত সম্পত্তি একটা তেতো জিনিস যদিনা তাতে সঙ্গীদের অংশ দান করে তা মধুর করা হয়। এটা কেবল একটি কর নয়, যা একটি নৈর্ব্যক্তিক সরকার জবরদস্তি আদায় করে, এমন সব লোকের ব্যয় বহনের জন্য যাদেরকে আমরা কখনো জানতে পারবোনা। এটি এমন একটি কর যা আমরা পরিশোধ করতে বাধ্য বলেই দিয়ে থাকি। অথচ যাকাত হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতে অংশ গ্রহণের স্বআরোপিত কর্তব্য, যে কর্তব্য আমরা পালন করি, কেবল তাঁরই উদ্দেশ্যে। এটি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাতে অংশ গ্রহণ করলে দাতা আধ্যাত্মিকভাবে পুনর্বাসিত হয় এবং উম্মাহ্ লাভ করে আর্থিক শক্তি। যারা যাকাত গ্রহণ করে তারা এর জন্য কোনদিনও অসম্মান বোধ করেনা। কারণ যাকাত দান বা বদান্যতা নয়, আল্লাহই বিত্তশালীদের সম্পদে মানুষের 'হক' ঘোষণা করেছেন।[৬৫] কারণ আল্লাহর উদ্দেশ্য, এই কর্তব্যটির বহু ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে; এই ক্যাটেগরীর অধীনে রাষ্ট্রের সকল কর্তব্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে, উম্মাহ্র প্রতিরক্ষাসহ। প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি সমাজ যেখানে সকল যাকাত সংগ্রহ সরকার ব্যয় করে এই উদ্দেশ্যে, দেশের অভ্যন্তরে এবং তার সীমান্তের বাইরে। এর অর্থ এই যে, রাষ্ট্রে কোন দুস্থ দরিদ্র অথবা অভাবগ্রস্থ লোকেরই অস্তিত্ব থাকবে না। এমন কোন বন্দী নেই যাকে মুক্তিপণ দিয়ে আজাদ করতে হবে, কোন দেউলিয়া নেই যে তার মহাজনকে ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম। পরিশেষে যাকাত এবং সাদাকা মিলে এমন একটি সমাজের জন্ম দিতে পারে যা সম্ভাব্য সুবিচারে আদর্শের কাছাকাছি হতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই কুরআনে 'এতিমকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া ও দুস্থকে খাদ্য দানের বিরোধিতাকে" 'গোটা দ্বীনেরই অস্বীকৃতির" সমার্থক গণ্য করা হয়েছে। এই কারণেই কুরআনুল করিমের এমন কোন পৃষ্ঠা নেই যেখানে মুসলমানদেরকে তাগিদ দেয়া হয়নি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে তার সম্পদের অংশ তার সঙ্গের মানুষকে দিতে। তৌহীদই আর্থিক ব্যবস্থার প্রথম নীতি হিসেবে সৃষ্টি করেছিল প্রথম 'জনকল্যাণমূলক" রাষ্ট্র এবং ইসলামই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রথম সমাজবাদী আন্দোলনের জন্ম দেয়। কিন্তু ইসলাম এবং তার সারনির্যাস তাওহীদ

---

৬৩. Barakat. *Al Murshid.* s. v. salah. zakah.

৬৪. অবশ্যই সফলকাম সেই সব মুমিন যারা নিজেদের সালাতে বিনয়ী, যারা অসার ক্রিয়া কলাপ হতে দূরে থাকে, যারা যাকাত দানে সক্রিয়... (এই ওহী) নিষ্ঠাবানদের জন্য পথ প্রদর্শক যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে দান করে (২৩: ১-৪, ২: ২-৩)।

৬৫. (তোমরাই সৎকর্মপরায়ণ) যারা তাদের সম্পদে দরিদ্র এবং বঞ্চিতদের একটি অংশ স্বীকার করে (১৫:১৯)।

www.icsbook.info

সামাজিক সুবিচার ও মানবজাতির পুনর্বাসনের জন্য এর চেয়ে আরো অনেক বেশী কিছু করেছে, যে কারণে সমসাময়িক পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সর্বোত্তম আদর্শের অর্থে ইসলামের কল্যাণমূলক রাষ্ট্র এবং প্রথম সমাজবাদী আন্দোলনের বর্ণনা তাদের জন্য অবমাননাকর।

উপরে যা বর্ণনা করা হয়েছে তারপরও ইসলাম এই নীতি ঘোষণা করেছে যে, ইসলামিক রাষ্ট্র একচেটিয়া বাণিজ্য এবং মজুতদারী থেকে মুক্ত হবে। এগুলো ইসলামে নিন্দিত সম্পূর্ণভাবে এবং নিঃশর্তভাবে।[৬৬] ইসলাম দৈহিকভাবে সক্ষম বয়স্ক ব্যক্তির জন্য মদদের ব্যবস্থা করেছে, যদি সেই ব্যক্তির থাকে বহু সংখ্যক পোষ্য এবং আত্মীয়-স্বজন, এবং তাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে মজবুত করেছে শরীয়াহর উত্তরাধিকার আইনের মাধ্যমে। সংক্ষেপে, আর্থিক ব্যবহার সঙ্গে তৌহীদ তার প্রাসঙ্গিকতার দ্বারা উম্মাহ্কে এ জীবন এবং পরজীবনের সৌন্দর্যের জন্য প্রস্তুত করেছে, যাকে করআনিক ভাষায় বলা হয়েছে *আল হুসনাইন* (দুই সৌন্দর্য)[৬৭] যেখানে উম্মাহ্ এই দুটি সুখ বা কল্যাণের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়, অর্থাৎ এমন একটি নৈতিকতামন্ডিত পন্থায়, পৃথিবীতে বৈষয়িক, মনস্তাত্তিক এবং আত্মিক সুখের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের নিশ্চয়তা রয়েছে, তখন সে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয় এবং তার নেতৃত্ব উম্মাহ্র আস্থার সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হয়। উম্মাহ্র একজন সদস্য হিসেবে একজন মুসলিম সব সময়ই প্রস্তুত থাকেন পরিচালিত, নির্দেশিত, সৈন্যশ্রেণীভূক্ত এবং সমাবিষ্ট হতে। এমন কি, রেজিমেন্টেড হতেও, যখন তা সম্পূর্ণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তার নিজেদের এবং তার সঙ্গীদের দুই কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য। তার চল্লিশ বছর গড়পড়তা উৎপাদনশীল জীবনকালে, তার উৎপাদনশীলতার সময়ে এবং তার শৈশবে তার ভরণপোষণের জন্য তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশী উৎপাদনী শক্তি থাকা দরকার। এমন সুন্দর সুষ্ঠুভাবে আর্থিক জীবনের বিন্যাস করতে হবে যাতে উভয়বিদ কল্যাণ ও সুখ নিশ্চিত হয়। যদি তা না হয় তার অপরাধ ব্যক্তি কিংবা প্রকৃতির নয়, তার জন্য উম্মাহ্র নেতৃত্ব এবং তার শাসকবর্গই দায়ী। কিন্তু ইসলাম দ্ব্যর্থহীনভাবে শিক্ষা দিয়েছে যে, জনগণ তার নেতাদের চেয়ে বেহতর নয়। তাই চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্যর্থতা হচ্ছে যৌথ উম্মাহ্র যার অধিকতর মৌলিক পরিবর্তন আবশ্যক, সরকার পরিবর্তনের চেয়ে।

---

৬৬. (ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য) যে ধন সম্পদ সঞ্চয় করে ও পুঞ্জীভূত করে (১০৪ : ২) ... যারা স্বর্ণ এবং রৌপ্য স্তূপীকৃত করে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তাদের জন্য মহাশাস্তি ঘোষণা কর (৯:৩৪)।

৬৭. বল হে মুমিনগণ, আমাদের উপর কিছুই আপতিত হবেনা, দুটি কল্যাণের একটি ছাড়া (শাহাদাত এবং জান্নাত, অথবা জয় এবং শত্রুর উপর বিজয়), অথচ তোমাদের জন্য আমরা প্রত্যাশা করি মর্মন্তুদ শাস্তির যা তোমাদের উপর আপতিত হবে, সরাসরি আল্লাহর পক্ষ হতে অথবা আমাদের হাত দ্বারা (৯:৫২)।

www.icsbook.info

দ্বাদশ অধ্যায়

বিশ্ব ব্যবস্থার মৌলনীতি

১. বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব

আল্লাহ যেহেতু এক এবং একক, সে কারণে তার সকল আদেশই সকল মানুষের জন্য বৈধ। এই বিশ্বজনীনতা কর্তা হিসেবে অর্থাৎ আদেশ পালনকর্তা হিসেবে মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আবার কর্ম হিসেবেও মানুষের বেলায় প্রযোজ্য যাদের মধ্যে আল্লাহর আদেশগুলো পূরণ হয়। এর পূর্বে মানুষ একত্র হয়েছে রেস্ (নরগোষ্ঠী) অথবা সংস্কৃতির ভিত্তিতে কিংবা উভয়ের ভিত্তিতে। ইসলাম মানবিক মিলনের এক অভিনব ভিত্তি স্থাপন করেছে, উম্মাহ হচ্ছে সেই ভিত্তি।

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি দৃষ্টি, ইচ্ছা এবং কর্মের ত্রয়ী ঐকমত্য হচ্ছে উম্মাহ, যাতে কেবল মুসলমানরাই একমত হবে বলে আশা করা হয়। তৌহীদ যে বিশ্বজনীনতা বুঝায় তা একটি নতুন বিন্যাস দাবী করে। যেহেতু মুসলিম উম্মাহ একটি নতুন সমাজ, যার ভিত্তি গোত্র বা রেস নয় বরং ধর্ম, তাই আশা করা হয় অমুসলমানরাও এই নীতিই অনুসরণ করবে, অর্থাৎ তারা গোত্র এবং রেসের বন্ধন অতিক্রম করে ধর্মের ভিত্তিতে নিজেদেরকে সংগঠিত করবে। আধুনিক প্রাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যম ধর্মকে মনে করে পশ্চাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানব সংহতির অচল বিভেদমূলক ও সংকীর্ণ নীতি। কিন্তু ধর্ম তা মোটেই নয়। এখনো পৃথিবীতে মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ধর্ম। ধর্মেই আমরা পাই মানুষের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংজ্ঞা। খ্রীষ্টিয়ান চার্চের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য জাতিগুলোর দীর্ঘ এবং তিক্ত সংগ্রাম ধর্মের এই অপখ্যাতির জন্য দায়ী[১] যেহেতু চার্চের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেছে রাজার প্রতি আনুগত্য, নৃতত্ত্বকেন্দ্রীকতা এবং জাতীয়তাবাদের শক্তিসমূহ।[২]

তাই মিলনের ভিত্তি হিসেবে এবং ধর্মের উদ্দিষ্ট বিশ্বজনীন সমাজের বুনিয়াদ হিসেবে ধর্ম পরিত্যক্ত হয়েছে এবং চার্চের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের জন্য নিন্দিত হয়েছে। তাই পাশ্চাত্য মন এনলাইটেনমেন্টের আদর্শে মুখ ফিরিয়েছে। বিশ্বজনীন সম্প্রদায়ের আদর্শের দিকে যেখানে চর্চের একই আদর্শ অনুসৃত হল কেবল যুক্তির ভিত্তিতে, ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। পরে আবার সে আদর্শ পরিত্যক্ত হয়, কারণ বৈপ্লবিক ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের মোবাবেলায় পশ্চিমা জগৎ তা সমর্থন করতে গিয়ে স্নায়ুর শক্তি হারিয়ে ফেলে।

---

১. এর প্রধান কারণ হচ্ছে, রোমান ক্যাথলিক চার্চের দূর্নীতি, যাদের যাজক নেতৃত্ব তাদের ইউরোপীয় প্রজাদের শাসন করতো। তাদের কাছ থেকে জবরদস্তি ধন-সম্পদ আদায় করতো এবং তা ব্যয় করতো তাদের নিজেদের স্বার্থে ও রোমের নান্দনিক পুনর্গঠনের জন্য।

২. Reinhold Niebuhr. *An Interpretation of Christian Ethics* (New York Harper. 1935) c,ov. 91. 235-244

www.icsbook.info

ইসলাম পৃথিবীকে দেখতে চেয়েছে বাস্তবতা সম্পর্কে তার নিজের ধারণা, তার নিজের আদর্শ, তার স্বজন ও বংশধরদের ও মানব জাতির চূড়ান্ত গন্তব্য সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে, আর এ সমুদয় নিয়েই গঠিত ইসরাম। ইসলাম অমুসলমানদের কাছ থেকে এ ধরনের একটি সত্যকে প্রত্যাহার কববেনা যা দ্বীনের উপর ভিত্তি করে নিজেদের সংগঠিত করে পালন করে থাকে। পক্ষান্তরে, ইসলাম এ তাগিদ দেয় যে তারা একইরূপ সম্মান ও মর্যাদা ভোগ করবে অন্য কোন ভিত্তির উপর নিজেদের পরিচয় দিতে বা সমাজ গঠনে অস্বীকৃতি জানিয়ে; বস্তুত এটা ইসলামের জন্য আরো সম্মাজনক যে, যারা ইসলাম অনুসরণ করবেনা তাদের পার্থিব জীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোতে প্রতিযোগী হিসেবে দেখে এবং তাদের কেবল এই সব প্রশ্নের জবাবকে কেন্দ্র করে গঠিত সমাজ বলেই গণ্য করে।[৩]

হিযরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলমানদেরকে দ্বীনের ভিত্তিতে একটি সংগঠনরূপে সংগঠিত করেন। তিনি 'আওস' এবং 'খাজরাজ' গোত্র দুটিকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং তাদেরকে সংঘবদ্ধ করেন, কোরাইশের সেই সব গোত্রীয় লোকদের সাথে, যাদেরকে তিনি মদীনায় পাঠাতে শুরু করেছিলেন। তদুপরি তিনি আজাদ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন দাসদের সঙ্গে, প্রভুকে তার প্রজার সঙ্গে, তাদের সকলের জন্য সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে আল্লাহর আইনকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় কায়েম করেছিলেন। সমভাবেই তিনি তাদের উপর নিজেকে স্থাপন করেছিলেন রাজনৈতিক ও বিচার বিষয়ক প্রধান হিসেবে। কিন্তু ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মদীনায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুসলমান ও ইহুদীদের জন্য একটি সনদ ঘোষণা করেন, যে চুক্তিতে মুসলমান ও ইহুদীরা আবদ্ধ হবে এবং তদনুসারে তাদের জীবনকে গঠন করবে। এই সনদটি ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান এবং বিশ্ব ব্যবস্থার গঠনতন্ত্র, মানবজাতির জন্য যে ব্যবস্থার নির্মাণ হচ্ছে ইসলামের লক্ষ্য। এই সংবিধান বলবৎ করার মানেই ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রবর্তন এবং তৎসহ বিশ্ব ইতিহাসে একটি প্রতিযোগী আন্দোলন হিসেবে ইসলামের ঘোষণা। এই শেষোক্ত বিবেচনায় উদ্দীপিত হয়ে খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ঘোষণা করেন যে, এই দিবসটি হচ্ছে ইসলামী ইতিহাসের সূচনা, ইসলামের সময়কে হিসেব করার শুরু। মূলত[৪] সংবিধানটি ছিলো একটি সনদ যার বলে সৃষ্টি হল ইসলামী রাষ্ট্র, এই সনদ বা চুক্তি হল রাসূলুল্লাহ (সা.), মুসলিমগণ এবং মদীনার ইহুদী ও বিভিন্ন গোত্রের লোকদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

---

৩. এ হচ্ছে জিম্মি শ্রেণী সম্পর্কে শরীয়াহর বক্তব্যের তাৎপর্য। ইসলাম মানুষের সংজ্ঞা দিয়েছে তাদের ধর্মীয় আনুগত্যের বিচারে, যারা মুসলিম ছিলোনা, তাদেরকে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছিলো তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে, যে সম্প্রদায়গুলো নিয়ে গঠিত ছিলো যৌথ অস্তিত্ব। ইসলামী আইনের অর্থে পূর্ণ আইনগত ব্যক্তিত্বসহ।

৪. একাজ করে, ইসলাম একটি নতুনত্বের অবতারণা করে যা কিছু পূর্ববর্তী সকল ধর্ম থেকে পৃথক। যে সব ধর্মের জন্য ধর্মপ্রবর্তকের জন্ম অথবা মৃত্যু কিংবা তাঁর নবুয়তের 'সূচনাকেই, তাদের কালের সূচনা গণ্য করা হতো' ইহা ইহুদী ধর্ম থেকে ছিলো একইভাবে ভিন্ন, কেননা ইহুদী ধর্ম নির্বিচারে সৃষ্টির একটি তারিখ নির্ধারিত করে এবং সেই বিন্দু থেকে সকল সময়ের হিসাব করে।

www.icsbook.info

এই সনদের গ্যারান্টার হচ্ছেন আল্লাহ নিজে যার নামে তা প্রবর্তিত হল, এই সনদ প্রথমে গোত্রীয় আনুগত্যের পরিচয়ে দল গঠনের পদ্ধতিকে উচ্ছেদ করে এবং কর্তব্য, অধিকার ও দায়িত্বকে গোত্রের প্রতি আনুগত্য হিসেবে প্রকাশ করার নিয়ম রহিত করে। গোত্রবাদের স্থানে এই সনদ দ্বীনকে প্রথম নীতি হিসেবে স্থাপন করে এবং তার অধীনে বিভিন্ন গোত্র সামাজিক মর্যাদার এবং নানা জাতের লোকদের সংঘবদ্ধ করে। তখন থেকে সকল মুসলমান হল একটি মুক্ত, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত উম্মাহর সদস্য, যার সামাজিক ঐক্যবন্ধন হচ্ছে ইসলাম।[৫] মুসলমানদের উম্মাহর পাশাপাশি ছিল আর একটি উম্মাহ-ইহুদী উম্মাহ। মুসলমানদের মত তারাও নিজেদেরকে গঠন করবে একটিমাত্র পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত সত্তায় তাদের গোত্রীয় আনুগত্য উপেক্ষা করে। তাদের উম্মাহ শাসিত হবে ইহুদী (তাওরাত) আইন দ্বারা এবং এর সদস্যদের জীবন পরিচালিত হবে রাব্বিগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত ইহুদী ধর্মের বিধিবিধান দ্বারা। ইসলামে রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে ইহুদী উম্মাহর সুরক্ষা, রাব্বিনিক আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা, এবং এর কল্যাণ ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা, শান্তি ও পরিবেশের ব্যবস্থা করা।

ছয় বছর পরে দক্ষিণ আরবের নাজরানের খ্রীষ্ঠানরা মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা.) সঙ্গে সাক্ষাত করে ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করার জন্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে অভিনন্দিত করে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান, তাদের মধ্যে যারা ইসলাম কবুল করলো, তারা মুসলিম উম্মাহর সামিল হয়ে গেল, কিন্তু যারা খ্রীষ্ট ধর্ম ত্যাগ করলনা রাসূলুল্লাহ তাদেরকে ইহুদীদের মত আর একটি উম্মায় সংগঠিত করলেন, তাদের জন্য একই অগ্রাধিকার এবং কর্তব্যের নিশ্চয়তাসহ। পরবর্তীকালে খলিফারা একের পর এক একই মর্যাদা দিয়েছেন ঘোরাস্ত্রীয়, হিন্দু এবং বৌদ্ধগণকে। ইসলামী রাষ্ট্র সম্প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নওমুসলিমরা মুসলিম উম্মাহ্র পরিসর স্ফীত করে তোলে, এবং যারা ইসলাম কবুল করলনা তারা ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য উম্মাহ্র সদস্য রয়ে যায়। প্রথমোক্তগণ ইসলামী রাষ্ট্রের পদাংক অনুসরণ করে, ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে নওমুসলিম লোকদের অন্তর্ভুক্ত ও অঙ্গীভূত করে নেয় এবং নতুন ব্যবস্থার নাগরিক হিসেবে তাদেরকে পুনর্বাসিত করে। প্রথম দিকের কয়েক যুগ পর ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক আঞ্চলিক সম্প্রসারণের পর ইসলামী রাষ্ট্রে বিপুল পরিমাণে সংখ্যাগুরু ছিলো অমুসলিমরা। রাষ্ট্রের সেবাযত্নের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের বিষয়বস্তু ছিলো এইসব অমুসলিমের ভবিষ্যত এবং নিশ্চয়তা, তাদের কল্যাণ এবং প্রতিষ্ঠাসমূহ।

আজকের দিনে জাতি অর্থে যাকে 'ষ্টেট' বলা হয়, সেই অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র একটি রাষ্ট্র নয়। ইসলামী রাষ্ট্র একটি সমজাতিক সমগ্র নয়, একটি জাতীয়তামূলে সংহত একক

---

৫. এই তোমাদের উম্মাহ এক, ঐক্যবদ্ধ এবং অবিভাজ্য এবং আমি তোমাদের রব রাব্ব, আমার ইবাদত কর (২১:৯২)।

www.icsbook.info

নয়। সম্প্রদায় শব্দটির সংজ্ঞাবদ্ধ সদস্যদের একটি সম্প্রদায় নয়, যার একমাত্র যৌক্তিকতা হচ্ছে সকল বিষয়ের মানদন্ড হিসেবে এর প্রতিরক্ষা ও খিদমত। ইসলামে রাষ্ট্র ছিল একটি সুদৃঢ় কেন্দ্র, যার প্রতিরক্ষার পেছনে ছিলো একটি প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি এবং একটি মুসলিম উম্মাহর সমর্থন ও স্বায়ত্বশাসিত ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের একটি ফেডারেশনের সহযোগিতা, যে সম্প্রদায়গুলোর প্রত্যেকটিরই ছিলো নিজস্ব ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তাদের সকলের উপর ছিলো ইসলামী রাষ্ট্র, তবে তার ক্ষমতা ছিলো কেবল নির্বাহী ক্ষমতা। রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিলনা। রাষ্ট্র নিজেকে যে আইনের অধীন মনে করতো তা হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত, তার অভিপ্রায়কে কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, পৃথিবীতে রাষ্ট্রের মিশন হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র তার সম্প্রসারণ এবং তাতে করে সকল মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের ভিত্তিতে একত্রীকরণ, কেননা আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন গোত্র, জাতিতে বিভক্ত করেছেন, পরিচয়ের সুবিধা এবং সহযোগিতার জন্য।[৬] ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব হচ্ছে আইনের, রাষ্ট্র তার সকল প্রতিষ্ঠানসহ এই আইনের নির্বাহী শক্তিমাত্র। এই ঐশী আইন রাষ্ট্রের মিশন হিসেবে বিধান দিয়েছে এই পৃথিবীকে এবং মানবজাতিকে আল্লাহ তাঁর প্রত্যাদেশ মারফত যে নমুনা দিয়েছেন সেই নমুনার আদলে রূপান্তরিত করতে।

ইসলামী রাষ্ট্র খ্রীষ্টান, ইহুদী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রের গঠনকারী উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতেই কেবল বাধ্য নয় বরং সমগ্র মানবজাতিকেই ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্গত করা তার দায়িত্ব। তাই অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানে এমন একটা জীবন ব্যবস্থার সুযোগ থাকবে যেখানে সকল সম্প্রদায় শান্তিতে বসবাস করবে পুরো ন্যায় নিষ্ঠার সঙ্গে এবং একে অপরের সঙ্গে নানা কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সাথে। ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানে এ সকলেরই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক. ইসলামে শান্তি

ইসলাম যে নতুন বিশ্বব্যবস্থা পেশ করেছে তা হচ্ছে শান্তির ব্যবস্থা, পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য যুদ্ধ এবং শত্রুতার চির অবসান ঘটাতে হবে। এই শান্তি সকলের জন্য, এবং ব্যক্তি ও গ্রুপ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য এই শান্তির দ্বার অবারিত। আল্লাহ মুসলমানদেরকে আদেশ করেছেন, "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা শান্তিতে প্রবেশ কর সম্পূর্ণভাবে এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা।"[৭] তিনি তাদেরকে আদেশ করেছেন সকল মানুষকে শান্তির দিকে আহ্বান করতে। "যদি তারা (বিরোধীগণ) শান্তির প্রতি আগ্রহশীল হয়, তোমরাও শান্তি অনুসরণ কর এবং আল্লাহতে বিশ্বাস

৬. আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সেই হচ্ছে সবচেয়ে মহৎ যে সবচেয়ে ন্যায়নিষ্ঠ (৪৯ : ১৩)।

৭. যে মুমিনগণ, তোমরা শান্তিতে প্রবেশ করো পূর্ণভাবে এবং ব্যতিক্রমহীনভাবে শয়তানের আদর্শ অনুসরণ করোনা, সে তোমাদের প্রকাশ শত্রু (২:২০৮)।

www.icsbook.info

স্থাপন কর।"[৮] শান্তির ব্যবস্থা প্রদান করতে হবে সকল মানুষকে এবং প্রত্যাশা করা হয় যে, সকলেই তা গ্রহণ করবে এবং সর্বান্তকরণে সকলে শান্তিতে প্রবেশ করবে, শান্তির প্রস্তাব পত্যাখ্যান করা যাবেনা। যদি কেউ প্রত্যাখ্যান করে তবে বুঝতে হবে সে দল শান্তি চায়না এবং তা যুদ্ধ ঘোষণারই সামিল। নিদেনপক্ষে অবস্থা এই হতে পারে যে, শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান দ্বারা বুঝাতে পারে, যে দল শান্তির প্রস্তাব দিয়েছে বিরোধী দল তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপনে অনিচ্ছুক। কিন্তু এ ত 'আইসোলেশনিজম' বা অন্যদের থেকে দূরে সরে থাকা; এই বিকল্প কিন্তু যুদ্ধের মতই নিন্দনীয় যদিও তা হিংসাত্মক নয়। কারণ এতে শান্তির দাবীর প্রতি তাচ্ছিল্য বুঝায়। যে দাবী উত্থাপিত হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অথবা এর দ্বারা বুঝায় ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আদান প্রদানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের জনগণকে নিরাপদ রাখার বাসনা। ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই দুই বিকল্পের জন্যই শান্তি হচ্ছে জবরদস্তি মূলক জবাব; প্রথম, যে কোন জনের পক্ষ থেকে শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা অমানবিক কাজ এবং দ্বিতীয়ত, যে লোকগুলোকে এ ধরনের আদান প্রদানের জন্য আহ্বান করা হয়েছে তাদের মর্যাদার জন্য তা অপমানজনক। বস্তুত নর-নারী নির্বিশেষে কেউ যাতে অন্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা না করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কোন মানুষকে একটা নিরেট পর্দার অন্তরালে আড়াল করা তার সততার বিশ্বাসযোগ্যতার উপর আক্রমণ এবং সে কারণে এরূপ কর্ম সেই লোকের বিরুদ্ধে একটি আগ্রাসী কার্য। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের সঙ্গে প্রকল্পিত আদান প্রদান হতে পারে ব্যবসায়িক এবং সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে, যা অন্য রাষ্ট্র আপত্তিকর মনে করতে পারে, কিন্তু তাতে সম্ভাব্য ভবিষ্যত সম্পর্কগুলোর সম্ভাবনা ফুরিয়ে যায়না। সকল অ[illegible] এবং সামাহিক আদান প্রদানের পরও রয়েছে ইসলামের এই আদর্শগত দাবী যে, বিশ্বশক্তির একটি নতুন ব্যবস্থা হচ্ছে মানব জাতির অধিকার, যোগাযোগের এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে মানুষ আদান প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাধীন। অন্যের কথা শুনতে ও অন্যকে তার কথা শোনাতে, অন্যকে সত্যের ব্যাপারে বিশ্বাসী করতে এবং অন্যের দ্বারা নিজে বিশ্বাসী হবার বেলায় সে বাধাহীন, তার সামনে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবেনা। ইসলামী রাষ্ট্র তার সনদ দ্বারা বাধ্য আল্লাহর কালাম ঘোষণা করতে, এর দাবী এই যে, তার কথা শুনতে হবে। বাণীটি গৃহীত হল কি, না হলো, তা একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার, যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পছন্দের ব্যাপারে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন, কিন্তু অন্যের কথা না শোনার ব্যাপারে মানুষ স্বাধীন নয়। এধরনের প্রত্যাখ্যান যখন দায়িত্বশীল রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আসে, তখন তা হয়ে দাঁড়ায় তাদের নেতাগণ কর্তৃক জনগণের অবমাননা এবং ইসলামের বিচার সম্মত দাবীর প্রতি একটি অযৌক্তিক প্রতিক্রিয়া।

---

৮. এবং শত্রু যদি শান্তির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে তোমরাও শান্তি অনুসরণ কর এবং আল্লাহতে বিশ্বাস করো, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (৮:৬১)।

www.icsbook.info

খ. জাতি সম্পর্কিত ইসলামী বিধান

যদি ইসলামী রাষ্ট্রের সনদের শান্তির প্রস্তাবের উত্তরে কোন একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্র ইতিবাচক সাড়া দেয়, তাহলে সেই রাষ্ট্র ইসলামের শান্তিতে বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সদস্যপদের জন্য নির্ধারিত সকল অধিকার এবং প্রাধিকার লাভের অধিকারী হয়ে উঠে। এভাবে যে সদস্য নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রবেশ করল তার রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ অক্ষুন্ন থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে, এ এগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের প্রটেকশনের দাবীদার। এখন থেকে হিংসা বা বিপ্লবের মাধ্যমে কিংবা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সম্মতি ছাড়া এগুলো পরিবর্তন করা যাবেনা। এই সব প্রতিষ্ঠানের রায় ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা, সর্বোপরি আইন আদালতের রায়ও সিদ্ধান্ত লংঘনের পরিণামে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গে বলবৎ হবে। সেই জনগোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহ তাদের নিজেদের আইন দ্বারা শাসিত হবে। জনগণ তাদের নিজেদের ধর্মের নীতিমালার আলোকে তাদের নিজেদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কিংবা যথাবিধি গঠিত ও নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাখ্যার আলোকে তাদের নিজেদের জীবন অবাধে যাপন করবে। সকল মানুষকে আল্লাহর দিকে, তার দ্বীন ইসলামের দিকে আহ্বান করা মুসলমানের কর্তব্য বলে, এইসব নতুন নাগরিকের সঙ্গে মুসলমানরা সম্পর্ক স্থাপনে চেষ্টা করবে তাদের সঙ্গে ইসলামের বিষয়ে আলাপ আলোচনার আহ্বান জানাবে। অবশ্য নতুন নাগরিকদের প্রতি এবং তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। আল্লাহ মুসলমানদের আদেশ করেছেন দয়া ও সহানুভূতির সঙ্গে অমুসলমানদের কাছে ইসলামকে পেশ করতেঃ মানুষকে তোমার প্রভুর দিকে আহ্বান কর হিকমত ও সৎ উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সৎভাবে।[৯] যদি তারা ইসলামের এই দাওয়াত গ্রহণ করে, তারা হবে মুসলমানদের ভ্রাতা ও ভগ্নী। আর যদি গ্রহণ না করে, তাদের সিদ্ধান্তকে সম্মান করতে হবে এবং কোন অবস্থাই তাদের উপর পীড়ন করা যাবেনা। সর্বোপরি তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করার প্রয়াসে জবরদস্তি, প্রতারণা, প্রলোভন বা ঘুষের আশ্রয় নেয়া চলবেনা। আল্লাহর আদেশ সম্পূর্ণই স্পষ্টঃ "দিনের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই।" (কুরআন ২:২৫৬)। কোনো ব্যক্তিকে দীক্ষিত করার জন্য জবরদস্তি, বা উৎকোচের আশ্রয় নিলে আল্লাহর গজব নেমে আসবে। অধিকন্তু ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে এর কোন বাধ্যবাধকতাই নেই। যেখানে ইসলামী রাষ্ট্রের নতুন নাগরিকদের সংঘর্ষ বাধে পুরনো নাগরিকদের সঙ্গে, সেখানে বাদী এবং বিবাদী প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ উম্মার আশ্রয় নিতে পারে। আদালত শুনানীর পর এই নীতিকে সম্মান করতে এবং তদনুসারে বিচার করতে বাধ্য হবে। যেখানে বিবাদের কারণটি সুস্পষ্ট নয় সেখানে উভয় পক্ষের সর্বোত্তম স্বার্থের খাতিরে এবং তাদের নিজ নিজ উম্মাহর ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে একই আদালত বা উচ্চতর আদালতে এর মীমাংসা করতে হবে।

---

৯. তোমাদের প্রভুর প্রতি আহ্বান করো প্রজ্ঞা এবং সুন্দর শোভন প্রচারের মাধ্যমে। অবিশ্বাসীদের সঙ্গে উত্তম যুক্তি তর্কসহ কথা বলো (১৬:১২৫)।

www.icsbook.info

আইনের প্রক্রিয়ার সুযোগ গ্রহণের জন্য শরীয়াহ প্রত্যেকের অধিকারই স্বীকার করে। ব্যক্তি হউক কিংবা গ্রুপ হউক, নতুন নাগরিকেরা আইনের সাহায্য নিতে পারে। অভিযোগটি অন্য কোনো মুসলিম ব্যক্তি, গ্রুপ, এমনকি খোদ ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হলেও তাতে কিছু আসে যায়না। অমুসলিম উম্মাহর যে কোন সদস্য খলিফা, ইসলামী রাষ্ট্র, মুসলিম উম্মাহ বা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করতে পারে। ইসলামী আদালত স্বভাবতই এই অভিযোগ গ্রহণ করতে এবং আইন অনুসারে তা বিচার করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

প্রকৃতপক্ষে কোনো ইসলামী আদালতে অভিযোগ পেশ করার জন্য বাদীর ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া মোটেই আবশ্যক নয়। পৃথিবীর সকল মানুষ, মুসলিম এবং অনাগরিকসহ সকলে ইসলামী বিচারালয়ে অভিযোগ পেশ করতে পারে। ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের এটি একটি মহৎ শ্রেষ্ঠত্ব যে, এ আইন কেবল সার্বভৌম জাতিসমূহের অধিকারই স্বীকার করেনা, একইভাবে ব্যক্তিবর্গের অধিকারও স্বীকার করে। এর ব্যাখ্যা এই যে, ইসলামী আইন তার লক্ষ্য হিসেবে বিভিন্ন ব্যক্তির স্বার্থে ন্যায় বিচারের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছে, অথচ পাশ্চাত্য আন্তর্জাতিক আইন বিভিন্ন সার্বভৌম গ্রুপের মধ্যে সংগতি বিধানের চেষ্টা করে। গ্রুপের স্বার্থ যে ব্যক্তির স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে না পারে, সেকথা বিবেচনা না করেই– একথা প্রায়শই ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া হয় প্রবলের স্বার্থে। অসঙ্গত মনে হতে পারে যে, ইসলামী আইন অন্য রাষ্ট্রের কোনো নিঃস্ব নাগরিককে বা রাষ্ট্রপরিচয়হীন একজন নাগরিককেও গোটা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযুক্ত করার অধিকার দেয় এবং তার খলিফাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে। কিন্তু ইসলামে আদালত কর্তৃক নির্দোষ ঘোষিত ব্যক্তির জন্য ন্যায় বিচার সম্পূর্ণ ফ্রি– আদালতের ব্যয় সব সময় বহন করে অপরাধী। প্রবলপরাক্রান্ত খলিফার সম্মান এবং আরাম আয়েশের চাইতে এই নিঃস্বের সুবিচার আইনের দৃষ্টিতে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যেমন খলিফার দায়িত্ব গ্রহণের পর আবুবকর সিদ্দীক বলেছিলেন : "আমি যতক্ষণ না প্রবলের কাছ থেকে দুর্বলের অধিকার ছিনিয়ে আনতে পেরেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার দৃষ্টিতে প্রবল বা শক্তিশালী পক্ষ হবে তুচ্ছ। দুর্বল আমার দৃষ্টিতে হবে শক্তিশালী যতক্ষণ না আমি তাদেরকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে পেরেছি।"[১০]

সমভাবে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন আন্তর্জাতিক যুদ্ধে বন্দীদের পুনর্বাসনের জন্য প্রভূত যত্ন নিয়েছে। সাধারণত দেখা যায়, যুদ্ধোত্তর মীমাংসায় আলোচনার ক্ষেত্রে যুদ্ধবন্দীরা বিভিন্ন গ্রুপের দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাদের জীবন এবং ভাগ্য নির্ধারিত হয় ইউরোপীয় শক্তিগুলোর গৃহীত স্বেচ্ছাচারী কনভেশনের আওতায়। ইসলামিক আইনে এটা স্বীকৃত যে যুদ্ধবন্দীদের নিজেকে মুক্ত করার অধিকার আছে।

---

১০. Ibn Hisham. *The life of Muhammad Abyt A Guillaume* (London Oxford University Press 1955) 687

www.icsbook.info

সে নিজে এবং নিজের উদ্যোগেই মুক্তি অর্জন করতে পারে– তার নিজের আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব মুক্তিপণস্বরূপ যা দিতে পারে তার সাহায্যে অথবা বিষয় সম্পদ বা খেদমতের বিনিময়ে সে ব্যক্তিগতভাবে যা উৎপাদন করতে পারে তার বিনিময়ে। ইসলামী রাষ্ট্র যুদ্ধবন্দীর নিজের প্রদত্ত অথবা তার পক্ষে প্রদত্ত উপযুক্ত মুক্তিপণ প্রত্যাখ্যান করতে পারেনা; ইসলামী আদালত এ ব্যাপারে রাষ্ট্রকে বাধ্য করতে পারে। ইসলামে বিধান রয়েছে সকল মুসলমান ব্যক্তি এবং গ্রুপ নির্বিশেষে তাদের যাকাতের এক সপ্তমাংশ যুদ্ধবন্দীদের মুক্তপণ স্বরূপ ব্যয় করবে, যুদ্ধবন্দীরা মুসলমান হউক বা না হউক। ইসলাম একদিকে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদান মহাপুণ্যের কর্ম বলে ঘোষণা করেছে, অন্যদিকে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদানকে মহাপাপের কাফফারা বলে ইসলাম ধর্মীয় নির্দেশ ঘোষণা করেছে। যখন কোনো মহিলা যুদ্ধবন্দী গর্ভবতী হয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে তার বন্দীত্বের অবসান হয় এবং আমৃত্যু সে তার বন্দীকর্তার স্বাধীন স্ত্রীর পূর্ণ মর্যাদা ভোগ করে। ব্যক্তির জন্য এই সুবিচারের আগ্রহের ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য সম্ভাবনার পথ খুলে দেয়। ইসলামী রাষ্ট্রে ক্রয় বিক্রয়ের অধিকার তার এলাকার ভেতর দিয়ে লোক চলাচল, পণ্য ও তহবিল চলাচলের অধিকার? ইসলামী রাষ্ট্র এবং আগ্রহী পরদেশী ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ চুক্তির বিষয় হতে পারে, যাকে বলা হয় আল-ইস্তিমান। এসবের মধ্যেই ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান বিবেচনার বিষয়ের ইঙ্গিত মেলে। যেমন, ন্যায় বিচার ও সুবিচার তৎসহ মুসলিম নাগরিক অথবা অনাগরিক নির্বিশেষে প্রত্যেকের নিজের কল্যাণ, নিজের শুভ ও সমৃদ্ধি অনুসন্ধানের স্বাধীনতা– সংক্ষেপে গ্রুপ বা দলের স্বার্থের আগে ব্যক্তি মানুষের স্বার্থের স্থান। কিন্তু পাশ্চাত্য আন্তর্জাতিক আইনে গ্রুপ বা সমষ্টির স্বার্থকেই সম্মান করা হয়।[১১]

গ. যুদ্ধ বিগ্রহ

ব্যক্তি এবং গ্রুপের জন্য ইসলামী শান্তিতে প্রবেশের ফলে যে সব সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা হয় সে সমুদয়ের বিপরীতে, নতুন ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য ছাড়া কেবল মাত্র বাধ্যবাধকতাই রয়েছে। সেই বাধ্যবাধকতাটি হচ্ছে বৎসরে একবার করে সকল অমুসলিমের উপর ধার্যকৃত একটি কর পরিশোধের বাধ্যবাধকতা, এ করকে বলা হয় জিজিয়া। এই কর সকল মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক, যাকাতের চেয়ে অনেক কম। জিজিয়া সাধারণ বয়স্ক পুরুষদের উপর ধার্য করা হয় এবং কেবলমাত্র এই শর্তে যে, এই লোকগুলো এই কর পরিশোধের জন্য আর্থিক দিক দিয়ে সমর্থ। যাযকমন্ডলী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকজন, রমনীগণ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ, এই করের আওতায় পড়েনা.. তারা মুসলমান হলে তা পরিশোধ করতে তারা বাধ্য থাকতো। ইসলামী আদালতসমূহ এই আইন ঘোষণা করছে যে, খ্রীষ্টান এবং ইহুদীদের কাছ থেকে একই বৎসরে সংগৃহীত অর্থ ইসলামী রাষ্ট্র অবশ্যই ফেরত দেবে, যদি রাষ্ট্র

---

১১. দ্রঃ জাতিপুঞ্জ সনদ ১৯৪৫, একই ব্যাপার ঘটেছিলো, জাতিসংঘের ক্ষেত্রে, যা স্থান গ্রহণ করে জাতিপুঞ্জের এবং হেগের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে, যা আজও টিকে আছে।

www.icsbook.info

তাদের সীমান্ত গ্রামগুলোকে বাইজানটাইন শক্তি বা কোন অজ্ঞাত শত্রুর আক্রমণের হয়রানি থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়।[১২]

অধিকন্তু, একটি ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীতে কাজ করার জন্য অমুসলিমদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগ করা যাবেনা। রাষ্ট্র যেহেতু আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাই অমুসলমানরা সামরিক বাহিনীতে যোগ দেবে এবং প্রয়োজনবোধে তার জন্য প্রাণ দেবে, ন্যায়ের দিক থেকে তা প্রত্যাশা করা যায়না। নিশ্চয়ই সে স্বেচ্ছাসেবী হতে পারে এবং যদি সে স্বেচ্ছাসেবী হয়, তাকে মুসলিম বলে গণ্য করা হয় এবং সে মুসলমানদের উপর ধার্য যাকাত এবং তার সঙ্গে জিজিয়া– এই উভয় কর থেকেই অব্যাহতি পায়। এমন লোককে ইসলামী রাষ্ট্রে নিয়োগ দিতে পারে এবং সে সর্বোচ্চ বেসামরিক পদে উন্নীত হতে পারে এবং অনেক ইহুদী এবং খ্রীষ্টান প্রধানমন্ত্রী এমনকি উজিরে আজম পদে নিযুক্ত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের দরবারে হাস্‌দাই বিন সারপুত এবং উমাইয়াদের আমলে সারজিউদের নিয়োগ উল্লেখ করা যায়।[১৩]

যুদ্ধ ঘোষণা ও পরিচালনার জন্য ইসলামী আইন একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা দিয়েছে। যুদ্ধ ঘোষণার অধিকার নির্বাহী কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত হয়, এ অধিকার হচ্ছে আদালতের, যা সাক্ষ্য তলব করবে যখন ইসলামী রাষ্ট্র বা তার নাগরিকদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন বা অবিচার সংগঠিত হয়। নির্বিচারে হত্যা বা সম্পত্তি বিনাশ, যাযক, স্ত্রীলোক ও শিশুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে; অর্থাৎ আদালত এবং আল্লাহ কর্তৃক দণ্ডনীয় বলে ঘোষিত হয়েছে যদিনা যাযক, রমনী ও শিশুগণ যুদ্ধক্ষেত্রে সশরীরে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। সবচেয়ে বড় কথা, ইসলাম আগ্রাসনকে নিষিদ্ধ করেছে এবং সে কারণে আত্মসম্প্রসারণ, যুদ্ধলব্দ মাল অথবা ক্ষমতার জন্য যুদ্ধ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। একই দৃষ্টান্ত দ্বারা ইসলামে মুসলমানদের নিজেদের জান বিনা দ্বিধায় কোরবান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যখন ন্যায় বিচার লংঘিত হয় এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কোরবানী কর্তব্য হয়ে ওঠে। ইসলাম এই শিক্ষা দেয় যে, একটি ন্যায় যুদ্ধে কোনো মুসলমান মারা গেলে সে স্বতঃই একজন শহীদ বলে গণ্য হয়, যার জন্য বেহেস্তে স্থান নির্ধারিত। শাহাদাত হচ্ছে সর্বোচ্চ এবং মহত্তম মুকুট, যার দ্বারা কোন মানুষের জীবনকে ভূষিত করা যায়। "আল্লাহর উদ্দেশ্যে যারা জান দেয়, তাদেরকে মৃত বলোনা, তারা জীবিত যদিও তোমরা দেখনা..."[১৪] "যারা ঈমান এনেছে এবং মহানবীর সঙ্গে জেহাদ করেছে তাদের জান ও মাল দিয়ে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার এবং তারা মহাভাগ্যবান। আল্লাহ তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন জান্নাত যার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদী, ওখানেই তাদের চিরস্থায়ী আবাস।"[১৫]

---

১২. দেখুন : T. W. Arnold, *The Preaching of Islam* (Lahore : Sh Muhammad Asraf Publisher 1961) পৃ. ৬১।
১৩. Phillip K. Hitti. *History of the Arabs* (London Macmillan Co. 1963) পৃ. 195. 524
১৪. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত গণ্য করোনা। তারা আল্লাহর কাছে জীবিত এবং তিনি তাঁদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেন (৩:১৬৯)।
১৫. কিন্তু নবী এবং তাঁর সঙ্গীগণ, তাঁদের অর্থবিত্ত এবং জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছেন তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম (৯:৮৮)।

www.icsbook.info

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সৌন্দর্যতত্ত্বের নীতিমালা

১. মুসলিম শিল্পের একত্ব এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বীগণ

ইসলামী শিল্পকলার একত্ব নিয়ে বিতর্ক অর্থহীন। যদিও, ইতিহাসবিদেরা ভৌগোলিক বা কালানুক্রমিকভাবে পৃথক বিপুলসংখ্যক বিচিত্র মোটিফসমূহ উপাদান-উপকরণ এবং রীতিপ্রকরণ লক্ষ্য করে থাকেন, তবু সমস্ত ইসলামী শিল্পকলার প্রবল বাস্তবতা হচ্ছে এর উদ্দেশ্য ও রূপের একত্ব। কর্ডোভা থেকে মিন্দানাও পর্যন্ত দেশগুলো ইসলামে দীক্ষিত হবার পরই এর শিল্পকলায় একই রকম গঠনগত বৈশিষ্ট্য এবং বিকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠে। এতে দেখা যায়, রীতি বা শৈলির অগ্রাধিকার এবং অন্তহীনতার অগ্রাধিকার। সমস্ত ইসলামী শিল্পকলায় কুরআন এবং হাদীসের অতিশয় উদ্দীপক শব্দমালা, আরবী এবং ইরানী কাব্যের অথবা ইসলামী সাহিত্যের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অভিব্যক্তিগুলোর শরণ নিয়েছে এবং সেগুলো ব্যবহার করেছে আরবী লিখন শিল্প বা ক্যালিগ্রাফিতে সেসবের রূপ দিয়েছে। একইভাবে, যুগের পর যুগ ধরে সকল মুসলমান কুরআন তেলাওয়াতে এবং আযানে সাড়া দিয়েছে গভীরতম আবেগের সঙ্গে, এমন কি সেসবের আরবী অর্থ সামান্য বুঝে বা না বুঝেই। এসব ক্ষেত্রে তাদের বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গমনকারী যুক্তি এবং বিচার বুদ্ধি, বোধশক্তি সক্রিয় না হলেও তাতে ইন্দ্রিয়জ এবং ইনটুইটিভ বৃত্তিসমূহ সম্পূর্ণ সক্রিয় হয়ে ওঠে– এসথেটিক বা নান্দনিক মূল্যগুলোর মান লাভের প্রত্যাশায়। প্রকৃতপক্ষে তাদের নান্দনিক উপলব্ধি, যাদের তাত্ত্বিক উপলব্ধি পঠন এবং প্রণিধানের জন্য যথেষ্ট, তাদের এস্‌থেটিক উপলব্ধির মতই একইরূপ প্রবল– কেননা নান্দনিক মূল্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে আশু ইনটুইশন হামেশাই অগ্রবর্তী। এক্ষেত্রে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরগামী বোধশক্তি যেন একটি গৌণভূমিকা পালন করে, কেবলমাত্র সহযোগিতার হাতই প্রসারিত করে। ইসলামের নান্দনিক মূল্যের শক্তি এবং তার শৈল্পিক একত্ব, যা চূড়ান্ত রকমে স্বতন্ত্র ও বিচিত্র সাংস্কৃতিক সমাবেশের মধ্যে থেকে এমনিতরো শৈল্পিক একত্ব সৃষ্টি করে যে আটলান্টিকের পূর্ব উপকূল থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম তীর পর্যন্ত, যে পর্যটক সফর করে সে এমন একটি অঞ্চলে ভ্রমণ করে যা, এর ইসলামিক স্থাপত্যের, যা লতাপাতার শিল্পরূপ ও আরবী লিখন ও শিল্প পদ্ধতির দ্বারা অলংকৃতকরণে তা তার কাছে সুপরিচিত ঠেকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বর্ণ, ভাষা এবং জীবন পদ্ধতির মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যে লক্ষ্য ও ইসলাম যে সাহিত্যিক দৃষ্টিকার্য এবং সাংগিতিক মূল্য সৃষ্টি করেছে, সে বিষয়ে সে উপলব্ধি করে একটি অভিন্ন অনুভূতি।[১]

---

১. এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ এই বাস্তবতা যে, মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র একই এসথেটিক মূল্যগুলোর প্রাধান্য, মূল্যান্তর বিন্যাসের শীর্ষবিন্দুতে রয়েছে সুন্দর, আরবী ক্যালিগ্রাফিক, কুরআনুল কারীম

www.icsbook.info

"Misconceptions on the Nature of Islamnic Art" শীর্ষক যে প্রবন্ধটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে,[২] তাতে আমরা অলংকরণ, চিত্রণ, স্থাপত্য, সাহিত্য, সঙ্গীত এবং শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রে তথাকথিত প্রাচ্যবিদ পন্ডিতদের পান্ডিত্যের কিছু নমুনা তুলে ধরেছি। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা একজন করে জাঁদরেল পাশ্চাত্য পন্ডিত্যের মতামত নিয়ে আলোচনা করেছি, যেমন, Richard Ettinghausen. H. G. Farmer, M. S. Dimand, T. W. Arnold, E. Herzfeld, K. A. C. Creswell, G. Von Grunebaum. এঁদের প্রত্যেকরই খ্যাতির মূলে রয়েছে অংশত বা সম্পূর্ণত এক্ষেত্রে অবদানের জন্য। এদের প্রত্যেকেই এই ভ্রান্ত ধারণা, বরং বলা যায়, এই পক্ষপাতদুষ্টতার শিকার হয়েছেন যে, যুগ যুগ ধরে মুসলিম জাতির শিল্পকলায় কোন অবদান রাখা তো দূরের কথা, বিপরীত পক্ষে, ইসলাম শিল্পকলাকে বাধাগ্রস্থ বা সীমিত করেছে, এবং তাতে করে, তাদের শৈল্পিক প্রবণতাগুলোকে নষ্ট করেছে। ইসলামের নন্দনতাত্ত্বিক বিকাশের একমাত্র দৃষ্টান্ত হচ্ছে আরবী, কুরানিক আইনগুলো তর্জমার মাধ্যমে এই ঐতিহ্য ভঙ্গের মধ্যে Ethinghausen সেই মনোপলির অবসানের সূচনায় কিছুটা মজার সঙ্গে উপভোগ করেছেন। প্রত্যেকেই দেখবার চেষ্টা করেছেন অন্ধগোড়ামী থেকে মুক্ত, যে শিল্পকর্মই মুসলমানরা সৃষ্টি করেছে, তা তারা করতে পেরেছে ইসলামকে ডিঙ্গিয়ে এবং ইসলামের নির্দেশমালাকে লংঘন করে। তাদের মতে মুসলিম অভিজাত বা রাজন্যবর্গ তাদের মহলে বা পাঠাগারে মানুষ এবং জীবজন্তুর চিত্রিত প্রতিকৃতি উপভোগ করেছেন এবং এসবের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, এবং তৎসহ তারা সঙ্গীতেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, ইসলামের নির্দেশ অমান্য করে যে "সঙ্গীত মাদকতা সৃষ্টি করে এবং ব্যভিচারে উৎসাহিত করে।" তারা সামান্যই উপলব্ধি করেছেন যে, নান্দনিকতার দিক দিয়ে তথাকথিত পাপাশ্রয়ী শিল্পকলা, পুরোপুরি ইসলাম সম্মতই বটে– মুসলিম বিশ্বের শিল্পকলার সামগ্রিক সৃষ্টিকর্মের মধ্যে অনু পরিমাণ স্থান দখল করে আছে।

এদের মধ্যে কেউ কেউ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যারও প্রয়াস পেয়েছেন। প্রকৃতি শূন্যতা বরদাস্ত করেনা, এই যুক্তিতে তারা দাবী করেন যে, মুসলমান আর্টিষ্টরা তাদের সকল শিল্পকর্মের সম্মুখ ভাগ নক্সার দ্বারা আচ্ছাদিত করেছে। কেউ কেউ সম্পূর্ণ বিপরীত মত পেশ করেছেন। তাদের যুক্তি এই যে, মুসলিম শিল্পীরা রঙ বা বর্ণপাগল, যারা সাদামাটাভাবে শূন্য রংয়ের উজ্জ্বল ঝলক সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এবং এতে করে তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রতিভার জন্য যে সাধনা এবং আগ্রহ আবশ্যক তা লাঘব করে কতিপয় রংয়ের নেশায় বিনষ্ট শিল্পী শিল্পকর্মকে কেবলমাত্র মোহ সৃষ্টির প্রয়াসে পর্যবসিত করেছেন।

কপি করার পূণ্য; কুরআনের আয়াত দ্বারা মানুষের বাড়ি-ঘর, মসজিদ, সরকারী দালানকোঠা অলংকরণ, একটি মাত্রার স্বল্প কয়েকটি সুদের উপর ভিত্তি করে উৎপন্ন রাগিনীতে তা আবৃত্তি করা এবং এর বিশিষ্ট্যতুক শব্দগুলোর দ্বারা সাহিত্যিক পত্র পুস্তকাদির অলংকরণ।

২. দ্রঃ বর্তমান গ্রন্থকারের প্রবন্ধ .... "Misconception of the Nature of the Work of Art in Islam" *Islam and the Modern Age.* vol. I. No 2. (May 1970) পৃঃ ২৯-৪৯।

www.icsbook.info

দুর্ভাগ্যক্রমে এদের কারোরই একথা কখনো মনে হয়নি যে, তারা পাশ্চাত্য শিল্পকলার লক্ষ্য ও মান অনুযায়ী ইসলামী শিল্পকলার বিচার করছেন, এবং কখনো কেউ এই অভিযোগটি উত্থাপন করেননি। মুসলিম সংস্কৃতির প্রকাশক শিল্পকর্মের যে ব্যাখ্যা তারা দিয়েছেন তা বিভ্রান্তিকর, মানুষের এতে হাসি পায়। Titus Burckhardt এবং Louis Massignon এর ব্যাখ্যায় সত্যদর্শনের সাফলের ঝলক এবং ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে Earnst Kuhnel এর ঠাণ্ডা আত্মসংযমকে বাদ দিলে, ইসলামী আর্টের ইতিহাসবিদেরা একমত হয়ে পাশ্চাত্য নতুন তত্ত্বের আলোকে ইসলামী শিল্পকর্মের বিচার করেছে। এদের প্রত্যেকেই হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছেন এমন এক শিল্পকর্মে যাতে কোনো প্রতিমা, প্রতিকৃতি নেই। নাটক নেই, প্রকৃতিবাদ নেই, তাদের গ্রন্থাদি পাঠ করে তাতে প্রত্যেকেই বিভ্রান্ত হন, কারণ তারা এতে পাশ্চাত্য শিল্পের এমন কিছুই পাননা যার সঙ্গে ইসলামী শিল্পকর্মকে সম্পৃক্ত করতে পারেন। তারা বিভ্রান্ত যে, আধ্যাত্মিক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে ইসলামী শিল্পকর্মের উপর তারা তাদের আগাম রায় দিয়ে বসেছেন।

আর একটি প্রবন্ধনের মাধ্যমে[৩] আমরা গ্রীক শিল্পের প্রকৃতি এবং আলেকজান্ডারের অভিযানের পর থেকে গ্রীক-শিল্পের প্রতি নিকটপ্রাচ্যের শিল্প ঐতিহ্যের প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছি। গ্রীক শিল্পের সারকথা হচ্ছে প্রকৃতিবাদ, তবে একথা মনে করা ঠিক হবেনা যে গ্রীক শিল্প প্রকৃতির সরল ফটোগ্রাফিক অনুকরণমাত্র, বরং এ হচ্ছে একটি প্রাকসিদ্ধ ধারণার ইন্দ্রিয়জ সম্পদের প্রতিরূপ, যে ধারণাটিকে প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণার অংশত তাৎক্ষণিক রূপ। প্রকৃতি তার প্রত্যেকটি সৃষ্টির মধ্যে স্থাপন করেছে সনাতন গ্রীক সংস্কৃতির পর্বতশীর্ষ এলাকায় দীর্ঘসরু উঁচুভূমির অনুরূপ একটি ধারণা। তার থিওরির মতে, পাথর কেঁটে মানুষের প্রতিমা নির্মাণ হচ্ছে সর্বোচ্চ শিল্প। মানুষের সম্পর্কে ধারণা হচ্ছে, সে প্রকৃতির সবচেয়ে ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং সবচেয়ে জটিল entelechy. এর গভীরতা এবং অন্তর্গত বৈচিত্র হচ্ছে শিল্পীর অনুসন্ধান আবিষ্কার ও প্রকাশের জন্য একটি অন্তহীন খনি। এই কারণেই মানুষ হচ্ছে "সমস্ত বিছুর বিচার ও পরিমাপের মানদন্ড"। সে সৃষ্টির চূড়া সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সকল প্রকার মূল্যের বাহক ও কংক্রীট রূপদাতা। এ কারণে খোদ ঐশী সত্ত্বাকে ধারণা করা হয়েছে তার প্রতিমূর্তিতে, ধর্মকে মনে করা হয়েছে মানবতাবাদ এবং ঐশী সত্ত্বার উপাসনা হয়েছে মানুষের অন্তরতম প্রকৃতির অন্তহীন গভীরতা এবং বৈচিত্রের অনুধ্যান। গ্রীক বা হেলেনিক সংস্কৃতির এই সার নির্যাসের প্রতিফলনই সমগ্র হেলেনিক সভ্যতার শিল্পের জন্য আবশ্যক হয়ে উঠেছিলো।

নিকটপ্রাচ্য আমাদের সামনে উপস্থাপন করে একটি সম্পূর্ণ বিপরীত ঐতিহ্য। এখানে মানুষ হচ্ছে ঐশী সত্ত্বার একটি নিমিত্তক মাত্র, যাকে স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন ইবাদত করার জন্য। মানুষ কখনোই নিজেই কোন চরম লক্ষ্য নয় এবং নিশ্চয়ই কোনো কিছুর

---

৩. দ্রঃ বর্তমান গ্রন্থকারের প্রবন্ধ .... "On the Nature of the Work of Art in Islam" *Islam and the Modern Age*. vol. I. No 2. (August 1970) পৃঃ ৬৪-৮১।

www.icsbook.info

পরিমাপের মানদন্ড নয়। মানদন্ড ঐশী সত্তা স্থাপন করেন। এই মানদন্ড থেকে নিষ্পন্ন বিধিবিধানসমূহ মানুষের জন্য আইন। এখানে কোনো প্রমিথিউস নেই, স্রষ্টার ভূমিতে আছে কেবল একজন দাস বা ভৃত্য, যে আদেশ পালন করলে আশীষ লাভ করে, আদেশ পালনে ভুল করলে আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয় এবং আদেশ লংঘন করলে ধ্বংস হয়। অবশ্য আল্লাহর ঐশীত্ব হচ্ছে একটি *mysterium,* একটি *tremendum* এবং একটি *fascinosum*। একারণে আল্লাহর ঐশী হচ্ছে মানুষের একটি আবিষ্টতা, তার স্থির ধারণা, তার সার্বক্ষণিক চিন্তা হচ্ছে এই ঐশী অভিপ্রায় কি এবং তা কিভাবে কাজ করে; আল্লাহ কেন্দ্রীকতাই হচ্ছে তার ভাগ্য। এ থেকেই মানুষ অর্জন করে তার তাৎপর্যতার গৌরব এবং তার বিশ্বজাগতিক মর্যাদা। অপরিহার্যভাবেই তাই নিকটপ্রাচ্যের সভ্যতা হচ্ছে নিকটপ্রাচ্য সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যের একটি প্রকাশ। প্রকৃতি এবং সর্বোপরি মানব প্রকৃতি হচ্ছে ঐশী স্থান দখলের প্রবলতম প্রতিযোগী এবং প্রমিথিউস মোটেই কোন কাহিনী নয়, বরং প্রভূত্ব অর্জনের জন্য ঐশী সত্তার সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের মিত্র কাব্যিক উপাখ্যান মাত্র। প্রথমত, নিকটবর্তী গ্রীস এবং মিশর ঐশী সত্তা এবং প্রকৃতি বিষয়ে যে ধরনের প্রলোভন এবং বিভ্রান্ত সৃষ্টি করেছে তা অবশ্যই রুখতে হবে এবং চৈতন্য থেকে নির্বাসিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সমস্ত চৈতন্যকে অবশ্যই নিমগ্ন করতে হবে ঐশী এলাকার অভ্যন্তরে যা হচ্ছে এর উৎস, এর আদর্শ, এর প্রভু এবং ভাগ্য। তাই আলেকভারের অনেক পূর্বে নিকটপ্রাচ্যের শিল্প প্রকৃতিবাদ থেকে বন্ধন মুক্তির জন্য ষ্টাইলাইজেসন উদ্ভাবন করে। নিশ্চয়ই নিকটপ্রাচ্য যখন গ্রীকদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং নিকটপ্রাচ্যের জনমানুষের উপর গ্রীক সভ্যতা চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন ষ্টাইলাইজেসন বা শৈলীকরণ আরো প্রবল এবং আরো জোরদার হয়ে উঠে।

ইহুদীদের নিকটপ্রাচ্যের আর একটি সংস্কৃতি এবং ধর্ম ইহুদীবাদ, সাম্রাজ্যবাদী হেলেনিজমের মোকাবেলা করে সাহসিকতার সঙ্গে। এবং সম্ভবতঃ সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় দূর্ঘটনা হচ্ছে Philo। আধুনিক কালে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং ধর্ম দ্বারা এর সৌন্দর্য তাত্ত্বিক অভিন্দ্রিয়তা অংশত বিকৃত হয়ে পড়লে, বিশেষ করে ইউরোপীয় রোমান্টিসিজমের আবির্ভাবকাল থেকে সেই বেপরোয়া অযৌক্তিক এবং বৈশেষিক প্রকৃতিবাদীর আর্বিভাবের পর, জাতি, জনগোষ্ঠী, রক্ত ও বালি, মা-রাশিয়া ঈশ্বর-রাজা-দেশ ইত্যাদির অন্ধ মোকাবেলায় ইহুদীদের বিশ্বস্ততার সঙ্গে মূল নিকটপ্রাচ্যের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তার শিল্পকলাকে অনুসরণ করেছে। "তুমি খোদাই করে কোন প্রতিমা বানাবেনা"– এই নির্দেশকে ইহুদীরা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কেবল একটি আত্মরক্ষার নির্দেশ হিসেবেই দেখেনি বরং নন্দনতত্ত্বের একটি মূলনীতি হিসেবে উপলব্ধি করেছে। তাদের সিনাগগগুলো শিল্পকর্মের দিক দিয়ে শূন্যই ছিল, মুসলিম বিশ্ব ছাড়া অন্য সর্বত্র, মুসলিম বিশ্বে তারা ইসলামের বিকাশমান অগ্রগতিকে অনুকরণ করেছে। পবিত্র গ্রন্থের কাব্য মাধুর্যের দ্বারা তাদের নন্দনতাত্ত্বিক চাহিদা সম্পূর্ণ পূরণ হয় এবং ঐশী সত্তাকে প্রত্যক্ষ করার ব্যাপারে তাদের ইন্দ্রিয়গুলোর সকল দাবী অস্বীকৃত হয়। তাদের বিশ্বাস

www.icsbook.info

দাবী করে এবং স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ঐশী সত্ত্বাকে এই ধরনের স্নায়ুবিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া স্বজ্ঞার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে হবে। আর তা না হলে তা ঐশী সত্ত্বাই নয়। সমস্ত সত্ত্বার আদি নীতি স্বজ্ঞার মাধ্যমে উপলব্ধির প্রয়াসে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য যত নেয়া হবে ততই সে স্বজ্ঞার বিষয় হবে অধিকতর ইন্দ্রিয়াতীত, ততই দৃষ্টি হবে বিশুদ্ধতর।[৪]

২. নন্দনতত্ত্বের অতীন্দ্রিয়তা

তৌহীদ দ্বারা বুঝায় আল্লাহতত্ত্বকে তত্ত্ববিজ্ঞানের দিক দিয়ে প্রকৃতি সমগ্র রাজ্য থেকে আলাদাকরণ, যা কিছু সৃষ্টিতে বিদ্যমান, সৃষ্টি থেকে আগত, তাই সৃষ্টি, অতীন্দ্রিয় নয় এবং দেশকালের বিধানের অধীন, কোন অর্থে এর কোন কিছু খোদা বা খোদা-সদৃশ হতে পারেনা, বিশেষ করে তত্ত্ববিজ্ঞানের দিক দিয়ে, যা একেশ্বরবাদের সারমর্ম হিসেবে তৌহীদ অস্বীকার করে। আল্লাহ সম্পূর্ণভাবে সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র, সমগ্রভাবেই প্রকৃতি থেকে পৃথক এবং সে কারণেই ইন্দ্রিয়াতীত তিনি, একমাত্র ইন্দ্রিয়াতীত সত্ত্বা। তৌহীদ আরো দাবী করে, কোন কিছু তার মত নয়।[৫] এবং সে কারণে সৃষ্টিতে কোন কিছু তার সদৃশ বা প্রতীক হতে পারেনা, কোন কিছুই তার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সংজ্ঞার দিক দিয়ে আল্লাহর কোন প্রতীক অসম্ভব। আল্লাহ হচ্ছেন তিনি, যার সম্পর্কে কোন নন্দনতাত্ত্বিক ইন্দ্রয়গত কোন দিব্যজ্ঞানই সম্ভব নয়।

নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝায় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধির সাহায্যে একটি প্রাক-সিদ্ধ এবং সে কারণে, অতীন্দ্রিয় প্রকৃতি-অতিক্রান্ত উপলব্ধি, যার সারনির্যাস দৃষ্টি-বিষয়ের নমুনা নীতি হিসেবে কাজ করে– এ হচ্ছে যা হওয়া উচিত তারই বিষয়। দৃষ্ট বস্তুটি তার সার নির্যাসের যতই নিকটবর্তী হবে ততই হবে অধিকতর সুন্দর।

তৃণলতা, জীবজন্তু এবং বিশেষ করে মানুষের প্রাণময় প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাই হচ্ছে সুন্দর, যা প্রাকসিদ্ধ সারসত্ত্বার সম্ভাব্য অনুরূপ হয়, যাতে করে বিচারক্ষম প্রত্যেকেরই এ দাবীর অধিকার থাকবে যে, নান্দনিক বিষয় বা বস্তুটিতে প্রকৃতি নিজেকে ব্যক্ত করেছে তেজস্বিতার সঙ্গে, পরিস্কারভাবে। সুন্দর বস্তু হচ্ছে তাই, প্রকৃতি যা বলতে চায়, যা সে বলে থাকে, কদাচিৎ কখনো তার হাজারো এক ত্রুটির মধ্যে। শিল্পকলা হচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে যাওয়া, সেই সারসত্ত্বাকে আবিস্কার করার এবং তাকে দৃশ্যরূপে প্রকাশ করার প্রক্রিয়া। স্পষ্টতই, শিল্প সৃষ্ট- প্রকৃতির অনুকরণ নয়, যে সব বস্তুর প্রাকৃতিক-বাস্তবতা সম্পূর্ণ সেগুলোর ইন্দ্রিয়নির্ভর রূপ সৃষ্টি শিল্প নয়। পরিচয় প্রমাণ করবার জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন ও ডকুমেন্টেশনের জন্য ফটোগ্রাফিক চিত্ররূপ, যা

---

৪. অতিবর্তিতা বা অতিন্দ্রিয়তার সংজ্ঞার একটি আবশ্যক শর্ত এই যে, যুক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বারা সরাসরি অতিবর্তী বা অতিন্দ্রিয়কে উপলব্ধি করতে হবে, অর্থাৎ প্রবর্তন প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়গুলো যদি সামান্যতম ভূমিকাও পালন করে তেমন অবস্থায় যে বস্তুটিকে উপলব্ধি করা হল তা কিছুতেই অতিবর্তী হতে পারে না।

৫. (আল্লাহ) আসমান এবং জমিনের স্রষ্টা। কোন কিছুই তাঁর মতো নয়। তিনি সমস্ত কিছু শোনেন এবং দেখেন (৪২:১১)।

www.icsbook.info

বিষয়টি যেভাবে বিদ্যমান সেভাবেই তার ছবি তোলে, তা মূল্যবান হতে পারে। শিল্প হচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে সেই সারসত্ত্বার পঠন, যা প্রকৃতির অতীত এবং সারসত্ত্বাটিকে তার যথাযথ একটি দৃশ্যরূপ দান করা।[৬]

এ পর্যন্ত যেভাবে সংজ্ঞা দান করা হয়েছে এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাতে শিল্প হচ্ছে অপরিহার্যভাবেই প্রকৃতির মধ্যে তারই ধারণা করা যা প্রকৃতির অন্তর্গত নয়। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে যা সম্পর্কিত নয়, তা ইন্দ্রিয়াতীত এবং যা দিব্য, কেবল তাই এই মর্যাদা লাভের যোগ্য। অধিকন্ত প্রাকসিদ্ধ সারসত্ত্বা, যা নন্দনতাত্ত্বিক উপলব্ধির বিষয়, তা যেহেতু আদর্শসূলভ এবং সুন্দর, সে কারণে মানুষের আবেগ অনুভূতি এর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। একারণেই মানুষ সুন্দরকে ভালবাসে এবং সুন্দরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যখন তারা মানুষের প্রকৃতিতে সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করে, তখন প্রাকসিদ্ধ প্রকৃতির অতীত সারসত্ত্বা হয়ে ওঠে মানবিকতা, যা ইন্দ্রিয়াতীত, মাত্রায় আদর্শরূপ পরিগ্রহণ করে। একেই গ্রীসিয়রা বলতো apotheosis অর্থাৎ ঐশী সত্তার মধ্যে মানবিকতার প্রতিস্থাপন। মানুষ এ ধরনের রূপান্তরিত মানুষের বিশেষ করে মান্য করে এবং তাদেরকে দেব দেবী বলে গণ্য করে। আধুনিক পাশ্চাত্যের লোকেরা মেটাফিজিক্স বা তত্ত্বশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন উপাস্যের প্রতি অতি সামান্যই সহনশীল। কিন্তু নীতিশাস্ত্র এবং আচরনের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের লোকেরা মানুষের প্রবৃত্তি ও প্রবণতাগুলোকে আদর্শের রূপ দিতে গিয়ে যে সব দেব-দেবী সৃষ্টি করে সেগুলোই প্রকৃতপক্ষে তার কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করে।[৭]

এই হচ্ছে ব্যাখ্যা, কেন দৃশ্যরূপে ভাস্কর্যে এবং কল্পনায়, তার কারো ও নাটকে প্রাচীন গ্রীসীয়রা মানবিক উপকরণসমূহ তার গুণাবলী অথবা তার প্রবৃত্তিগুলোর প্রতীক প্রাচীন গ্রীসের শিল্পকর্মে সর্বোচ্চ নন্দনতাত্ত্বিক প্রয়াস হিসেবে গৃহীত হয়েছিলো। তারা যে সব বিষয়ের, যেমন ঈশ্বরের প্রতিরূপ সৃষ্টি করেছিল, সেগুলো সুন্দর ছিলো একারণে যে মানব প্রকৃতি যা-হওয়া-উচিত সেগুলো ছিলো তারই আদর্শরূপ। তাদের সৌন্দর্য অন্য দেবতাদের সঙ্গে তাদের অন্তর্গত বিরোধ গোপন করতোনা, সত্যিকার অর্থে একারণে যে, প্রত্যেকেই ছিলো প্রকৃতির একটি প্রকৃত বিষয় যাকে তারা ঐশীরূপে তথা অতিপ্রাকৃত স্তরে চূড়ান্তরূপ দিয়েছিলো।[৮]

রোমেই কেবল গ্রীক অবক্ষয়ের নাট্যমঞ্চ, গ্রীক ভাস্কর্য শিল্পের অবনতি ঘটে রাজা বাদশাদের বাস্তববাদী অভিজ্ঞতামূলক, বাস্তভিত্তিক প্রতিকৃতিতে। অবশ্য তখনো তা সম্ভব হতোনা সম্রাটকে দেবতায় পরিণত না করে। গ্রীসে যেখানে শত শত বছর ধরে

---

৬. Arthur Schopenhaser. *The World as Will and Idea*. tr. R.B. Haldane and J. Kemp London : Routledge and Kegan Paul Limited) vol i. Third Book. p. 217

৭. Friedrich Nietzsche. Works. tr. and ed Walter Kaufmaan (New York The Viking Press. 1954) পৃ: 459. Walter *Kaufmann. Nietzsche. Philospher. Psychologist. Antichrist* (Princeton: Princeton Press. Meridian Books. 1956) পৃ:102

৮. Murray. *Five. Stages* পৃ: 57.60.63

www.icsbook.info

এই থিওরীটি তার বিশুদ্ধরূপে বিদ্যমান ছিল– যেখানে ভাস্কর্য শিল্পের পাশাপাশি নাট্যশিল্প বিকশিত হয় প্রকৃতপক্ষে দেবতাদের মধ্যকার শাশ্বত পারস্পরিক দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত করার জন্য, একসারি ঘটনা উপস্থাপনের মাধ্যমে, যাতে চরিত্রগুলো ছিলা জড়িত। সামগ্রিক উদ্দেশ্য ছিল– তাদের ব্যক্তি চরিত্রগুলো উন্মোচিত করা, দর্শকরা যাদেরকে মানবিক, অতিমাত্রায় মানুষ্যজনোচিত জানতো– অবশ্য তা ছিলো বিপুল আনন্দের উৎস। তাদের চোখের সামনে উৎঘাটিত নাটকের ঘটনাগুলো পরিনতি যদি ঘটতো ট্রাজিক সমাপ্তিতে, তা অপরিহার্য এবং তাদের চরিত্রের অন্তর্গত বলে গণ্য হত। এর অনিবার্যতায় ফুলের একটি দংশন দূর হয় এবং কেতারসিসের মাধ্যমে তারা অনৈতিক কাজকর্ম ও প্রচেষ্টার জন্য তারা যে অপরাধবোধ করতো তার অবসান ঘটাতে সাহায্য করতো। এজন্যই, গ্রীসে উদ্ভাসিত পূর্ণতা-সাধিত্ব ট্রাজেডিশিল্প ছিলো সাহিত্যশিল্পের শীর্ষ বিন্দু এবং সকল মানববিদ্যারও। এক বিরল সত্যভাষণের মাধ্যমে প্রাচ্যবিদ ফনগ্রুনেবোম্ বলেছেন, ইসলামে প্রতিমাধর্মী শিল্পকলা ভাস্কর্য চিত্র এবং নাটক নেই, কারণ ইসলামে প্রকৃতিতে কোন দেবদেবীর অবতারের অবকাশ নেই, অথবা প্রকৃতিতে অন্তবর্তী কোন দেবদেবীর ধারণা থেকে মুক্ত ইসলাম। যে সব দেবদেবী পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত অথবা মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বেজড়িত,[৯] ফনগ্রুনোবোম এটিকে ইসলামের একটি নিন্দাবাদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যদিও আসলে ইহা ইসলামের একটি পরম বৈশিষ্ট্য। এ হচ্ছে ইসলামের একটি একক গৌরব যে ইসলাম পৌত্তলিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, অর্থাৎ সৃষ্টিকে স্রষ্টারূপে গণ্য করার প্রমাণ থেকে ইসলাম মুক্ত।

তাওহীদ শৈল্পিক সৃজনশীলতার বিরোধী নয়; সৌন্দর্য উপভোগেরও বিরোধী নয়। পক্ষান্তরে তাওহীদ সৌন্দর্যকে পবিত্র গণ্য করে এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎকর্ষ সাধন করে। তাওহীদ কেবলমাত্র আল্লাহতে এবং ওহীর বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রকাশিত তার অভিপ্রায় বা তার শব্দের মধ্যে পরম সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই দৃষ্টিভঙ্গির উপযোগী নতুন সৃষ্টিতে তাওহীদ উন্মুখ। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এই আশ্রয়বাক্য থেকে শুরু করে মুসলিম শিল্পী এ বিষয়ে প্রত্যয়দৃপ্ত যে, প্রকৃতির যা কিছুই রূপায়িত করেছে, তাকেই শৈলীবদ্ধ করেছে। অর্থাৎ শৈলীবদ্ধ করার মাধ্যমে তাকে সে যথাসম্ভব নিসর্গ বা প্রকৃতি থেকে বিযুক্ত করেছে। বলতে কি, প্রকৃতির বিষয় বা বস্তু প্রকৃতি থেকে এতদুর বিচ্ছিন্ন করা হল যে, তা প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে উঠলো। শিল্পীর হাতে শৈলীবদ্ধতা ছিল একটি নৈতিবাচক যন্ত্র, যার মাধ্যমে সে প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক বস্তু এমনকি খোদ সৃষ্টির প্রতি ব্যক্ত করেছে তার 'না' বা অস্বীকৃতি। প্রাকৃতিকতাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখান করে মুসলিম শিল্পী দৃশ্যরূপে প্রকাশ করে শাহাদার নেতিবাচক দিকটি, অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মুসলিম শিল্পীর এই শাহাদাই আসলে তার প্রকৃতিতে ইন্দ্রিয়াতীততার অস্বীকৃতির সমার্থক।[১০]

---

৯. দ্রঃ এই গ্রন্থারের ... "On the Nature of the Work of Art in Islam"
১০. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৬।

www.icsbook.info

মুসলিম শিল্পী এখানেই থেমে গেলেন না। তার সৃজনশীলতার মুক্তি তখনই ঘটলো যখন তাঁর এই চৈতন্য হল যে আল্লাহকে প্রকৃতির কোন মূর্তিতে প্রকাশ করা এককথা এবং এ ধরনের মূর্তিতে তা প্রকাশ অসম্ভব, তা বলা ভিন্ন কথা। আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালাকে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, এই উপলব্ধি হচ্ছে মানুষের জন্য মহত্তম নান্দনিক লক্ষ্য, আল্লাহ তায়ালা নিঃশর্ত চরম পরম ও মহিমাময়। সৃষ্টির কোন কিছুর দ্বারা যে তাকে প্রকাশ করা যায় না এই সিদ্ধান্তের অর্থই আল্লাহর পরমত্ব ও মহিমাময়তাকে অতিশয় গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা। কল্পনায় তাকে সৃষ্টির সমস্ত কিছু থেকে পৃথকরূপে দেখার অর্থই হচ্ছে তাকে সুন্দররূপে দেখা, সুন্দর অন্য যে কোন বিষয় বা বস্তু থেকে স্বতন্ত্ররূপে দেখা। ঐশী অনির্বচনীয়তা হচ্ছে, একটি ঐশীগুণ যার অর্থ হচ্ছে অন্তহীনতা, পরমতা, চূড়ান্ততা বা নিঃশর্ততা, অপরিমেয়তা, অসীম বা অনন্ত -সকল অর্থেই অনির্বচনীয়।[১১]

ইসলামী চিন্দাধারায়, চিন্তার এই ধারা অনুসারে মুসলিমশিল্পী আবিস্কার করেছে অলংকরণ শিল্প এবং তাকে রূপান্তরিত করেছে লতাপাতা, ডালপালা সর্পিল কারুকার্যময় নক্সায়, আর এটি এমন একটি non-devolopmental নক্সা যা সম্প্রসারিত হয়েছে সকল দিকে অনন্ত অভিমুখে। এই শিল্প যাকে বলা হয় এরাবেস্ক যা টেক্সটাইল, ধাতু, পুষ্পাধার, প্রাচীন, সিলিং, স্তম্ভ, জানালা, বা বইয়ের একটি পৃষ্ঠা ইত্যাদি-প্রকৃতির যেকোন বস্তুকেই তা অলংকৃত করে, তাকেই রূপান্তরিত করে নির্ভর, স্বচ্ছ, ভাসমান প্যাটার্ণে, যা অন্তহীনতার অভিমুখে সকল দিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতির বিষয় প্রকৃতি নিজে নয়-বরং তা হচ্ছে "transubstantiated" এতে কেবল একটি দৃষ্টিক্ষেত্র হয়ে উঠে। নান্দনিকতার দিক দিয়ে এরাবেস্ক শিল্পরূপের মাধ্যমে নিঃসর্গের বস্তু হয়ে উঠে অনন্তের দিকে একটি জানাল। একে যখন অনন্তের ইশারা হিসেবে দেখা হয় তখন ইন্দ্রিয়াতীততার একটি মানে স্পষ্ট হয়ে উঠে– নেতিবাচকভাবে প্রদত্ত হলেও একমাত্র মানেই, যা ইন্দ্রিয়গত রূপায়ণ এবং ইনটুইশনের পক্ষে অর্জন সম্ভব।[১২]

এতেই আমরা ব্যাখ্যা পাই কেন মুসলমানরা যে শিল্প সৃষ্টি করেছেন তার প্রায় সবটাই বিমূর্ত, এমনকি, যেখানে লতাপাতা, জীবজন্তু এবং মানুষের প্রতিকৃতি ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেও আর্টিষ্ট এগুলোকে যথেষ্ঠভাবে শৈলী রূপ দিয়েছে, এরা যে প্রকৃত কোন সৃষ্ট বস্তু নয়, তা প্রকাশ করার জন্য– একথা অস্বীকার করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কোন অতীন্দ্রিয় সারসত্ত্বা বাস করছে। এই প্রয়াসে মুসলিম শিল্পী সাহায্য পেয়েছে, তার ভাষাগত এবং সাহিত্যিক উত্তরাধিকার থেকে। একই উদ্দেশ্যে সে আরবী বর্ণমালা এভাবে বিকাশ সাধন করেছে যাতে করে তা হয়ে ওঠে একটি অন্তহীন এরাবেস্ক শিল্পকলা, যার প্রসার ঘটেছে কেলিগ্রাফারের পছন্দমত যে কোন দিকে, অপরিবর্তনীয়ভাবে; মুসলিম স্থপতিদের বেলায় একই কথা সত্য, যার ইমারত হচ্ছে

---

১১. দেখুন এই গ্রন্থারের ... *"Divine Transcendence"* pp. 11-19

১২. দ্রঃ এই গ্রন্থারের ... *"On the Nature of the Work of Art in Islam"* P. 78.

www.icsbook.info

তার সম্মুখভাগ, এলিভেশন, স্কাইলাইন এবং মেঝে পরিকল্পনার দিক দিয়ে একটি এরাবেস্ক শিল্পকলা। ভূগোল বা নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে মুসলিম আর্টিষ্টরা যত পৃথকই হউক, যাদের বিশ্বদৃষ্টি ইসলামের বিশ্বদৃষ্টি, সেই সকল শিল্পীরই একটি সাধারণ বিভাজক হচ্ছে তাহীদ।[১৩]

ক. নন্দনতত্ত্বে ইসলামের বন্ধন মুক্তি

কোন কিছুই, যা প্রাকৃতিক বস্তু নয় তা, ঐশী সত্ত্বাকে প্রকাশ করার একটি মাধ্যম হতে পারে না, এর দ্বারা সাধারণত এ সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হয়না যে, প্রকৃতির একটি বস্তু সেই সত্যকে প্রকাশের একটি বাহন হতে পারে– অর্থাৎ এই সত্যটিকে যে ঐশী সত্ত্বা আসলেই অসীম এবং অনির্বচনীয়। ঐশী সত্ত্বা অনির্বচনীয় বলেই তাকে প্রকাশ না করা এক কথা এবং এই সূত্রের অন্তর্গত সত্যকে প্রকাশ করা আরেক কথা। স্বীকৃতভাবেই, আল্লাহ যে ইন্দ্রিয়ের দিক দিয়ে অনির্বচনীয় এই সত্য প্রকাশের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ তা যে কোন শিল্পীর কল্পনাকে বিহ্বল করে দেয়। কিন্তু ইহা অসম্ভব নয়। বস্তুত এখানেই ইসলামের শৈল্পিক প্রতিভা বিজয়ী বন্ধন– মুক্তি অর্জন করে। আমরা দেখেছি, প্রাচীন নিকটপ্রাচ্য যে ষ্টাইলাইজেশন সুপরিচিত ছিলো এবং যার অনুশীলন হতো, তাকে আলেকজান্ডার এবং তাঁর উত্তরসূরীগণ কর্তৃক আরোপিত হেলেনিয় প্রকৃতিবাদের প্রতিক্রিয়ায় পূর্ণতার একটি নতুন স্তরে উন্নীত করে। এখন, খ্রীষ্টান ছদ্মাবরণ স্বরূপ হেলিনিজমের মোকাবেলা করতে গিয়ে ইসলামে নন্দনতাত্ত্বিক প্রয়াসের ক্ষেত্রে সেমেটিক প্রক্রিয়া হল একই রকম প্রবল, যেমন প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ধর্মতাত্ত্বিক প্রয়াসের ক্ষেত্রে। হযরত ঈসার ঐশ্বরিকতা ইসলাম যে প্রবলতার সঙ্গে প্রত্যাখান করে তার তুল্য প্রত্যাখান হচ্ছে প্রকৃতির সৌন্দর্যতাত্ত্বিক রূপায়ণে প্রকৃতিবাদের অস্বীকৃতি। এবং ইসলাম তা সমাধা করেছে ষ্টাইলাইজেশনকে উৎসাহিত করে। একটি শৈল্পিক লতা পাতা বা ফুল প্রকৃতির একটি বাস্তব বস্তুর বর্গের কেচার মাত্র, যাকে বলা যায় অপ্রকৃত। মনে হয় শিল্পী তা অংকন করতে গিয়ে প্রকৃতিকে অস্বীকার করে, অ- প্রকৃতিত্ব অর্থাৎ প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রত্যাখান প্রকাশের এটি একটি উপযুক্ত হাতিয়ার হতে পারেনা। অবশ্য এককভাবে বিচার করলে শৈলীরূপ লতাপাতা বা ফুল প্রকৃতির বহির্ভূতকেই প্রকাশ করে। কিন্তু স্বতন্ত্ররূপে এতে এই ইঙ্গিতই মিলে যে, বস্তুটির মধ্যে প্রকৃতির মৃত্যুই একটি স্বাতন্ত্রিক রূপ পেয়েছে। প্রাকৃতিক বিষয়কে প্রকৃতিমুক্ত রূপ দিতে গিয়ে এ উচ্চাঙ্গের প্রকৃতিবাদকেও প্রকাশ করতে পারে, যা ইসলামের লক্ষ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। তেমনটি আমরা প্রায়ই দেখতে পাই রুগ্নতার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের এবং মৃত্যুর মাধ্যমে জীবন প্রতিফলিত হয়। তাই জুদাইজম যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে সফল হতে হলে ইসলামের ঐশী সত্ত্বার অনির্বচনীয়তা সংরক্ষণের জন্য ভিন্ন কিছু আবশ্যক ছিল।[১৪]

---

১৩. দ্রঃ এই গ্রন্থারের ... *"Divine Transcedence"*.....p.22

১৪. দ্রঃ এই গ্রন্থারের ... *"On the Nature of the Work of Art in Islam"*.

www.icsbook.info

এখন এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার জন্য মুসলিম শিল্পী দন্ডায়মান হলেন। তার অনন্য সৃজনশীল এবং মৌলিক সমাধান হচ্ছে, যেন, যে কোন বা সকল স্বাতন্ত্রিকরণকে অস্বীকার করার জন্য এবং পরিণামে চৈতন্য থেকে প্রকৃতিবাদকে চিরতরে নির্বাসন দেওয়ার জন্য শিল্পগত তরুলতা ও ফুলকে অন্তহীন পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা। প্রকৃতি বহির্ভূত কোন বিষয় একইভাবে বার বার প্রকাশ করলে তা অ-প্রকৃতিত্বকেই প্রকাশ করে। এর উপরে যদি শিল্পী অ-প্রকৃত পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে সুন্দর তাত্ত্বিকভাবে অসীমতা ও অনির্বচনীয়তা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়, তেমন অবস্থায় পরিণামে তা হয়ে উঠতে পারে এই সাক্ষ্যের সমার্থক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যা উচ্চারিত হয় শাব্দিক এবং অপ্রাসঙ্গিকভাবে। কারণ যে অনির্বচনীয়তা এবং অসীমতা শৈল্পিক প্রতিফলনের উপকরণ তাতে এগুলো যে অ- প্রকৃতির গুণাবলী তার ইঙ্গিত মেলে। তাই ইসলামী মন এই অনুধাবন করে যে, সেমেটিক চৈতন্যের আদি প্রেরণার সঙ্গে, দৃশ্যশিল্পের সাযুজ্যের একটি পন্থা রয়েছে। কিন্তু এখানে প্রধান বাধা হচ্ছে, প্রকৃতির কোন বস্তু যতো শৈল্পিক রূপই তাকে দেওয়া হউক, কি করে তা অসীমতা ও অনির্বচনীয়তা প্রকাশের বাহন হতে পারে?

১. আরব চৈতন্য : ইসলামের ঐতিহাসিক ভিত্তিমূল

একটি সমাধান লাভের জন্য ইসলামী চেতনাকারণ নেয় তার নিজের ঐতিহাসিক ভিত্তিমূল, তথা আরব চৈতন্যের উপর। ইহাই সেই ঐতিহাসিক বিষয় যা ঐশী প্রত্যাদেশ অবহিত করে এবং তার সংঘটনের জন্য *Sit-zim-Leben* রূপে ব্যবহার করেছে। ঐশী সত্য প্রকাশের মাধ্যম ও বাহনরূপে এই চেতনাই মূর্তরূপ লাভ করে হযরত মোহাম্মদের (সা.) মধ্যে, যিনি এই প্রত্যাদেশ লাভ করেন এবং দেশকালের মানবজাতির কাছে তা প্রচার করেন নবুয়্যতের মাধ্যমে। ইসলামের পূর্বে ভাষা এবং লেখন শিল্পে এর অর্জন ছিলো প্রকৃতই একটি অলৌকিক ব্যাপার এবং এ বিষয়টিই নতুন প্রত্যাদেশের ধরন বা পদ্ধতি নির্ধারণ করে তা হবে সাহিত্যের পূর্ণতা, কারণ এই প্রত্যাদেশের জন্য তা ছিলো প্রস্তুত এবং তা বহনের ক্ষতাসম্পন্ন।

আরব চৈতন্যের প্রথম হাতিয়ার এবং তার সকল ক্যাটেগরির অবয়ব হচ্ছে আরবী ভাষা। মূলত আরবী ভাষা হচ্ছে তিনটি মূল ব্যঞ্জন ধাতুমূল নিয়ে গঠিত, যার প্রত্যেকটি তিনশতেরও অধিক রূপে ধাতুরূপ সম্ভাব্য বাচ্যে পরিবর্তন করে উপসর্গ, অনুসর্গ বা মধ্যসর্গ যোগ করে। যে শব্দরূপই গঠন করা হউক না কেন, যে সকল শব্দের একই ধাতুরূপ রয়েছে সে সকলের একই প্রকারত্ব অর্থ রয়েছে, ধাতুমূলের ভিন্নতা সত্বেও, ধাতুর অর্থ একই থেকে যায়, কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয় অন্য একটি প্রকারাত্মক অর্থ, ধাতুরূপের মাধ্যমে তা যে অর্থটি লাভ করে এবং সকল সময়, সর্বত্র যা একই থাকে।[১৫] তখন ভাষার একটি যৌক্তিক কাঠামো গঠিত হয় যা প্রথমেই

১৫. যে কোন ব্যাকরণমূলক পাঠ অনুসারে এই ভূমিকা প্রায় সকল সেমেটিক ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ধাতুমূল্যের ত্রি-ব্যঞ্জনমূলক কাঠামো সেমেটিক ভাষাতত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

www.icsbook.info

সুস্পষ্ট, সম্পূর্ণ এবং বোধগম্য। এই কাঠামোটি বুঝতে পারলেই যে কোন ব্যক্তি ভাষাপণ্ডিত হয়ে ওঠে, যখন ধাতুমূলের অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান হয়ে উঠে গৌণও গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্য-শিল্প নিহিত রয়েছে বিভিন্ন ধারণার একটি পদ্ধতি নির্মাণে, যে ধারণাগুলো এভাবে পরস্পর সম্পর্কিত যে তাতে করে ধাতুগুলোর কনজুগেশনের মাধ্যমে সাদৃশ্য ও বৈপরীত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যখন বোধ শক্তির পক্ষে সম্ভব হয় জটিলতার মধ্য দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন অভঙ্গুর রেখায় অগ্রসর হওয়া একটি এরাবেস্ক শিল্পে, যার মধ্যে ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, বৃত্ত, পঞ্চভুজ, অষ্টভুজ ইত্যাদি হাজারো রূপ সবই ভিন্ন বর্ণে বিচিত্র এবং একে অপরের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে অবস্থান করে তা চোখকে ঝল্‌সে দেয়, কিন্তু মনকে নয়– প্রত্যেকটি ফিগারকে তার স্বরূপে চিনতে পেরে বর্ণ বিচরণ করতে পারে একটি পঞ্চভুজ থেকে অন্য একটি পঞ্চভুজে, তাদের বর্ণের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এবং শিল্পকর্মটির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এগোতে পারে– প্রত্যেক বিরতির স্থানেই কিছু আনন্দের অভিজ্ঞতা নিয়ে, একইরূপ আকৃতিজাত সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য প্রত্যক্ষ করে– অর্থাৎ ধাতুমূলের বিভিন্ন অর্থ প্রকাশের একইরূপ ধরন এবং খোদ শব্দমূলগুলো কর্তৃক সৃষ্ট বৈপরীত্ব অনুধাবন করে।

আরবী ভাষার গঠনমূলক প্রকৃতি তার কবিতাকেও গঠন করে। আরবী কবিতা স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ এবং স্বাধীন শ্লোক নিয়ে গঠিত, যার প্রত্যেকটি একই এবং অভিন্ন ছন্দরূপের অভিন্ন রূপায়ণ। আরবী কাব্য ঐতিহ্যে সুপরিচিত ত্রিশটি প্যাটার্ণের মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নেবার স্বাধীনতা কবির আছে। কিন্তু একবার নির্বাচনের পর গোটা কবিতাটির প্রত্যেকটি অংশই এই প্যাটার্ণের সঙ্গে সাম্যঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। আরবী কবিতা শ্রবণ এবং উপভোগের তাৎপর্যই হচ্ছে এই প্যাটার্ণের সঙ্গে উপলব্ধি; কবিতা আবৃতির সঙ্গে সঙ্গে কবিতার শ্রোতা ও সমজদার এর ছন্দ প্রবাহের সঙ্গে অগ্রসর হয় এবং এই প্যাটার্ণ যা প্রত্যাশা করেছে তা প্রত্যাশা ও গ্রহণ করে। অবশ্য প্রত্যেক শ্লোকে শব্দ ধারণা এবং অনুভূতি নির্মাণ পৃথক পৃথক। এতে করেই রংয়ের বৈচিত্র ফুটে ওঠে, কিন্তু তার কাঠামোগত রূপ আগাগোড়ায় এক।

আরবী ভাষা ও আরবী কবিতার এই বুনিয়াদি জ্যামিতির বদৌলতে আরব চৈতন্য দ্বিরায়তনের পর্যায়ে অনন্তের ধারণা উপলব্ধি করতে সঙ্গম হয়। ধাতু মূলগুলো বহু, বলা যায় অনন্ত, কেননা তিনটি স্বরবর্ণের যে কোন নতুন সম্মেলনের প্রতি প্রথাগতভাবে যে কোন অর্থ আরোপ করা যেতে পারে। আরবীয় চৈতন্য বিদেশী ধাতুমূলকে অবিচলিত *স্থৈর্যের* সঙ্গে গ্রহণ করে এবং এজন্য বিদেশী শব্দমূলটিকে আরবীয় রূপদানের জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তার নিজস্ব ধাতুরূপের কারখানার উপর। তাদের সংখ্যার অনন্ত তার মতই তাদের ধাতুমূলও অনন্ত, ধাতুমূলের পরিচিত, প্যাটার্ণ রয়েছে সীমিত সংখ্যক শব্দমূলেরই ধাতুরূপ করা হয়েছে এবং তাদের ধাতুরূপগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ওয়েবষ্টার কিংবা অক্সফোর্ডের মত আরবী ভাষার একটি অভিধান, যাতে সকল শব্দ সংকলিত এবং তালিকাবদ্ধ হবে তা একেবারেই অসম্ভব, কারণ কাল পরম পরাক্রমে পরিচিত সকল শব্দমূলের ধাতুরূপ

www.icsbook.info

করা হয়নি। ধাতুমূলের তালিকা কখনো বন্ধ করা হয়নি। ধাতুরূপের সব কয়টি ধরন বা রূপ ব্যবহৃত হয়নি, এবং ধরনের তালিকাও সমাপ্ত হয়নি। ঐতিহ্য সচেতনবোধ দ্বারা নতুন ধরনের সম্ভাবনা অস্বীকার করেনা। তবে তারা সেই প্রতিভার অপেক্ষায় থাকেন যে যৌক্তিকতা প্রমাণ এবং নিজের সুবিধার খাতিরে ব্যবহার করা যায়। তাই আরবী ভাষা অস্তিত্বের আরবীয় প্রবাহের মতই এমন একটি পদ্ধতি যা কেন্দ্রস্থলে উজ্জ্বল (ঐতিহ্য হেতু), কিন্তু কিনারের দিকে অস্পষ্ট, যা সকল দিকে ছড়িয়ে পড়ে অনিশ্চিতভাবে।[১৬]

এবার কবিতার কথায় আসা যাক। শ্লোকগুলোর ছন্দরূপ কবিতার অবয়র গঠন করে বলে কোনো কবিতার শ্লোকগুলোর জন্য জরুরী নয়– কবি যে ধারণায় সেগুলো রচনা করেছেন সেই ক্রম অনুসারে সেগুলো পাঠ করা, বা অন্য কোন নিয়ম অনুসারে। কবিতাটি শুরু থেকেই সমাপ্তির দিকে পাঠ করা হউক কিংবা সমাপ্তি থেকে শুরুর দিকে আবৃত্তি করা হউক, কবিতাটি বরাবরই একই রকম মাধুর্য বজায় রাখে, কারণ কবি প্রত্যেকটি শ্লোকের সঙ্গে তার প্যাটার্ণের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে গেছেন। পুনরাবৃত্তিতে আমরা আনন্দিত হই, কারণ তাতে করে আমাদের ইনটুইটিভ ক্ষমতা স্বীকৃত হয়, অর্থ এবং বোধ কাঠামোর বাস্তবতার বৈচিত্র থেকে আমরা যা প্রত্যাশা করেছিলাম তা প্রত্যাশা ও উপলব্ধ করতে পারি। তাই সংজ্ঞা অনুসারে কোনো আরবী কবিতাই সম্পূর্ণ এবং বন্দী নয় এবং কোন অর্থেই পরিপূর্ণ নয়, যাতে করে মনে করা যেতে পারে কবিতার সঙ্গে কোন কিছু যোগ বা নিরবচ্ছিন্নতা ব্যাহত হতে বা এমন কিছু ধারণা করা যেতে পারে। বলতে কি, আরবী কবিতাকে উভয় দিকে টেনে নিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব, তার শুরুতে এবং তার অন্তে। তার সৌন্দর্যকে বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন না করে কোন মানুষ কর্তৃক, ব্যক্তিগত রচনাশৈলীর দ্বারা না হলেও কবিতাটির রচয়িতার দ্বারা তো বটেই। বস্তুত আমরা যদি উত্তম শ্রোতা হই, তাহলে একথা ধরে নেয়া হবে যে, আমরা কবির সঙ্গে তার কবিতা সৃষ্টিতে সূচনাতে অংশগ্রহণ করবো। যেমনটি করা হয় একটি জীবন্ত অভিনয়, এবং দ্বিতীয়ত আমরা তার কবিতা অনুসরণ করবো আমাদের নিজেদেরই হিতার্থে, কেননা তার আবৃত্তি যে গতি সঞ্চার করেছে তার দ্বারা আমাদেরকে বন্দী করেছে এবং আমাদেরকে এর নিজস্ব অসীম কাব্যিক পরিমন্ডলে নিক্ষেপ করেছে। আরব জগতে একজন কবির জন্য এ কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, যখন কবি মহৎ শ্রোতাদের উপস্থিতিতে সেই শ্রোতাদের মৌখিক সাহায্য লাভ করেন, তার কবিতার আবৃত্তিতে,যে কবিতা ইতিপূর্বে কখনো তিনি শোনেননি অথবা তার কবিতার সঙ্গে একই কবিতার আরো অংশ যোগ করে, তার প্রতি মন্তব্য প্রকাশ করে থাকেন।[১৭]

---

১৬. দ্রঃ এই গ্রন্থারের প্রবন্ধ, "Islam and Art." *Studia Islamica* fasciculi xxxvii (1973) পৃঃ 93

১৭. শ্রোতা এবং আবৃত্তিকার বা পরিবেশকের মধ্যে একই ধরনের সহযোগিতামূলক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হচ্ছে গোটা মুসলিম বিশ্বের মধ্যযুগের সঙ্গীত ও কবিতার মোসায়েরাগুলোর বৈশিষ্ট্য, যা দেখা যাবে ঐ আমলের সাহিত্যের প্রয়াস (যেমন : *Kitab al Aghani* by al Isfahani)

www.icsbook.info

২. ইসলাম প্রথম শিল্পকর্ম : আল্-কুরআনুল করীম

এই আরব চৈতন্যই ইসলামের ছাঁচ এবং বুনিয়াদ হিসেবে কাজ করে। ইসলামী প্রত্যাদেশ আল্-কুরআনুল করীম নাযিল হয় মহত্তম শিল্পকর্ম হিসেবে। সেই চৈতন্যের সকল আদর্শ লক্ষ্য একই মুহূর্তে চূড়ান্ত পরিপূরণের জন্য এই অনুভূতি আসে।

কোন কিছু যদি শিল্পের দাবী রাখে, কুরআন নিশ্চয়ই শিল্প। কোন কিছুর দ্বারা মুসলিম মন যদি আন্দোলিত ও প্রভাবিত হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই কুরআন কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছে। এই প্রভাব যদি কোথাও ভিত্তিমূলক উপাদানে পরিণত হবার মত যথেষ্ট গভীরতা অর্জন করে থাকে, তা হচ্ছে নন্দনতাত্ত্বিকতা। এমন কোন মুসলমান নেই কুরআনের সুর মুর্ছনা, ছন্দ এবং তার প্রাঞ্জলতার বিভিন্ন স্তর, যার অস্তিত্বের গভীরতম মর্মমূল পর্যন্ত নাড়িয়ে দেয়নি। এমন কোনো মুসলমান নেই, যার আদর্শ ও সৌন্দর্যের মান কুরআন নতুন করে গড়েনি এবং তার নিজের আলোকে নির্মাণ করেনি।

মুসলমানরা কুরআনের এই দিকটিকে ই'জার বলে উল্লেখ করেছে, যার অর্থ হচ্ছে স্তব্ধ করে দেওয়া। "ই'জাজ পাঠককে একটি চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় স্থাপন করে, যা মোকাবেলা করার জন্য সে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু কখনো মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়না।" বস্তুত কুরআন নিজেই সর্বোচ্চ সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী আরব শ্রোতাগণকে আহ্বান করেছে কুরআনের মত কিছু সৃষ্টি করতে (২: ২৩) এবং তাদের ব্যর্থতার জন্য তাদের তিরস্কার করেছে (১০ : ৩৮, ১১ : ১৩, ১৭ : ১৮)। রাসূলুল্লাহর সমসাময়িকদের মধ্যে ইসলামের কতিপয় শত্রু এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলার জন্য দাঁড়িয়েছিল, তারা তাদের বিরোধী এবং তাদের আপন বন্ধুদের বিচারে অপমানিত হয়েছিল।[১৮] মোহাম্মদকে (সা.) বলা হল "একজন ভূতাবিষ্ট মানুষ (১৮:২২) এবং কুরআন একটি যাদুর কিতাব" (২১:৫৩, ২৫:৪), কেবল মাত্র শ্রোতাদের চেতনার উপর এর ক্রিয়ার কারণে।

প্রত্যেকেই এ সত্যটি বুঝতে পারে যে, যদিও কুরআনের আয়াতগুলো কবিতার কোন জ্ঞাত প্যাটার্ণের সঙ্গে খাপ খায়না, তবু কবিতার মত একই প্রভাব বিস্তার করে এই সব আয়াত। বলতে কি চূড়ান্ত মাত্রায়, প্রত্যেকটি আয়াতই সম্পূর্ণ এবং নিজস্ব গুণেই নিখুঁত, প্রায়ই তা পূববর্তী আয়াত বা আয়াতসমূহের সঙ্গ ছন্দে মিলে যায় এবং তা পরম সৌন্দর্যের উচ্চারণ বা সাহিত্যিক অভিব্যক্তির মধ্যে নিহিত এক বা একাধিক ধর্মীয় বা নৈতিক তাৎপর্য বহন করে। এর আবৃত্তি এত প্রবল গতিসঞ্চার করে যে, শ্রোতারা অনিবার্যভাবেই এ আবৃত্তির সঙ্গে অগ্রসর হতে পরবর্তী আয়াতটি আশা করতে এবং তা শ্রবণের পর গভীরতম স্বীকৃতিতে পৌঁছাতে বাধ্য হয়। এর পর প্রক্রিয়াটি আবার শুরু হয় পরবর্তী একটি, দুটি অথবা তিনটি বা তিনের অধিক একটি গুচ্ছ আয়াতের সঙ্গে।[১৯]

---

১৮. Abd al qaidir al Jurjani, *Dalail al I'jaz*: (Cairo: Al Matba'ah al Arabiyah 1351 H).

১৯. Abu al Faraj al Isfahani. *Kitab al* Aghani (Beirut : Dar al Thaqafah. 1374/ 1955) witnesses to a countless number of such instances.

www.icsbook.info

মুসলিম আরবরা কি সপ্তম শতকে কোনো শিল্প নিয়ে আর্বিভূত হয়েছিলো? তারা কি বিজিত জাতিগুলোর পরবর্তীকালে বিকশিত শিল্পকলায় প্রাসঙ্গিক কোন অবদান রেখেছিলো? অজ্ঞতা বা বিদ্বেয় বশে এবং প্রায়ই এতদ উভয়ের দুঃখজনক সংমিলনে, ইসলামী শিল্পের প্রত্যেকটি পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদ জবাব দিয়েছেন, 'না'। এই শাস্ত্রের পিতামহ ঘোষণা করেছেন, "প্রথম যেসব লোক নিয়ে এই সব সেনাবাহিনী গঠিত হয় (ইসলামের প্রথম আরবীয় সেনাবাহিনী) তারা ছিলো মুখ্যত বেদুইন, এমনকি যারা স্থায়ী বসতি থেকে আসে, যেমন মক্কা ও মদীনা থেকে আগত লোকেরাও স্থাপত্য শিল্পের কিছুই জানতোনা।"[২০] তরুণতর প্রজন্ত অন্তহীনভাবে বার বার একথাই বলে "মুসলিম শিল্পকলা তার আরব অতীত থেকে বলতে গেলে কিছুই অর্জন করেনি।"[২১]

সত্য তাদের এই সব অভিযোগের কত বিপরীত। গোটা ইসলামী শিল্পকলাই অর্জিত হয় আরব অতীত থেকে– যা কিছু গঠনমূলক এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ সে সবের মর্মবাণী, নিয়মকানুন এবং পদ্ধতি, এ সবের লক্ষ্য ও লক্ষ্য অর্জনের পন্থা, সমস্ত কিছুই নিশ্চয়ই দৃশ্য ক্ষেত্রগুলোতে ইসলামী শিল্পকলার প্রয়াসের জন্য আবশ্যক ছিলো উপকরণের এবং বিষয়বস্তুর এবং যেখানে এগুলো পেয়েছে ইসলামী শিল্পকলা সেখান থেকে এগুলো নিয়েছে। কিন্তু শিল্পের অর্থ ও তাৎপর্য, তার ইতিহাস ও তথ্যের যে কোন আলোচনায় এগুলোকে ঋণ বলে উল্লেখ করা রচিবিরুদ্ধভাবে অগভীর। একটি শিল্পকর্ম শিল্প হয়ে উঠে তার শৈলী, তার উপাদান এবং তা প্রকাশের মাধ্যমে– সে যে সব উপকরণ ব্যবহার করে, যা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ভৌগোলিক অথবা সামাজিক আকস্মিকতা থেকে অর্জিত। আরব চেতনায় ইসলামের মাধ্যমে এই ভিত্তির কারণে ইসলামী শিল্পকলা একটি ঐক্য। আরব চৈতন্যের রীতিপ্রণালীগুলোর দ্বারাই সকল মুসলমানের শিল্পসৃষ্টি নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।[২২]

খ. দৃশ্যশিল্পের নন্দনতাত্ত্বিক রূপ

পাশ্চাত্য দৃষ্টিনির্ভর শিল্পকলা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করে মানব প্রকৃতির উপর– মানুষের প্রতিকৃতি, ভূ-চিত্র, স্থির জীবন, এমনকি বিমূঢ়ত্ব, নগ্নতা বা নগ্নতাহীনতার মাধ্যমে, যেভাবেই প্রকাশিত হউক। ইসলামী দৃশ্যশিল্পের আগ্রহ ছিলনা মানব প্রকৃতিতে, বরং তার আগ্রহ ছিল ঐশী প্রকৃতিতে। যেহেতু মানব প্রকৃতির নতুন নতুন দিক প্রকাশ করা এর লক্ষ্য ছিলোনা, এজন্য এ শিল্প নন্দনতাত্ত্বিকভাবে ফিগার বা প্রতিকৃতির আলোচনা করেনি, অর্থাৎ মানব প্রকৃতির যে অসংখ্য বৈচিত্রপূর্ণ রূপায়ণ ঘটে তা চিত্রিত করেনি। মানব চরিত্র যা মানুষের প্রাকসিদ্ধ এমন একটি ধারণা, যে

---

২০. K.A.C. Creswell. *Early Muslim Architecture* (Oxford : Clarendon Press. 1932-1940) vol. পৃ: 40

২১. দ্রঃ Richard Ethinghusen. "The Character of Islamic Art *"The Arab Heritage* ed. N.A. Fais (Princeton : Princeton University Press 1944) পৃ: 251-67

২২. দ্রঃ Al Faruqi "Urubah and Religion" p. 211.

www.icsbook.info

ধারণায় মানুষকে লক্ষ লক্ষ খুঁটিনাটিরূপে বিশ্লেষণ করা যায় বলে ধরে নেয়া হয়, যে সব খুঁটিনাটিতে মানুষের ব্যক্তিত্বের অন্য একটি গভীরতা বা উচ্চতা উদ্‌ঘাটিত হয়, এসবই কিন্তু মুসলিম শিল্পীর লক্ষ্যবস্তু ছিলনা। ঐশী সত্ত্বা হচ্ছে তার প্রথম প্রেম এবং তার শেষ আবিষ্টতার বিষয়। তার জন্য ঐশী সত্ত্বার সম্মুখে দাঁড়ানো হচ্ছে অস্তিত্বের এবং সমস্ত মহত্ব সৌন্দর্যের শীর্ষবিন্দু। এই লক্ষ্যে মুসলমানরা নিজেদের চারপাশে জড় করে প্রত্যেকটি অবলম্বন এবং প্রত্যেকটি উদ্দীপক যা সেই ঐশী অস্তিত্বের উপস্থিতির সম্পর্কে ইতিহাসে সহায়তা করে।

প্রথমে, শৈলীকরণের মাধ্যমে প্রকৃতিকে যেহেতু তার প্রকৃতিত্ব থেকে মুক্ত করা হয়, সেজন্য প্রথম দিকের আরব মুসলমানরা সেই উপায়টিকে তার অনিবার্য পরিণতির দিকে নিয়ে যান। অধিকন্তু শৈলীকরণের অর্থ হচ্ছে বৈচিত্র বা পরিবর্তনকে অস্বীকার করা– কান্ড থেকে শাখা প্রশাখা পত্রপল্লব পর্যন্ত বিকাশ সাধন, যেমনটি ঘটে থাকে উদ্ভিদ জগতে, অংকন শিল্পের আগাগোড়া কান্ড এবং শাখার গাঢ়ত্ব হয়ে উঠে এক, অভিন্ন এবং আকার অথবা রূপ হয়ে উঠে একই। পরিবর্তনের অনুপস্থিতির কারণেও ক্রমবিকাশ বাতিল হয়ে যায়। একই চিত্রের মধ্যে সকল পত্র পল্লব এবং ফুল পায় একই রূপ। পরিশেষে প্রকৃতিবাদের প্রতি মৃত্যু আঘাত হচ্ছে পুনরাবৃত্তি। বৃন্ত, এবং ফুল বার বার অংকন করে এবং সেগুলো একটি অপরটি থেকে অন্তহীন পর্যায়ে এমনভবে নির্গত দেখিয়ে যা প্রকৃতিতে অসম্ভব, প্রকৃতি সম্পর্কে সকল ধারাণাকেই মুছে দেওয়া হয়। পুনরাবৃত্তি এত নিশ্চিতভাবে এবং অভ্রান্তভাবে এই পরিণতি ঘটায় যে, তা আপন শত্রুকেও পর্যন্ত সয়ে যায়– অর্থাৎ বিকাশরূপ তার আপন শত্রুকেও সে বরদাস্ত করে– অবশ্য যদি একটি শিল্প কর্মের অংশে তার বিকাশ ঘটে ও তার পুনরাবৃত্তি ঘটে সমগ্র শিল্পকর্মটির মধ্যে। এভাবে চৈতন্য থেকে প্রকৃতিকে নির্মূল করা হয় এবং তা প্রকৃতিকে চিত্রিত করা হয়। যদি দর্শকের চৈতন্যে বৃন্ত পত্রপল্লব এবং ফুল তখনো প্রকৃতির কোনো চিহ্ন বা অবশেষ রেখে দেয়, সে অবস্থায় সকল ভগ্ন, বৃত্তাকার ফোয়ারার মত উৎসারিত বা বংকিম রেখা যা ফ্রীলান্স, নক্সা বা জ্যামিতিক ফিগারে ব্যবহৃত হয়, তাহলে এ কাজটি সম্পন্ন হবে সন্দেহাতীতভাবে উৎকৃষ্টতররূপে। এটিকে বৃন্ত, পাতা, ফুল উপকরণের সঙ্গে যুক্ত করে দর্শককে উদ্দিষ্ট (জ্যামিতিকতা এবং তার প্রাকৃতিকতার) দিকটি তুলে ধরে পরিশেষে পুনরাবৃত্তিকে যদি সিমেট্রির নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়, যাতে করে তা একই দূরত্ব বজায় রেখে সকল দিকে অগ্রসর হতে পারে, সে অবস্থায় শিল্পকর্মটি মর্মের দিক দিয়ে হয় একটি অনন্ত দৃষ্টিক্ষেত্র। ঘটনাক্রমে এই অনন্তক্ষেত্রের একটি অংশই মাত্র শিল্পী নিজের খেয়াল মত বেছে নেয় এবং পৃষ্ঠা, প্রাচীর, প্যানেল অথবা ক্যানভাসের বাস্তব ফ্রেমে তাকে সীমিত করে, যেখানে মানুষের ফিগারের জান্তব দিকটি ব্যবহৃত হয়, যেমন দেখা যায় ইরানের মিনিয়েচারে; সেখানে প্রকৃতিমুক্ত অবস্থা অর্জিত হয় প্রাণীটির শৈলীরূপ সৃষ্টি করে, এবং মানুষের মুখমন্ডল এবং শরীরকে কোন বিশিষ্ট রূপ, চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব অর্পণ না করে। একটি ফুলের মতই একজন মানুষ অ- প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করতে পারে শৈলীকরণের মাধ্যমে কিন্তু

www.icsbook.info

আসলে ইহাইতো ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের বিমোচন। একারণেই, পারস্যের মহত্তম মিনিয়েচারগুলোতে সব থাকে একাধিক মানুষের ফিগার। তাদের একজনকে অপরজন থেকে স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা যায় না।[২৩] আরবী কবিতার মতই মিনিয়েচারগুলো চিত্রিত হয় অনেকগুলো অংশ নিয়ে, যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, যাদের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব একটি স্বাধীন কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে। দর্শক যেমন কবিতার নক্সা বা ছকে স্থাপিত সাহিত্যিক মনিমুক্তাগুলো নিজ চৈতন্যে প্রত্যক্ষ করে, আনন্দের স্বাদ উপভোগ করে, একইভাবে দর্শক গালিচায়, দরজা, প্রাচীর, ঘোড়ার জিন, মানুষের পাগড়ি বা পোশাক ইত্যাদিতে মিনিয়েচারের একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতাপাতার বৃন্তে শিল্পগুলো সম্পর্কে চিন্তা করে এবং তখন তাদের মনে এই প্রত্যাশ্যাও থাকে যে, আরও সব অনন্ত কেন্দ্র রয়েছে যার দিকে সে অগ্রসর হতে পারে।[২৪]

ইসলামী শিল্পকর্মের সকল অংকন এবং অলংকরণে প্রশ্নাতীতভাবে রয়েছে গতি-প্রকৃতিপক্ষে যে গতি অনিবার্য একটি নক্সার এক ইউনিট থেকে অন্য ইউনিটের দিকে এবং পরে এক নক্সা থেকে অন্য নক্সায় এবং আসলে, একটি দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে অন্য একটি দৃষ্টিক্ষেত্রের দিকে, যেমনটি আমরা দেখতে পাই বড় বড় প্রাসাদের বিশাল তোরণে, সম্মুখ ভাগে অথবা প্রাচীরগুলোতে। কিন্তু এমন কোন ইসলামী শিল্প কর্মই নেই যেখানে গতি চূড়ান্ত। দর্শকের দৃষ্টি যে চলমান থাকে তাই মূল কথা। দর্শকের মন গতিশীল হয়ে উঠে অনন্তকে প্রত্যক্ষ করার সন্ধানে। ভর, আয়তন, স্থান, বেষ্টনি, সৌন্দর্য, সামঞ্জস্য, টেনশন এসবই হচ্ছে প্রকৃতির বাস্তবতা, যেগুলোকে অস্বীকার করতে হবে যদি অ-প্রকৃতির উপলব্ধি অর্জন করতে হয় স্বজ্ঞার সাহায্যে। কেবলমাত্র তেমন একটি নক্সাই, তেমন একটি মোমেন্টাম-স্রষ্টা প্যাটার্ণই মুসলিম সৌন্দর্য-প্রেমিককে ঘিরে থাকে– সকল দিকে অনন্ত পৃথিবীতে ছাড়িয়ে হয়। এতে করে তার মধ্যে সৃষ্টি হয় একটি ধ্যানী মেজাজ যা ঐশী সত্তার ইনটুইশনের জন্য আবশ্যক। কেবল একটি বইয়ের প্রচ্ছদের ডিজাইন নয়, যে আলোকিত পৃষ্ঠাটি সে পড়ছে তার পায়ের নিচের গালিচা, তার বাড়ীর সিলিং এর সম্মুখ ভাগ, ভিতর ও বাইরের প্রাচীরগুলোই কেবল নয়, বাড়ীটির মেঝের পরিকল্পনাও এমন একটি এরাবেস্ক তৈরী করে, যেখানে বাগিচা, বাড়ীর উঠান, প্রবেশ কক্ষ এবং প্রতিটি কক্ষই একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্র, লতাপাতার নিজস্ব শিল্পরূপ সমেত যা তার নিজস্ব গতি সৃষ্টি করে।

কিন্তু এরাবেস্ক কি? আমরা উপরে এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেছি একথা ধরে নিয়ে যে পাঠক এ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। যথার্থভাবেই এধারণা করেছি, কারণ অন্য যে কোন শিল্পকর্ম থেকে এরাবেস্ককে মুহূর্তে পৃথক করে চেনা যায়। সকল মুসলিম দেশে এই শিল্পরূপটি সর্বব্যাপী, এটি সকল ইসলামী শিল্পকর্মের একটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা

---

২৩. T.W. Arnold, *Painting in Islam* (Oxford : the Clarendon Press, 1928) c,. t. 133.
২৪. Sturt Cary Welch, *A Kings : The Shah–Nameh of Shah Tahmasp* (New York : Metropoliton Museam of Art, 1972). পৃ: 30.

www.icsbook.info

উপাদান। যথাযথই একে বলা হয় এরাবেস্ক, কেননা আরবী কাব্য এবং আরবী কুরআনের মতই এটি আরবীয়, তার নান্দনিকতার দিক দিয়ে। এর অস্তিত্ব যে কোন পরিবেশকে রূপান্তরিত করে ইসলামী আবহে, এই বৈশিষ্ট্যটিই চূড়ান্ত রকমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শিল্পকর্মে দান করে একটি ঐক্য। এটি সঙ্গে সঙ্গে চেনা যায় এবং আসলে এতে ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। মূলত এটি অনেকগুলো ইউনিট বা ফিগারের সমন্বয়ে রচিত যা একত্রে মিলিত হয় এবং এমনি ধারা পরস্পর জড়াজড়ি করে, যার ফলে একটি ফিগার বা ইউনিট থেকে অন্য একটি ইউনিটের অভিমুখে অগ্রসর হয় সকল দিকে, যতক্ষণ না শিল্পকর্মটিকে তার বাস্তব কিনার থেকে কিনার পর্যন্ত অতিক্রম করে গেছে দৃষ্টি। ফিগার বা ইউনিটটি অবশ্যই সম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র, কিন্তু তা পরবর্তী ফিগার বা ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত, দৃষ্টি বাধ্য হয় অগ্রসর হতে একটি ফিগারের আউটলাইন এবং নক্সা অনুসরণ করে পরবর্তী ফিগারটির রূপরেখা এবং নক্সার অনুসন্ধানে। এতেই সৃষ্টি হয় ছন্দ। এই গতিটি মন্থর হতে পারে যতই ফিগারগুলো পরস্পর থেকে হবে অধিকতর বিচ্ছিন্ন। যাই হউক, ফিগারগুলো যতই অধিকতর নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত হবে যার ফলে গতি, যতি এবং ছন্দ সৃষ্টি হয় এবং রেখাগুলোর ঘূর্ণায়মানতা এবং ভগ্নতার দ্বারা যতই গতি বাধাগ্রস্থ হয় ততই বেশী শক্তি সঞ্চারিত হয় এরাবেস্ক এর গতিবেগে। গতিবেগ যত বাড়বে ততই মনের জন্য সহজ হবে যুক্তিচিন্তার জন্ম দিতে, যাতে করে শিল্পকর্মের সীমা ছাড়িয়ে কল্পনায় ঝাপ দিতে পারে, মন যা চায় তা সৃষ্টির প্রয়াসে। এই প্রক্রিয়ার জন্য পুনরাবৃত্তি আবশ্যক। একারণে যেকোন শিল্পকর্মে ভিন্ন ভিন্ন রকম অনেকগুলো এরাবেস্ক এর কাজ থাকে যার প্রত্যেকটি ঢেকে দেয় একটি কাঠামোগত অংশ। উদ্দেশ্যটি সুস্পষ্টঃ এর উদ্দিষ্ট উড্ডয়নের উপর কল্পনার উৎক্ষেপণ। এটি ঘটতে পারে দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা দশম এরাবেস্ক-এ, যদি তা না আসে প্রথমটির সঙ্গে।

এরাবেস্কগুলো হয়ে থাকে লতাপাতা ফুলময় বা জ্যামিতিক,, শিল্প মাধ্যম, হিসেবে সেগুলো যে বৃন্ত, পত্র, ফুল ব্যবহার করলো (আল-তাওরিক) অথবা যে জ্যামিতিক বসম (ফিগার) ব্যবহার করলো, তার উপর ভিত্তি করে। জ্যামিতিক ফিগারটি হতে পারে খাত (রৈখিক), সৎ, যদি তা সরল এবং ভগ্ন রেখা ব্যবহার করে অথবা তা হতে পারে বংকিম (রামী) যদি তা ব্যবহার করে বহুকেন্দ্রিক বক্ররেখা। এ সমস্তরই সম্মেলন ঘটতে পারে এবং তখন তাকে বলা হর বাখ্ভী। এরাবেস্কগুলো হবে প্লানার বা সমতলিক, যদি সেগুলোর থাকে দুই আয়তন, যেমনটি আমরা দেখতে পাই প্রাচীর, দরজা, সিলিং, আসবাবপত্র কাপড়, গালিচা, পুস্তকের মলাট এবং পৃষ্ঠার সকল অলংকরণের মধ্যে। এগুলো স্থান বিষয়ক অথবা ত্রিমাত্রিক হতে পারে যা নির্মিত হয় স্তম্ভ, তোরণ এবং গম্বুজের পাঁজরের সাহায্যে। এই রূপটি হচ্ছে মাগরিব এবং আন্দালুসিয়ার স্থাপত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই কর্ডোভার মহান মসজিদে এবং গ্রানাডার আলহামরা প্রাসাদে। আলহামরাতে দৃশ্যমান তোরণের উপর স্থাপিত পরস্পর জড়াজড়ি করা বহু তোরণ দ্বারা নির্মিত হয়েছে একটি

www.icsbook.info

সম্পূর্ণ গম্বুজ যা কেবলমাত্র উদ্দীপ্ত কল্পনাই প্রত্যক্ষ করতে এবং তাদের গতিপথ অনুসরণ করতে পারে। এখানে গতিবেগটি এমনই প্রচন্ড যে ছন্দের সঙ্গে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক যে কোন ব্যক্তিকে তা পরিচালিত ও নিক্ষেপ করতে পারে অনন্তের সরাসরি উপলব্ধির দিকে। একটি প্রকান্ড মসজিদের মহৎ সম্মুখভাগ, একটা বিশাল প্রাচীরে প্রবেশ কক্ষের প্যানেল, দরজার যে হাতলের উপর দৃষ্টি হুমড়ি খেয়ে পড়ে, একটি পুস্ত কের পৃষ্ঠায় একটি মিনিয়েচার, একটি গালিচার নক্সা অথবা আপন কাপড় চোপড় বা বেল্ট কিংবা বেল্টের বাকল সবই মুসলিমের কাছে ঘোষণা করে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কেননা সে অ-প্রকৃত বা সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে যাওয়া অলৌকিক জগতের অসীমতা ও অনির্বচনীয়তা প্রত্যক্ষ করে এসবের মাধ্যমে।[২৫]

গ. আরবী ক্যালিগ্রাফি : অতিন্দ্রীয় উপলব্ধি বা চৈতন্য

মুসলিম চৈতন্য ইন্দ্রিয়াতীত ঐশী সত্তা নিয়ে এতটাই আবিষ্ট যে, মুসলিম উপলব্ধি চেয়েছে সর্বত্রই তার প্রকাশ দেখতে এবং ঐশী উপস্থিতি ঘোষণা করার পন্থা ও উপায় খুঁজে বার করার জন্য এই চৈতন্য এতটাই ব্যগ্র ছিল যে, এই করে পরম ভাব উচ্ছাসের সঙ্গে এমন একটি প্যাটার্ণ নির্মাণ যা মানবজাতির অভিজ্ঞতায় আগে কখনো ঘটেনি। এমন কি দৃশ্য শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে এর প্রতিভার জন্য এরাবেস্ক-এর অনন্ত বৈচিত্রও যথেষ্ট ছিলোনা। এ প্রতিভা প্রত্যেকটি চিন্তনীয় শিল্প প্রয়াসের বিষয়কে ব্যবহার করেছে, এমন একটি দর্পণে রূপান্তরিত করেছে যাতে এর মর্ম প্রতিবিম্বিত হয়। এটি তখন পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলো আরো একটি অধিকতর চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য।

প্রাক-ইসলামিক ইতিহাস, সাহিত্যিক গদ্য এবং কবিতায় শব্দের সৌন্দর্য বা নান্দনিকতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল। যদিও এর ধারণা ইসলামের আবির্ভাবকালে, আরবদের অনুরূপ অন্য কারো হাতে ততটুকু বিকশিত ছিলনা, তবু মেসোপটেমিয় এবং হিব্রুগণ, গ্রীক এবং রোমানগণ এবং হিন্দুরা শব্দের নান্দনিকতার সীমান্তকে যতদুর প্রসারিত করেছিল, তা সামান্য বিষয় ছিলনা। লিখন শিল্প ছিল অপরিপক্ক, স্থূল এবং সারা পৃথিবীতে সৌন্দর্যের বিচারে অনাকর্ষণীয় এবং এখনো প্রায় সর্বক্ষেত্রে একই অবস্থা বিদ্যমান।ভারত, বাইজানটিয়ান এবং খৃষ্টান প্রতীচ্যে লেখন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে এর যথোচিত ক্যাপাসিটি অনুযায়ী, অর্থাৎ যৌক্তিক প্রতীক হিসেবে। খৃষ্টান ও হিন্দুধর্মের দৃশ্য (প্রতিকৃতি মূলক) শিল্পের প্রকাশ কল্পিত হয়েছে লিখনের মাধ্যমে, অর্থাৎ বাঞ্ছিত খণ্ড খণ্ড ধারণাকে প্রকাশ করার জন্য শব্দের যৌক্তিক প্রতীকতার সাহায্যে তা ব্যক্ত হয়েছে। দৃশ্যশিল্পকে উদ্ধার করার জন্য অসংলগ্ন বিষয়ান্তরগামী চিন্ত ার সাহায্যের প্রয়োজন নেই, যদি না সেই শিল্প বাঞ্ছিত প্রাকসিদ্ধ ধারণাটিকে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে প্রকাশ করার জন্য অক্ষম হয়। এপোলো এবং এফ্রোদিতের জন্য এধরনের কোন অবলম্বনের প্রয়োজন ছিলোনা দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে, কেবল দৃষ্টহিসেবেই ওরা

---

২৫. কোনো দৃষ্টি তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, কিন্তু তিনি সমস্ত কিছু দেখেন। তিনি দয়াময় (৬:১০৩)

www.icsbook.info

দর্শকের কাছে ঐশীত্ব প্রকাশ করেছে, কারণ মানব প্রকৃতির সৌন্দর্য থেকেই এবং ইন্দ্রিয়কে প্রদত্ত চরিত্র থেকেই প্রত্যক্ষভাবে ঐশীত্ব বা প্রাকসিদ্ধ ধারণা উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল। কিন্তু বাইজানটাইন বা হিন্দুশিল্পের ব্যাপারে তা ছিলোনা, কারণ এই শিল্পের ফিগারগুলো ইঙ্গিতময় কোনো সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত ছিল, যেখানে এগুলোকে কেবল শৈলীরূপ দেওয়া হয়েছিল। এ কারণে লেখার আশ্রয় নেওয়া হয়, প্রতিচ্যে এবং ভারতীয় শিল্পে এর ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, এর প্রতীকতা ছিল সম্পূর্ণ যৌক্তিক এবং কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য, আরবী অথবা রোমান সংখ্যার থেকে যা ভিন্ন নয়। ইসলামের পূর্বে আরবী ভাষা যে লিপিতেই লেখা হউক না কেন প্রকৃত ব্যাপার ছিল এই ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এবং দৃশ্য শিল্পকর্মে ইন্দ্রিয়াতীততা অর্জনের জন্য বলিষ্ঠ উদ্যোগের ফলে, লিখন শিল্পে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবার প্রতীক্ষায় ছিলো, ইসলামী প্রতিভা সাফল্যের সঙ্গে সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে।

আরবী 'আল্লাহ' শব্দটি নাভাতি বর্ণমালা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নসখ রীতিতে (গোটা গোটা হাতের লেখায়) লিখিত হয় অথবা সিরিয়াক হরফের মাধ্যমে প্রাপ্ত আরামাইক, কুফী হরফে (কৌণিক)। অন্য যে কোন ভাষার মতই আগাগোড়াই এর তাৎপর্য ছিলো বলা যায়, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরগামী সম্ভবত আরো বেশী, এ কারণে যে, নিকটপ্রাচ্যের মানুষগুলো ক্যালিগ্রাফি বলতে যা বুঝায় তেমন কিছুর সঙ্গে পরিচিতই ছিলনা। রোমানরা ক্যালিগ্রাফিতে কিছুটা সামর্থ অর্জন করলেও হরফগুলোর তাৎপর্য আগের মত উজ্জ্বল, যৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক রয়ে গেল। আয়ারল্যান্ডের কেলটিক সন্যাসীরা Book of Kells এর মতো অল্প ক'টি উদ্ভাসিত পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলো। কিন্তু তাদের ক্যালিগ্রাফি রোমান স্তরকে অতিক্রম করেনি। তাদের অক্ষরগুলো ছিল গোল গোল এবং অলংকরণের মাধ্যমে, সৌন্দর্যমন্ডিত, কিন্তু তার পূর্ণ তাৎপর্যটি যৌক্তিকই থেকে যায়। অলংকরণ ছিল একটি অতিরিক্ত ব্যাপার। কারণ এতে করে হরফগুলোর চরিত্র পরিবর্তিত হয়নি এবং প্রত্যেকটি হরফই একাকী অবস্থান করে। দৃষ্টি এক হরফ থেকে আরেক হরফে পৌছায় লাফ দিয়ে এবং বোধশক্তিকে একাজে মধ্যস্থতা করতে হত, যুক্তি এবং স্মৃতি মিলিত হত গ্রাফিক অক্ষরগুলোকে শব্দ বা মনের ধারণায় রূপান্তরিত করার জন্য। লিখিত হরফ, শব্দ, ছত্র বা বাক্যের কোনো নান্দনিক ইনটুইশন হতনা। ক্রমে ক্রমে দুই জেনারেশনের ব্যবধানের মধ্যেই ইসলামী শিল্প আরবী শব্দকে রূপান্তরিত করলো একটি দৃশ্য শিল্পকর্মে এবং তাতে সংবেদনাত্মক ইনটুইশনকে এমন একটি নান্দনিক অর্থ দান করে যা অসংলগ্ন কর্ম ক্ষমতা ও বোধকে যে অসংলগ্ন অর্থ দান করে তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্যান্য শিল্পকলার মতই এই নতুন শিল্প ছিলো ইসলামী চৈতন্যের সামগ্রিক লক্ষের অধীন। এরদৃশ্য সামর্থগুলোর বিকাশ ঘটানো হয় একটি এরাবেস্ক নির্মাণ করার জন্য গ্রীক এবং ল্যাটিন বর্ণমালার মতই নাবাতি এবং সিরীয় বর্ণমালার হরফগুলো ছিল একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র। আরব শিল্পী এগুলোকে একত্রে যুক্ত করে দেয়, যাতে করে একটি অক্ষর প্রত্যক্ষ না করে দর্শকের চোখ একটি মাত্র দৃষ্টিপাতে এবং

www.icsbook.info

একটি সংবেদনাত্মক ইনটুইশনের সাহায্যে দেখতে পেতো পুরো শব্দটিকে এবং কার্যত গোটা বাকধারা বা ছত্রটিকে। দ্বিতীয়ত আরব শিল্পী অক্ষরগুলোকে করে নমনীয় যাতে করে সে অক্ষরগুলোকে প্রসারিত, প্রলম্বিত, সংকুচিত, নমিত, বিস্তৃত, সোজা, বাঁকানো, বিভাজন, গাঢ়করণ ক্রমে সংকীর্ণ করে আনয়ন, অংশত বা পূর্ণত বর্ধিতকরণ, যা খুশী তাই করতে পারে। হরফ হয়ে উঠে বংশবদ শিল্প উপকরণ, ক্যালিগ্রাফারের যে কোন নান্দনিক পরিকল্পনা বা ধারণাকে ধারণ ও কার্যকর করার জন্য যা থাকে প্রস্তুত। তৃতীয়ত, এরাবেস্ক শিল্পকর্মে এপর্যন্ত যা কিছু জ্ঞানলাভ হয়েছে শিল্পী তার সমস্ত কিছুকেই কাজে লাগায় ফুল ও লতাপাতার শিল্প রূপায়ণ এবং জ্যামিতিক চিত্রণ, কেবলমাত্র লেখন শিল্পের উৎকৃষ্টতর অলংকরণের জন্যই নয়, বরং লিখনকেই তার আপন অধিকারে একটি এরাবেস্ক-এ রূপদানের জন্য আরবী লিখন এভাবে হয়ে উঠে একটি মুক্ত তরঙ্গিত রেখা যা এখানে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে এবং নিজে নিজেই সম্পূর্ণ হতে পারে। মিল রেখে বিন্যাস করেই হউক বা বৃহৎ পরিবারে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়েই হউক অক্ষর বা বর্ণের নতুন করে অর্জিত নমনীয়তার ফলে ক্যালিগ্রাফারকে লিখনের ক্ষমতা দান করে দুটির একটি পন্থায় বা উভয় পন্থায়। সে যে নান্দনিক পরিকল্পনাটির বিকাশ ঘটাতে চায়, তার অনুসরণে। পরিশেষে সে অক্ষর বা হরফের এই মুক্তি সাধন করে, কেবলমাত্র এরাবেস্ক অলংকরণগুলোকে গ্রহণ করার জন্যই নয়, বরং একটি বৃহৎ এরাবেস্ক নির্মান করার জন্য তার সঙ্গে হরফকে মিশিয়ে দেয়। শিল্পী এটি সম্ভব করে তোলেঃ লিখন থেকে যাতে অন্য এরাবেস্কটি বিকাশ লাভ করে, অথবা সেসবের মধ্য থেকে লিখনের বিকাশ ঘটে। অক্ষরের যে মৌলিক প্রকৃতি অক্ষরকে বোধগম্যতা দান করে তা রক্ষিত হয়, এবং কাব্যে ছন্দের প্যাটার্ণ এবং সমতল এরাবেস্কগুলোতে গঠিত যে সব জ্যামিতিক ও লতাপাতা ফুলের রূপ ও আকৃতি, বোধগম্য আকারে সেগুলোকে প্রকাশ করার মধ্যেই সৃষ্টি হতো তাদের গতিশীলতা। এরাবেস্ক হিসেবে আরবী লিখন অসংলগ্ন রোধের চূড়ান্ত বাহনস্বরূপ অক্ষর বা যৌক্তিক প্রতীকগুলোকে রূপান্তরিত করে একটি সংবেদনাত্মক শিল্প উপকরণে এবং একটি নান্দনিক মাধ্যমে, যা জন্ম দেয় একটি অনন্য নান্দনিক ইনটুইশনের। মানবিক শিল্প হিসেবেই এ ছিল তার এক বিজয়, যার সাহায্যে অসংলগ্ন যুক্তির সর্বশেষ এলাকা অতিক্রম করে মানবিক শিল্পকে সংবদনাত্মক নান্দনিকতার জগতের সঙ্গে মুক্ত ও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এটি ছিল ইসলামের সর্বোচ্চ এবং চূড়ান্ত শৈল্পিক বিজয়।

ইসলাম দাবী করে, আল্লাহর বাণী বা কালাম হচ্ছে চিন্তার দিক দিয়ে তার নিকটতম ধারণা? তাঁর ইচ্ছার আশুতম প্রকাশ; যেহেতুে ইন্দ্রিয়াতীত হওয়ার কারণে তিনি অনন্ত কালই অজ্ঞেয় এবং অব্যক্ত মানবের গোচরে। সে কারণে তাঁর কালাম বা শব্দের মাধ্যমে প্রত্যাদেশের আকারে তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়েছে। তাহলে কুরআনের শব্দ হচ্ছে God-in-Percipi বুদ্ধিগ্রাহ্য আল্লাহ এবং একারণে সম্মানের দিক দিয়ে ও সৌন্দের্যের দিক দিয়ে তাকে দেওয়া উচিত চূড়ান্ত মর্যাদা। এজন্য ইসলামে এর লিখন

www.icsbook.info

হচ্ছে নান্দনিকতার চরম ও পরম। একারণে আরো যুক্তিসঙ্গত যে, আরবী ক্যালিগ্রাফির বিকাশ সাধন করতে হবে ঐশী সত্ত্বার সংবেদনাত্মক ইনটুইশন বা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ঘটানোর জন্য– আল্লাহকে যে প্রকাশ করা যায় না, চেতনায় ব্যক্ত করা এবং প্রতিফলিত করা যায়না, তারই পূর্ণ উপলব্ধির মাধ্যমে। যেহেতু আরবী লিখন একটি এরাবেস্ক হয়ে উঠেছে, সে কারণে তা যে কোন লিপিকর্মে প্রবেশ করতে পারে এবং সেখানে আইনত অবস্থান নিতে পারে তার চিন্তামূলক উপাদান যাই হউক। যে কোন শিল্পকর্মের উপরে তা চড়াও হতে পারে, এবং এর নান্দনিক গতিবেগ বা মূল্যের পরিপূরক হিসেবে, আর সেই শিল্পকে করতে পারে মহিমান্বিত, শিল্প কর্মটির সংঘা লিখন সমন্বত বা অঙ্গীভূত হোক বা না হোক, সকল মুসলমান পবিত্র কিতাবের প্রতি যে শ্রদ্ধা পোষণ করে থাকে, পরে লিখন শিল্প দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে এবং সর্বাধিক সংখ্যক মেধাকে সংহত করে ও প্রবেশ করে মুসলিম জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে। প্রস্তরে, কাঠে, কাগজে, চর্ম কিংবা বস্ত্রে, গৃহে, অফিসে, দোকানে, মসজিদে প্রত্যেকটি প্রাচীর এবং সিলিং-এ আরবী লিখন হয়ে উঠলো ইসলামের সাধারণ শিল্পকর্ম। এর প্রভাব এবং উপস্থিতি এত ব্যাপকতা লাভ করে যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কোন নগরী বা গ্রাম এই শিল্পকর্মের ডজন ডজন মহৎ স্রষ্টা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়নি। এমনকি, ইসলামের শত্রুরাও এই প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলনা। খ্রীষ্টান স্পেন, ফ্রান্স এবং ইটালীতে চিন্তার দিক দিয়ে অজ্ঞতা ও অযোগ্যতার বশে আনাড়ীর মত আরব লিখন শিল্প ব্যবহার করেছে, তবু সেই ব্যবহারের ফলে নান্দনিকতার দিক দিয়ে তারা প্রভূত লাভবান হয়েছে।[২৬] ইহা যে নান্দনিক সংবেদনাত্মক ইনটুইশনের জন্ম দেয় তা যে কোন এরাবেস্ক শিল্পকর্মের মতই কল্পনা উৎক্ষেপণ করতে সক্ষম, যে কোন যুক্তি অভিমুখে তার উর্ধ অভিসারী উড্ডয়নে, হয়তোবা তার চাইতেও বেশী, কারণ একই সময়ে এর অসংলগ্ন উপাদানগুলো পাঠ করতে সক্ষম দর্শকের জন্য আরবী লিখন বুদ্ধির সক্রিয়তার মাধ্যমে জন্মাবে কল্পনার লক্ষ্যের আরো বিশিষ্ট একটি রূপ, এর গতিবেগে সে লক্ষ্যের অভিমুখে আরো অগ্রসরতা। তাহলে, এ কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, কুরআন কপি করতে গিয়ে আরবী ক্যালিগ্রাফি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম বিশ্বের হয়ে ওঠে সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পকর্ম। রাজা বাদশা এবং প্রাকৃতজন প্রত্যেকই তাদের সমগ্র জীবনের জন্য একটি পরম আশা পোষণ করতেন: একখণ্ড সমগ্র কুরআন কপি করা এবং তা সমাপনের পর পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ।[২৭]

জামাখসারির (তাঁর আছাদ আল বালাগা, দ্রঃ 'কালাম') বিবৃতি মতে উজির মোহাম্মদ আবু আলী মুকলা লিখনকে তুলনা করেছিলেন কাজের সঙ্গে এবং দুটি শিল্পকর্মের

---

২৬. ইতিহাসবিদরা 'মোজারাবিক' শব্দটি সৃষ্টি করেছেন, খ্রীষ্টিয়ান, ইতালী ও স্পেনিস অলংকরণের সমুদয় ঐতিহ্যটি বুজানোর জন্য, যেগুলোর সঙ্গে আরবী motive (মুলভাব) এবং নক্সা সংশ্লিষ্ট।

২৭. তা বুঝা যায়, কুরআনের পাঠের কপির অনন্ত বিপুলতায়, যা বাজনাবর্গ অভিজাতগণ এবং সাধারণরা, সকল স্তরের মানুষের কপি করেছিলেন, বা যা রয়েছে সকল স্তরের মানুষের অধিকারে।

www.icsbook.info

পরিকল্পনায় ও রচনায় অর্পণ করেছিলেন একই নান্দনিক দায়িত্ব। তিনি লিখন শিল্পের মৌল গুণ পাঁচটি বলে বর্ণনা করেছিলেন; আত্ তাওফিয়া (শব্দটি যেসব অক্ষর দিয়ে নির্মিত তার প্রত্যেকটিকে তার পূর্ণ অংশ প্রদান যাতে করে সমগ্র ও অংশের মধ্যে সম্পর্ক ভারসাম্যপূর্ণ এবং সুসামঞ্জস্য হতে পারে), আল ইলমান (প্রত্যকটি অক্ষরকে তার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান, ক্ষমতা ও গুরুত্ব প্রদান), আল ইকমাল (প্রত্যেকটি অক্ষরকে তার দৃশ্য ব্যক্তিত্ব প্রদান, যা প্রকাশিত তার ভঙ্গিতে, সোজা, দন্ডয়মান অবস্থায় ফ্ল্যাট অবস্থায় শুয়ে পড়ায়, দৃঢ় ন্যুব্জতায়, আত্মসমর্পণ, অভিজ্ঞতালব্ধ বক্রতায়); আল্ ইশবা (প্রত্যেকটি বর্ণকে তার অন্তর্গত দৃশ্য ব্যক্তিত্ব যার প্রকাশ ঘটে সূক্ষ্মতার মাধ্যমে প্রত্যেকটি অক্ষরের যা দাবী তা দান করা); আল ইরসাল (মুক্ত গতিতে রেখার উৎসারণ যা ইতস্ততা বা কোন অন্তর্গত প্রতিনিবৃত্তির দ্বারা বাধ্যগ্রস্থ নয়, যা উচ্চ গতির বেগ সৃষ্টি করে)।[২৮] আবু হাইয়ান আত্ তাওহীদী তার *ইলমুল কিতাবাতে* বলেনঃ "সাধারণভাবে লিখন হচ্ছে জাগতিক উপকরণ দিয়ে আধ্যাত্মিক চিত্রণ।"[২৯] যুগ যুগ ধরে মুসলমানরা অজ্ঞাতনামা সাধু দরবেশদের উক্তির আবৃত্তি করেছেন, যেমন : 'মানুষের মনের অবস্থান তাদের কলমের দাঁতের নীচে,' "লিখন হচ্ছে চিন্তার পানি সেচন," "সুন্দর লিখা দুর্বল চিন্তার অভাব পূরণ করে, আর ধ্বনিকে তা দান করে জীবনীশক্তি,"[৩০]

মধ্যযুগের বহু পণ্ডিত মানবিক বিষয়ে মহৎ খ্যাতি অর্জন করেছেন, যেমন ইবন আবদ রাব্বী, মোহাম্মদ আমীন, ইবনুন আছীর, ইবনুল নাদী, আল কালকাসান্দী প্রমুখ। এঁরা সকলেই লিখন ক্ষেত্রে সহগামী মুসলমানের কৃতিত্বকে স্বীকার করেছেন। তাঁরা এতে গর্বিত ছিলেন যে, অন্য যে কোন লেখনী শিল্পের চেয়ে আরবী লিখন অনেক বেশী বিকশিত হয়েছে। তারা গর্বিত যে, আরবী লিখন-সৌন্দর্য শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে, এবং এমন অভিব্যাপ্তি ও গৌরব অর্জন করেছে যা সম্পূর্ণভাবে তুলনাবিহীন, এবং পরিশেষে এতে অর্পিত হয়েছে পরমমূল্য অর্থাৎ ধর্মীয় মূল্য, ঐশী প্রজ্ঞা প্রকাশের বাহন এবং মাধ্যম হিসেবে। কুরআনুল করীম তাদের মূল্য নির্ণয়ের অভ্রান্ততার চূড়ান্ত প্রত্যয় ও সন্তোষের সঙ্গে দাবী করে যে, লিখনকে অপার্থিব মর্যাদা দান করেছে একটি আয়াতে যার সূচনা কলম এবং লেখনির তাকিদ দিয়ে।[৩১]

যেখানে, সমস্ত শিল্পকলাই সমজদারদের উপর চিং-প্রকর্ষ ও মানবিকতা-সৃজনকারী

---

২৮. Naji Zayn al Din. *Musawwer al Khan al Arabi.* Baghdad: Al Mujam al Ilmi al Iraqi. 1288/ 1968). P. 372.

২৯. ঐ, পৃষ্ঠা ৩৯৬, যাতে জইনুদ্দিন আত তৌহীদের রিসালা ফি ইলমুল কিতাবাত একটি অংশ উদ্ধৃত করেছে। এটি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি।

৩০. ঐ।

৩১. নূন! কলমের সাক্ষ্য এবং যা, তা লিপিবদ্ধ করে তার সাক্ষ্য (৬৮:১-২) পাঠকের .... তোমার রাব্বের নামে, যিনি দয়াময়, যিনি কলম ব্যবহার শিখিয়েছেন, মানুষকে শিখিয়েছেন, যা সে জানতো না (৯৬:৩-৫)।

www.icsbook.info

প্রভাব বিস্তার করে, সেখানে গ্রীস এবং রেনেসাঁর শিল্পকলা মানুষের কাছে মানুষের নিজের মূল্য বৃদ্ধি করে এবং তার কল্পনা এবং ইচ্ছাকে আত্মউপলব্ধির বৃহত্তর উচ্চতায় উন্নীত করার জন্য তাকে অনুপ্রাণিত করে। গ্রীক এবং রেনেসাঁ শিল্প তা সম্পাদন করে মানুষকে একটা মহত্তর ও গভীরতর মানবিকতায় শিক্ষিত করে, এমন মহৎ এক মানবিকতা যে, তার চেতনায় তা লোপ পায় ঐশ্বরিকতার মধ্যে যা কিনা আশা ও সর্চোচ্চ জীবন মানের শীর্ষবিন্দু। ইসলামে শিল্পকর্ম উৎকর্ষ মানবিকতা ও আত্মউপলব্ধিকর একই প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু ইসলাম তা সম্পাদন করে মানুষকে প্রতিটি মুহূর্তে ঐশী উপস্থিতির সম্মুখে স্থাপন করে। ঐশীসত্ত্বা অপৌরুষেয় এবং ইন্দ্রিয়াতীত হওয়ায় ইসলামী শিল্পকলা যে আদর্শবাদের জন্ম দেয় তা কখনো দাম্ভিক অথবা অবাধ্য প্রমিথিউসের মত ছিলনা। যেহেতু তা ছিল মানবীয়, একারণে ইসলামী শিল্পকলার আদর্শবাদ নিজেকে নিয়ম-শৃংখলার অধীনে স্থাপন করে, তার নিজের ইন্দ্রিয়াতীত চেতনার মাধ্যমে। এটি কি সীমাবদ্ধতা? নিশ্চয়ই। এই সীমাবদ্ধতা আরোপিত হয় ইন্দ্রিয়াতীত মূল্যমান দ্বারা সংজ্ঞা মতে যার সূচনা অনন্ত থেকে; এই সীমাবদ্ধতা হচ্ছে সেই সব মূল্যের কারণে যেগুলো, সেসব বিষয়ে 'বিভ্রান্তির' মাধ্যমে নয় বরং সোজাসুজি তার সামনে দাঁড়িয়ে, উৎকৃষ্টতরভাবে নিরীক্ষণ ও উপলব্ধি করা যায়। যেহেতু মূল্যের উভয় জগতই প্রাকসিদ্ধ, সে কারণে ধারণার দিক দিয়ে সে সব বিষয়ে মানুষের বিভ্রান্তি অসম্ভব এবং প্রমিথিউস হামেশাই একজন আত্মতুষ্ট ব্যক্তি। ইসলামী শিল্পকর্মের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে খোদ ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের অনুসন্ধান এবং সর্বদা পরম ট্রান্সেন্ডেন্ট বাস্তবতা থেকে পার্থক্যের দূরত্ব বজায় রাখা।

www.icsbook.info

তথ্যসূত্র (References)

'Abd Allah, Ismail. *World Chaos or a New Order: A Third World View.* "World Faiths and the New World Order," eds. Joseph Gremillion and William Ryan (Washington: The Interreligious Peace Colloquime, 1978).

Al Ash'ari, Abu al Hasan. *Maqalat al Islamiyin* (Cairo: Maktabat al Nahdah al Misriya, 1373/1954).

Ahmad, Khurshid and Ansari, Zafar. eds. Islamic Perspectives: *Studies in Honor of Mawlana Sayyid Abu al 'Ala Mawdudi* "Is Muslim Definable in Terms of His Economic Pursuits?" (Leicester: The Islamic Foundation, 1399/1979.

Arnold, T.W. *Painting in Islam* (Oxford: The Clarendon Press, 1928).

Arnold, T.W. The Preaching of Islam (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf Pulishing, 1961).

Al Isfahani, Abu al Faraj. *Kitab al Aghani* (Beirut: Dar al Thaqafah, 1374/1955).

Barakat, Muhammad. *Al Murshid ila Ayat al Quran al Karim* (Cairo: Al Maktabah al Hashimiyah, 1957).

Barth, Karl. *Against the Stream* (London: SCM Press, 1954).

Barth, Karl. *Church Dogmatics,* tr. G. W. Bromley and T.F. Torrence (London: T.&T. Clark, 1960).

Bell, Norman W. and Vogel, Ezra F. eds. *The Family* (Glencoe, IL: The Free Press, 1960).

Battenson, Henry. *Documents of the Christian Church* (London: Oxford University Press, 1956).

Brhadaranyaka Upanisad. 3.7.3.

Buber, Martin. *On Judaism* (New York: Schocken Books, 1972).

Al Bukhari, Muhammad ibn Ismail, *al Jamial Sahih.*

Clemen, Carl. *Primitive Christianity and Its Non-Jewish Sources,* tr. Robert G. Nisbert (Edinburgh: T&T. Clark, 1912).

Cox, Harvey, *The Secular City* (New York: Macmillan, 1956).

Creswell, K. A. C. *Oriental Religions in Roman Paganism* (New York: Dover Publications, 1956).

Duwaydir, Amin. *Suwar min Hayat al Rasul* (Cairo: Dar al Ma'arif bi Misr, 1372/1953).

www.icsbook.info

Ettinghausen Richard. *The Character of Islamic Art in The Arab Heritage,* ed. N. A. Fairs (Princeton: Princeton University Press, 1944).

Al Faruqi, Isma'l Raji. *Christian Ethics: A Systematic and Historical Analysis of its Dominant Ideas* (Montreal: McGill University Press, 1967).

Al Faruqi, Isma'il Raji. "Divine Transcendence and Its Expression," *World Faiths,* No. 107 (Spring, 1979).

Al Faruqi, Isma'il Raji. *Historical Atlas of the Religions of the World* (New York: The Macmillan Co., 1974).

Al Faruqi, Isma'il Raji. "Islam and Art," *Studia Islamica,* Fasciculi xxxvii (1973).

Al Faruqi, Isma'il Raji. "Jawhar al Hadarah al Islamiyah," *Al Muslim al Muasir,* Vol. 7, No. 27 (1901/1981).

Al Faruqi, Isma'il Raji. "The Metaphysical Status of Values in the Western and Islamic Traditions, *Studia Islamica,* Fascicle xxviii, 1968.

Al Faruqi, Isma'il Raji. "Misconceptions of the Nature of the Work of Art in Islam," *Islam and the Modern Age,* Vol. 1, No. 1 (May, 1970).

Al Faruqi, Isma'il Raji. *On Arabism: "Urubah and Religion: An Analysis of the Fundamental Ideas of Arabism and of Islam as Its Highest Moments of Consciousness* (Amsterdam: Djambatan, 1962).

Al Faruqi, Isma'il Raji. "On the Nature of Islamic Da'wah," *International Review of Mission,* Vol. 65, No. 260 (October, 1976).

Al Faruqi, Isma'il Raji. "On the Nature of the Work of Art in Islam," *Islam and the Modern Age,* Vol. 1, No. 2 (Augusts, 1970).

Al Faruqi, Isma'il Raji. "On the Raison d'etre of the Ummah," *Islamic Studies,* Vol. 2, No. 2 (June, 1963). 120

Al Faruqi, Isma'il Raji. *Usul al Sahyuniyah fi al Din al Yahudi* (Cairo: Ma'had al Dirasat al 'Arabiyah al 'Aliyah, 1963).

Al Faruqi, Isma'il Raji, and A. O. *Naseef, Social and Natural Sciences* (London: Hodder and Stoughton, 1981).

Al Ghazali, Abu Hamid. *Al Munqidh min al Dalal* (Damascus: University Press 1376/1956).

Al Ghazali, Abu Hamid. *Tahafut al Falasifah,* tr. Sabih Ahad Kamali (Lahore: The Pakistan Philosophical Congress, 1958).

Gordis, Robert. *A Faith for Moderns* (New York: Macmillan, 1932).

Hastings, Nicolai. *Ethics,* tr. Stanton Coit (New York: Macmillan, 1932).

Haykal, Muhammad Husayn. *Al Faruqi 'Umar* (Cairo: Matba'at Misr, 1364).

www.icsbook.info

Haykal, Muhammad Husayn. *The Life of Muhammad,* tr. Isma'il R. Al Faruqi (Indianapolis: American Trust Publications, 1976).

Hiriyanna, M. *Outlines of Indian Philisophy* (London: Allen and Unwin, 1961, 1st. ed., 1932).

Hitti, Philip K. *History of the Arabs* (London: Macmillan Co., 1963).

Al Husayni, Ishaq Musa. *Al Ikhwan al Muslimun* (Beirut: Dar Beirut li al Tiba'ah wa al Nashr, 1955).

Ibn Bajjah, *Risalat Tadbir al Mutawahhid.*

Ibn Hisham. *The Life of Muhammad,* tr. A. Guillaume (London: Oxford University Press, 1955)

Al Isfahani, Abu al Faraj. *Kitab Aghani* (Beirut: Dar al Thaqfah, 1374/1955).

Ibn Kathir, Isma'il. *Tafsir al Qur'an al 'Azim* (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1388/1969).

Ibn Khaldun, 'Abd al Rahman. *Al Muqaddimah* (Cairo: Matba'at Mustafa Muhammad, n.d.).

Ibn Taymiyah. Ahmad ibn 'Abd al Halim. *Al Hisbah fil Islam wa Wazifat al Hukumah al Islamiyah* (Madinah: Islamic University Press, n.d.).

Ibn Taymiyah, *Al Siyasah al Shariyah,* (Beirut: Dar al Kutub al 'Arabiyah, 1966).

Ibn Tufayl. *Hayy ibn Yaqzan,* tr. George N. Atiyah, in *A Sourcebook in Medieval Political Philosophy,* ed. Ralph Lerner and Muhsin Mahdi (Glencoe, IL: The Free Press, 1936).

Iqbal, Muhammad. *Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1977).

Al Islam wa al Hadarah (Riyadh: W.A.M.Y. Publications, 1401/1981).

James, William. *The Variety of Religious Experience* (New York: Mentor Books, New American Library, 1953).

Al Jaziri, 'Abd al Rahman. *Al Fiqh 'ala al Madhahib al Arba'ah* (Cairo: Matba'at Mustafa Muhammad, n.d.).

Jonas, Hans. *The Gnostic Religion,* (Boston: Beacon Press, 1958).

Al Jurjani, 'Abd al Qadir, *Dalail al I'jaz* (Cairo: al Matba'ah al 'Arabiyah, 1352 H.).

Kaufmann, Walter, *Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist* (Princeton: Princeton Press, Meridian Books, 1956).

Kenkel, William F. *The Family in Perspective* (New York: Meredith Corporation, 1973).

www.icsbook.info

Khallaf, 'Abd al Wahhab. *'Ilm Usul al Fiqh* (Cairo: Dar al Qalam, 1392/1972).

Larrabee, Harold A. *Reliable Knowledge* (New York: Houghton Mifflin Company, 1945).

Lewis, C. I. *Analysis of Knowledge and Valuation* (La Salle: The Open Court Publishing Co., 1946).

MacNeil, William. *The Rise of the West* (Chicago: Chicago University Press, 1964).

Al Muhammasani, Subhi. *Falsafat at Tashrifi al Islam* (Beirut: Dar al 'Ilm li al Malayin, 1380/1961).

Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure* (Glencoe, IL: the Free Press, 1962).

Muhammad ibn 'Abd al Wahhab. *Kitab al Tawhid* (Kuwait: I.I.F.S.O., 1399/1979).

Al Muhdhiri, al Hafiz. *Mukhtasar Sahih Muslim,* ed. Muhammad Nasir al Din al Albani (Kuwait: al Dar al Kuwaytiyah li al Tiba'ah).

Murray, Gilbert. *Five Stages of Greek Religion* (Garden City, NY.: Doubleday, 1955).

Murti, T.R.V. *The Central Philosophy of Budhism* (London: Allen and Unwin, 1955).

Muslim ibn al Hajjaj al Qushayri. Al Jami 'al Sahih.

The Muslim World and the Future Economic Order (London: The Islamic Council of Europe, 1979).

Naji, Zayn al Din. *Musawwar al Khatt al 'Arabi* (Baghdad: Al Majma' al 'Ilmi al 'Iraqi, 1980).

Al Nashshar, 'Ali Sami. *Manhij al Bahth inda Mufakkiri al Islam wa Naqd al Muslimin li al Mantiq al Aristatalist* (Cairo: Dar al Fikr al 'Arabi, 1367/1947).

The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, ed. Samuel Macauley Jackson (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1977).

Niebuhr, Reinhold, *An Interpretation of Christian Ethics* (New York: Harper, 1935).

Niebuhr, Reinhold, *Moral Man an Immoral Society* (New York: Scribner's, 1955).

Niebuhr, Reinhold, *The Nature and Destiny of Man: a Christian Interpretation* (New York: Scribner, 1941).

Nietzche, Friedrich. *Works,* tr. and ed. Walter Kaufmann (New York: The Viking Press, 1954).

www.icsbook.info

Noss, John B. *Man's Religions* (New York: Macmillan, 1974).

Otto, Rudolf. *The Idea of the Holy* (New York: Oxford University Press, 1958).

Pritchard, James. *Ancient Near Eastern Texts* (Princeton: Princeton University, 1955).

The Qur'an.

Radhakrishnan, S. *Indian Philosophy* (London: Allen and Unwin, 1951, 1st. ed. 1923).

Robertson, John M. *Pagan Christs* (Secaucus, N.J.: University Books, 1911).

Sabine, George H. *A History of Political Theory* (New York: Henry Holt and Co., 1947).

Santayana, George. *Skepticism and Animal Faith* (New York: Scribner's, 1923).

Saqr, Muhammad. *A Iqtisad al Islami* (Jeddah: Al Ma'had al 'Alami li Abhath al Iqtisad al Islami, 1980).

Schleiemacher, Friedrich, D. *Religion-Speeches to its Cultural Despisers,* tr. John Oman (New York: Harper and Brothers, Publishers, 1958).

Schopenhauer, Arthur. *The World as Will and Idea,* tr. R. B. Haldane and J. Kemp (London: Routledge and Kegan Paul Limited).

Al Shahristani, Muhammad 'Abd al Karim. *Al Milal wa al Nihal* (Cairo: Al Azhar Press, 1328/1910).

St. Augustine. "Against Two Letters of the Pelagians, *"Nicene and Post Nicene Fathers,* First Series vol. 5 (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1978).

St. Augustine. *"De Diversi Quaestionibus, Ad Simplicianum."*

St. Augustine. *The Enchiridion,* A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, First Series eds. Philip Schaff (Grand Rapids: Wm, B. Eerdmans, 1978).

Al Tawhidi, Abu Hayyan. *Risalah fi 'ilm al Kitabah.* An unpublished MS, Cairo University Library.

Thoughts on Islamic Economics (Dacca, Bangladesh: Islamic Economics Research Bureau, 1979).

United Nations Charter, 1945.

World Faiths London: Journal of the World of Congress of Faiths.

Zaehner, Robert. *Hinduism* (New York: Oxford University Press; 1966).

Al Zubaydi, M. M. *Taj al 'Arus* (Dar Maktabat al Hayah, 1965).

www.icsbook.info

বিদেশী পরিভাষাসমূহ ও শব্দকোষ

A

A Fortiori : দৃঢ়তর যুক্তির সঙ্গে।

A la Pascal : প্যাসক্যালের মত অনুসারে।

A la West : পাশ্চাত্য পন্থায়।

A priori : অগ্রে, কারণ থেকে কার্য।

Actus : কর্ম।

Adhab al Akhirah : পরকালের শাস্তি।

Ad infinitum : অনন্ত পর্যন্ত।

Ad nauseam : পীড়াদায়ক চূড়ান্ত সীমা।

Akhirah al : মৃত্যু পরবর্তী জীবন।

Al Amr bi al Maruf wa al Nahy 'an al Munkar : *Maruf* কল্যাণের সাহায্য এবং মন্দের বাধা প্রদান।

Al aqrabun Awla bi al: স্বজনেরা দান-খয়য়াতের অধিকতরো হকদার।

Allah A'lam : আল্লাহই ভাল জানেন।

Allah akbar : আল্লাহ মহান।

Amal, al : যে সকল কর্ম দ্বারা মানুষ পুরস্কার বা শাস্তি পায়।

Amil, al: (১) উরওয়াহুল উসকার প্রতিষ্ঠাতা, সংগঠক ও নেতা।

: (২) গভর্ণর বা শাসক।

Amanah : স্বর্গীয় আমানত।

Amn : নিরাপত্তা।

Ansar, al : মদিনার প্রথমদিককার মুসলিমগণ।

Arete : পাহাড়ের শিরদাঁড়া।

Asabiyah, al : সামাজিক সংহতি।

Awjuh al Balaghh : গ্রন্থিলতার বিভিন্ন দিক।

Ayah : নিশান, নিদর্শন।

Ayat Ayah : এর বহুবচন, নির্দশনসমূহ।

www.icsbook.info

B

Bar-Adam : সুশিক্ষাপ্রাপ্ত, এবং সে কারণে পুণ্যবান মানুষ।

Barnash: একইরূপ : সুশিক্ষাপ্রাপ্ত, এবং পুণ্যবান।

Bay'ah, al : খলিফা অথবা রাষ্ট্রধানের প্রতি চিরাচরিত আনুগত্য।

Bellum omnium contra omnes : সকলের বিরুদ্ধে সকলের যুদ্ধ।

Bete noire : এমনকিছু যা অহেতুক ভীতি জন্মায়।

Bidah, al : নিন্দিত নতুন কিছু।

Bila kayf : কারণ না দেখিয়ে।

Blut and Boden : রক্তমাংস।

Blut and Erde : রক্ত এবং ধুলিকণা।

Buyu, al : বেচাকেনা।

C

Chef-d'oeuvre : শ্রেষ্ঠ রচনা বা কীর্তি।

Condition sine qua non : প্রয়োজনীয় শর্ত।

Coup de grace : শেষ পোচ।

D

Da'iyah, al : ইসলামের দিকে আহ্বানকারী।

Da'wah, al : মিশণ।

Dar al Akhirah. al : অন্তিম বাসস্থান, পরবর্তী দুনিয়া।

Dar al Harb : যুদ্ধের গৃহ, দেশ।

Dar al Islam : ইসলামী রাষ্ট্র।

Dar al Salam : শান্তির গৃহ।

Das Volk : জনগোষ্ঠী, জাতি।

Dawlah : রাষ্ট্র।

De jure : অধিকার বলে, আইনগত।

Demut : নম্রতা।

Denovement : সমস্যা, সমাধান।

www.icsbook.info

Depasse : অতিক্রম করে যাওয়া।

Deus otiosus : নিষ্ক্রিয়, অলস ঈশ্বর।

Dhimmi,al : জিম্মি, ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক।

Dhu Qurba : স্বজ্ঞানে, স্বজন।

Die Willikur : পছন্দ, খামখেয়ালী।

Din al Fitrah : আল্লাহর দ্বীন, প্রকৃতি এবং যুক্তির ধর্ম, ভারসাম্য এবং সোনালী মধ্যপন্থা।

Din al Hanif : প্রকৃত ধর্ম।

Diwan al : দরকার।

E

Elan : জীবনী বা প্রাণশক্তি, প্রবল উৎসাহ।

Esthetique : সৌন্দর্যতত্ত্ব।

Eudaemonia : একটি এরিষ্টটলী পরিভাষা, যুক্তিসঙ্গত সক্রিয়ায় জীবনের সুখ।

Ex cathedra : উচ্চ কর্তৃত্বের সঙ্গে।

Ex hypothesi : অনুমানের ভিত্তিতে।

Ex nihilo : নাস্তি থেকে।

F

Facta : কর্ম।

Falah, al : কর্মের মাধ্যমে পরিতৃপ্তি, সাফল্য, সুখ এবং আরাম ও স্বস্তি।

Fard al : কর্তব্য।

Fard Kifayah : সমষ্টিগত কর্তব্য।

Fitrah, al : প্রাকৃতিক অবস্থা, যে অবস্থায় প্রত্যেকেই জন্মলাভ করে।

G

Gemeinschaft : সম্প্রদায়, সম্প্রদায়ের সদস্যত্ব।

Gesellschaft : সমাজ, সংঘ।

Ghuluww. al : অল্পতা।

Grosser Stille : মহাশান্তি, স্কুল।

www.icsbook.info

H

Hadith, al : মহানবী (সা.) এর কথা ও কাজের বিবরণ।

Hajj, al : হজ্জ, মক্কার নির্দিষ্ট স্থানসমূহে এবং নিদের্শিত সময়গুলোতে ইবাদতের জন্য তীর্থ যাত্রা।

Haqq al : সত্য।

Haram al : নিষিদ্ধ, অনধিগম্য।

Heilsgeschichte : নাজাত।

Hidayah al : যা সত্য এবং সঠিক তার দিকে পথ নির্দেশ।

Hijrah, al : ইসলামের খাতিরে দেশত্যাগ।

Hisab al : বিচার, হিসাব-নিকাশ।

Homo economicus : অর্থনৈতিক জীব।

Homo religious : যে ব্যক্তির চৈতন্য সব সময়ই কার্যকর।

Horror vacui : প্রকৃতি শূন্যতাকে ঘৃণা করে।

Hu : আরবী 'হুয়া' শব্দটির সংক্ষিপ্তরূপ– অর্থাৎ 'তিনি' আল্লাহ তা'য়ালা।

Hudud, al : বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সংঘটিত অপরাধের জন্য আল্লাহ কর্তৃক কুরআনের নির্দেশিত শাস্তি।

*Husnayayn, al :*দু'টি সুখ।

I

Ijaz, al : শক্তি হরণের ক্ষমতা।

Ibtigha wajh Allah : আল্লাহর প্রসন্নতা কামনা করা।

Idee-fize : স্থির ধারণা।

Ijma, al : ঐকমত্য।

*Ijma al 'amal :*কর্মের ঐকমত্য।

*Ijma al Iradah :*ইচ্ছার ঐকমত্য।

Ijma al ruvah : দৃষ্টির ঐকমত্য।

Ijma al ijtihad : ইযতিহাদের ঐকমত্য।

Ijtihad, al : আইন বিষয়ক নীতিমালার ব্যবহার এবং ইসলামিক আইন তৈরির জন্য আগ্রহ।

Ikhlas al : উদ্দেশ্যের সততা ও পবিত্রতা।

Ikmal al : ভঙ্গিতে প্রকাশিত – সোজা দাঁড়ানো অবস্থায়, চিৎ হয়ে শুয়ে, দৃঢ়ভাবে নীচু হয়ে, আত্ম-ত্যাগ, যা বক্রতার মধ্যে উপলব্ধি করা যায়– প্রত্যেকটি হরফে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিত্ব সংগতিপূর্ণ।

www.icsbook.info

Illah al : যথোপযুক্ত যুক্তি।

*Ilm al tawhid :*ধর্মতত্ত্ব।

Ilman, al : প্রত্যেকটি হরফকে তার যথোপযুক্ত স্থান এবং শক্তি বা গুরুত্ব প্রদান।

Imago Dei : আল্লাহর ছায়ায়, প্রতিবিম্ব।

Imam, al : একজন নেতা– ধর্মীয়, রাজনৈতিক অথবা অন্যরকমের।

Iman al : ঈমান, বিশ্বাস।

Imperium Mundi : বিশ্ব সরকার রাষ্ট্র।

Imperiam Romanum : রোমক রাষ্ট্র।

Inna al din al muamalah : ধর্ম হচ্ছে তার লোকজনের প্রতি মানুষের ব্যবহার।

Ipso facto : ঠিক এই হেতু।

Irsal, al : দ্বিধাদ্বন্দ্ব কিংবা অন্তর্নিহিত কোনো বাধা দ্বারা বাধাগ্রস্থ না হয়ে একটি রেখা স্বাধীনভাবে অগ্রসর হলে ফোয়ারার মত বিস্ফোরণ ঘটে, এবং এভাবে গতিবেগের সঞ্চার হয়।

Ishba, al : ব্যক্তিত্বের কারণে যা প্রকাশিত হয় চাতুর্য বা গুরুত্বের সঙ্গে।

Istiman al : নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রার্থনা করা।

Istimar, al : পুনর্গঠন, উৎকৃষ্টতরো করার উদ্দেশ্যে বিকাশ সাধন।

Istimar Ard : জমিনের পুনর্গঠন।

Istihsan al : একটি আইনগত সিদ্ধান্তের উপর অন্য একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

J

Jahili al : অমুসলিম এবং মুসলিম আমলের আরব।

Jahliya, al : প্রাক ইসলামী আমল।

Jamaah, al : দশটি যারিয়া, গ্রুপ বা দল।

Jihad al : ইসলামের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ, আত্ম-প্রয়াস।

Jinn : আল্লাহ কর্তৃক আগুন দ্বারা সৃষ্ট জীব, এদের কেউ কেউ বিশ্বাসী এবং অন্যরা অবিশ্বাসী।

Jizyah, al : প্রতিটি অমুসলিম নাগরিকের উপর আরোপিত ট্যাকস, যা প্রতিবছর ধার্য করা হয়।

K

Kadhib al : মিথ্যাবাদী।

Kalimah al : ঘোষণা, ইসলামের মর্মবাণী।

*Karma :*কর্ম, নিজেকে অনন্ত করার বিধান।

www.icsbook.info

Kasb al : কর্মের ফল গ্রহণের সামর্থ্য।

Khalaif al : উত্তরাধিকারীগণ।

Khalifah al : খলিফা, প্রতিনিধি।

Khatt al : সরল রেখা।

Khilafah, al : প্রতিনিধিত্ব।

Khulafa al : আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধিগণ।

Khutbah, al : ভাষণ, জুমার নামাজের বক্তৃতা।

Kufi, al : কৌণিক, আরবী ক্যালিগ্রাফির এটা রূপ।

Kufr, al : অবিশ্বাস।

L

La bonte Chretienne : খৃষ্টীয় দয়া দাক্ষিণ্য।

La ilaha illa Allah : আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

La nation : জাতি।

Labbayka Allahumma Labbayk' : তোমার সামনে, হে প্রভু, আমরা এখানে সমাগত– তোমার আহ্বানে।

*Laissez_faire :*যে থিওরী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করে; অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার মতবাদ।

M

Makruh, al : যার বিরুদ্ধে মত দেওয়া হয়েছে, নিষিদ্ধ।

Mal a-propos : অসময়োচিত।

Mana : আল্লাহর করুণা।

Mandub, al : নির্দেশিত, অনুমোদিত।

Masalih al Mursalah : বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে, কোন কিছুকে অনুগ্রহ করার আইনগত বিধান।

Massa peccata : পতিত জীব।

*Materia prima :*মূখ্য বস্তু।

Materiaux : প্রকৃত অস্তিত্বশীল, প্রকৃতই বিদ্যমান।

Materiel : বাস্তব, প্রকৃত।

*Materiel dart :*আটিষ্টিক প্রচেষ্টার লক্ষ্য।

www.icsbook.info

Modus vivendi : জীবন যাপন প্রণালী, সাময়িক চুক্তি।

Monaster : কনভেন্ট, মঠ।

Muamalat, al : ক্রয়-বিক্রয়।

Mubah : অনুমোদন যোগ্য।

Mahajirun, al : যেসব মুসলিম ইসলামের কারণে মদিনা বা অন্যস্থানে চলে গিয়েছিলেন।

Muhasib, al : সরকারী হিসাবরক্ষক।

Mukallaf al : দায়িত্বপ্রাপ্ত, আইনগতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত, যোগ্য।

Munafiq al : কপট, মুনাফিক।

*Muruah, al :*সাহস, বীরত্ব, মহানুভবতা।

Muzaraah, al : কৃষিকর্মে শরীকানা।

N

Nasihah, al : অযাচিতভাবে প্রদত্ত উপদেশ, যার অর্থ পারস্পরিক শুভকামনা।

Naskh, al : আরবী লিপি, গোটা হাতের লিখা।

Nisab, al : নির্ধারিত সর্বনিম্ন সম্পদ, যাকাতের জন্য অর্থসম্পদের সীমা।

Niyah, al : ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত, অভিপ্রায়।

Nizam, al : সাংগঠনিক, এবং লজিস্টিকাল যন্ত্র যার সাহায্যে সিদ্ধান্তকে স্পষ্টরূপ দেওয়া যায়।

O

OM : Om Main Padue Hum : পদ্মকূলের জহরতকে অভিনন্দন।

Othopraxies : বাস্তব ধর্ম-সঠিক আমল।

P

Paideia : সংস্কৃতি।

Par excellence : এর মধ্যে সর্বোত্তম।

Pax Islamica : ইসলামিক শান্তি।

Per contra : বিপরীতমুখী।

Per se : এর সাহায্যে, কিংবা এতে করে।

www.icsbook.info

Q

Qada, al : জনগণের আদালত।

Qadar, al : কর্মের সামর্থ।

Al qawaid al kulliyah : সাধারণ নিয়ম-কানুন।

Al qawaid al usuliyah al Tashrilyah : আইন প্রণয়নের সাধারণ নীতিমালা।

Qaem, al : গোত্র।

Qist, al : ন্যায়বিচার, সম-বিচার।

Quud al : বিরাম, অবকাশ, নিষ্কর্ম।

Qurba, al : স্বজন, আত্মীয়জন।

R

Raison d'etra : কোনো কিছুর অস্তিত্বের যুক্তি।

Rakhawi, al : মিশ্র লতাপাতা এবং জ্যামিতিক আরাবেস্ক।

Rami, al : গুলো ছোড়ার দক্ষতা।

Rshidum, al : সুপথে পরিচালিত।

Rasm, al : অংকন।

Reatus : বন্ধন।

Reizfahighkeit : মুগ্ধ করার সামর্থ্য।

Rerum natura : স্বাভাবিক জিনিস।

Riddah, al : ধর্মত্যাগ।

Rizq, al : আল্লাহ কর্তৃক বণ্টনকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা।

S

Saah, al : সময়, শেষদিন।

Sadaqah, al : বদান্যতা, দয়া দাক্ষিণ্য।

Sahabah, al : নবীর সহচরগণ।

Salaf al : পূর্ববর্তী জেনারেশনসমূহ।

Salah al : নির্ধারিত নামাজ বা প্রার্থনা।

Salat al jumiah : শুক্রবারের নামাজ।

Sawm, al : সংযম, রোজা।

Scandalon al : মনের সম্মুখে বাধা।

www.icsbook.info

Sensus communis : সামাজিক সংহতি।

Sha'b, al : জনগোষ্ঠি।

Shahadah, al (1) : ইসলামী বিশ্বাস ঘোষণা, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রেরিত পুরুষ।

Shahadah *al* (2) : শাহাদাত।

Sharh al Sadr : সন্তুষ্ট।

Shariah, al : শরীয়ত, ইসলামী আইন, আল্লাহর আইন।

Shirk, *al* : শিরক, আল্লাহর কোন শরীক করা।

Shuubiyah al : গোত্রবাদ।

Shura, al : পারস্পরিক আলোচনা।

Simpliciter : শাব্দিক অর্থে।

Sine qua non : অপরিহার্য।

Sirah, al : জীবনী গ্রন্থ, বিশেষতঃ মহানবীর জীবনবৃত্তান্ত।

Status quo : বিদ্যমান অবস্থা।

Sub specie eternitatis : চিরন্তন, কোন ঘটনা বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত শব্দ।

Sui generis : অনন্য।

Summum bonum : সর্বোত্তম মূল্যবোধ।

Sunan, al : আইন কানুন এবং প্যাটার্ণ।

Sunnah, al : মহানবীর তরিকা।

Surah : আল কুরআনের অধ্যায়।

T

Taakhi, al : ভ্রাতৃত্ববন্ধন, ভাই ভাই রূপে মানুষের ঐক্যবন্ধন, একইরূপ অধিকার এবং দায়িত্বসহ।

Taalm, al : পড়াশুনা, পাণ্ডিত্য।

Taawun, al : পরস্পর সহযোগিতা।

Talif al qulub : হৃদয়ের পুনর্মিলন।

Tatil, al : আল্লাহর গুণাবলীকে করা, সে সবের ব্যাখ্যার মাধ্যমে।

Tabdhir al : আতিশয্য, প্রশ্রয়দান।

Taghut, al : মিথ্যা ভগবান, প্রলোভনদাতা।

www.icsbook.info

Tahaabbub, al : পারস্পরিক ভালোবাসা।

Tahnnuth, al : শপথ ভঙ্গ করা।

Taklif, al : দায়িত্ব, নৈতিক দায়িত্ব।

Taqwa, al : ধার্মিকতা, সদাচারণ।

Targhib, al : এ জগতে কিংবা পরবর্তী জীবনে পুরস্কারের ওয়াদা।

Tarhib, al : শাস্তির ভয়, কষ্টভোগ এবং অসুখবিসুখের ভীতি প্রদর্শন।

Tasaduq wa al taannus Targhib, al : বন্ধুত্ব করা।

Tasawwuf, al : মরমীবাদ।

Tawasi, *al* : সান্ত্বনা প্রদান।

Tawazun, al : ভারসাম্য।

Tawfiyah, al : যেসব অক্ষর নিয়ে শব্দ গঠিত তার প্রত্যেকটিকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান, যাতে করে সমগ্রের সম্পর্কের মধ্যে অংশসমূহের সঙ্গে ভারসাম্য স্থাপিত হয়।

Tawhid, al : আল্লাহর একত্ব, ঐশিসত্তার একত্ব।

Tawriq, al : ফুল-লতাপাতার জিডাইন।

Tazawuj, al : আন্তঃবিবাহ।

Thawab al Akhirah : আখিরাতের পুণ্য।

Toto : সমগ্র।

Travail de singe : অগ্নিপরীক্ষা।

Tuhr, al : পবিত্রতা।

U

Ummah, al : বিশ্বাসী মুসলিম সম্প্রদায়।

Ummah wasat : মানবজাতির মধ্যে মধ্যপন্থীগণ।

Una substantia : একই পদার্থ।

Urubah, al : আরববাদ, আরব ভাবধারা এবং চরিত্র।

Urwah, al : পারিবারিক একক; শাব্দিক অর্থে বন্ধন।

Usrah, al : দশজন মুসলিমের এক দল, তাদের পরিবারবর্গসহ।

Usrah al : দশটি উরওয়াহ।

Untergang : পতন, অবক্ষয়।

www.icsbook.info

Usul al Fiqh : আইনশাস্ত্র, আইনবিষয়ক উৎসাদির মেথডোলজি অধ্যয়ন।

Usuliyun, al : উসুল ফিকাহের পণ্ডিতগণ।

V

Vis-a-vis : মুকাবিলায়, বিপরীত।

Voila : এখানে স্বচক্ষে দেখ, লক্ষ্য করো।

Vax Populi, Vox Dei : জনগণের কণ্ঠই ঈশ্বরের কণ্ঠ।

W

Wa Islamah : হায় ইসলাম! মর্মবেদনার প্রকাশ।

Wajib al : বাধ্যতামূলক।

Y

Yaqin al : সন্দেহের ছায়াপথহীন নিশ্চয়তা।

Yastakhlifukum : তিনি তোমাদের তাঁর খলিফা করেন বা করবেন।

Yawm al Hisab : বিচারের দিবস।

Z

Zukah al : দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদেরকে অতিরিক্ত সম্পদের একটা শতকরা অংশ দিয়ে পরিশোধন অর্জন।

Zann al : ধারণা, যা নিশ্চিত জ্ঞানের চাইতে দূর্বল।

Zawiyah al : দশটি উসরাহ।

Zigurrat : পীড়ামিডাকৃতি টাওয়ারের আকৃতিতে নির্মিত মন্দির।

Zinah al : আনন্দ, সৌন্দর্য।

Zulm al : অবিচার।

www.icsbook.info

BIIT AT A GLANCE

Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT) was founded in 1989 as a non-government research organization to conduct research and in-depth studies, among others, to identify the islamic perspective of different disciplines specially in higher education and to popularize the 'islamization of knowledge' program among students, teachers and researchers in Bangladesh In order to achieve its objectives, the organization undertakes the following activities:

- **Research**: In order to identify the Islamic approach in different disciplines of higher education, BIIT sponsors research programs under the supervision of senior faculties of public and private universities.
- **Translation**: In order to publicize the ideas and thoughts of major scholars of the world, BIIT takes initiative to translate the major books of prominent scholars written in Arabic and English into Bangla.
- **Publication**: BIIT publishes the original writings, research works, translation work and seminar proceedings which are used as reference for teachers, students, researchers and thinkers.
- **Library Service**: BIIT maintains a library which has a good number of rare books and journals including the publications of IIIT, USA. These books and journals are issued to professionals, university teachers, students and researchers on request.
- **Supply of Materials**: One of the major programs of BIIT is to collect and supply study materials on national, international and ummatic issues.
- **Series of Seminars & Lectures**: BIIT organizes seminars, symposiums, workshops, study circles, discussion meetings on contemporary issues related to thoughts on education, culture and religion.
- **Exchange Program**: To exchange information, ideas and views, BIIT organizes partnership programs with related organizations and individuals at home and abroad.
- **Distribution of Publications**: In order to disseminate knowledge, BIIT distributes the publications of IIIT and BIIT to concerned organizations and individuals.
- **Training Program**: BIIT conducts different types of training programs on various topics such as research methodology, English and Arabic language courses etc to improve the skills and efficiency of human resources.
- **Dialogue & Roundtable Discussion**: Dialogues on national and international issues particularly inter-faith issue, socio-economic issue are arranged by BIIT.

www.icsbook.info

লেখক পরিচিতি

মরহুম ড. ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী (১৩৩৯-১৪০৬/১৯২১-১৯৮৬) ইসলাম এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একজন অথরিটি হিসাবে সুপরিচিত। তার জন্মভূমি ফিলিস্তিনে কলেজ শিক্ষা সমাপনের পর তিনি বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনে বি.এ, ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন এবং পরে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলাম ও ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম ও ইহুদী ধর্মের উপর পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করেন। এ কারণে ইসলাম, খ্রীষ্টধর্ম ও ইহুদীধর্ম সম্পর্কে মুসলিম পন্ডিতদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

ইসলামিক স্টাডিজের ভিজিটিং অধ্যাপক এবং আবাসিক অধ্যাপক হিসেবে ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৩৭৮-১৩৮১/১৯৫৮-১৯৬১), করাচীর ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক রিসার্চের (১৩৮১-১৩৮৩/১৯৬১-১৯৬৩) অধ্যাপক হিসেবে, সিরাউজ বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৩৮৪-১৩৮৮/১৯৬৪-১৯৬৮) সহকারী অধ্যাপক হিসেবে এবং টেম্পল ইউনিভার্সিটিতে (১৩৮৮-১৪০৬/১৯৬৮-১৯৮৬) ধর্ম বিষয়ক অধ্যাপক হিসেবে কাজ করার সময় তিনি বহু আন্তর্জাতিক জার্নাল ও ম্যাগাজিনে শতাধিক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেন। তার গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে- *Historical Atlas of Religions of the World; Trialogue of the Abrahamic Faiths; Christian Ethics; A Historical and Systematic Analysis of its Dominant Ideas and a monumental work entitled The Cultural Atlas of Islam.*

তিনি ইসলামী বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং অধ্যাপক ও উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছেন। বর্তমান গ্রন্থ 'আত তাওহীদ'এই মহামনীষীর ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণে তার অবদানের একটি ভগ্নাংশ মাত্র।

অনুবাদক পরিচিতি

কথাশিল্পী, অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রবন্ধকার অধ্যাপক শাহেদ আলী, সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর থানার মাহমুদপুর গ্রামে ১৯২৫ সালের ৩০ মে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের পাঠশালায় হাতে খড়ি। বৃত্তিসহ মাহমুদপুর প্রাইমারী স্কুল ও মধ্যনগর এম. ই. স্কুল সুনামগঞ্জ সরকারী জুবিলী হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। সিলেট এম. সি. কলেজ থেকে ডিষ্টিংশনসহ বি.এ এবং ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাশ করেন।

তিনি বগুড়া আজিজুল হক কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, চট্টগ্রাম সিটি কলেজ, নারায়ণগঞ্জ তুলারাম কলেজ, ঢাকার আবুজর গিফারী কলেজ ও সরকারী বাংলা কলেজে অধ্যাপনা করেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থ প্রায় ৩০টি। তার বিখ্যাত অনুবাদগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ মক্কার পথ, ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালন মূলনীতি, হিরোডোটাসের *The History, History of Political Theory, Fundamentals of Economics, Daily Life in Ancient Rome*। তাঁর প্রবন্ধ পুস্তকগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ তাওহীদ, বুদ্ধির ফসল, আত্মার আশিস, জীবন নিরবচ্ছিন্ন, একমাত্র পথ, তরুণের সমস্যা, তরুণ মুসলিমের ভূমিকা প্রভৃতি। তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার, পাকিস্তান সরকারের তমগায়ে ইমতিয়াজ, ভাষা আন্দোলন পদক, নাসির উদ্দিন স্বর্ণ পদক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল স্টুডেন্টস এওয়ার্ড ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ ইসলামিক দুবাই সাহিত্য পুরস্কার, ফরুখ আহমদ স্মৃতি পুরস্কার, রাগীব রাবেয়া সাহিত্য পুরস্কার, ইত্যাদিতে ভূষিত হন।

১৯৫৪-৫৮ সময়কালে তিনি প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। তিনি বাংলা একাডেমীর ফেলো, আন্তর্জাতিক পি.ই.এন এর সদস্য, চেয়ারম্যান, আবুজর গিফারী সোসাইটি, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আবুজর গিফারী কলেজ। তিনি *International Conference on Education and Culture in the Islamic World* এ অংশগ্রহণ ও পেপার উপস্থাপন করেন, তিনি আজীবন সদস্য, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট। তিনি ইউরোপ ও এশিয়ার বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন।